ও৩ম্

বেদ মন্ত্রের উপদেশ

(বৈদিক সম্পত্তি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

প্রস্তুতকরণে - আশীষ আর্য

প্রত্যুষ্টংরক্ষঃ প্রত্যুষ্টাऽঅরাতয়ো নিষ্টপ্তংরক্ষো নিষ্টপ্তাऽঅরাতয়ঃ । উর্বন্তরিক্ষমন্বেমি ।।৭।।

ওঁতম্

ওঁম্
অগ্নি
বায়ু
আদিত্য
অঙ্গিরা
ঋগ্বেদ
য়জুর্বেদ
সামবেদ
অথর্ববেদ

বায়ু
আদিত্য
অগ্নি
অঙ্গিরা
ব্রহ্মা
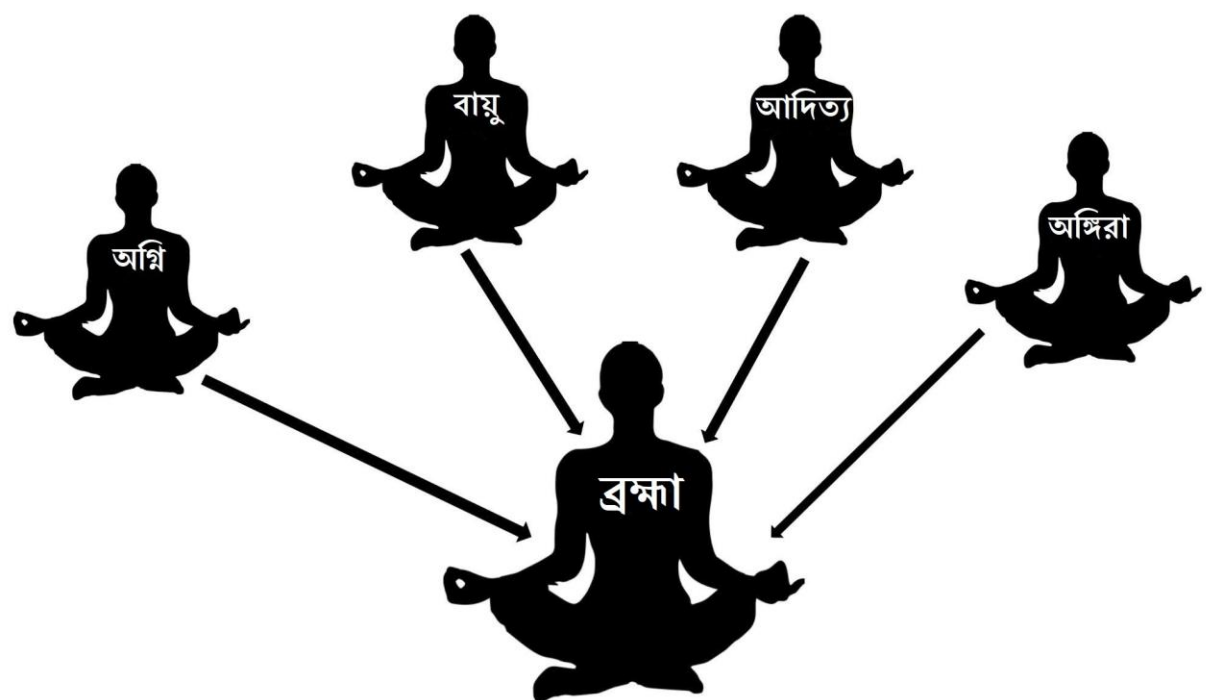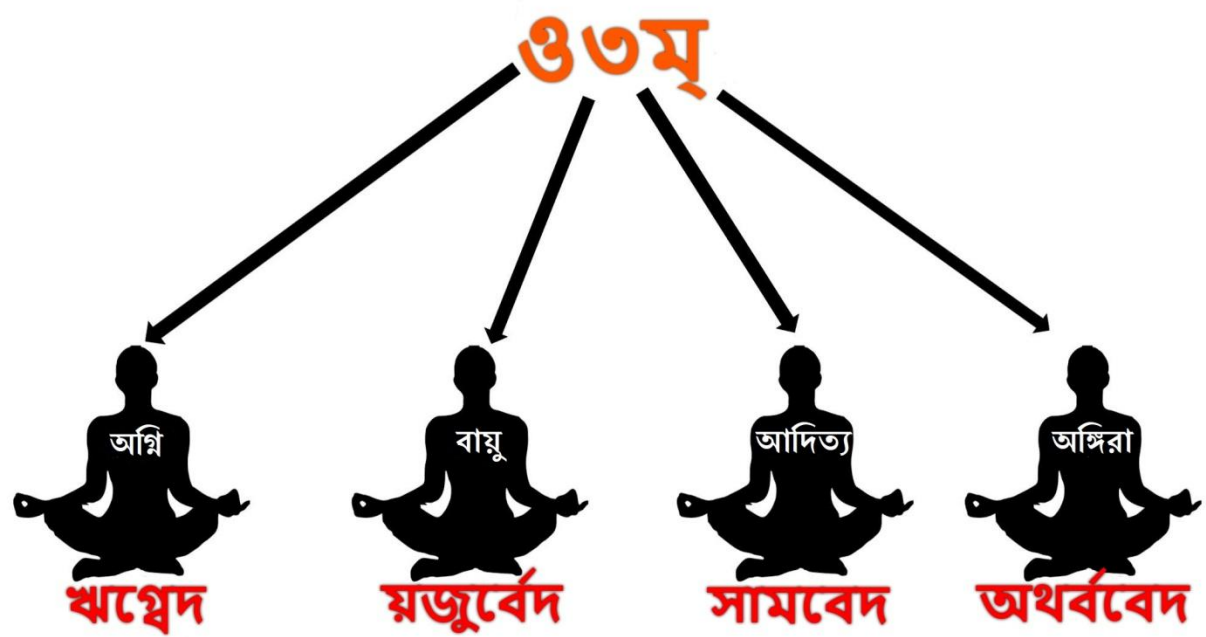
"বৈদিক সম্পত্তির"

সুযোগ্য লেখক
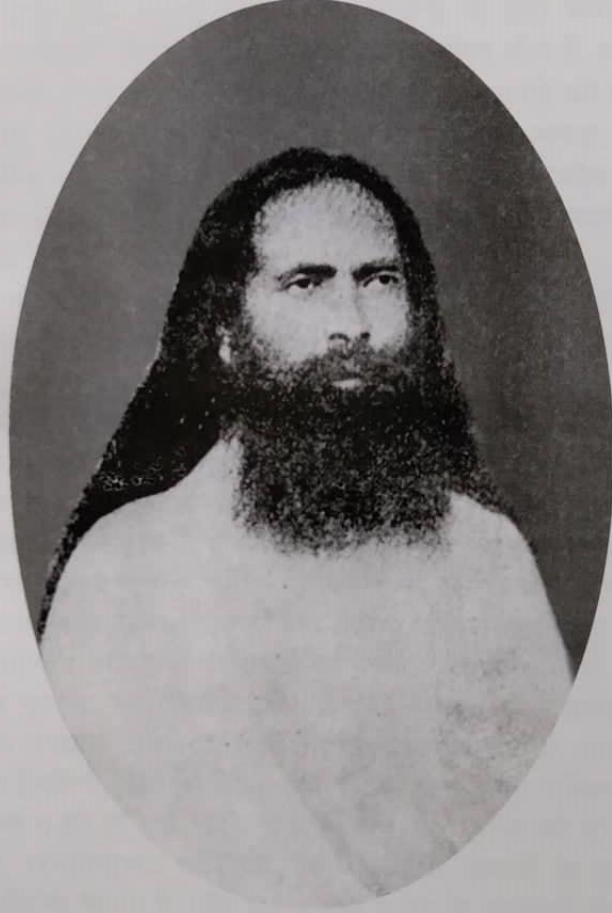
স্ব০ প০ রঘুনন্দন শর্মা

সাহিত্য - ভূষণ

'অক্ষর বিজ্ঞান' সম্পাদক

অনুক্রমণিকা

বেদ মন্ত্রের উপদেশ

প্রায়শই লোকে বলে থাকে যে মানুষের যত জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে সেসব জ্ঞান বেদে - সংহিতাগুলোতে নেই, অর্থাৎ আমাদের ব্যবহারে আসা এরকম অনেক বিষয় রয়েছে যার বর্ণনা বেদে নেই, এইজন্য বেদের সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য গ্রন্থের শিক্ষাও না সম্মিলিত করা হয় ততক্ষন পর্যন্ত মানব সমাজের কাজ নির্ধারিত হবে না। কথাটা শুনতে যদিও ঠিক মনে হয়, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলেই এই অভিযোগে কিছুই দম দেখা যায় না, কারণ সেই অভিযোগ বর্তমান সমাজের কল্পিত ব্যবহারকে দেখে উৎপন্ন করা হয়েছে আর বৈদিক শিক্ষার বাস্তবিক স্বরূপে ধ্যান দেওয়া হয়নি। বৈদিক শিক্ষাতে ন্যূনতা দেখতে পাওয়ার প্রধানতঃ এই তিনটি কারণই রয়েছে - প্রথম কারণ এই হল যে, আমরা যেসব বিষয়কে, প্রথাকে, ক্রিয়াকলাপকে যতটা গুরুত্ব দিয়ে রেখেছি, বেদের দৃষ্টিতে সেসব ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা দত্তক আদি পুত্রকে নিয়ে নিজের সম্পত্তির স্বামী বানানোর রীতিকে ধর্মশাস্ত্রে লিখে রেখেছি, কিন্তু বেদ এই প্রথাকে স্থান দেয় না। এর কারণ হল এটাই যে বৈদিক ধর্মানুসারে কোনো ব্যক্তি কোনো সম্পত্তির বংশপরম্পরাগত স্বামী হতে পারবে না। দ্বিতীয় কারণ এই হল যে, শাখাপ্রচারকেরা বেদের মন্ত্রগুলোকে মন মতো স্থানে রেখে দিয়েছে, যারফলে পুরো প্রকরণের বিষয়ই বোঝা যায় না। ফলে পরিণাম এই হয় যে অনেক বিষয়ে আমরা প্রবেশই করতে পারি না। এইভাবে তৃতীয় কারণ হল বেদের অনেক শব্দের অর্থের সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা। বেদে সহস্র শব্দ এরকম রয়েছে যার ঠিক-ঠিক অর্থ জ্ঞাত হয় না। এরথেকেও অনেক বিষয়ের জ্ঞান যথার্থরূপে আমাদের কাছে পৌঁছায় না, এইজন্য বেদে যদি কোনো মনুষ্যোপয়োগী আবশ্যক বিষয়ের প্রত্যক্ষ বর্ণনা না দেখা যায় তো তার তাৎপর্য মোটেও এটা নয় যে বেদে তার বীজই নেই।

বেদের সমস্ত শব্দের অর্থের বিস্ফোটন করে আর সমস্ত মন্ত্রকে বিষয়বার এক জায়গায় একত্র করে কিছু দিন মন লাগিয়ে স্বাধ্যায় করলে বেদের মধ্যে মনুষ্যোপয়োগী সমস্ত আবশ্যক জ্ঞান বীজরূপে বের হতে পারে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যেক সময়ের যোগ্য, প্রত্যেক মানুষ বা সমাজের যোগ্য আর প্রত্যেক স্থানে ব্যবহারের যোগ্য বিষয় বেদ হতে বের হওয়া সম্ভব নয়। এর কারণ হল এই যে বেদের মধ্যে প্রাবেশিক জ্ঞানেরই শিক্ষা রয়েছে, কল্পিত জ্ঞানের নেই। যদি আমরা আমাদের কল্পিত প্রথাকে সরিয়ে দেই আর শব্দার্থকে খুলে আর মন্ত্রের বিষয়বার করে পড়ি তাহলে তারথেকে এত শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে যে যারদ্বারা মানুষের বুদ্ধি এই যোগ্য হয়ে যাবে যে সে তার নিজের সমস্ত কাজ করতে পারবে, কিন্তু যেসব বিষয়গুলোকে বেদ অনাবশ্যক মনে করেছে সেসব বিষয় বেদ হতে বের হওয়া সম্ভব নয়, সেটাকে আমরা যতই আমাদের সমাজে কর্মধর্মতে সম্মিলিত করে থাকি না কেন।

উদাহরণ স্বরূপ দত্তক পুত্রের মতো য়জ্ঞোপবীতকেও ধরে নিন। সংহিতাতে য়জ্ঞোপবীতের জন্য সূতা, রেশম, উল আদির বর্ণনা নেই। সেখানে মেখলার চর্চাই রয়েছে, মেখলার অর্থ হল ঘেরা, কোনো পদার্থকে গলা অথবা কোমরে এক ঘেরা - মালা পড়িয়ে দেওয়া, অর্থাৎ চিহ্নমাত্র করে দেওয়া। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্যদের জন্য সূতোয় ভেদ করে দেওয়া হয়, কিন্তু য়জ্ঞোপবীত কতটা লম্বা হবে এটা তারাও বলেনি। এটা আধুনিক গ্রন্থই বাড়িয়েছে। যদিও এইভাবে কয়েকবার বিধি বাড়ানো হয়েছে তথাপি য়জ্ঞোপবীতে কয়টি গিঁট হবে আর তা কার হাত দ্বারা মাপতে হবে আদি বিষয় যদিও রয়েগেছে। এইভাবে কানে চরানো বা মাথায় মুড়িয়ে রাখা আদি কথা রয়েগেছে, যাকে খুবই আধুনিক সাহিত্য পূরণ করে দিয়েছে। এটার তাৎপর্য কি? এটার তাৎপর্য হল এটাই যে, আমরা আমাদের প্রথা যেভাবে-যেভাবে বাড়াতে থাকি ঠিক সেভাবে-সেভাবে সেই কল্পিত প্রথাকে পুষ্ট করার জন্য বিধিবাক্যও লিখতে থাকি। মানে আগে-আগে আমরা আর পেছন-পেছন শাস্ত্র দৌড়াচ্ছে। আমরা শাস্ত্রের অনুসারে চলছি না বরং শাস্ত্র আমাদের কল্পনার অনুসারে চলছে, কিন্তু এই দশা বেদের নেই। বেদ কোনো প্রথার পরে হয়নি, বরং সেটাই আবশ্যক প্রথার জন্ম দিয়েছে। য়জ্ঞোপবীতের জন্য বেদ এটাই আবশ্যক মনে করে যে অন্য কুলে গেলে, বিদ্যারম্ভ করলে আর মানব শরীরের অন্তিম ধ্যায়কে প্রাপ্ত কারক ব্রতকে ধারণ করলে আবশ্যক হবে যে তাকে এমন কোনো চিহ্ন দেওয়া হোক যাতে তাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সমাজ তাকে সেই চিহ্ন দ্বারা জানতে পারে, যারদ্বারা তাকে শিক্ষা, সৎকার আর সহায়তা আদি দিতে সুবিধা হয়। এই চিহ্ন যেমনই হোক না কেন, কিন্তু শরীরে সর্বদাই যেন থাকে। সেটা একটা মালা, অর্থাৎ মেখলার রূপেই অধিক উপযোগী হতে পারে আর কোমরে, গলাতে অথবা কাঁধেই সেটা রাখা অধিক উচিত বলে মনে হয়। এইকারণেই পারসী লোকেরা এটিকে কোমরেই বাঁধে। পুরাতন কালে অনেক বৈদিক আর্যও পরিকর বন্ধনের মতো সেটি পরতো (লোকমান্য তিলক মহোদয় একথা "ওরায়ন" গ্রন্থে সপ্রমাণ লিখেছেন), কিন্তু শাখাভেদে যেরকম - যেরকমভাবে পড়াশোনার শৈলী পরিবর্তিত হতে থাকে আর গোত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে সেরকম-সেরকমভাবে উপবীতের ঢংও পরিবর্তিত হয়ে যায় আর ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। য়জ্ঞোপবীত আজকাল যে অবস্থাতে এসে পৌঁছেছে যদি সেই সমস্ত দশা আপনি বেদে খুঁজতে চান তবে পাবেন না। যুবক পড়তে যাবে আর তার মামা তাকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, এই বিধির উপর না তো কোনো সংহিতার শ্রুতি রয়েছে, না ব্রাহ্মণগ্রন্থের গাঁথা, না সূত্রের সূত্র রয়েছে, আর না রয়েছে নির্ণয়সিন্ধুরের কোনো নদী। এরজন্য তো আল্হখণ্ডতেও প্রমাণ পাওয়া যাবে না। বলার তাৎপর্য হল এই যে বেদকে নিজের প্রথার গুলাম বানানো উচিত নয়। বেদের মধ্যে যেসব শিক্ষা বীজরূপে রয়েছে তাকে ঋষিগণ সুবিধার জন্য বিস্তারপূর্বক লিখে নিজেদের সময়ে সদা প্রচলিত করেছেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থের পূর্বেও একটি মহান্ সাহিত্য ছিল সেটির মধ্যেও কিছু ছিল, এখনও কিছু রয়েছে আর পরবর্তীতেও কিছু থাকবে, কিন্তু বেদ এসবের উত্তরদাতা নয়। তাতে তো যা রয়েছে সেটা এতটাই যে মানুষের বুদ্ধিকে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্য বানিয়ে তোলে আর এরকম যোগ্য বানিয়ে তোলে যে মানুষ তার নিজের ভালোর নিয়মগুলোকে সেই বীজের অনুসারে বানিয়ে নেয়।

এইভাবে মূল আর ভাষ্য সর্বদা একত্রেই হতে থাকে, কিন্তু ভাষ্য মূল হয়ে যায় না। মনু বৈবস্বতের সময়েই বেদের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, কিন্তু সেই সময়ে ব্রাহ্মণও বানাতে হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই যে বেদে কোথাও লেখা নেই যে অমুক কাজ করার সময় অমুক মন্ত্র পড়, কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থে রয়েছে। এতে জানা গেল যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলো এক নতুন পদ্ধতি এটা তৈরি করেছে যে কোনো কাজ মৌন হয়ে করা হবে না,

প্রত্যুত মন্ত্র বলেই করা হবে। এতে কোনো পাপ ছিল না আর তাই এতে কোনো আপত্তিও হয়নি, কিন্তু যদি কেউ মার্জন করার সময় "আপো হিষ্ঠা" না পড়ে তবে তার মার্জন খারাপ হবে না আর স্নানের সময়ে যদি কেউ "গঙ্গাষ্টক" না পড়ে তবে তার স্নানে কোনো ত্রুটিও হবে না, কারণ স্নান আলাদা বিষয় আর মন্ত্র পড়ে স্নান করা আলাদা বিষয়। না তো পূর্বেরটিতে কোনো পাপ রয়েছে আর না পরেরটিতে কোনো পুণ্য, কিন্তু প্রশ্ন হল তো এটা যে আজ্ঞা আর বিধির পালন কিভাবে করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তর সর্বদা এটা হল যে বেদের বীজরূপ সূচনাতে বিদ্বানগণের বিচার দ্বারা বিধি নির্ধারিত হোক সেটাই কর্তব্য ধরে নেওয়া হবে, কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে যে বেদের সূচনা অপরিবর্তনশীল আর দ্বিতীয়ত বিদ্বানগণের বিচার হল পরিবর্তনশীল। প্রথমটিতে কারও মতভেদ হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে হতে পারে, যজ্ঞোপবীত হল প্রথম পক্ষ এতে মতভেদ হবে না, কিন্তু কখন করা উচিত এতে মতভেদ হতে পারে। এইজন্য গৃহসূত্রতে কেউ বলেন যে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত বসন্তে করা উচিত আর কেউ বলেন যে সব ঋতুতে করা উচিত। বেদের আজ্ঞা আর বিদ্বানগণের বিধিতে প্রথম কথাটি দ্বিতীয় কথাটির উপর নির্ভর নয়, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটির উপর নির্ভর করে। যজ্ঞোপবীত মাঘে হোক অথবা পৌষে কিন্তু হোক অবশ্যয়ই এটাই হল তাৎপর্য। এর উপরও প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে যে, মাঘ আর পৌষের নির্ণয়ও বেদ কেন করে দেয়নি আর রেশম তথা সূতের বিধিও কেন বলে দেয়নি? এতে আমার বিনম্র হল এই যে, যেসব বৈদিক শিক্ষা সমস্ত পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষদের জন্য রয়েছে সেখানে এই প্রকারের বর্ণনা হতেই পারে না, কারণ জেলা-জেলার পরিস্থিতি ভিন্ন-ভিন্ন রয়েছে, পদার্থের উপজ ভিন্ন-ভিন্ন রয়েছে আর ঋতুর প্রভাব আলাদা-আলাদা রয়েছে। এরকম দশাতে যদি সবকিছু বেদই লিখতে বসে তবে বেদের পুস্তক তো এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালোয় হয়ে যাবে, বেদের গৌরব আর মানুষের স্বাধীন চিন্তাতে বিঘ্ন উৎপন্ন হয়ে যাবে, ধর্ম আর আপদ্ধর্মে কোনো পার্থক্যই থাকবে না আর সংকটের সময় মানুষ তার সমাধানই চিন্তা করতে পারবে না, এইজন্য ক্রিয়াকলাপ, আপদ্ধর্ম আর মানুষের সাময়িক উপযোগিতার বিস্তৃত বর্ণনা না করাতে বেদকে অপূর্ণ ভাবাটা উচিত হবে না। বেদ হল পূর্ণ, যা পরলোকের পূর্ণ আর বিস্তৃত শিক্ষা দেয় তথা এই লোকের শিক্ষাতে মানুষকে এমন যোগ্য বানিয়ে তোলে যে তার একটাও আবশ্যক কাজ কখনও থেমেই থাকে না।

উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে বেদের কিছু সরলার্থ মন্ত্রকে উদ্ধৃত করে দেখাবো যে বেদ প্রত্যেক আবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা কিভাবে দেয়। এখানে আমি এক-একটি বিষয়ের দুটি-দুটি, চারটি-চারটি করে মন্ত্রই দিব।এটা হল বেদ বিষয়ের এক সূচীমাত্রই। এই বিষয়গুলোর সম্বন্ধজনিত বেদে অনেক মন্ত্র রয়েছে, কিন্তু সবকটি লেখার আবশ্যকতা নেই। আমি এই মন্ত্রসূচী আর বিষয়প্রতিপাদনে নিজের মতো করে ক্রম দিয়েছি। এই ক্রম দ্বারা বেদের জ্ঞানের স্পষ্টতা হবে। সর্বপ্রথম আমি মানুষের ইচ্ছার মন্ত্র লিখেছি। মানুষের সমস্ত ইচ্ছাগুলোর সমাবেশ বড়-বড় সাতটি স্তম্ভে হয়ে যায়। এই ইচ্ছাগুলো গৃহস্থাশ্রম দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে, এইজন্য আমি ইচ্ছাগুলোর পরে গৃহস্থাশ্রমের মন্ত্র লিখেছি। গৃহস্থের নির্বাহ বিনা উত্তম সামাজিক ব্যবস্থার ধারণ করা ছাড়া হতেই পারে না, কারণ মানুষ হল সামাজিক প্রাণী, এইজন্য আমি তৃতীয় ক্রমে সামাজিক ব্যবহারের মন্ত্র দিয়েছি, কিন্তু সেই ব্যক্তি ভালো সামাজিক ব্যবহার করতে পারবে না যদি সদাচারী না হয়,

এইজন্য আমি চতুর্থ স্থানটিতে সদাচারের মন্ত্র দিয়েছি। সদাচার কখনও সুদৃঢ় হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের গর্ভ থেকে শুরু করে যজ্ঞোপবীত, অর্থাৎ আচার্যকুলবাস পর্যন্ত সংস্কার দ্বারা সুসংস্কৃত না করা হয়, এইজন্য আমি সংস্কারের মন্ত্রকে পঞ্চম স্থান দিয়েছি। সংস্কার দ্বারা সদাচারের পুষ্টি হয়ে থাকে আর সমাজ পবিত্রও হয়, কিন্তু বিনা জীবিকাতে তার নির্বাহ হবে না, এইজন্য আমি ষষ্ঠ স্থানে জীবিকার মন্ত্র রেখেছি। এটিতে ভৌগলিক জ্ঞান আর ব্যবসা সম্বন্ধিত সমস্ত বিষয় এসে গেছে। জীবিকার পূর্বে সমাজের রক্ষার প্রশ্নটি আসে। রোগ থেকে শরীর রক্ষা, কলহ আর পাপ থেকে সমাজরক্ষা আর বাহ্য শত্রুদের থেকে রাষ্ট্ররক্ষা করতে হয়, এইজন্য আয়ুর্বেদ, যজ্ঞ আর রাজ ব্যবস্থার মন্ত্রগুলোকে একত্রিত করে জীবিকার পরে সপ্তম স্থানে রেখেছি। এরপর পরলোক চিন্তার মন্ত্র রয়েছে। এটিতে সর্বপ্রথম বার্তা সৃষ্টির উৎপত্তির রয়েছে। সৃষ্টি উৎপত্তির কারণের সমূহই হল পরলোক, এইজন্য আমি পরলোক সম্বন্ধিত জীব, ব্রহ্ম, বন্ধ, মোক্ষ আর পুনর্জন্ম আদি বিষয়ের মন্ত্রের সমাবেশ অষ্টম স্থানে করেছি। এইপ্রকারে সারাংশরূপে আমি লোক-পরলোক সম্বন্ধিত প্রায় সকল বিষয়ের মন্ত্র লিখে দিয়েছি। আমার অনুমান হল যে যত বিষয়ের মন্ত্র আমি দিয়েছি তত বিষয়ে প্রবেশ হয়ে গেলে মানুষের বুদ্ধি এত যোগ্য হয়ে যাবে যে সে নিজের ভালো-মন্দ, লাভ-হানী নিয়ে ভাববে আর নিজের উন্নতি করতে পারবে।

মানুষের ইচ্ছা

সর্বপ্রথম মানুষের ইচ্ছাগুলোকে লক্ষ্য করুন। মানুষের ইচ্ছা হল সাত ভাগে বিভক্ত। যথা -

(১) অনেক দিন বেঁচে থাকার ইচ্ছা

(২) স্ত্রী, পুত্র, রতি, শোভা, শৃঙ্গারের ইচ্ছা

(৩) আহার-পানাদি করতে, বস্ত্র পরিধান করতে, সাজ-সজ্জা, ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, বাগান, জমি আর ক্ষেত তথা পশু আদির ইচ্ছা

(৪) গৌরব এবং খ্যাতি আদির ইচ্ছা

(৫) বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান আর জানার ইচ্ছা

(৬) তার সঙ্গে কেউ যেন অন্যায় না করে, অর্থাৎ ন্যায়ের ইচ্ছা আর

(৭) বার-বার জন্মমরণের দুঃখ থেকে বেরিয়ে মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা মানবমাত্রের হয়ে থাকে।

বেদ গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা এই ইচ্ছাগুলোর পূর্তির জন্যই নিত্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার উপদেশ করেছে। গায়ত্রীর মহত্ব বর্ণনাতে অথর্ববেদ ১৯|৭১|১ তে বলা হয়েছে যে -

স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্র চোদয়ন্তাম্ পাবমানী দ্বিজানাম্।

আয়ুঃ প্রাণম্ প্রজাম্ পশুম্ কীর্তিম্ দ্রবিণম্ ব্রহ্মবর্চসম্।

মহ্যম্ দত্ত্বা ব্রজত ব্রহ্মলোকম্।।

অর্থাৎ - প্রচোদয়াত্ পদান্তকারী আর দ্বিজদের পবিত্রকারী বেদমাতা গায়ত্রীর আমি এইজন্য স্তুতি করি যেন সে আমায় আয়ু, বল, প্রজা, পশু, কীর্তি, ধন আর বৈদিক জ্ঞান দিয়ে ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ মোক্ষপদে পৌঁছে দেয়।

এই আদেশ দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে যে মানবমাত্রের এই ইচ্ছা হল স্বাভাবিক। ফ্রিনোলজিগণও বলেন যে মস্তিষ্কের মধ্যে জ্ঞান, খ্যাতি, অর্থ, কাম, আয়ু, বিজ্ঞান আর ন্যায়ধর্মেরই প্রধান সাতটি স্থান রয়েছে। অন্য স্থান তো এরই অন্তর্গত, আর এরই শাখা। এতে জ্ঞাত হয় যে এই শাখাগুলো হল নৈসর্গিক। এই সবগুলোর মধ্যে দীর্ঘজীবনের ইচ্ছাটি হল সর্বপ্রথম, এইজন্য সবার আগে আমি দীর্ঘজীবনেরই মন্ত্রের উদাহরণ দেখাচ্ছি। য়জুর্বেদে লেখা রয়েছে যে -

শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা য়ত্রা নশ্চক্রা জরসন্তনূনাম্।
পুত্রাসো য়ত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যারীরিষতায়ুর্গন্তোঃ।।

(য়জুঃ ২৫|২২)

অর্থাৎ - হে বিদ্বানগণ! মানুষের আয়ু শত বর্ষ নির্ধারিত, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শরীরের জরা অবস্থান না হয়ে যায় আর আমাদের পুত্রও পিতা না হয়ে যায় ততক্ষণ আমরা জীবিত থাকি, অর্থাৎ শত বর্ষের ভিতর আমাদের আয়ু যেন ক্ষীণ না হয়ে যায়।

এরকমটা নয় যে, আমরা যেমন-তেমনভাবে শত বর্ষ বাঁচবো, বরং আরোগ্যতা আর বলের সঙ্গে বাঁচবো, যেমনটা লেখা রয়েছে -

তুচ্চক্ষুর্দেবহিতম্ পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরত্।
পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতঁশৃণুয়াম শরদঃ শতম্ প্রব্রবাম
শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম্ ভূয়শ্চ শরদঃ শতাত্।।

(য়জুঃ ৩৬|২৪)

অর্থাৎ - সেই পরমাত্মা হলেন সর্বদ্রষ্টা, উপাসকদের কল্যাণদাতা ও পবিত্র। তাঁর কৃপায় আমি যেন শত বর্ষ চোখ দিয়ে দেখি, শত বর্ষ কান দিয়ে শুনি, শত বর্ষ কথা বলতে পারি, শত বর্ষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে থাকি এবং শত বর্ষেরও অধিক আনন্দে বাঁচতে পারি।

বেদে দীর্ঘজীবনের এইরকম ইচ্ছার পরে কামের ইচ্ছার বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

কামস্তদগ্রে সমবর্তত মনসো রেতঃ প্রথমম্ য়দাসীত্।
স কাম কামেন বৃহতা সয়োনী রায়স্পোষম্ য়জমানায় ধেহি।।

(অথর্বঃ ১৯|৫২|১)

অর্থাৎ - যে "কাম" মনের মধ্যে বীজরূপে রয়েছে, তা পূর্বে হয়েছে। হে কাম! তুমি অনেক বড় কামের বিস্তার করে দিয়েছ, এইজন্য এখন ধন দাও।

প্রিয়ো দেবানাম্ ভূয়াসম্।। প্রিয়ঃ প্রজানাম্ ভূয়াসম্।।

প্রিয়ঃ পশূনাম্ ভূয়াসম্।। প্রিয়ঃ সমানানাম্ ভূয়াসম্।।

(অথর্বঃ ১৭|১|২-৫)

অর্থাৎ - দেবগণের জন্য, প্রজাগণের জন্য, পশুদের জন্য আর পদার্থের জন্য আমি যেন প্রিয় হই। কামনা সম্বন্ধিত এই দুটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, মন আর রেতই হল কামের মূল। এই কামনা দ্বারাই পরবর্তীতে পুত্রাদির বড়-বড় কামনাগুলো উৎপন্ন হয় আর এরজন্যই সাজ-সজ্জা, চয়ন, শোভা, শৃঙ্গার আর ঠাট-বাটে ভরা জীবনের আবশ্যকতা হয়ে থাকে। এসবের মূলই হল মন আর রেত, অর্থাৎ রতি। প্রজা, পশু আর অন্নাদি ধনের দিশায় বিশেষ প্রবৃত্তি রতিই উৎপন্ন করায়, কারণ দীর্ঘজীবন আর কামজন্য স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য ধনের ইচ্ছা হয়ে থাকে। মানুষের এই ধনের ইচ্ছা কিরকম থাকে তার উদাহরণ বেদ নিম্ন মন্ত্রে দিয়েছে-

একপাদ্ভূয়ো দ্বিপদো বি চক্রমে দ্বিপাত্ত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
চতুষ্পাদেতি দ্বিপদামভিস্বরে সম্পশ্যন্‌পঞ্ক্তীরুপতিষ্ঠমানঃ।।

(ঋঃ ১০|১১৭|৮)

অর্থাৎ - এক গুণ ধনের অধিকারী তার থেকে দ্বিগুণ ধনের অধিকারীর মার্গকে আক্রমণ করে, দ্বিগুণ ধনের অধিকারী ত্রিগুণ ধনের অধিকারীর পিছনে দৌড়ায় আর চতুর্গুণ ধনের অধিকারী তার থেকে দ্বিগুণ ধনীর মহত্বকে প্রাপ্ত করে, অর্থাৎ মনুষ্য ধনীদের দেখে প্রতিযোগিতা করে অধিকাধিক ধন প্রাপ্ত করার ইচ্ছা করে থাকে।

এই ধনের ইচ্ছার পরে সম্মানের ইচ্ছা হয়ে থাকে। বেদে সম্মানের ইচ্ছার উদাহরণ এইরকম দেখানো হয়েছে -

য়থা সূর্য়ো অতিভাতি য়থাস্মিন্তেজ আহিতম্।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।
তেজসা মা সমুক্ষতু য়শসা সমনুক্ত মা।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।
য়থা য়শশ্চন্দ্রমস্যাদিত্যে চ নৃচক্ষসি।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।
য়থা য়শঃ পৃথিব্যাম্ য়থাস্মিঞ্জাতবেদসি।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।
য়থা য়শঃ কন্যায়াম্ য়থাস্মিন্ত্সম্ভৃতে রথে।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।
য়থা য়শঃ সোমপীথে মধুপর্কে য়থা য়শঃ।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।
য়থা য়শোऽগ্নিহোত্রে বষটকারে য়থা য়শঃ।

এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।

য়থা য়শো য়জমানে য়থাস্মিন্ য়জ্ঞ অহিতম্।

এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।

য়থা য়শঃ প্রজাপতৌ য়থাস্মিন্ পরমেষ্ঠিনি।

এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।

য়থা দেবেষ্বমৃতম্ য়থৈষু সত্যমাহিতম্।

এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিম্ ভূতিম্ নিয়চ্ছতু।।

(অথর্বঃ ১০|৩|১৭-২৫)

অর্থাৎ - যে প্রকারে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, ব্রহ্মচারিণী কন্যা, মধুপর্ক আর সোমপান প্রাপ্ত বিদ্বান, অগ্নিহোত্রী, য়জ্ঞকারী, য়জমান (অতিথিসেবক), পরমেষ্ঠি আর প্রজাপতি য়শ (গৌরব) আর কীর্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, ঠিক সেই প্রকারের কীর্তি, তেজ আর গৌরব আমারও প্রাপ্ত হোক।

এই মন্ত্রগুলোতে গৌরব, কীর্তি আর সম্মানের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, কারণ লেখা হয়েছে যে **"সর্বে নন্দন্তি য়শসা"** (ঋঃ ১০|৭১|১০), অর্থাৎ সকলে গৌরব দ্বারা আনন্দ পায়। এই সম্মানের ইচ্ছার পরে বেদের মধ্যে জ্ঞানের ইচ্ছার বর্ণনা এই প্রকারে রয়েছে -

য়াম্ মেধাম্ দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে।

তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনম্ কুরু।।

মেধাম্ মে বরুণো দদাতু মেধামগ্নিঃ প্রজাপতিঃ।

মেধামিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মেধাম্ ধাতা দদাতু মে।।

(য়জুঃ ৩২|১৪-১৫)

অর্থাৎ - যে মেধাকে সকল বিদ্বান ও অভিজ্ঞ পুরুষেরা উপাসনা করেন। হে পরমেশ্বর! আমাকেও সেই মেধার সহিত যুক্ত করো। বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ইন্দ্র, বায়ু আর পরমাত্মা আমাকে সেই মেধা দিবে, অর্থাৎ এইসব পদার্থের জ্ঞান আমার শীঘ্র হোক। এইজন্য -

মনসে চেতসে ধিয় আকূতয় উত চিত্তয়ে।

মত্যৈ শ্রুতায় চক্ষসে বিধেম হবিষা বয়ম্।।

(অথর্বঃ ৬|৪১|১)

অর্থাৎ - মন, অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, জ্ঞানশক্তি, আগ্রহ, শ্রবণশক্তি, আর দৃষ্টিশক্তির উন্নতির জন্য আমরা সকলে য়জ্ঞকর্ম করবো।

এই জ্ঞানেচ্ছার পরে বেদের মধ্যে ন্যায়ের ইচ্ছা এই প্রকারে বলা হয়েছে -

দেহি মে দদামি তে নি মে ধেহি নি তে দধে।

নিহারম্ চ হরাসি মে নিহারম্ নিহরাণি তে।।

(য়জুঃ ৩|৫০)

অর্থাৎ - তুমি আমায় দাও আর আমি তোমায় দিই।তুমি উত্তম গুণ আমার মধ্যে ধারণ করো আর আমি তোমার মধ্যে ধারণ করি। এটা আমি নিই আর এটা তুমি নাও, অর্থাৎ পরস্পর ন্যায়যুক্ত ব্যবহার হোক। ন্যায়ের কিরকম সুন্দর আদর্শ! এরপর পরমপদের ইচ্ছার বর্ণনা এই প্রকারে রয়েছে -

বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তমাদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাত্।
তমেব বিদিত্বাऽতি মৃত্যুমেতি ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতেऽয়নায়।।

(য়জুঃ ৩১|১৮)

য়ত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃপ্রমুদ আসতে।
কামস্য য়াত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতম্ কৃধি।।

(ঋঃ ৯|১১৩|১১)

অর্থাৎ - আমি অন্ধকারেরও উর্ধ্বে সেই মহান্ প্রকাশময় সূর্যতুল্য পরমাত্মাকে জানি। তাঁকে জানলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়ে যায়, এছাড়া অন্য কোনো মার্গ নেই। এইজন্য যেখানে আনন্দই-আনন্দ রয়েছে আর যেখানে সকল কামনা পূর্ণ হয়ে যায়, সেই মোক্ষধামে আমাকে অমর করুন।

এই মন্ত্রের মধ্যে দীর্ঘাতিদীর্ঘ জীবন, অর্থাৎ অমৃতত্বের মহান্ ইচ্ছা বর্তমান রয়েছে। সংসারে অনেক দিন বাঁচার যে ইচ্ছা দেখতে পাওয়া যায় সেটা হল এই অনন্ত জীবনের অভিলাষা। এইভাবে মানুষের এই সাতটি স্বাভাবিক ইচ্ছাগুলোকে দেখানোর মন্ত্র বেদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এই ইচ্ছাগুলো গৃহস্থাশ্রম ছাড়া পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

গৃহস্থাশ্রম

উপর্যুক্ত ইচ্ছাগুলো গৃহস্থাশ্রম বিনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, এইজন্য বেদের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমের পর্যাপ্ত বর্ণনা রয়েছে। এখানে আমি উদাহরণস্বরূপ গৃহস্থাশ্রমের কয়েকটি বিশেষ-বিশেষ বিষয়কে তুলে ধরবো। সবার আগে আমরা দেখবো যে বেদমন্ত্রের অনুসারে গৃহস্থাশ্রমের অবস্থা কিরকম হওয়া উচিত। ঋগ্বেদে লেখা রয়েছে -

ইহৈব স্তম্ মা বি য়োষ্টম্ বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।
ক্রীළন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে।।

(ঋঃ ১০|৮৫|৪২)

অর্থাৎ - কারও সঙ্গে বিরোধ করো না, গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে থাকো, পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত করো, পুত্র আর পৌত্রের সঙ্গে ক্রীড়া করো আর আনন্দের সঙ্গে নিজেরই গৃহে থাকো আর গৃহকে আদর্শরূপ বানাও।

এরপর দেখবেন যে, গৃহস্বামী দম্পতির পরস্পর কিরকম আদর্শ হওয়া উচিত। ঋগ্বেদ উপদেশ করছে যে-

সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্ মাতরিশ্বা সম্ ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।।
(ঋঃ ১০|৮৫|৪৭)

অর্থাৎ - সংসারের সমস্ত শক্তি আর বিদ্বান্ আমাদের দুই স্বামী - স্ত্রীকে সুন্দরভাবে জানুক, আমাদের দুজনের হৃদয় জলের সমান শান্ত হোক আর আমাদের দুজনের প্রাণশক্তি, ধারণাশক্তি আর উপদেশশক্তি পরস্পর কল্যাণকারী হোক।

এই হল বৈদিক দম্পতির আদর্শ। এখন দেখতে হবে যে, বৈদিক দম্পতির গৃহ কিরকম হবে? বেদমন্ত্রের আদেশানুসার সর্বসাধারণের গৃহ খুবই সরল হওয়া উচিত। অথর্ববেদে লেখা রয়েছে যে -

ঊর্জস্বতী পয়স্বতী পৃথিব্যাম্ নিমিতা মিতা।
বিশ্বান্নম্ বিভ্রতী শালে মা হিম্সীঃ প্রতি গৃহ্ণতঃ।।
(অথর্বঃ ৯|৩|১৬)

তৃণৈরাবৃতা পলদান্ বসানা রাত্রীব শালা জগতো নিবেশনী।
মিতা পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠসি হস্তিনীব পদ্বতী।।
(অথর্বঃ ৯|৩|১৭)

য়া দ্বিপক্ষা চতুষ্পক্ষা ষটপক্ষা য়া নিমীয়তে।
অষ্টপক্ষাম্ দশপক্ষাম্ শালাম্ মানস্য পত্নীমগ্নির্গর্ভ ইবাশয়ে।।
(অথর্বঃ ৯|৩|২১)

অর্থাৎ - উর্বর আর নিকটতম জলযুক্ত ভূমিতে ছোট্ট নির্বাহযোগ্য যেখানে সমস্ত আবশ্যক অন্ন অনেক রয়েছে, এরকম হে শালা! তুমি নিজের গ্রহণকর্তাকে (নিবাসীকে) মেরো না। তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত আর সুন্দর বাগানে সাজা হে শালা। তুমি রাত্রিকালে সকলের শান্তিদাতা আর কাষ্ঠ স্তম্ভে হস্তিনীর নেয় ছোট্ট ভূমিতে দৃঢ় অবস্থিত। যে শালা দুই ছাউনি, চার ছাউনি, ছয় ছাউনি আর আট ছাউনি তথা দশ ছাউনি দ্বারা নির্মিত হয়, সেই সম্মানের সীমা রক্ষাকারী শালাতে আমি জঠরাগ্নি (পরিপাক শক্তির) আর গর্ভের সমান নিবাস করি। এই হল বৈদিক গৃহের সরলতা! এখন দেখা উচিত যে গৃহে খাদ্য আর পানীয় পদার্থের নির্মাণকারী গৃহস্থীর কিরকম বর্ণনা রয়েছে। ঋগ্বেদে লেখা রয়েছে -

য়ত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্বো ভবতি সোতবে।
উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ।।
য়ত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা।
উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ।।

যত্র নার্য়পচ্যবমুপচ্যবম্ চ শিক্ষতে।
উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥
যত্র মন্থাম্ বিবধ্নতে রশ্মীন্যমিতবাইব।
উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥
য়চ্চিদ্ধি ত্বম্ গৃহেগৃহ উলূখলক য়ুজ্যসে।
ইহ দ্যুমত্তমম্ বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ॥

(ঋঃ ১|২৮|১-৫)

অর্থাৎ - যেখানে বড় স্থূল পাথর (চাক্কি) নিচে-উপরে চলে, যেখানে দুই উরুর মাঝে সিলবাটা চলে, যেখানে স্ত্রীগণ পদার্থকে ধরতে, উঠাতে আর রন্ধন করতে জানে, যেখানে মথানীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দই মথানো হয় আর যেখানে ঘরে-ঘরে উলূখল-মূসল (ঢেঁকি - ছাম ও গাহেন) চলে সে ঘর এরকম প্রকাশিত হয় যেন জয়ের সময় দুন্দুভি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এই বৈদিক গৃহগুলোতে চাক্কি, সিলবাটা, ঊখলী-মূসল আর মথানীর শব্দ দুন্দুভীর সমান অন্ন গ্রহীতাদের ঘোষিত করছে আর গৃহের দেবীগণ পদার্থ ধরতে - উঠাতে আর রন্ধনাদি কর্মে লেগে রয়েছেন। এইসব গৃহে যেভাবে অন্নদানের স্রোত লেগেছে সেইভাবে ঘী-দুধের ধারাও বইছে। অথর্ববেদে লেখা রয়েছে যে -

চতুরঃ কুম্ভাম্শ্চতুর্থা দদামি ক্ষীরেণ পূর্ণা উদকেন দধ্না।
এতাস্ত্বা ধারা উপ য়ন্তু সর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমত্
পিন্বমানা উপ ত্বা তিষ্ঠন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ॥

(অথর্বঃ ৪|৩৪|৭)

অর্থাৎ - চার-চার ঘড়া দুধ আর চার-চার ঘড়া জল চতুর্দিকে দিই। এসব তোমাকে স্বর্গে অর্থাৎ সুখ বিশেষ স্থানে পোষণ পৌঁছাবে।

পূর্ণম্ নারি প্র ভর কুম্ভমেতম্ ঘৃতস্য ধারামমৃতেন সম্ভৃতাম্।
ইমাম্ পাত্রৃনমৃতেনা সমঞ্ঙ্ধীষ্টাপূর্তমভি রক্ষাত্যেনাম্॥

(অথর্বঃ ৩|২১|৮)

অর্থাৎ - হে স্ত্রী! তুমি দুধ আর ঘীকে ঘড়াতে ভরে তার ধারা দিয়ে এই পানকারীদের তৃপ্ত করো আর জলাশয়, কুয়ো, পুকুর, পুষ্করিণী, সরোবর তথা দান আদি সর্বপ্রকারে এদের রক্ষা করো।

ঊর্জম্ বহন্তীরমৃতম্ ঘৃতম্ পয়ঃ কীলালঃ পরিশ্রুতম্।
স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিত্রৃন্॥

(য়জুঃ ২|৩৪)

অর্থাৎ - বলকারক জল, ঘৃত, দুধ, রসযুক্ত অন্ন আর পাকা তথা ঝরে পড়া মিষ্ঠ ফলের ধারা বইছে, তাই হে স্বধাতে উপস্থিত পিতর! আপনি তৃপ্ত হন।

এইসব মন্ত্রের অনুসারে বৈদিক গৃহগুলোতে দেব, ঋষি আর পিতরগণের তৃপ্তির জন্য ঘী, দুধ আর ফলের বিশাল আয়োজন দেখা যাচ্ছে। এতেই শেষ নয়, বরং বৈদিক গৃহস্থ তার নিজের ইষ্টমিত্র, অতিথি আর ক্ষুধাপীড়িত মানুষদের জন্য কিভাবে অন্ন, জল আর সেবা দ্বারা তৃপ্ত করার জন্য আহ্বান করছে সেটাও দেখবার যোগ্য। অথর্ববেদে লেখা রয়েছে যে -

ঊর্জম্ বিভ্রদ্ বসুবনিঃ সুমেধা অঘোরেণ চক্ষুষা মিত্রিয়েণ।
গৃহানৈমি সুমনা বন্দমানো রমধ্বম্ মা বিভীত্ মত্।।
ইমে গৃহা ময়োভুব ঊর্জস্বন্তঃ পয়স্বন্তঃ।
পূর্ণা বামেন তিষ্ঠন্তস্তে নো জানন্ত্বায়তঃ।।
য়েষামধ্যেঽতি প্রবসন্ য়েষু সৌমনসো বহুঃ।
গৃহানুপ হ্বয়ামহে তে নো জানন্ত্বায়তঃ।।
উপহূতা ভূরিধনাঃ সখায়ঃ স্বাদুসম্মুদঃ।
অক্ষুধ্যা অতৃংয়া স্ত গৃহা মাস্মদ্ বিভীতন।।
উপহূতা ইব গাব উপহূতা অজাবয়ঃ।
অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ।।
সুনৃতাবন্তঃ সুভগা ইরাবন্তো হসামুদাঃ।
অতৃষ্যা অক্ষুধ্যা স্ত গৃহা মাস্মদ্ বিভীতন।।
ইহৈব স্ত মানু গাত বিশ্বা রূপাণি পুষ্যত।
ঐষ্যামি ভদ্রেণা সহ ভূয়াংসো ভবতা ময়া।।

(অথর্বঃ ৭|৬০|১-৭)

অর্থাৎ - হে বীর্য, ধন, সম্পত্তি, মেধা, সুহৃদ্ভাব আর শুভ চিন্তাকারী! আপনারা এই গৃহে প্রেমপূর্বক আসুন, ভয় পাবেন না। গৃহে আগন্তুকদের জন্য এই গৃহ হল আরোগ্যবর্ধক, শক্তিশালী, দুগ্ধকারী, লক্ষ্মীবান্ আর শ্রীমান্। এই গৃহ হল অমিত ধনী, মিত্রের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদকারী আর ক্ষুদা-তৃষ্ণাকে হরনকারী, এইজন্য আসুন, ভয় পাবেন না। গাভী, ছাগের দুগ্ধ আর নানা প্রকারের রসালো অন্ন আমাদের গৃহ ভরপুর রয়েছে। এই গৃহ হল সত্যার্থী, ভাগ্যবান্, ধনী, হাসিমুখ আর খিদা - তৃষ্ণা থেকে রহিতদের জন্য, তাই ভয় পাবেন না। যে ক্লান্ত পথিক এই গৃহের স্মরণ করে তাদের এই গৃহ নিজের দিকে আহ্বান জানায়, এইজন্য আমরাও এখানে এসেছি, বসবাস করছি আর সর্বপ্রকারে সুখে আছি।

এই উপদেশে গৃহস্থাশ্রমের কিরকম ভব্য বর্ণনা রয়েছে আর কিরকম উদার গৃহস্থদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে! এরকারণ হল এটাই যে, বেদের মধ্যে যারা অতিথিসৎকার করে না আর ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করে না এরকম গৃহস্থদের নিন্দা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে লেখা রয়েছে যে -

য় আধ্রায় চকমানায় পিত্বোঽন্নবান্ত্সন্রফিতায়োপজগ্মুষে।

স্থিরম্ মনঃ কৃণুতে সেবতে পুরোতো চিৎস মর্ডিতারম্ ন বিন্দতে।।
স ইদ্ভোজো য়ো গৃহবে দদাত্যন্নকামায় চরতে কৃশায়।
অরমস্মৈ ভবতি য়ামহূতা উতাপরীষু কৃণুতে সখায়ম্।।

(ঋঃ ১০|১১৭|২-৩)

অর্থাৎ - যে অন্নবান্, অথচ অন্ন চাইতে আসা আগন্তুক, ক্ষীণ শরীর ব্যক্তি, ভিক্ষুক আর গরীবের প্রতি মন কঠোর করে নেয়, অন্নদানের জন্য ভাবে না আর নিজে মজা করে আহার করে, সে সুখদাতা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে না। আর যে অন্ন চাইতে আসা য়াচককে অন্ন দান করে সে-ই আসল আহার করে থাকে। এরকম দাতার কাছে দান করার জন্য পর্যাপ্ত অন্ন এসে যায়, তার অভাব হয় না আর জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও সহায়ক মিত্র উৎপন্ন হয়ে যায়।

এই প্রকারে এই বেদ মন্ত্রগুলো আদর্শ গৃহস্থের চিত্র দেখানোর সঙ্গে বলে দিয়েছে যে, গৃহ তো সর্বদা সাধারণই হবে, কিন্তু সেই সাধারণ গৃহ অন্ন আদি আবশ্যক পদার্থ দ্বারা পূর্ণ হবে আর গৃহে আগন্তুকের প্রতি উত্তম সৎকার করা হবে, কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে যে এই দানশীলতার কারণে যেন ঋণ না হয়ে যায়। ঋণ মানুষকে অনেক নীচ বানিয়ে দেয়, এইজন্য ততটুকুই ব্যয় করা উচিত যতটুকু তার নিজের আয় হবে। অথর্ববেদে লেখে রয়েছে -

অনৃণা অস্মিন্ননৃণাঃ পরস্মিন্ তৃতীয়ে লোকে অনৃণাঃ স্যাম।
য়ে দেবয়ানাঃ পিতৃয়াণাশ্চ লোকাঃ সর্বান্ পথো অনৃণা আ ক্ষিয়েম।।

(অথর্বঃ ৬|১১৭|৩)

পুষ্টিম্ পশূনাম্ পরি জগ্রভাহম্ চতুষ্পদাম্ দ্বিপদাম্ য়চ্চ ধান্যম্।
পয়ঃ পশূনাম্ রসমোষধীনাম্ বৃহস্পতিঃ সবিতা মে নিয়চ্ছাত্।।

(অথর্বঃ ১৯|৩১|৫)

অর্থাৎ - এই লোকে, পরলোকে আর তৃতীয় লোকে আমরা সবাই অনৃণ হবো আর দেবয়ান তথা পিতৃয়ানের যে মার্গ আর স্থান রয়েছে সেসবের মধ্যে আমরা অনৃণ হয়ে নিবাস করবো। আমি চতুষ্পাদ পশুদের থেকে, দ্বিপাদ মানুষদের থেকে আর ধানাদি থেকে প্রাপ্ত পদার্থ স্বীকার করছি আর বৃহস্পতি তথা সবিতাদেব পরমাত্মা আমাকে যেসব পশুদের দুধ আর ঔষধির রস দিয়েছেন, তার থেকেই নিজের পোষণ করি। এই মন্ত্রগুলোর তাৎপর্য হল এটাই যে, যা কিছু নিজের পুরুষার্থ দ্বারা প্রাপ্ত হবে তার অনুসারেই ব্যয় করা উচিত, ঋণ করে নয়। এইভাবে গৃহস্থের দশার বর্ণনা করে এখন গৃহস্থের নিত্য করার যোগ্য পঞ্চমহাযজ্ঞের বর্ণনাতে আসা যাক। য়জুর্বেদে লেখা রয়েছে যে -

য়দগ্রামে য়দরণ্যে য়ত্সভায়াম্ য়দিন্দ্রিয়ে।
য়দেনশ্চক্রিমা বয়মিদন্তদবয়জামহে।।

(য়জুঃ ৩|৪৫)

অর্থাৎ - গ্রামে, জঙ্গলে, আমি ইন্দ্রিয় দ্বারা যেসব পাপ করেছি তাকে এই যজ্ঞতে হোম করে দূরে ফেলে

দিই।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য এটাই হল যে, গৃহস্থ দ্বারা যে পাঁচ স্থানে পাপ হয়ে থাকে অথবা যুদ্ধে আর হিংস্রপশুর হত্যা দ্বারা যেসব পাপ হয়ে থাকে অথবা গ্রামে, জঙ্গলে আর সভাতে যে মন, বাণী আর কর্ম দ্বারা বিনা কোনো ইচ্ছায় পাপ হয়ে যায়, সেসব পঞ্চমহাযজ্ঞ আর ইষ্টাপূর্ত্তাদি লোকোপকারী কর্ম দ্বারা দূর হয়ে যায়, অর্থাৎ এক প্রকারে নিত্য প্রায়শ্চিত হয়ে যায়। এই পঞ্চমহাযজ্ঞতে সবার প্রথমে বেদের অধ্যায়ন আর প্রাণায়ামপূর্বক গায়ত্রী মন্ত্রের জপ রয়েছে। এটাই হল ব্রহ্মযজ্ঞ। বেদের মধ্যে এই ব্রহ্মযজ্ঞ করার আজ্ঞা করা হয়েছে। বেদের স্বাধ্যায়ের জন্য য়জুর্বেদে লেখা রয়েছে-

য়থেমাম্ বাচম্ কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাঁ শূদ্রায় চায়র্য়ায় চ স্বায় চারণায় চ।
প্রিয়ো দেবানাম্ দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ম্ মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু।।

(য়জুঃ ২৬|২)

অর্থাৎ - যেরকম এই কল্যাণকারিণী বাণীকে মানুষের জন্য আমি বলি সেরকমই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, আর অনার্যদের জন্য আপনিও বলুন আর ভাবুন যে এই প্রকারের বিদ্যা দ্বারা আমি দেবতাদের মধ্যে প্রিয় হবো, আমি যেন পরোক্ষ সুখ পাই আর আমার সব কামনা পূর্ণ হোক।

এই হল বেদের স্বাধ্যায়ের মহিমা, কিন্তু বেদ-স্বাধ্যায়ের অর্থ কেবল এটা নয় যে শুধু বেদকে অক্ষর পড়া বরং তার অর্থকে সঠিকভাবে জানা। এইজন্য অথর্ববেদে লেখা রয়েছে -

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ য়স্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
য়স্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য় ইত্তদ্ বিদুস্তে অমী সমাসতে।।

(অথর্বঃ ৯|১০|১৮)

অর্থাৎ - ঋচাগুলো পরমব্যাপক অক্ষরের মধ্যে অবস্থান করছে যারমধ্যে বেদের দেবতা - অর্থ উপস্থিত রয়েছে, সুতরাং যে অক্ষর আর তার অক্ষরের অর্থকে জানে না সে কেবল ঋচাগুলো থেকে কি লাভ প্রাপ্ত করতে পারবে? সঠিকভাবে, যে অক্ষর আর তার অর্থকে জানবে সে-ই ভালো ভাবে বেদের তাৎপর্যে পৌঁছাবে।

এইজন্য বেদের অর্থ সহিত পড়াই উচিত। বেদ আলোচনার পরে প্রাণায়ামপূর্বক গায়ত্রীর জপ করা উচিত। অথর্ববেদে গায়ত্রীর মহিমা এইপ্রকারে লেখা রয়েছে -

স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্র চোদয়ন্তাম্ পাবমানী
দ্বিজানাম্। আয়ুঃ প্রাণম্ প্রজাম্ পশুম্ কীর্তিম্ দ্রবিণম্
ব্রহ্মবর্চসম্। মহ্যম্ দত্বা ব্রজত ব্রহ্মলোকম্।।

অর্থাৎ - দ্বিজদের প্রেরণাকারক পবিত্র বেদমাতা গায়ত্রীর আমি স্তুতি করি। সে আমায় আয়ু, বল, প্রজা, পশু, কীর্তি, ধন আর ব্রহ্মবর্চস্ব অর্থাৎ বৈদিকজ্ঞান দিয়ে ব্রহ্মলোকে পৌঁছাবে। এটাই হল ব্রহ্মযজ্ঞ।

এরপর দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান রয়েছে। দেবযজ্ঞের তাৎপর্য হল সকাল-বিকেল উভয় সময়ে হবন করা।

অথর্ববেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

সায়ম্সায়ম্ গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃপ্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা।

বসোর্বসোর্বসুদান এধি বয়ম্ ত্বেন্ধানাস্তন্বম্ পুষেম।।

প্রাতঃপ্রাতর্গৃহপতির্নো অগ্নিঃ সায়ম্সায়ম্ সৌমনসস্য দাতা।

বসোর্বসোর্বসুদান এধীন্ধানাস্ত্বা শতম্ হিমা ঋধেম।।

(অথর্বঃ ১৯|৫৫|৩-৪)

অর্থাৎ - বিকালের নিত্য হবন প্রাতঃকালের সময় পর্যন্ত গৃহস্থের মনকে প্রসন্নকারী করে রাখে আর প্রাতঃকালের নিত্য হবন বিকেলের সময় পর্যন্ত মনকে প্রসন্নকারী করে রাখে, এইজন্য গৃহস্থকে নিত্য উভয় সন্ধ্যাতে হবন করা উচিত। এটাই হল দেবযজ্ঞ।

এই দেবযজ্ঞের পরে পিতৃযজ্ঞের বিধান রয়েছে। য়জুর্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

য়ে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো য়মরাজ্যে।

তেষাম্ লোকঃ স্বধা নমো য়জ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্।।

(য়জুঃ ১৯|৪৫)

অর্থাৎ - যমের রাজ্যে যেসব পিতর হল এক - সমান আর সমান চিন্তনশীল সেই পিতরদের মাঝে ভুবন, স্বধা, নমস্কার আর যজ্ঞ প্রাপ্ত হোক। (এই পিতর হল সৌম্য, এইজন্য এর সৎকার প্রায়শঃ জল দ্বারা হয়ে থাকে। অন্যদিকে বৃক্ষকেও সৌম্য বলা হয়, এটাই হল কারণ যে, পিতৃজল বৃক্ষে ঢালা হয়। পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে যেখানে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী আর কীটপতঙ্গ পর্যন্তকে ভোজ্য ভাগ দেওয়া হয়ে থাকে, সেখানে সৌম্য পিতরদের অধিকার সৌম্য বৃক্ষগুলোকেই দেওয়া হয়ে থাকে। **"একা ক্রিয়া দ্ব্যের্থকরী বভূব"** লিখে পতঞ্জলি জী তাঁর মহাভাষ্যে এই ধরনের সংকেত করেছেন।)

এই পিতৃযজ্ঞের পরে বলিবৈশ্বদেবের বিধান রয়েছে। তারজন্য য়জুর্বেদ আর অথর্ববেদের মধ্যে লেখা রয়েছে-

য়দ্দতম্ য়ত্পরা দানম্ য়ত্পূর্বম্ য়াশ্চ দক্ষিণাঃ।

তদগ্নির্বৈশ্বকর্মণঃ স্বর্দেবেষু নো দধাত্।।

(য়জুঃ ১৮|৬৪)

অহরহর্বলিমিত্তে হরন্তোऽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমগ্নে।।

(অথর্বঃ ১৯|৫৫|৬)

অর্থাৎ - যা এখন দিয়েছি আর যা এরপূর্বে দিয়েছি তথা যা পরে দিয়েছি আর যা পশচাতে দিয়েছি সেসব বলিবৈশ্বকর্মের অগ্নিতে প্রাপ্ত হোক। যেভাবে ঘোড়া নিত্য ঘাস পেয়ে থাকে সেইভাবে প্রতিদিন প্রাণীদের জন্য তাদের ভাগ, অর্থাৎ বলি দেওয়া উচিত।

এরপর অতিথিযজ্ঞ রয়েছে। অতিথিযজ্ঞের বিষয়ে লেখা রয়েছে যে -

তদ্যস্যৈবম্ বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোऽতিথির্গৃহানাগচ্ছেত্।

শ্রেয়াম্সমেনমাত্মনো মানয়েত্ তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে।।

(অথর্বঃ ১৫|১০|১-২)

তদ্ য়স্যৈবম্ বিদ্বান্ ব্রাত্যোऽতিথির্গৃহানাগচ্ছেত্।

স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রুয়াদ্ ব্রাত্য ক্বাবাত্সীর্ব্রাত্যোদকম্

ব্রাত্য য়থা তে প্রিয়ম্ তথাস্তু ব্রাত্যয়থা তে বশস্তথাস্তু

ব্রাত্য য়থা তে নিকামস্তথাস্ত্বিতি।

(অথর্বঃ ১৪|১১|১-২)

অর্থাৎ - যখন বিদ্বান আর ব্রতধারী অতিথি রাজার গৃহে আসেন তখন রাজার উচিত যে তিনি যেন অতিথিকে নিজের থেকেও অধিক শ্রেষ্ঠ মানেন। এতে রাজা না তো ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে দোষী হন আর না রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দোষী হন। যার গৃহে ব্রতধারী আর বিদ্বান অতিথি আসেন তো তার উচিত যে সে যেন উঠে অতিথিকে বলে যে, হে ব্রাত্য! আপনি কথা থেকে এসেছেন? আসুন, এই জল নিন, আপনি তৃপ্ত হন আর যা আপনার ইচ্ছা হবে তাও উপস্থিত করা হবে তথা যা আজ্ঞা হবে তা করা হবে।

এই হল বৈদিক আতিথ্যের উদাহরণ। এইভাবে পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্বারা গৃহস্থ সকলকে অন্ন - জল পৌঁছে দেয় আর এই প্রকারের গৃহস্থ পূর্বে বলা আয়ু, বল, কীর্তি, বিদ্যা, প্রজা, ধন আর মোক্ষ আদির ইচ্ছাগুলোকে প্রাপ্ত করতে পারে, কিন্তু এই বিষয় গৃহস্থ তখনই প্রাপ্ত করতে পারবে যখন তাদের সামাজিক ব্যবহারও উত্তম হবে।

সামাজিক ব্যবহার

মনুষ্য হল সামাজিক প্রাণী। তার সম্বন্ধ কেবল তার নিজের সঙ্গেই নয় বরং তার সম্বন্ধ দম্পতি, আত্মীয়, জ্ঞাতি, সমাজ আর সমস্ত সংসারের মানুষ তথা সমস্ত সংসারের প্রাণীমাত্রের সঙ্গে রয়েছে, এইজন্য তাকে সকলের সঙ্গে প্রেম, দয়া আর সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রতে সেটাই উদাত্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি সবার আগে দম্পতি - প্রেমের উদাহরণ উদ্ধৃত করছি। ঋগ্বেদ আর অথর্ববেদে লেখা রয়েছে যে -

য়া দম্পতী সমনসা সুনুত আ চ ধাবতঃ।

দেবাসো নিত্যয়াশিরা।।

(ঋগ্বেদ ৮|৩১|৫)

স্যোনাদ্যোনেরধি বুধ্যমানৌ হসামুদৌ মহসামোদমানৌ।

সুগূ সুপুত্রৌ সুগৃহৌ তরাথো জীবাবুষসো বিভাতীঃ।।

(অথর্বঃ ১৪|২|৪৩)

অর্থাৎ - যে দম্পতি এক মন হয়ে যজ্ঞ, অর্থাৎ উত্তম কাজের জন্য সঙ্গে-সঙ্গে চলে আর নিত্য পরমেশ্বরের প্রার্থনা করে, তারা হল দেবতা। হে দম্পতি! তোমরা দুজন এই সুখদায়ক গৃহে সুন্দরভাবে সজাক হয়ে, হাসি-খুশির সঙ্গে, অনেক প্রেমানন্দ করে, সুন্দর সুপুত্র আর সুন্দর গৃহস্থীকারী হয়ে প্রকাশ যুক্ত অনেকগুলো প্রাতঃকালকে দেখো, অর্থাৎ অনেক দিন পর্যন্ত বাঁচো।

এই বেদ মন্ত্রগুলোর মধ্যে দম্পতি-প্রেমের উৎকৃষ্ট উদাহরণে এটা বলা হয়েছে যে, দুইজন এক-মন হয়ে আনন্দপূর্বক উত্তম কর্মে লেগে থাকবে আর পরস্পর প্রেম আর বিনোদের সঙ্গে ব্যবহার করবে। এই দম্পতি-কর্তব্য বর্ণনার পরে আপনজনদের প্রতি ব্যবহারের উপদেশ এইপ্রকারে রয়েছে -

অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সম্মনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীম্ বাচম্ বদতু শন্তিবাম্।।
মা ভ্রাতা ভ্রাতরম্ দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচম্ বদত ভদ্রয়া।।

(অথর্বঃ ৩|৩০|২-৩)

অর্থাৎ - পুত্র পিতার আজ্ঞাকারী আর মাতার ইচ্ছাকারী হোক তথা স্ত্রী পতি একে অপরের সঙ্গে মধুর আর শান্ত বাণীর সঙ্গে কথা বলুক। ভাইয়ের সঙ্গে ভাই দ্বেষ করবে না আর না বোনের সঙ্গে বোন কোনোরূপ ঈর্ষা করবে। সকলে নিজের-নিজের ব্রত, অর্থাৎ স্থানে থেকে সর্বদা একে অপরের মধ্যে ভদ্রভাষাতেই কথা বলবে। কি সুন্দর আপনজনদের প্রতি ব্যবহার! এই সমস্ত আপনজনদের মধ্যে মাতার স্থান অনেক উঁচুতে রয়েছে, এইজন্য বেদের মধ্যে মাতার প্রশংসা এইভাবে রয়েছে -

কুমারম্ মাতা যুবতিঃ সমুব্ধঃ গুহা বিভর্তি ন দদাতি পিত্রে।
অনীকমস্য ন মিনজ্জনাসঃ পুরঃ পশ্যন্তি নিহতমরতৌ।।

(ঋগ্বেদঃ ৫|২|১)

অর্থাৎ - যুবতী মাতা পুত্রকে নিজের গর্ভের মধ্যেই ধারণ করেন, নিজের তুল্য পিতাকে দেন না আর না তার বলকে ক্ষীণ হতে দেন, এইজন্য বিদ্বান পুরুষগণ মাতাকে প্রথম স্থান দিয়েছে।

এই মন্ত্রে মাতার স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ এইকারণে বলা হয়েছে যে তিনি সমতার দাবিদার নিজের পতির বল নষ্ট না করে গর্ভকে নিজেরই পেটে ধারণ করেন আর পতিকে সেই কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেন। এই মাতৃভক্তির পরে গৃহের বুড় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেবা দ্বারা পবিত্রতা পালন করার উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

পুনন্তু মা পিতরঃ সোম্যাসঃ পুনন্তু মা পিতামহাঃ পুনন্তু প্রপিতামহাঃ। পবিত্রেণ শতায়ুষা।
পুনন্তু মা পিতামহাঃ পুনন্তু প্রপিতামহাঃ।
পবিত্রেণ শতায়ুষা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৈ।।
পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ।
পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মা।।

(য়জুঃ ১৯|৩৭, ৩৯)

অর্থাৎ - সৌম্য পিতা আমাকে পবিত্র করুক, সৌম্য পিতামহ আমাকে পবিত্র করুক আর সৌম্য প্রপিতামহ আমাকে পবিত্র করুক, যারদ্বারা আমি শত বর্ষ জীবিত থাকিব। পিতামহ আর প্রপিতামহ আমাকে পবিত্র করুক যারদ্বারা আমি শত বর্ষের আয়ু প্রাপ্ত করিব। আমাকে সমস্ত দেবগণ পবিত্র করুক, আমার মন আর বুদ্ধি আমাকে পবিত্র করুক, সমস্ত পঞ্চমহাভূত আমাকে পবিত্র করুক আর অগ্নি আমাকে পবিত্র করুক।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে বৃদ্ধের সেবা দ্বারা পবিত্রতা আর দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এরদ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, বৈদিক শিক্ষার মধ্যে বুড় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সম্মান আর সেবার জন্য কতটা জোড় দেওয়া হয়েছে। এই আপনজনদের ব্যবহারের পরে আমি দেখাতে চাইবো যে, বেদের মধ্যে আত্মীয় সম্বন্ধিত অন্য বন্ধু-বান্ধব, স্বজনদের জন্য কিরকম সুখের কামনা করার উপদেশ রয়েছে। ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশাপতিঃ।

সসন্তু সর্বে জ্ঞাতয়ঃ সস্ত্বয়মভিতো জনঃ।।

(ঋগ্বেদ ৭|৫৫|৫)

আত্মানম্ পিতরম্ পুত্রম্ পৌত্রম্ পিতামহম্।

জায়াম্ জনিত্রীম্ মাতরম্ যে প্রিয়াস্তানুপহ্বয়ে।।

(অথর্বঃ ৯|৫|৩০)

অর্থাৎ - মাতা, পিতা, জ্ঞাতি, চাকর-চাকরানি আর পশু আদি সকলে সুখে ঘুমাক। আত্মীয়জন, পিতা পুত্র, পৌত্র, পিতামহ, স্ত্রী, পিতামহী, মাতা আর যারা স্নেহী তাদের আমি স্নেহের সঙ্গে আহ্বান জানাই।

এই আপনজন আর আত্মীয়দের সম্বন্ধীত ব্যবহারের বর্ণনা করার পরে মিত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করার উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

সর্বে নন্দন্তি য়শসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখ্যায়ঃ।

কিল্বিষস্পৃত্পিতুষণির্হ্যোষামরম্ হিতো ভবতিবাজিনায়।।

(ঋঃ ১০|৭১|১০)

ন স সখা য়ো ন দদাতি সখ্যে সচাভুবে সচমানায় পিত্বঃ।

অপাস্মাত্প্রেয়ান্ন তদোকো অস্তি পৃণন্তমন্যমরণম্ চিদিচ্ছেত্।।

(ঋঃ ১০|১১৭|৪)

অর্থাৎ - মিত্রের সঙ্গে থাকতে আর গৌরব হওয়াতে সকলে আনন্দিত হয়। মিত্র ধন দিয়ে সমাজের পাপকে দূর করে দেয় আর সকলের হিতকরী হয়। সে সখা, অর্থাৎ মিত্র নয় যে ধনবান্ হওয়া সত্ত্বেও নিজের মিত্রের সহায়তা করে না। তার গৃহ আসল গৃহ নয়। তার থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত।

এই দুই মন্ত্রের মধ্যে মৈত্রীক ভাব আর কর্তব্য ভালোভাবে বলে দেওয়া হয়েছে আর দেখানো হয়েছে যে, মিত্রকেও আপনজন আর আত্মীয়ের মতো সহায়তা করা উচিত। এরপর সমস্ত আর্যদের সঙ্গে ব্যবহার করার উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

প্রিয়ম্ মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ম্ রাজসু মা কৃণু।

প্রিয়ম্ সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥

(অথর্বঃ ১৯|৬২|১)

রুচম্ নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচঁ রাজসু নস্কৃধি।

রুচম্ বিশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি ধেহি রুচা রুচম্॥

(য়জুঃ ১৮|৪৮)

অর্থাৎ - আমাকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রিয় করুন, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রিয় করুন, বৈশ্যদের মধ্যে প্রিয় করুন আর শূদ্রদের মধ্যে প্রিয় করুন। আমার ব্রাহ্মণদের মধ্যে রুচি হোক, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে রুচি হোক, বৈশ্যদের মধ্যে রুচি হোক আর শূদ্রদের মধ্যে রুচি হোক তথা এই রুচির মধ্যেও রুচি হোক।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে আর্যদের চার বর্ণের সঙ্গে রুচি রাখার আর তারমধ্যে প্রিয় হওয়ার উপদেশ রয়েছে। এরপর সমস্ত মনুষ্যজাতির সঙ্গে ব্যবহার করার আদেশ এইভাবে রয়েছে -

সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে য়োক্ত্রে সহ বো

য়ুনজিম। সম্যঞ্চোঽগ্নিম্ সপর্য়তারা নাভিমিবাভিতঃ॥

(অথর্বঃ ৩|৩০|৬)

সহৃদয়ম্ সাম্মনস্যমবিদ্বেষম্ কৃণোমি বঃ।

অন্যো অন্যমভি হর্য়ত বৎসম্ জাতমিবাঘ্ন্যা॥

(অথর্বঃ ৩|৩০|১)

য়ে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ।

তেষাঁ শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিঁল্লোকে শতঁ সমাঃ॥

(য়জুঃ ১৯|৪৬)

অর্থাৎ - তোমাদের সকল মানুষের জলস্থান এক সমান হোক তোমরা সকলে অন্নকে এক সমানই ভাগ করে নাও। আমি তোমাদের সকলকে একই আত্মীয় বন্ধনে বাঁধছি, এইজন্য তোমরা সকলে মিলে কাজ করো। যেরকম রথ চক্র সবদিকে একই নাভীর মধ্যে লেগে থাকে আর কাজ করে। আমি তোমাদের হৃদয়কে এক সমান করছি আর তোমাদের মনকে বিদ্বেষরহিত করছি। তোমরা একে অপরকে সেই প্রীতির সঙ্গে চাও যেরকম গৌ তার সদ্যঃজাত গো-শাবককে চায়। যেসব জীব তার মন, বাণী দ্বারা এই ধরনের সমানতার পক্ষপাতী হয়েছে তাদের জন্যই আমি এই ভুবনে শত বর্ষ পর্যন্ত সমস্ত ঐশ্বর্যকে দিয়েছি।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে মানুষমাত্রের সঙ্গে সমতার ব্যবহার করার উপদেশ করা হয়েছে। এই উপদেশে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত মানুষের সম্পত্তি, বিচার আর জীবনযাপন এক সমান হওয়া উচিত, তবেই শত বর্ষ পর্যন্ত লোকজন সুখে বাঁচতে পারবে। সমস্ত মানুষের সঙ্গে এই প্রকারের ব্যবহার করার আজ্ঞার পরে বেদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল মানুষের সঙ্গেই নয় বরং প্রাণীমাত্রের সঙ্গে প্রেম, দয়া আর সহানুভূতির ব্যবহার করা উচিত। বেদ উপদেশ করছে যে -

য়ো বৈ কশায়াঃ সপ্ত মধূনি বেদ মধুমান্ ভবতি।

ব্রাহ্মণশ্চ রাজা চ ধেনুশ্চানড্বাঁশ্চ ব্রীহিশ্চ য়বশ্চ মধু সপ্তমম্।।

(অথর্বঃ ৯|১|২২)

দৃতে দৃঁহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহম্ চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।।

(য়জুঃ ৩৬|১৮)

অর্থাৎ - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ধেনু, বৃষ, ধান, যব আর মধু এই সাতটি হল মধু। যে মানুষ জ্ঞানের এই সাতটি মধুকে জানে সে মধুমান্, অর্থাৎ মধুর হয়ে যায়। হে দৃষ্টস্বরূপ পরমাত্মন্! আমার দৃষ্টিকে দৃঢ় করুন, যাতে সকল প্রাণী আমাকে মিত্র-দৃষ্টিতে দেখে। এইভাবে আমিও যেন সকল প্রাণীদের মিত্র-দৃষ্টিতে দেখি আর আমরা সকল প্রাণী মিলে পরস্পর একে-অপরকে মিত্র-দৃষ্টিতে দেখি।

এই পর্যন্ত আমি সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধিত মন্ত্রগুলোকে সংগ্রহ করেছি। এই সংগ্রহের মধ্যে নিজের আত্মীয়জন থেকে শুরু করে সমস্ত সংসারের মানুষদের আর সমস্ত প্রাণীদের পর্যন্ত তাদের সঙ্গে প্রেম, দয়া, সমতা, সহানুভূতি আর মিত্রতাভাব দর্শায় এরকম বেদোপদেশ গ্রথিত রয়েছে। আমার মনে হয় না যে, সমাজ সম্বন্ধিত এরথেকেও অধিক উদাত্ত আর ব্যাপক ব্যবহার আর কোথাও সংসারে রয়েছে, কিন্তু এই সামাজিক ব্যবহার যতক্ষণ পর্যন্ত না সদাচারের সুদৃঢ় ভূমিকাতে স্থির হবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারবে না।

সদাচার

সদাচার বিনা সামাজিক ব্যবহার উত্তমতার সঙ্গে সফলই হবে না। সদাচারী মানুষই সমাজের মধ্যে সুখে থাকতে পারে। সত্যতা, শুদ্ধতা, চরিত্রশীলতা আর ব্রত আদির বিনা সমাজের মধ্যে মানুষদের নির্বাহই হবে না, এইজন্য সদাচার সবন্ধিত অনেক উপদেশ বেদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কিছু মন্ত্র উদ্ধৃত করছি। ঋগ্বেদে লেখা রয়েছে -

সপ্ত মর্যাদাঃ কবয়স্ত তক্ষুস্তাসামেকামিদভ্যংহুরো গাত্।
আয়োর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীঠে পথাম্ বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ।।

(ঋঃ ১০|৫|৬)

অর্থাৎ - হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, অসত্য ভাষণ আর এই পাপীদের সহযোগিতাকারীদের নাম হল সপ্ত মর্যাদা। এগুলোর মধ্যে কেউ যদি একটাও করে মর্যাদা উলঙ্ঘন করে, অর্থাৎ একটাও পাপ করে,

তবে সে হবে পাপী আর যে ধৈর্যের সঙ্গে এইসব হিংসাদি পাপগুলোকে ত্যাগ করে দেয় তার জীবনের স্তম্ভ নিঃসন্দেহে আদর্শ হয়ে যায় আর সে মোক্ষভাগী হয়।

উলূকয়াতুম্ শুশুলূকয়াতুম্ জহি শ্বয়াতুমুত কোকয়াতুম্।
সুপর্ণয়াতুমুত গৃধ্রয়াতুম্ দৃষদেব প্র মৃণ রক্ষ ইন্দ্র।।

(ঋঃ ৭|১০৪|২২)

অর্থাৎ - গরুড়ের সমান মদ (অহংকার), শকুনের সমান লোভ, কোক (পাখির) সমান কাম, কুকুরের সমান মৎসর (হিংসুটে), প্যাঁচার সমান মোহ (মূর্খতা) আর নেকড়ের সমান ক্রোধকে মেরে তাড়িয়ে দাও, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর আদি ছয় বিকারকে নিজের অন্তঃকরণ থেকে সরিয়ে দাও।

এই হিংসা আদি বাহ্য আর কামাদি অন্তর্দুর্বাসনাগুলোকে ত্যাগ করেই মানুষ উত্তম সামাজিক হতে পারবে। এসবের মধ্যে সত্যের মহিমা হল মহান্। বেদ উপদেশ করছে যে -

শক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো য়ত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাম্ লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি।।

(ঋঃ ১০|৭১|২)

অগ্নে ব্রতপতে ব্রতম্ চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ম্ তন্মে রাধ্যতাম্।
ইদমহমনৃতাত্ সত্যমুপৈমি।।

(য়জুঃ ১|৫)

দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোত্সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।
অশ্রদ্ধামনৃতেऽ দধাচ্ছ্রদ্ধাঁসত্যে প্রজাপতিঃ।।

(য়জুঃ ১৯|৭৭)

য়দর্বাচীনম্ ত্রৈহায়ণাদনৃতম্ কিম্ চোদিম।
আপো মা তস্মাত্সর্বস্মাদ্ দুরিতাত্পাত্বম্হসঃ।

(অথর্বঃ ১০|৫|২২)

সুবিজ্ঞানম্ চিকিতুষে জনায় সচ্চাসচ্চ বচসী পস্পৃধাতে।
তয়োর্য়ত্সত্যম্ য়তরদৃজীয়স্তদিত্সোমোऽবতি হন্ত্যাসত্।।

(ঋঃ ৭|১০৪|১২)

অর্থাৎ - যেভাবে চালনি দিয়ে ছাতু চালা হয় সেইভাবে যেখানে বিদ্বানগণ নিজের বাণীকে মন দ্বারা শুদ্ধ করে বলেন, সেখানেই লক্ষ্মী আর মিত্রতা বাস করে। হে পরমেশ্বর! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি নিজের শক্তিভর সত্যের পালন করবো, তাই এই অসত্য থেকে বেরিয়ে সত্যতে আসছি। প্রজাপতি সত্য আর অসত্যকে ভেবেচিন্তে আলাদা করেছেন আর অসত্যতে অশ্রদ্ধা তথা সত্যতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করেছেন। তিন বর্ষের এইপারে যে মিথ্যা আমি বলেছি, হে পরমাত্মন্! সেসব দুষ্ফল পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মানুষের সুবিধার জন্য সত্য আর অসত্যের বিজ্ঞানকে একে-অপরের বিরুদ্ধ বলা হয়েছে। এই উভয়ের মধ্যে

যা সত্য হবে তা সরল আর সোজা স্বভাবে বলা হয়ে থাকে তথা তাতে কোমলতা আসে, কিন্তু অসত্য হল সেটা যা সর্বপ্রকারে বিনাশই করে থাকে।

এই সত্যের প্রতিপাদনকারী মন্ত্রগুলো সত্যভাষণের সমস্ত বিশেষত্বগুলোকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। এরপর মধুর ভাষণের বিশেষত্বের বর্ণনা করা হয়েছে -

জিহ্বায়া অগ্রে মধু মেম্ জিহ্বামূলে মধুকলম্।

মমেদহ ক্রতাবসো মম চিত্ত মুপায়সি॥

মধুমন্মে নিক্রমণম্ মধুমন্মে পরায়ণম্।

বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসম্ মধু সন্দৃশঃ॥

(অথর্বঃ ১|৩৪|২-৩)

অর্থাৎ - আমার জিহ্বার অগ্রভাগে মধুরতা হোক আর জিহ্বার মূলে মধুরতা হোক। হে মধুরতা! আমার কর্মে তোমার নিবাস হোক আর আমার মনের ভিতরও তুমি পৌঁছে যাও। আমার আসা-যাওয়া মধুর হোক, আমি যে ভাষা বলি সেটা মধুর হোক আর আমি স্বয়ং মধুর-মূর্তি হয়ে যাই।

এইপর্যন্ত সত্য আর মধুর বাণী বলার শিক্ষা দিয়ে এখন বেদ উপদেশ করেছে যে, নিজের কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা অভদ্র, অসভ্য আর অমঙ্গল ব্যবহার যেন না হয়ে যায়, কিন্তু সব ব্যবহার ভদ্র আর ভদ্রই হয়। য়জুর্বেদ উপদেশ করছে যে-

ভদ্রম্ কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রম্ পশ্যেমাক্ষভির্য়জত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাঁসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতম্ য়দায়ুঃ॥

(য়জুঃ ২৫|২১)

অর্থাৎ - হে যজ্ঞকারী পরমেশ্বরের ভক্ত বিদ্বানগণ! আমরা সর্বদা কল্যাণকারী শব্দই কান দিয়ে শুনবো, কল্যাণকারী দৃশ্যই চোখ দিয়ে দেখবো আর নিজের দৃঢ় অঙ্গগুলোর দ্বারা শরীর দিয়ে আজীবন সেই কর্ম করবো, যারদ্বারা বিদ্বানদের হিত হবে।

এরপর মনসা, বাচা, কর্মণা মন্দ থেকে বাঁচার উপদেশ করা হয়েছে। অথর্ববেদের মধ্যে লেখা রয়েছে-

ইদম্ য়ত্ পরমেষ্ঠিনম্ মনো বাম্ ব্রহ্মসম্শিতম্।

য়েনৈব সসৃজে ঘোরম্ তেনৈব শান্তিরস্তু নঃ॥

ইয়ম্ য়া পরমেষ্ঠিনী বাগ্দেবী ব্রহ্মসম্শিতা।

য়েয়ৈব সসৃজে ঘোরম্ তয়ৈব শান্তিরস্তু নঃ॥

ইমানি য়ানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃ ষষ্ঠানি মে হৃদি ব্রহ্মণা সম্শিতানি।

য়েরৈব সসৃজে ঘোরম্ তৈরেব শান্তিরস্তু নঃ॥

(অথর্বঃ ১৯|৯|৪,৩,৫)

অর্থাৎ - মন যা জ্ঞান দ্বারা তীক্ষ্ণ নির্মিত আর যারদ্বারা ভয়ংকর প্রসঙ্গ উৎপন্ন হয়ে যায়, সেটি আমাদের শান্তি দিক। ব্রাহ্মণের দ্বারা সংস্কৃত হওয়া যে পরমেষ্ঠিনী বাণী রয়েছে আর যারদ্বারা ভয়ংকর প্রসঙ্গ উৎপন্ন হয়ে

যায়, সেসব আমাদের শান্তি দিক। এই পাঁচ জ্ঞান অথবা কর্মেন্দ্রিয় যারদ্বারা ষষ্ঠ মনের সঙ্গে ভয়ংকর পাপ হয়ে যায়, সেসব আমাদের শান্তি দিক।

এইভাবে এই মন্ত্রগুলো মনসা, বাচা আর কর্মণা পাপ থেকে বাঁচতে আর শান্তিতে থাকার উত্তম উপদেশ দিয়েছে। এইসব মন, বাণী আর কর্মের মধ্যে মনই হল প্রধান। তার দ্বারাই সকল পাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে, এইজন্য মনকে নিষ্পাপ করার উপদেশ এইভাবে দেওয়া হয়েছে -

পরোऽপেহি মনস্পাপ কিমশস্তানি শন্সসি।

পরেহি ন ত্বা কাময়ে বৃক্ষাম্ বনানি সম্চর গৃহেষু গোষু মে মনঃ।।

(অথর্বঃ ৬|৪৫|১)

অর্থাৎ - হে আমার মনের পাপ! তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাও। আমার সঙ্গে খারাপ কথা কেন বলো? আমি তোমাকে চাই না, এইজন্য আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও আর যেখানে বন-বৃক্ষ রয়েছে সেখানে চলে যাও, কারণ আমি আমার শরীর, ইন্দ্রিয় আর মনের মধ্যে চিত্ত লাগাচ্ছি।

এইভাবে মন সম্বন্ধিত ঈর্ষা-দ্বেষ থেকে বাঁচারও উপদেশ করা হয়েছে। অথর্ববেদের মধ্যে বলা হয়েছে -

য়থা ভূমির্মৃতমনা মৃতান্মৃতমনস্তরা।

য়থোত মম্রুষো মন এবের্ষ্যোর্মৃতম্ মনঃ।।

(অথর্বঃ ৬|১৮|২)

অর্থাৎ - যেরকম পৃথিবী মৃতক হতেও অধিক মননশক্তিশূন্য আর যেরকম মৃত ব্যক্তির মনও শূন্য হয়ে যায় সেইরকম ঈর্ষাকারীর মনও মৃত হয়ে যায়।

এই উপদেশের তাৎপর্য হল এটাই যে, ঈর্ষা-দ্বেষ মনের মহানতা নষ্ট করে দেয়। সেটা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে যায়, মরে যায় আর নিন্দাও হয়। নিন্দা থেকে বাঁচতে বেদ উপদেশ করছে যে -

অয়ুতোऽহময়ুতো ম আত্মায়ুতম্ মে চক্ষুরয়ুতম্ মে

শ্রোত্রময়ুতো মে প্রাণোऽয়ুতো মে পানোऽ য়ুতো মে ব্যানোऽয়ুতোऽহম্ সর্বঃ।।

(অথর্বঃ ১৯|৫১|১)

অর্থাৎ - আমি অনিন্দিত হবো, আমার আত্মা অনিন্দিত হোক আর আমার চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ, অপান তথা ব্যান অনিন্দিত হোক।

এরপর বেদমন্ত্রের মধ্যে ব্যভিচার আদি দুষ্ট কর্মকে ত্যাগ করার শিক্ষা এইভাবে দেওয়া হয়েছে -

মা পৃণন্তো দুরিতমেন আরন্মা জারিষুঃ সূরয়ঃ সুব্রতাসঃ।

অন্যস্তেষাম্ পরিধিরস্তু কশ্চিদপৃণন্তমভি সম্ য়ন্তু শোকাঃ।।

(ঋঃ ১|১২৫|৭)

অর্থাৎ - দুষ্ট কর্ম করো না আর প্রতিষ্ঠিত তথা ধর্মাত্মার মধ্যে ব্যভিচার করো না, কারণ ব্যভিচারীদের জন্য আলাদা বিধানও রয়েছে, যারদ্বারা তারা শোকপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

এরপর হিংসার নিষেধ এইভাবে রয়েছে -

অনাগোহত্যা বৈ ভীমা কৃত্যে মা নো গামশ্বম্ পুরুষম্ বধীঃ।

য়ত্র য়ত্রাসি নিহিততা ততস্ত্বোত্থাপয়ামসি প্রণাল্লঘীয়সী ভব।।

(অথর্বঃ ১০|১|২৯)

য়েऽশ্রদ্ধা ধনকাম্যা ক্রব্যাদা সমাসতে।

তে বা অন্যেষাম্ কুম্ভীম্ পর্য়াদধতি সর্বদা।।

(অথর্বঃ ১২|২|৫১)

অর্থাৎ - হে হিংসে! নির্দোষীদের হত্যা নিশ্চয়ই মহাভয়ানক, অতঃ তুমি আমাদের গৌ, অশ্ব, পুরুষদের মেরো না। যেখানে-যেখানে তুমি গুপ্তরূপে লুকাবে সেখান-সেখান থেকে আমি তোমাকে বের করছি, অতঃ তুমি পত্র থেকেও অধিক হালকা হয়ে যাও। অশ্রদ্ধাকারী যে ধনের কামনায় মাংস ভক্ষকদের সঙ্গ দেয়, সে সর্বদা অন্যেরই হাঁড়ির খেয়ে থাকে।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে পশুবধ আর মাংস ভক্ষণের নিষেধ করা হয়েছে। এরপর মদ্যের নিষেধ এইভাবে রয়েছে -

হৃত্সু পীতাসো য়ুধ্যন্তে দুর্মদাসো ন সুরায়াম।

ঊধর্ন নগ্না জরন্তে।।

(ঋঃ ৮|২|১২)

অর্থাৎ - মদ্যপান করা দুষ্ট ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর নগ্ন হয়ে ব্যর্থ অনর্গল কথা বলে, এইজন্য মদ্যপান করা ভালো নয়।

যেরকম মদ্যপান করা খারাপ সেইরকম জুয়া খেলায়ও খারাপ। বেদ উপদেশ করেছে -

জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক্ক স্বিত্।

ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানোऽন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি।।

(ঋঃ ১০|৩৪|১০)

অর্থাৎ - জুয়ারীর স্ত্রী কষ্টময় অবস্থার কারণে দুঃখী থাকে, পথে-ঘাটে জুয়ারীর মাতা কেঁদে বেড়ায়, ঋণে ডুবা জুয়ারী স্বয়ং সর্বদা ভয় পেতে থাকে আর ধনের আশায় রাতের অন্ধকারে অন্যের গৃহে চুরি করতে পৌঁছায়, এইজন্য জুয়া খেলা অত্যন্ত খারাপ।

এইভাবে চুরি করাকেও খারাপ বলা হয়েছে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে -

য়েऽমাবাস্যাম্ত রাত্রিমুদস্থুর্ব্রাজমত্রিণঃ।

অগ্নিস্তুরীয়ো য়াদুহা সো অস্মভ্যমধি ব্রবত্।।

(অথর্বঃ ১|১৬|১)

অর্থাৎ - যেসব শয়তান, ক্ষুধাতুর আর বিচরণকারী রাতের অন্ধকারে গ্রামের ভিতর চুরি আর ডাকাতি করার জন্য আসে, তাদের থেকে বাঁচার জন্য রাজপুরুষ সকলকে সাবধান করে দেয় আর তাদের মেরে ফেলে,

এইজন্য কখনও কিছু চুরি করা উচিত নয়।

এই পর্যন্ত স্থূল সদাচারের বর্ণনা করে এখন সভ্যতা-সম্বন্ধিত সদাচারের বর্ণনাতে আসা যাক। সভ্যতার মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় হল স্বচ্ছতা আর পবিত্রতা, এইজন্য বেদ উপদেশ করেছে -

দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।

পূতম্ পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ।।

(য়জুঃ ২০|২০)

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্ত মনসা ধিয়ঃ।

পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মা।।

(য়জুঃ ১৯|৩৯)

অর্থাৎ - যেভাবে বৃক্ষ থেকে শুকনো পাতা পরে যায়, যেভাবে ঘেমে যাওয়া ব্যক্তি স্নান করে তার শরীরের মল ধুয়ে ফেলে আর যেভাবে ঘী দিয়ে পবিত্রতা হয়, ঠিক সেইভাবে হে জল! আমার শরীর, বস্ত্র আর গৃহের মলকে শুদ্ধ করে দাও। আমাকে বিদ্বান্ পবিত্র করুক। আমার মন আর বুদ্ধিকে পবিত্র করুক। সংসারের সমস্ত প্রাণী আমাকে পবিত্র করুক আর এই অগ্নি আমাকে পবিত্র করুক।

এই স্বচ্ছতা আর পবিত্রতার উপদেশের পরে সদাচার সম্বন্ধিত দিনচর্চার উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

শ্রদ্ধাম্ প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাম্ মধ্যন্দিনম্ পরি।

শ্রদ্ধাম্ সূর্য়স্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ।।

(ঋঃ ১০|১৫১|৫)

সুগুরসত্সু হিরণ্যঃ স্বশ্বো বৃহদস্মৈ বয় ইন্দ্রো দধাতি।

য়স্ত্বায়ন্তম্ বসুনা প্রাতরিত্বো মুক্ষীজয়েব পদিমুত্সিনাতি।।

(ঋঃ ১|১২৫|২)

প্রাতা রত্নম্ প্রাতরিত্বা দধাতি তম্ চিকিত্বানপ্রতিগৃহ্যা নি ধত্তে।

তেন প্রজাম্ বর্ধয়মান আয়ু রায়স্পোষেণ সচতে সুবীরঃ।।

(ঋঃ ১|১২৫|১)

অর্থাৎ - আমি প্রাতঃকাল শ্রদ্ধার পূজা করি, আমি মধ্যদিনে শ্রদ্ধার পূজা করি আর আমি সূর্য়াস্ত হলে শ্রদ্ধার পূজা করি, এইজন্য হে শ্রদ্ধে! তুমি শ্রদ্ধার জন্য আসো। যে প্রাতঃকালে ওঠে তাদের সুন্দর গৌ, সোনা, অশ্ব আর দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয় আর তাকে সূর্যদেবতা বসুর দ্বারা এইভাবে বেঁধে দেন যেরকম কেউ কাউকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়, অর্থাৎ প্রাতঃকাল ওঠার অভ্যাস করায় সূর্য স্বয়ংই উঠিয়ে দেয়। প্রাতঃকালে ওঠা ব্যক্তি অনেক প্রকারের রত্ন প্রাপ্ত করে থাকে, এইজন্য বুদ্ধিমান্ মনুষ্য সেই সময়টিকে ধরে রাখে, কারণ প্রাতঃকাল জাগরণ দ্বারা প্রজা, আয়ু, ধন, পুষ্টি বাড়ে আর বীরতা আসে।

এইভাবে দিনচর্চার বর্ণনা করে এখন সদাচারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধিত উদারতা, অর্থাৎ দানের বর্ণনা করা যাক-

তবোতিভিঃ সচমানা অরিষ্টা বৃহস্পতে মঘবানঃ সুবীরাঃ।

যে অশ্বদা উত বা সন্তি গোদা যে বস্ত্রদাঃ সুভগাস্তেষু রায়ঃ।।

(ঋঃ ৫|৪২|৮)

অনুপূর্ববত্‌সাম্‌ ধেনুমনড্বাহমুপবর্হণম্‌।
বাসো হিরণ্যম্‌ দত্ত্বা তে য়ন্তি দিবমুত্তমাম্‌।।

(অথর্বঃ ৯|৫|২৯)

অর্থাৎ - হে বৃহস্পতে! যে আপনার রক্ষায় সম্বন্ধ রাখে, সে দুঃখ হতে রহিত, ধনবান্‌ আর পুত্র-পৌত্রকারী হয়ে থাকে, আর যে গৌ, অশ্ব আর বস্ত্রের দান করে সে সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকে, আর তার গৃহে সর্বদা অনেক প্রকারের ধন প্রস্তুত থাকে। যে দুগ্ধদাতা গৌ, বোঝা টানা ষাঁড়, শিরের নিচে রাখা টাকিয়া, বস্ত্র আর সুবর্ণ দান করে, তার উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।

এই উদারতা আর দান সম্বন্ধিত উপদেশের পরে এখন সদাচারের মূল সৎসঙ্গের বর্ণনা দেখা যাক। ঋগ্বেদের লেখা রয়েছে যে -

নাকস্য পৃষ্ঠে অধি তিষ্ঠতি শ্রিতো য়ঃ প্রিণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি।
তস্মা আপো ঘৃতমর্ষন্তি সিন্ধবস্তস্মা ইয়ম্‌ দক্ষিণা পিন্বতে সদা।।

(ঋঃ ১|১২৫|৫)

অর্থাৎ - যে সর্বদা বিদ্বানদের নিকট থাকে সে সুখদায়ক স্বর্গের মধ্যে নিবাস করে, যেখানে অপতত্ত্ব (ইথর) স্থান দেয় আর সূর্যকিরণ দক্ষিণা দেয়।

এই মন্ত্রের মধ্যে বিদ্বানদের সঙ্গে সৎসঙ্গের ফল বলে দেওয়া হয়েছে। এরপর বিদ্বানদের দক্ষিণা দিয়ে তাদের সেবা করার ফলও বলে দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে -

দক্ষিণাবতামিদিমানি চিত্রা দক্ষিণাবতাম্‌ দিবি সূর্য়াসঃ।
দক্ষিণাবন্তো অমৃতম্‌ ভজন্তে দক্ষিণাবন্তঃ প্র তিরন্ত আয়ুঃ।।

(ঋঃ ১|১২৫|৬)

দক্ষিণাবান্‌প্রথমো হূত ইতি দক্ষিণাবান্‌গ্রামণীরগ্রমেতি।
টমেব মন্যে নৃপতিম্‌ জনানাম্‌ য়ঃ প্রথমো দক্ষিণাবিবায়া।।

(ঋঃ ১০|১০৭|৫)

দক্ষিণাশ্বম্‌ দক্ষিণা গাম্‌ দদাতি দক্ষিণা চন্দ্রমুত য়দ্ধিরণ্যম্‌।
দক্ষিণান্নম্‌ বনুতে য়ো ন আত্মা দক্ষিণাম্‌ বর্ম কৃণুতে বিজানন্‌।।

(ঋঃ ১০|১০৭|৭)

অর্থাৎ - দক্ষিণাবান্‌ পুরুষদের নানা প্রকারের সুখ, সূর্যের সমান ঐশ্বর্য আর অমৃতের সমান ফল তথা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়। যিনি প্রথম শ্রেণীর দক্ষিণাবান্‌ হন তাকে সর্বপ্রথম আহ্বান করা হয়, তিনিই গ্রামের প্রধান হন, আর তিনিই রাজার নিকট সম্মান পান। যিনি বিদ্বানগণের দক্ষিণাতে অশ্ব, গৌ, সোনা, রুপো আর অন্ন দান করেন, তার জন্য এই দক্ষিণা ঢালের সমান কাজে লাগে - তার রক্ষা করে।

এই সদাচার সম্বন্ধিত সমস্ত ব্যবহার তখনই সম্পন্ন হতে পারে যখন মানুষ ব্রতধারী হবে, যার সংকল্প দৃঢ় হবে আর যে সর্বদা নিজের সিদ্ধান্তের উপর স্থির থাকবে। এই ব্রতের মহত্ব বলার সঙ্গে বেদ উপদেশ করেছে -

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে৷৷
(য়জুঃ ১৯|৩০)

অর্থাৎ - মানুষ ব্রত দ্বারা দীক্ষাবান্ হয়, দীক্ষা দ্বারা দক্ষিণাবান্ হয়, দক্ষিণা দ্বারা শ্রদ্ধাবান্ হয় আর শ্রদ্ধা দ্বারা সত্যকে, অর্থাৎ মোক্ষকে প্রাপ্ত করে।

এইভাবে এই ব্রতই হল সদাচারের মূল। যিনি ব্রতধারী হন - দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকারী হন - তিনিই সদাচারের মধ্যে সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবেন, কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে যে, এই দৃঢ়তা আর এই ধরনের ব্রত বিনা কোনো নিয়মিত অভ্যাস ছাড়া হওয়া সম্ভব নয় আর বিনা সংস্কারে অভ্যেস হওয়া সম্ভব নয়, এইজন্য এরপর দেখবো যে, সংস্কার সম্বন্ধে বেদ কি কি উপদেশ করেছে।

বিবাহ আর গর্ভাধানাদি সংস্কার

যেভাবে সদাচারের বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবে সদাচারী মানুষ সমাজে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপন্ন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে উত্তম সংস্কার দ্বারা জন্ম থেকেই সংস্কৃত না করা হয়। সংস্কারের অর্থ হল মন, বাণী আর শরীরের সচ্ছতা, এইজন্য মানুষকে জন্ম থেকেই নয় বরং জন্মের পূর্ব থেকেই সংস্কার হওয়া উচিত। এখানেই শেষ নয়, বরং যেসব স্ত্রী-পুরুষের দ্বারা গর্ভাধান হবে তাদেরও ভালোভাবে সুসংস্কৃত হতে হবে। এটা বলার তাৎপর্য হল যে, বিবাহই সমস্ত সংস্কারের মূল সেটা বুঝে নেওয়া উচিত। বিবাহ করবে এমন বর-বধূর কি যোগ্যতা হবে, তাদের কি আয়ু হবে আর তাদের কি কর্তব্য হবে - এইসব বিষয় সংস্কারের আরম্ভের পূর্বেই স্থির করে দেওয়া হয়েছে, এইজন্য আমি এখানে এই বিষয়গুলো এই ক্রম থেকেই বর্ণনা করবো। বেদের আজ্ঞানুসারে সবার প্রথম সংস্কারই হল বিবাহ আর বিবাহের মধ্যে সবার প্রথম বিষয়টি বর - বধূর যোগ্যতা হবে, অতএব আমি বেদের এরকম মন্ত্র উদ্ধৃত করছি যারমধ্যে বিবাহ করবে এমন বর-বধূর যোগ্যতার বর্ণনা রয়েছে। অথর্ববেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

শুদ্ধাঃ পূতা য়োষিতো য়জ্ঞিয়া ইমা ব্রহ্মণাম্ হস্তেষু
প্রপৃথক্ সাদয়ামি। য়ত্কাম ইদমভিষিঞ্চামি
বোঽহমিন্দ্রো মরুত্বান্ত্স দদাতু তন্মে৷৷
(অথর্বঃ ৬|১২২|৫)

অর্থাৎ - শুদ্ধ, পবিত্র আর পূজনীয় এই স্ত্রীদের আমি জ্ঞানীদের হাতে আলাদা-আলাদা করে হস্তান্তর করছি আর যে কামনার জন্য আমি তোমার এই অভিষেক করছি, সকল দেবতা আমার সেই কামনা পূর্ণ করুক। এই মন্ত্রের মধ্যে বিবাহ করবে এরকম কন্যাকে শুদ্ধ, পবিত্র আর পূজনীয় বলা হয়েছে আর যার সঙ্গে বিবাহ হবে তাকে জ্ঞানী বিদ্বান বলা হয়েছে। এতে জ্ঞাত হচ্ছে যে, যেকোনো প্রকারের যোগ্য কন্যা আর বরের বিবাহই হল বৈদিক, অযোগ্যদের নয়, কারণ অবোধ কন্যা স্বয়ং নিজের যোগ্য বরের জন্য নিজের অভিপ্রায় প্রকট করতে পারবে না, কিন্তু বেদ উপদেশ করছে যে, যোগ্য কন্যা তার নিজের বর নিজেই বেছে নিক। ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

কিয়তী য়োষা মর্য়তো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্য়েণ।
ভদ্রা বধূর্ভবতি য়ত্সুপেশাঃ স্বয়ম্ সা মিত্রম্ বনুতে জনে চিত্॥

(ঋঃ ১০|২৭|১২)

অর্থাৎ - বধূ হবে এমন অনেক স্ত্রী যারা ভদ্র আর সুরূপা, মানুষের যোগ্যতাকে বেছে নিয়ে নিজের মিত্রকে (পতিকে) জনসমুহ থেকে স্বয়ং বেছে নিক।

এই মন্ত্রটির মধ্যে পতিবরণ করতে কন্যাদের স্বতন্ত্রতা দেখা যাচ্ছে। এরপর বিবাহের সময়ে কন্যার আয়ুর উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥
সোমো দদদ্ গন্ধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িম্ চ পুত্রাম্শ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্॥

(ঋঃ ১০|৮৫|৪০-৪১)

অর্থাৎ - প্রথম পতি হল সোম, দ্বিতীয় হল গন্ধর্ব, তৃতীয় হল অগ্নি আর চতুর্থ হল মানুষ। সোম দেয় গন্ধর্বকে, গন্ধর্ব দেয় অগ্নিকে আর অগ্নি ধন আর পুত্রের জন্য আমাকে দেয়।

এই মন্ত্রের দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, সোম, গন্ধর্ব আর অগ্নির উপভোগের পরে কেবল সন্তানের জন্যই বিবাহ হওয়া উচিত। এই মন্ত্রের অর্থ করে অত্রিস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, মানুষের পূর্বে কন্যাকে সোম, গন্ধর্ব আর অগ্নি আদি দেবতা ভোগে, অর্থাৎ রোমকালে সোম, স্তনকালে গন্ধর্ব আর রজোদর্শণ কালে অগ্নির প্রভাব থাকে, এইজন্য কন্যার বিবাহ রোম, স্তন আর রজোদর্শনের পরেই বিবাহ হওয়া উচিত (অত্রিস্মৃতি ১৯৪)। এইভাবে কন্যার আয়ু বলার পর বরের আয়ুর জন্য ঋগ্বেদ উপদেশ করেছে -

য়ুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাত্স উ শ্রয়ান্ভবতি জায়মানঃ।
তম্ ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যোতমনসা দেবয়ন্তঃ॥

(ঋঃ ৩|৮|৪)

অর্থাৎ - ব্রহ্মচর্য পূর্ব্বক বিদ্যালাভ করে, উত্তম বস্ত্র পরিধান করে যৌবনকালে যে গার্হস্থ্য আশ্রমে উপনীত হয় সে-ই দ্বিজত্ব লাভে খ্যাতি অর্জন করে মহৎ হয়। ধ্যান পরায়ণ, মননশীল, জ্ঞান প্রচারক, ধৈর্যবান

বিদ্বানেরা সেই পুরুষকে উন্নতি লাভে সহায়তা প্রদান করেন।

এই মন্ত্রটিতে সমাবর্তন সময়ে আয়ুর বর্ণনা রয়েছে। সমাবর্তনের পরেই বিবাহ হয়, এরদ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে যে, বিবাহের সময়ে পুরুষও যুবক হতে হবে, কারণ যদি বিবাহ করার যোগ্য আর যুবকাবস্থা প্রাপ্ত না হয় তবে সে নিজের কর্তব্য বুঝে পরস্পর প্রতিজ্ঞা করতে পারবে না। বর-বধূর পরস্পর বৈবাহিক প্রতিজ্ঞাগুলো বেদমন্ত্রের মধ্যে খুবই সুন্দরভাবে দর্শানো হয়েছে। বিবাহের সময় বর প্রতিজ্ঞা করে যে -

গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তম্ ময়া পত্যা জরদষ্টির্য়থাসঃ।
ভগো অর্য়মা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যম্ ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ।।

(অথর্বঃ ১৪|১|৫০)

ভগস্তে হস্তমগ্রহীত্ সবিতা হস্তমগ্রহীত্।
পত্নী ত্বমসি ধর্মণাহম্ গৃহপতিস্তব।।

(অথর্বঃ ১৪|১|৫১)

অর্থাৎ - ভগ, অর্যমা , সবিতা আর পুরন্ধি আদি দেবতাগণ আমাকে গার্হপত্যের জন্য তোমাকে দিয়েছে, অতএব আমি সৌভাগ্যের জন্য তোমার হাত ধরছি। তুমি বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকো। ভগ আর সবিতা আদি দেবতাগণ আমাকে তোমার সঙ্গে ধরিয়েছে, এইজন্য এখন তুমি ধর্ম দ্বারা আমার পত্নী হলে আর আমি ধর্ম দ্বারা তোমার স্বামী হলাম।

বরের এই প্রতিজ্ঞার পরে বধূ প্রতিজ্ঞা করছে যে -

অভি ত্বা মনুজাতেন দধামি মম বাসসা।
য়থাসো মম কেবলো নান্যাসাম্ কীর্তয়াশ্চন।।

(অথর্বঃ ৭|৩৭|১)

অহম্ বদামি নেত্ ত্বম্ সভায়ামহ ত্বম্ বদ।
মমেদসস্ত্বম্ কেবলো নান্যাসাম্ কীর্তয়াশ্চন।।

(অথর্বঃ ৭|৩৮|৪)

অর্থাৎ - হে মননশীল পুরুষ! আমি তোমাকে নিজের বস্ত্র দ্বারা বাঁধছি আর তুমি যেন অন্য স্ত্রীদের কখনও কথা না বলো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর তুমিও প্রতিজ্ঞা করো এই সভাতে যারদ্বারা তুমি আমারই হবে আর অন্য স্ত্রীদের কখনও কথা বলবে না।

এই প্রকারের এই প্রতিজ্ঞাবচনের পরেই বিবাহ হয়ে যায়। বিবাহ হয়ে গেলে মাতা-পিতার উচিত যে তারা যেন বর-বধূকে আবশ্যক পদার্থ দেন। এই বিষয়কে বেদমন্ত্র সূর্যের আলোঙ্কার দিয়ে এইভাবে বলেছে -

চিত্তিরা উপবর্হণম্ চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্ য়দয়াত্ সুর্য়া পতিম্।।

(অথর্বঃ ১৪|১|৬)

য়া অকৃন্তন্নবয়ন্ য়াশ্চ তত্নিরে য়া দেবীরন্তাঁ অভিতোঽদদন্ত।

তাস্ত্বা জরসে সম্ ব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদম্ পরি ধত্স্ব বাসঃ।।

(অথর্বঃ ১৪|১|৪৫)

কৃত্রিমঃ কন্টকঃ শতদন্ য় এষঃ।

অপাস্যাঃ কেশম্ মলমপ শীর্ষণ্যম্ লিখাত্।।

(অথর্বঃ ১৪|২|৬৮)

অর্থাৎ - যখন সূর্য (কন্যা) তার পতিকে প্রাপ্ত করবে তখন চৈতন্য (বুদ্ধি) হবে ওড়না, দর্শনশক্তি হয়ে যাবে অঞ্জন আর ভূমি ও আকাশের সম্পুট হয়ে যাবে ঝাঁপি। যেসব স্ত্রীগণ সূত কেটেছে, যারা টেনেছে, যারা বুনেছে আর যেসব দেবীগণ আঞ্জল ক্বাথ (তাঁতে বোনা বস্ত্র) করেছে, সেসব স্ত্রীগণ কন্যাকে বস্ত্র পরাবে আর বলবে যে, হে আয়ুষ্মতী বধূ! তুমি এটা পরে নাও। কৃত্রিম কাঁটা দিয়ে নির্মিত অনেক দাঁতের এই চিরুনি যা বধূর কেশের আর মাথার মলকে বের করে দিবে।

এইভাবে অঞ্জন, ঝাঁপি, ওড়না, ক্বাথ (তাঁতে বোনা) বস্ত্র আর চিরুনি আদি আবশ্যক পদার্থ বধূকে দিতে হবে আর ভালো বাহনে বসিয়ে তাকে পতির গৃহে বিদায় করা হবে। বেদ আজ্ঞা দেয় যে -

রুক্মপ্রস্তরণম্ বহ্যম্ বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতম্।

আরোহত্ সুর্য়া সাবিত্রী বৃহতে সৌভগায় কম্।।

(অথর্বঃ ১৪|২|৩০)

অর্থাৎ - নকশা করা চাদর বিছানো সাজগাড়ী যা অনেক প্রকার পদার্থে সুসজ্জিত করা হয়েছে তার উপর সৌভাগ্যবতী বধূ পতির গৃহে যাওয়ার জন্য আরোহণ করুক। যেসময় বধূ বাহনে চরে যাবে সেসময় বিদ্বান্ আশীর্বাদ করবে যে -

ব্রহ্মাপরম্ যুজ্যতাম্ ব্রহ্ম পূর্বম্ ব্রহ্মান্ততো মধ্যতো ব্রহ্ম সর্বতঃ।

অনাব্যাধাম্ দেবপুরাম্ প্রপদ্য শিবা স্যোনা পতিলোকে বি রাজ।।

(অথর্বঃ ১৪|১|৬৪)

য়থা সিন্ধুর্নদীনাম্ সাম্রাজ্যম্ সুষুবে বৃষা।

এবা ত্বম্ সম্রাজ্ঞ্যেধি পত্যুরস্তম্ পরেত্য।।

সম্রাজ্ঞ্যেধি শ্বশুরেষু সম্রাজ্ঞ্যুত দেবৃষু।

ননান্দুঃ সম্রাজ্ঞ্যেধি সম্রাজ্ঞ্যুত শ্বশ্রাঃ।।

(অথর্বঃ ১৪|১|৪৩, ৪৪)

অর্থাৎ - আগে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, মাঝে ব্রহ্ম আর অন্তে ব্রহ্মকে স্মরণ করে হে বধূ! তুমি তোমার সুদৃঢ় দেবপুর - পতিগৃহে সুখদায়িনী আর কল্যাণকারিণী হও আর বিরাজমান হও। যেরকম শক্তিশালী সমুদ্র নদীর রাজ্য প্রাপ্ত করে সেরকম তুমিও পতির গৃহে রাজরাজেশ্বরী হও। শ্বশুরের দৃষ্টিতে রানীর মতো, শাশুড়ির নিকট রানীর মতো আর ননদ তথা দেবরের জন্য মহারানীর মতো হয়ে থাকো।

এই প্রকারের আশীর্বাদ পেয়ে বধূ পতিগৃহে এসে পৌঁছায় আর পতিগ্রামের স্ত্রী-পুরুষ তার স্বাগতম

করে তথা বলে যে -

আত্মন্বত্যুর্বরা নারীয়মাগন্ তস্যাম্ নরো বপত বীজমস্যাম্।
সা বঃপ্রজাম্ জনয়দ্ বক্ষণাভ্যো বিভ্রতী দুগ্ধমৃষভস্য রেতঃ।।

(অথর্বঃ ১৪|২|১৪)

অর্থাৎ - এই আত্মবান্ আর উর্বশী নারী এসেছে, এইজন্য হে নর (পতি)! এরমধ্যে বীজ বপন করো আর এই বধূ শুদ্ধ বীর্যকে ধারণ করে নিজের গর্ভে তোমার জন্য পুত্র উৎপন্ন করুক।

এই পর্যন্ত বেদমন্ত্রগুলোতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিদ্বান, যোগ্য, যুবক আর ধন-ধান্য সম্পন্নই হবে বিবাহ করার অধিকারী, অন্যরা নয়। অযোগ্যদের বিবাহের নিন্দা করার সঙ্গে বেদ উপদেশ করেছে যে -

অশ্লীলা তনূর্ভবতি রুশতী পাপয়ামুয়া।
পতির্যদ্ বধেবা৩বাসসঃ স্বমঙ্গমভ্যূর্ণতে।।

(অথর্বঃ ১৪|১|২৭)

অর্থাৎ - দরিদ্র পুরুষ যখন স্ত্রীর বস্ত্র পরে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন স্ত্রীর শরীর নগ্ন হয়ে যায়, এইজন্য এদের সঙ্গে বিবাহ করতে নেই।

বিবাহ সর্বদা যোগ্য স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যেই হওয়া উচিত। তারাই গর্ভাধানাদি সংস্কারগুলোকে সঠিকভাবে করতে পারবে আর তাদেরই সন্তান সদাচারী হয়ে সমাজের যোগ্য হতে পারবে আর প্রারম্ভে বলা সাত ইচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করতে সক্ষম হবে। উপর্যুক্ত বেদের মন্ত্রগুলো আদর্শ বিবাহের চিত্র তুলে ধরে বলে দিয়েছে যে, এই ধরনের আদর্শ বিবাহের পরেই গর্ভাধান হওয়া উচিত। বেদের গর্ভাধানপ্রকরণ প্রজনন-শাস্ত্র খুবই সূক্ষ্ম নিয়মের উপদেশ করেছে। সেটি এই রহস্যকে এক উচ্চশ্রেণীর বৈদ্যের মতো করে বলেছে, যারদ্বারা উত্তম সন্তান হোক আর দম্পতি সেই ব্যাধি আর হানিগুলো থেকে বেঁচে যাক যা প্রায়শই অজ্ঞানী যুবকদের আর সদ্যবিবাহিতদের ভুগতে হয়। এই উপদেশগুলোকে অশ্লীল ভাবা উচিত নয়। এরপরে এই বিবাহপ্রকরণের মধ্যে গর্ভাধানসংস্কারের জন্য বেদ আজ্ঞা দেয় যে -

আরোহ তল্পম্ সুমনস্যমানেহ প্রজাম্ জনয় পত্যে অস্মৈ।
ইন্দ্রাণীব সুবুধা বুধ্যমানা জ্যোতিরগ্রা উষসঃ প্রতি জাগরাসি।।

(অথর্বঃ ১৪|২|৩১)

দেবা অগ্রে নিপদ্যন্ত পত্নীঃ সমস্পৃশন্ত তন্বস্তনূভিঃ।
সূর্যেব নারী বিশ্বরূপা মহিত্বা প্রজাবতী পত্যা সম্ ভবেহ।।

(অথর্বঃ ১৪|২|৩২)

তাম্ পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব য়স্যাম্ বীজম্ মনুষ্যা বপন্তি।
য়া ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতি য়স্যামুশন্তঃ প্রহরেম শেপঃ।।

(অথর্বঃ ১৪|২|৩৮)

প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্ য়েন ত্বাবধ্নাত্ সবিতা সুশেবাঃ।
উরুম্ লোকম্ সুগমত্র পন্থাম্ কৃণোমি তুভ্যম্ সহ পত্ন্যৈ বধু।।
(অথর্বঃ ১৪|১|৫৮)

আ রোহোরুমুপ ধত্স্ব হস্তম্ পরি ষ্বজস্ব জায়াম্ সুমনস্যমানঃ।
প্রজাম্ কৃণ্বাথামিহ মোদমানৌ দীর্ঘম্ বামায়ুঃ সবিতা কৃণোতু।।
(অথর্বঃ ১৪|২|৩৯)

য়দ্ দুষ্কৃতম্ য়চ্ছমলম্ বিবাহে বহতৌ চ য়ত্।
তত্ সম্ভলস্য কম্বলে মৃজমহে দুরিতম্ বয়ম্।।
(অথর্বঃ ১৪|২|৬৬)

অর্থাৎ - হে বধূ! তুমি প্রসন্ন চিত্ত হয়ে এই পর্যকে আরোহণ করো আর নিজের পতির জন্য সন্তান উৎপন্ন করো তথা ইন্দ্রাণীর নেয় হে সৌভাগ্যবতী! বুদ্ধিমানের মতো সূর্য ওঠার পূর্বে ঊষাকালেই জাগবে। বিদ্বানগণ পূর্বেও নিজেদের পত্নীদের প্রাপ্ত করেছে আর নিজের শরীরের সঙ্গে তাদের শরীর মিলিয়েছে, এইজন্য হে বড় ঐশ্বর্যশালী আর প্রজা প্রাপ্তকারী স্ত্রী! তুমিও তোমার পতির সঙ্গে মিলন করো। হে পালনকর্তা পরমেশ্বর! যে স্ত্রীর আজ বীজ বপন করা হবে তাকে প্রেরিত করুন, যেন সে আমার কামনা করার সঙ্গে নিজের উরুকে প্রসারিত করবে আর আমি কামনা করে নিজের গুপ্তেন্দ্রিয়ের প্রহার করি। হে বধূ! আমি তোমার পতির দ্বারা তোমার উরুপ্রদেশের গুপ্ত মার্গকে সুগম করি আর তোমাকে সেই বরুণের উৎকৃষ্ট বন্ধন দ্বারা মুক্ত করি যাকে সবিতা বেঁধেছে। হে পুরুষ! তুমি উরুর উপর আসো, হাতের সাহায্য নাও, প্রসন্নচিত্ত হয়ে পত্নীকে আলিঙ্গন করো আর হর্ষের সঙ্গে তোমরা দুজনে সন্তানকে উৎপন্ন করো, সবিতাদেব যেন তোমাদের উভয়ের আয়ুকে বাড়িয়ে দেয়। এই বৈবাহিক কাজের জন্য যে মলিনতা উভয়ের দ্বারা হয়েছে সেই কম্বলের দাগকে ধুয়ে দাও।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে গর্ভাধান ক্রিয়ার উপদেশ আয়ুর্বৈদিক বিজ্ঞানের অনুসারে করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মন্ত্রটিতে গর্ভাধানের জন্য রাতের সময়কে বলা হয়েছে, দিনের সময় নয়, কারণ বলা হয়েছে যে ঊষাকালের পূর্বেই জাগবে। এর এটাই তাৎপর্য হল যে, দিনের সময়ে লজ্জা আর সঙ্কোচ হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রে আলিঙ্গনের উপদেশ রয়েছে। আলিঙ্গনে বিদ্যুৎ পরিবর্তিত হয়ে থাকে, ভয় দূর হয়ে আনন্দের উদ্বেগ হয়, আর লজ্জার নিবারণ হয়ে যায় যা প্রায়শঃ প্রথম সমাগমের সময় স্ত্রীদের মধ্যে হয়ে থাকে, এইজন্য তৃতীয় মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী প্রসন্নতাপূর্বক এই কাজে সম্মিলিত হোক। চতুর্থ মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে যে, সমাগমের পূর্বে প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভমার্গ এক নির্দিষ্ট ঝিল্লী দ্বারা আবরণ থাকে, এইজন্য পুরুষকে তারথেকে সাবধান থাকা উচিত আর এমন সময় যেন না আসে যারদ্বারা স্ত্রীর কোনো কষ্ট হয়।

পঞ্চম মন্ত্রটিতে স্বাভাবিক আসনের বর্ণনা করা হয়েছে যার তাৎপর্য এই হল যে, উল্টো - বেঁকা আসনের যেন ব্যবহার না হয়, কারণ অস্বাভাবিক আসন দ্বারা সন্তান বিকলাঙ্গ উৎপন্ন হয়ে থাকে। পঞ্চম মন্ত্রটিতে কার্যনিবৃত্তির পরে পরিষ্কার জলে স্নান করারও উপদেশ রয়েছে, যার তাৎপর্য হল স্বচ্ছতা আর

আরোগ্যরক্ষা। এইসব উপদেশের তিনটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমটি হল যে, প্রথম সমাগমের ব্রহ্মচর্যযুক্ত রজ-বীর্য অজ্ঞানতার কারণে যেন ব্যর্থ না হয়ে যায়, কিন্তু গর্ভ অবশ্যই স্থাপিত হয়, এইজন্য রাতের সময়ের, আলিঙ্গনের, স্ত্রীর প্রসন্নতাপূর্বক সম্মিলিত হওয়ার উপদেশ আর স্বাভাবিক আসনের উপদেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল যে, সন্তান যেন সর্বাঙ্গ সুন্দর আর উত্তম হয়, এইজন্য ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ আর কষ্টের নিবারণ বলে দেওয়া হয়েছে। আর তৃতীয়টি হল, দম্পতির আরোগ্যতা যেন স্থির থাকে, এইজন্য আনন্দ আর শুদ্ধতার উপদেশ করা হয়েছে। এইসব উপদেশের তাৎপর্য হল এটাই যে, ব্রহ্মচর্যযুক্ত রজ-বীর্য দ্বারা সর্বগুণসম্পন্ন সন্তান উৎপন্ন হয়ে যাক আর দম্পতির আরোগ্যতাতে যেন কোনো বাঁধা উপস্থিত না হয়। এই মন্ত্রগুলোর দ্বারা এই রহস্যপূর্ণ কৃত্যের বর্ণনা করার পরে বেদ উপদেশ করেছে যে, যখন পতি-পত্নী গর্ভাধান থেকে নিবৃত্তি হয়ে যাবে তখন বস্ত্রকে ধুয়ে নিক আর দুজনে স্নান করে গার্হপত্যাগ্নিতে হবন করবে তথা পতি বিনম্রভাবে পরমেশ্বরের নিকট এইভাবে প্রার্থনা করবে যে -

বিষ্ণুর্য়োনিম্ কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিম্শতু।
আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভম্ দধাতু তে।।
গর্ভম্ ধেহি সিনীবালি গর্ভম্ ধেহি সরস্বতি।
গর্ভম্ তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাম্ পুষ্করস্রজা।।
হিরণ্যয়ী অরণী য়ম্ নির্মন্থতো অশ্বিনা।
তম্ তে গর্ভম্ হবামহে দশমে মাসি সূতবে।।

(ঋঃ ১০|১৮৪|১-৩)

অর্থাৎ - হে বধূ! বিষ্ণু তোমার গর্ভস্থানকে গর্ভ গ্রহণ করার যোগ্য করুক, ত্বষ্টা তোমার গর্ভের আকারকে স্পষ্ট করুক, প্রজাপতি জীবনীশক্তির সঞ্চার করুক আর ধাতা গর্ভের পুষ্টি করুক। চন্দ্রশক্তি গর্ভকে ধারণ করুক, সরস্বতী গর্ভকে ধারণ করুক, আর আকাশপুত্র অশ্বিনী দেবতা গর্ভকে পোষণ করুক। অশ্বিনী দেবতা যে বিদ্যুত্ প্রেরণা দ্বারা গর্ভকে বাইরে নিয়ে আসে সেই শক্তি দিয়ে দশ মাসের মধ্যে গর্ভ বাইরে নিয়ে আসার জন্য আমি আপনার আহ্বান করছি® |

এইভাবে গর্ভাধান সংস্কারের পরে প্রাতঃকাল গ্রামের বৃদ্ধ পুরুষ বধূর মুখ দেখেন আর আশীর্বাদ করেন। বেদ আদেশ করেছে যে -

য়ে পিতরো বধূদর্শা ইমম্ বহতুমাগমন্।
তে অস্যৈ বধ্বৈ সম্পত্ন্যৈ প্রজাবচ্ছর্ম য়চ্ছন্তু।।

(অথর্বঃ ১৪|২|৭৩)

® এই প্রার্থনাতে বিষ্ণু, ত্বষ্টা, প্রজাপতি, ধাতা, চন্দ্র, সরস্বতী আর অশ্বিনী আদি শক্তিগুলোর বর্ণনা এসেছে। এগুলো হল সেইসব সূক্ষ্মশক্তি যা দিয়ে গর্ভের ধারণ, পোষণ আর জনন হয়ে থাকে, এইজন্য সগর্ভার উচিত যে, সে যেন এরকম আহার-বিহারে থাকে যাতে গর্ভ দশ মাস পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকে আর সময় এলে পরে সরলতার সঙ্গে সন্তানোত্পত্তি হয়ে যায়। বেদ সর্বদা প্রার্থনার দ্বারা তত্তত্কার্যশক্তির সূচনা দিয়ে দেয়, যার উপয়োগ দ্বারা সেই-সেই কার্য হয়ে থাকে। এটাই হল বেদের শৈলী।

অর্থাৎ - বধূকে দেখার জন্য যেসব পিতর এই বিবাহতে এসেছে তারা সকলে পতিসহিত বধূকে উত্তম প্রজার জন্য আশীর্বাদ দিক।

এইভাবে বৈদিক বিবাহ আর গর্ভাধান সংস্কার সমাপ্ত হয়, কিন্তু যদি কখনও দুর্ভাগ্যবশত পতিসংযোগের পূর্বেই কন্যা বিধবা হয়ে যায়, তবে এরকম আপত্কালের জন্য বেদ উপদেশ করেছে যে -

গ্রাহ্যা গৃহাঃ সম্ সৃজ্যন্তে স্ত্রিয়া য়ন্মিয়তে পতিঃ।
ব্রহ্মৈব বিদ্বানেষ্যো৩য়ঃ ক্রব্যাদম্ নিরাদধত্॥
(অথর্বঃ ১২|২|৩৯)

য়া পূর্বম্ পতিম্ বিত্বাথান্যম্ বিন্দতেऽপরম্ পতিম্।
পঞ্চৌদনম্ চ তাবজম্ দদাতো ন বি য়োষতঃ॥
সমানলোকো ভবতি পুবর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
য়ো৩জম্ পঞ্চৌদনম্ দক্ষিণাজ্যোতিষম্ দদাতি॥
(অথর্বঃ ৯|৫|২৭-২৮)

অর্থাৎ - যখন স্ত্রীর পতি মরে যায়, তখন গৃহ নষ্ট হয়ে যায়, এইজন্য কন্যার জন্য পতি সর্বদা বেদবেত্তাই খোঁজা উচিত, যে কখনও মাংস খায়নি। যে স্ত্রী পূর্বের পতিকে পেয়ে দ্বিতীয় পতিকে প্রাপ্ত করে তা পঞ্চৌদন দ্বারা তার থেকে বিচ্ছেদ হয় না। দ্বিতীয় পতি বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে পঞ্চৌদনযজ্ঞ দ্বারা বিবাহ করে নিজের জাতির মধ্যে সমানতার স্থান পায়।

এই পর্যন্ত আমি বেদমন্ত্র থেকে বিবাহ আর গর্ভাধান সংস্কারের বর্ণনা করেছি। এরপর পুম্সবন সংস্কার সম্বন্ধিত মন্ত্রগুলো দেখাবো। এই সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য হল গর্ভস্থকে পুষ্ট (সুস্থ) রাখা। এই কাজ এক ঔষধির দ্বারা করা হয়। বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

শমীমশ্বত্থ আরূঢ়স্তত্র পুম্সবনম্ কৃতম্।
তদ্বৈ পুত্রস্য বেদনম্ তত্স্ত্রীষ্বা ভরামসি॥
পুম্সি বৈ রেতো ভবতি তত্স্ত্রিয়ামনু সিচ্যতে।
তদ্বৈ পুত্রস্য বেদনম্ তত্প্রজাপতিরব্রবীত্॥
(অথর্বঃ ৬|১১|১-২)

অর্থাৎ - যে শমীবৃক্ষে অশ্বত্থ উৎপন্ন হয়েছে তার মূলটিকে গর্ভাধানের দিন থেকে দুই-তিন মাস পর্যন্ত স্ত্রীকে দিলে পরে সুস্থ সন্তান প্রাপ্ত হয়। যে বীর্য স্ত্রীর মধ্যে দেওয়া হয় তা পুম্সত্বকে প্রাপ্ত হয় আর পুষ্ট সন্তান প্রাপ্তি হয়, এটা প্রজাপতি (পরমাত্মা) বলেছে।

এই পুম্সবন সংস্কারের পরে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার হয়। যখন গর্ভ চার-পাঁচ মাসের হয়ে যায় তখন মস্তিষ্ক উন্নত হয় আর বুদ্ধি জাগ্রত হয়। এটিকেই সীমন্ত - উন্নয়ন, অর্থাৎ শির (মস্তিষ্কের) উন্নতি বলা হয়। মস্তিষ্কের বিষয়ে বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

তদ্বা অথর্বণাঃ শিরো দেবকোশঃ সমুব্জিতঃ।

তত্ প্রাণো অভি রক্ষতি শিরো অন্নমথো মনঃ।।

(অথর্বঃ ১০|২|২৭)

অর্থাৎ - জ্ঞানের কেন্দ্র হল মস্তক যা হল দেবতাদের সুরক্ষিত কোশ। এই কোশটির রক্ষা প্রাণ, মন আর অন্ন করে থাকে।

এরকম জ্ঞানকোশ মস্তিষ্কের বৃদ্ধির সময় থেকে গর্ভিণীর উচিত যে সে যেন বীর যোদ্ধাদের গল্প শোনে, উত্তম চিত্র দেখে আর উত্তম কর্মের (যজ্ঞের) অনুষ্ঠান করে, যারদ্বারা গর্ভস্থের মস্তিষ্ক উত্তম সংস্কারের দ্বারা সুসংস্কৃত হয়ে যায়। এই সংস্কারের পরে জাতকর্ম সংস্কার রয়েছে। এই সংস্কারটি সন্তানের জন্মের পর করা হয়। যেসময় সন্তান উৎপন্ন হয় সেই সময়ের প্রার্থনার অর্থাৎ প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার বর্ণনা বেদ এইভাবে করেছে -

য়থা বাতঃ পুষ্করিণীম্ সমিম্গয়তি সর্বতঃ।
এবা তে গর্ভ এজতু নিরৈতু দশমাস্যঃ।।
য়থা বাতো য়থা বনম্ য়থা সমুদ্র এজতি।
এবা ত্বম্ দশমাস্য সহাবেহি জরায়ুণা।।
দশ মাসাঞ্ছশয়ানঃ কুমারো অধিমাতরি।
নিরৈতু জীবো অক্ষতো জীবো জীবন্ত্যা অধি।।

(ঋঃ ৫|৭৮|৭-৯)

অর্থাৎ - যেভাবে বায়ুর দ্বারা ছোটো সরোবর সবদিক হতে নড়াচড়া শুরু করে সেইভাবে দশ মাসের মধ্যে তোমার গর্ভ নড়াচড়া করুক, আর শিশুটি বাইরে বেরিয়ে আসুক। যেভাবে বায়ু, বন আর সমুদ্র নড়াচড়া করে সেইভাবে হে শিশু! তুমি জরায়ু সহিত আসো। জীবিত মাতার জীবনে হে জীব (শিশু)! তুমি মাতার গর্ভে দশটি মাস ঘুমিয়ে অক্ষত বাইরে আসো।

এই মন্ত্রগুলোর দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, গর্ভিণীর পেটে যে চতুর্দিক থেকে পীড়া উৎপন্ন হয় তাতে বিচলিত হয়ে সে যেন গর্ভস্থের প্রতি খারাপ ভাবনা না ভাবে, যার প্রভাব শিশুর উপর খারাপ পড়বে, বরং সে যেন এটা ভাবে যে এই পীড়া শিশুটি করছে না, বরং প্রাকৃতিক শক্তির কারণে হচ্ছে। এরপর সর্বপ্রথম দুগ্ধপানের ক্রিয়ার উপর বেদ বলেছে যে -

ইমঁস্তনমূর্জস্বন্তম্ ধয়াপাম্ প্রপীনমগ্নে সরিরস্য মধ্যে।
উত্সম্ জুষস্ব মধুমন্তমর্বন্ত্সমুদ্রিয়ঁ সদনমাবিশস্ব।।

(য়জুঃ ১৭|৮৭)

য়স্তে স্তনঃ শশয়ো য়ো ময়োভূর্য়েন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য়াণি।
য়ো রত্নধা বসুবিধঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ।।

(ঋঃ ১|১৬৪|৪৯)

অর্থাৎ - হে অগ্নিতুল্য শিশু! তুমি সম্বন্ধীদের মাঝে এসে এই জলীয় রস দিয়ে স্থূল স্তনকে পান করো আর

সুস্বাদু, গতিশীল তথা সমুদ্রের সমান জ্ঞান দাতা এই স্তনের সেবন করো। হে জ্ঞানবতী প্রসূতা! তুমি নিজের এই সূখদায়ী শরীরস্থ স্তন যা শিশুর অঙ্গের পুষ্টকারক, দুগ্ধরূপ রত্নের ধারণকারী আর শোভাদায়ক, তাহা শিশুর মুখে দাও।

এই মন্ত্রগুলোতে আরম্ভিক দুগ্ধপানের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষার দ্বারা শিশুটিতে মাতার দুগ্ধের গুণের সংস্কার ভরা হয়, যারদ্বারা শিশুটি যেন আজীবন তার মাতার ভক্ত হয়ে থাকে আর প্রসবের সময় মাতার কষ্টের কারণে যা শিশুর উপর খারাপ প্রভাব পড়েছে, তা দূর হয়ে যায়। এরই নাম হল জাতকর্ম, অর্থাৎ জন্ম হওয়ার কর্ম। জাতকর্মের পরে নামকরণ সংস্কার রয়েছে। বেদে লেখা রয়েছে যে -

কোऽ সি কতমোऽ সি কস্যাসি কো নামাসি।

য়স্য তে নামামন্মহি য়ম্ ত্বা সামেনাতীতৃপাম্।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাঁ সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ।।

(য়জুঃ ৭|২৯)

অর্থাৎ - তুমি কে আর তোমার নাম কি? তুমি বড়ো নামকরা হও আর পৃথিবী থেকে মহাকাশ আর দ্যৌ পর্যন্ত পূজা আর পোষণের সঙ্গে বড়ো হও।

এই মন্ত্রটিতে নামকরণ সংস্কারের শিক্ষা রয়েছে। এই সংস্কারের তাৎপর্য শিশুটির নামের সঙ্গে রয়েছে। মানুষের উপর নামের অনেক বড়ো প্রভাব হয়ে থাকে। উত্তম, সার্থক আর উচ্চভাবের বোধকারী নাম নামীকে সর্বদা নিজের নামের সূচনা দিয়ে তাকে অনেক দুর্ব্যবহারের থেকে বাঁচিয়ে দেয় আর উচ্চ হওয়ার প্রেরণা দেয়, এইজন্য বেদ এই সংস্কারটি করার আজ্ঞা দিয়েছে। এই নামকরণ সংস্কারের পরে নিষ্ক্রমণ সংস্কার রয়েছে। এই সংস্কারের দ্বারা শিশুটিকে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসা হয়। এর দ্বারাই শিশুটির প্রথমবার সংসারের সঙ্গে পরিচয় হয়। বেদ এই সম্বন্ধে উপদেশ করেছে যে -

শিবে তে স্তাম্ দ্যাবাপৃথিবী অসন্তাপে অভিশ্রিয়ৌ।

শম্ তে সূর্য় আ তপতু শম্ বাতো বাতু তে হৃদে।

শিবা অভি ক্ষরন্তু ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ।।

শিবাস্তে সন্ত্বোষধয় উত্ত্বাহার্ষমধরস্যা উত্তরাম্ পৃথিবীমভি।

তত্র ত্বাদিত্যৌ রক্ষতাম্ সূর্য়াচন্দ্রমসাবুভা।।

(অথর্বঃ ৮|২|১৪-১৫)

অর্থাৎ - হে শিশু! তোমার জন্য এই দ্যৌ আর পৃথিবীলোক দুঃখ রহিত, কল্যাণকারী আর শোভা তথা ঐশ্বর্যের দাতা হোক। এই সূর্য তোমার জন্য প্রকাশদাতা হোক, বায়ু তোমার হৃদয়কে শান্তিদায়ক হোক আর জল তোমার জন্য সুন্দর সুস্বাদু হয়ে প্রবাহিত হোক। তোমাকে ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছি যেন তোমার জন্য ঔষধি কল্যাণকারী হয়। সূর্য-চন্দ্র উভয় তোমার রক্ষা করুক।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে নিষ্ক্রমণের দুটি তাৎপর্য বলা হয়েছে। একটি হল শিশুটিকে পদার্থের পরিচয় করানো, অন্যটি হল শীতোষ্ণ সহ্য করার অভ্যাস, এইজন্য এই সংস্কারটিকে আবশ্যক বলে মনে করা হয়।

এরপর রয়েছে অন্নপ্রাশন সংস্কার। এই সংস্কারের দ্বারা উত্তম পদার্থের স্বাদের জ্ঞান করানো আর হানিকারক পদার্থ থেকে তিরস্কারের সংস্কার বুঝানো হয়। এর সম্বন্ধে বেদ উপদেশ করেছে যে -

অন্নপেতऽ ন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ।

প্রপ্র দাতারম্ তারিষ ঊর্জম্ নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে।।

(য়জুঃ ১১|৮৩)

অর্থাৎ - হে অন্নের স্বামী পরমাত্মন্! আপনি আমাদের জন্য, আমাদের পশু-পক্ষীর জন্য আর অন্য মানুষদের জন্য রোগরহিত আর বলকারক অন্ন দিন আর তার বৃদ্ধি করুন।

এই প্রার্থনার তাৎপর্য হল এটাই যে, আমরা যেন রোগরহিত, বলকারক অন্নেরই সেবন করি আর সেই প্রকারের অন্ন সেবনের সংস্কার শিশুকাল থেকেই সন্তানদের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করি। এই সংস্কারের পরে মুণ্ডন (চূড়াকর্ম) সংস্কার রয়েছে। বেদের মধ্যে এরজন্য এইভাবে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে -

য়েনাবপত্সবিতা ক্ষুরেণ সমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্।

তেন ব্রাহ্মণো বপতেদমস্য গোমানশ্ববানয়মস্তু প্রজাবান্।।

(অথর্বঃ ৬|৬৮|৩)

অর্থাৎ - যেভাবে ক্ষুর দিয়ে সোম আর বরুণের ক্ষৌর সবিতা (বিদ্বান্) করে সেইভাবে ব্রাহ্মণের উচিত যে তিনি যেন এই শিশুটির মুণ্ডন করেন, যাতে এই শিশুটি ধনবান্ আর প্রজাবান্ হয়।

এখানে শিশুর মুণ্ডনের বিধিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেভাবে সোম অর্থাৎ জলতত্ত্বে সূর্য অর্থাৎ অগ্নিতত্ত্ব নিজের সঞ্চার করে, সেইভাবে শিশুটির ঠান্ডা মাথায় হালকা উষ্ণ জল দিয়ে মুণ্ডন করা হোক। এই মুণ্ডনসংস্কার গর্ভের অপবিত্র কেশকে কেটে দেওয়ার জন্য করা হয়, যারদ্বারা শুদ্ধতা আসে আর আরোগ্যতা বাড়ে। এই সংস্কারের পরে কর্ণবেধ সংস্কারের আবশ্যকতা বলে দেওয়া হয়েছে। কর্ণবেধ দ্বারা ডিম্ববৃদ্ধির রোগ হয় না আর এর থেকেই আরোগ্যতার জন্য স্বর্ণ পড়ার কাজও হয়ে যায়। বেদ উপদেশ করেছে যে -

লোহিতেন স্বধিতিনা মিথুনম্ কর্ণয়ো কৃধি।

অকর্তামশ্বিনো লক্ষ্ম তদস্তু প্রজয়া বহু।।

(অথর্বঃ ৬|১৪১|২)

অর্থাৎ - দুটি কানের মধ্যে অশ্বিনী দেবতাগণ পূর্বেই চিহ্ন করে রেখেছে, তাতে লৌহ শস্ত্র দ্বারা হে বৈদ্যো! অনেক প্রজা দিবে এমন ছিদ্র করুন।

এই ছিদ্রকে সুশ্রুতে **"দেবকৃতে ছিদ্রে"** লেখা রয়েছে। কানের মধ্যে তিনটি শিরার মাঝে যেস্থানটি রয়েছে সেটিই হল দেবছিদ্র। তার ছেদন করলে আর তাতে স্বর্ণ পড়লে ডিম্ববৃদ্ধি রোগ হয় না আর ডিম্ববৃদ্ধি না হওয়াতেই সন্তান হয়, এইজন্য এই সংস্কারটি আবশ্যক। এই মুণ্ডন আর কর্ণবেধ উভয় সংস্কার দুটি শিশুর মধ্যে আরোগ্যরক্ষার সংস্কারের প্রভাব দেওয়া শুরু করে। এইভাবে ছোট-বড়ো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলোর পরে উপনয়ন সংস্কার করা হয়। বেদের মধ্যে এই সংস্কারের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণম্ কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।

তম্ রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তম্ জাতম্ দ্রষ্টুমভিসম্যন্তি দেবাঃ।। ৩ ।।
ইয়ম্ সমিত্ পৃথিবীদ্যৌর্দ্বিতীয়োতান্তরিক্ষম্ সমিধা পৃণাতি।
ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোকাম্স্তপসা পিপর্তি।।

(অথর্বঃ ১১|৫|৩-৪)

অর্থাৎ - আচার্য আগন্তুক ব্রহ্মচারীকে নিজের নিকট গর্ভের মতো তিন দিন পর্যন্ত রাখেন আর সকলে সেই ব্রহ্মচারীকে দেখতে আসেন। তার প্রথম সমিধা পৃথিবী, দ্বিতীয় মহাকাশ আর তৃতীয় দ্যৌ হয়ে থাকে। সে সমিধা দ্বারা, মেখলা দ্বারা, শ্রম দ্বারা আর তপ দ্বারা তিন লোককে পালন করে।

এই দুই মন্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মচারীর আচার্যকুলে যাওয়া আর আচার্যের গৃহে জন্ম নিয়ে দ্বিজ হওয়া - বলা হয়েছে আর বলে দেওয়া হয়েছে যে সরলতা, যজ্ঞ, শ্রম আর তপ দ্বারা পৃথিবী, মহাকাশ আর দ্যৌ-এর জ্ঞান - ঋগ্বেদ, য়জুর্বেদ আর সামবেদকে প্রাপ্ত করুক। এরপরে তার ভিক্ষাবৃত্তির গৌরব বেদের মধ্যে এইভাবে বলা হয়েছে -

ইমাম্ ভূমিম্ পৃথিবীম্ ব্রহ্মচারী ভিক্ষামা জভার প্রথমো দিবম্ চ।
তে কৃত্বা সমিধাবুপাস্তে তয়োরার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা।।

(অথর্বঃ ১১|৫|৯)

অর্থাৎ - ব্রহ্মচারী পূর্বে বিশাল ভূমি আর দ্যুলোকের ভিক্ষা প্রাপ্ত করেছে। এখন সেই ব্রহ্মচারী তার দুই সমিধা বানিয়ে উপাসনা করে, কারণ সেই উভয়ের মাঝে সব ভুবন স্থিত রয়েছে।

এই মন্ত্রের মধ্যে পৃথিবী থেকে দ্যৌ পর্যন্ত ঈশ্বরের নির্মিত পদার্থের ভিক্ষার উপদেশ রয়েছে। এর তাৎপর্য হল এটাই যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা প্রবন্ধ করে দিয়েছে, এইজন্য ভিক্ষা করে সেটা গ্রহণ করো আর বিদ্যাধ্যয়ন করো। এরপর বেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য এইভাবে বর্ণিত রয়েছে -

আচার্যো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঃ।
প্রজাপতির্বি রাজতি বিরাডিন্দ্রোऽভবদ্ বশী।।
ব্রহ্মচর্য়েণ তপসা রাজা রাষ্ট্রম্ বি রক্ষতি।
আচার্যো ব্রহ্মচর্য়েণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।।
ব্রহ্মচর্য়েণ কন্যা য়ুবানম্ বিন্দুতে পতিম্।
অনড্বান্ ব্রহ্মচর্য়েণাশ্বো ঘাসম্ জিগীর্ষতি।।
ব্রহ্মচর্য়েণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্য়েণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরত্।।

(অথর্বঃ ১১|৫|১৬-১৯)

অর্থাৎ - ব্রহ্মচারীই আচার্য হয়, ব্রহ্মচারীই প্রজাপতি হয় আর প্রজাপতি অর্থাৎ ইন্দ্রই বিরাটের নিয়ন্ত্রক হয়। ব্রহ্মচর্যের তপ দ্বারাই রাজা রাষ্ট্রের রক্ষা করে, ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই আচার্য ব্রহ্মচারীদের পড়াতে পারে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করার পর কুমারী কন্যা যুবক পতিকে লাভ করে। বলবান্ ও বুদ্ধিমান ব্যাক্তিই ভোগ্য পদার্থকে

সম্যক ভোগ করতে পারে, ব্রহ্মচর্য আর তপ দ্বারাই দেবতাগণ মৃত্যুকে সরিয়ে দেয় আর ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই ইন্দ্র দেবতাদের সুখে ভরে দেয়।

এইভাবে এই সদাচার আর সভ্যতার মূল তথা ভুবন আর পরলোকের সাধনরূপ ব্রহ্মচর্যের মহিমা বেদের মধ্যে বিস্তারভাবে বর্ণিত রয়েছে। এইজন্য এই সংস্কারের আবশ্যকতা বলে দেওয়া হয়েছে। এই সংস্কার দ্বারা মনুষ্য উৎকৃষ্ট গুণগুলোকে পেয়েই সমাজের মধ্যে মিলিত হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। এই মিলিত হওয়ার নামই হল সমাবর্তনসংস্কার। সমাবর্তন সংস্কারেরও অনেক মহিমা রয়েছে, কারণ এটাই হল সমাজের মূল। এরজন্য বেদ আজ্ঞা দিয়েছে যে -

তানি কল্পদ্ ব্রহ্মচারী সলিলস্য পৃষ্ঠে তপোऽতিষ্ঠত্তপ্যমানঃ সমুদ্রে।
স স্নাতো বভ্রুঃ পিঙ্গলঃ পৃথিব্যাম্ বহু রোচতে।।

(অথর্বঃ ১১|৫|২৬)

অর্থাৎ - যে ব্রহ্মচারী সমুদ্রের মতো গম্ভীর হয়ে আর উত্তম ব্রত ব্রহ্মচর্যের মধ্যে নিবাস করে মহাতপকে ধারণ করে আর বেদপঠন, বীর্যনিগ্রহ তথা আচার্যের প্রিয়াচরণাদি কর্মকে পূর্ণ করে আর সমাবর্তনের স্নানবিধিকে করে উত্তম গুণ-কর্ম-স্বভাবের দ্বারা প্রকাশিত হয়, সে-ই ধন্যবাদের যোগ্য।

এই মন্ত্রের মধ্যে সমাবর্তন সংস্কারের গুরত্ব দেখানো হয়েছে। এরপর বিবাহ আর গৃহস্থাশ্রম সংস্কার রয়েছে যা পূর্ণরূপে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানেই লৌকিক সংস্কারের সমাপ্তি হয়ে যায়। গৃহস্থাশ্রম সংস্কারের পরে পরলোক সম্বন্ধিত তিনটি সংস্কার আরও রয়েছে। তাদের নাম হল বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস আর অন্ত্যেষ্টি সংস্কার। এই তিন সংস্কার ছাড়া মানুষের জন্ম সফল হয় না, কারণ বিনা বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাসে মনুষ্য সঠিকভাবে পরলোক চিন্তা করতে পারে না আর না পরমতত্বকে প্রাপ্ত করতে পারে, এইজন্যই ঋগ্বেদের মধ্যে অরণ্যানী সূক্তে উপদেশ করা হয়েছে। অরণ্যানী সূক্তের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

ন বা অরণ্যানির্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় য়থাকামম্ নি পদ্যতে।।

(ঋঃ ১০|১৪৬|৫)

অর্থাৎ - বানপ্রস্থ গ্রহণকারীকে বন্য পশু হনন করে না অন্যান্য প্রাণীও এদের হনন করে না। এরা সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করে।

এই সংস্কার দ্বারা একান্ত থেকে তপ আর যোগের দ্বারা গৃহস্থাশ্রম, অর্থাৎ সমাজে যেসব সংস্কারগুলো রয়েছে তা দূর করে দেওয়া হয় আর পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের উৎকট অভিলাষার পারলৌকিক সংস্কারগুলোকে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করা হয়। এই সংস্কারের পরে সন্ন্যাস সংস্কার রয়েছে, কিন্তু বৈদিক সন্ন্যাসের অভিপ্রায় আজকালকার সন্ন্যাসীদের মতো নয়। আজকালকার সন্ন্যাসী তো বৌদ্ধ-ভিক্ষুকদের নকল। বৈদিক সন্ন্যাসী এই ধরণের ছিল না। বৈদিক সন্ন্যাসীদের দেব বলা হতো আর তারা সংসার হতে বিরক্ত হয়ে সমাধির দ্বারা পরমাত্মার দর্শনের জন্য সর্বদা চেষ্টা করতেন। বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"ব্রহ্মচর্য়েণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত"**, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য আর তপ দ্বারাই সমস্ত দেবগণ মোক্ষ প্রাপ্ত করেন।

এই কারণেই দেবসংস্কারের উপদেশ বেদের মধ্যে এইভাবে রয়েছে -

য়েনা সহস্রম্ বহসি য়েনাগ্নে সর্ববেদসম্।
তেনেমম্ য়জ্ঞম্ নো বহ স্বর্দেবেষু গন্তবে।।

(অথর্বঃ ৯|৫|১৭)

অর্থাৎ - হে অগ্নে - পরমেশ্বর! যে গৃহস্থাশ্রমকে সহস্রজন ধারণ করে আছে, তাকে ত্যাগ করে আমি দেবের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এটাই হল সন্ন্যাস ধারণ করার সংস্কার।

এই সংস্কারের পরে অন্ত্যেষ্টি সংস্কার রয়েছে। বেদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি সংস্কারের অনেক বড়ো মহিমা রয়েছে। এটিকে পিতৃযজ্ঞ নামেও অনেকে ডাকে। এই ক্রিয়ার বর্ণনা বেদের মধ্যে বিস্তারভাবে রয়েছে। আমি এখানে সেই প্রকরণের কেবল একটি মন্ত্র দিয়ে এই সংস্কার প্রকরণটি সমাপ্ত করছি। ঋগ্বেদে লেখা রয়েছে যে -

সূর্য়ম্ চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাম্ চ গচ্ছ পৃথিবীম্ চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ য়দি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ।।

(ঋঃ ১০|১৬|৩)

অর্থাৎ - চক্ষু সূর্যতে চলে যাক, প্রাণ বায়ুতে চলে যাক, পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে চলে যাক, জলের অংশ জলের মধ্যে চলে যাক আর ঔষোধির অংশ ঔষোধির মধ্যে চলে যাক।

এইভাবে জন্ম হওয়ার পূর্ব থেকে মৃত্যুর পরে পর্যন্ত সংস্কারের বর্ণনা বেদের মধ্যে রয়েছে। এই সংস্কারগুলোর দ্বারাই মানুষের মন, বাণী আর কর্ম সদাচারযুক্ত বানানো হয়, যারদ্বারা সে সমাজের মধ্যে উত্তম গৃহস্থ হয়ে তার নিজের সাত ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারবে, কিন্তু মনুষ্যসমাজের কাজ কেবল সদাচার দ্বারাই চলা সম্ভব নয়। সদাচারের সঙ্গে-সঙ্গে তার জীবিকারও আবশ্যকতা রয়েছে, এইজন্য এরপর আমরা দেখবো যে বেদের মধ্যে জীবিকার বিষয়ে ঠিক কি কি আজ্ঞা রয়েছে।

জীবিকা, উদ্যোগ আর জ্ঞান-বিজ্ঞান

জীবিকা উৎপন্ন করার জন্য সকলকে কৃষি, পশুরক্ষা আর বাণিজ্যেরই সাহায্য নিতে হয়। কৃষি, পশুপালন আর ব্যবসা পৃথিবীর ফলনের সঙ্গেই সম্বন্ধ রাখে, এইজন্য ভৌগলিক জ্ঞান ছাড়া জীবিকার প্রশ্ন সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। বেদের মধ্যে ভৌগলিক শিক্ষা এইভাবে দেওয়া হয়েছে -

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তম্ পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি য়ত্র ভুবনস্য নাভিঃ।
পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমম্ ব্যোম।।

ইয়ম্ বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ম্ য়জ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ঁ সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ম্ বাচঃ পরমম্ ব্যোম॥

(য়জুঃ ২৩|৬১-৬২)

অর্থাৎ - তোমার নিকট এই পৃথিবীর অন্ত জিজ্ঞেস করছি, ভুবনের মধ্য জিজ্ঞেস করছি, সেচনকারী অশ্বের রেত জিজ্ঞেস করছি আর এই আকাশময়ী বাণীকে জিজ্ঞেস করছি। এই বেদীই হল পৃথিবীর অন্তিম সীমা, এই যজ্ঞই হল ভুবনের মধ্য, এই সোমই হল সেচনকারী অশ্বের রেত আর বেদই হল আকাশময়ী বাণী।

এই দুটি মন্ত্রে প্রশ্নোত্তরের রীতি দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই যজ্ঞবেদী অর্থাৎ যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেটাই হল পৃথিবীর অন্ত আর এটাই হল ভুবনের মধ্য, কারণ গোল পদার্থের প্রত্যেক বিন্দুই (স্থানই) তার অন্ত হয় আর সেটাই তার মধ্য হয়। পৃথিবী আর ভুবন উভয়ই হল গোল, এইজন্য উভয়ের প্রত্যেক বিন্দুই হল অন্ত আর মধ্য। এই ভূগোল বর্ণনার পরে পৃথিবীর জল-স্থল বিভাগের জ্ঞানের জন্য দ্বীপের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে যে -

বি দ্বীপানি পাপতন্তিষ্ঠদ্ দুচ্ছুনোভে য়ুজন্ত রোদসী।
প্রধন্বান্যৈরত শুভ্রখাদয়ো য়দেজথ স্বভানবঃ॥

(ঋঃ ৮|২০|৪)

নব ভূমিঃ সমুদ্রা উচ্ছিষ্টেऽধি শ্রিতা দিবঃ।
আ সূর্য়ো ভাত্যুচ্ছিষ্টেऽহোরাত্রে অপি তন্ময়ি॥

(অথর্বঃ ১১|৭|১৪)

এনা ব্যাঘ্রম্ পরি ষস্বজানাঃ সিংহম্ হিন্বন্তি মহতে সৌভগায়।
সমুদ্রম্ ন সুভুবস্তস্থিবাংসম্ মর্মৃজ্যন্তে দ্বীপিনমপ্স্বন্তঃ॥

(অথর্বঃ ৪|৮|৭)

অর্থাৎ - যখন পৃথিবী আর আকাশের মধ্যে আকর্ষণ আর কম্পন হয় তখন কোথাও না কোথাও নতুন দ্বীপ উৎপন্ন হয়ে যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায় আর সমস্ত স্থাবর দুঃখ পায়। নতুন ভূমি সমুদ্র থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে আর সূর্য তার দিন-রাতের প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর স্থলভাগ সমুদ্রে ঘেরা থাকে, যেখানে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি জন্তুরা গর্জন করে।

এই মন্ত্রগুলোতে দ্বীপ আর উচ্চস্থানের উৎপত্তি আর সেটি সমুদ্রে ঘিরে থাকার কথা বলা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ফলনের বর্ণনায় আসা যাক। সবার আগে জঙ্গলের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ য়া প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামম্ ন প্রচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী৩ঁ॥
বৃষারবায় বদতে য়দুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ঘাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে॥
উত গাবইবাদন্ত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে।

উতো অরণ্যানিঃসায়ম্ শাকটীরিব সর্জতি।।
গামঙ্গৈষ আ হ্বয়তি দার্বঙ্গৈষো অপাবধীত্।
বসন্নরণ্যান্যাম্ সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে।।
ন বা অরণ্যানির্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় য়থাকামম্ নিপদ্যতে।।
আঞ্জনগন্ধিম্ সুরভিম্ বহ্বন্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহম্ মৃগাণাম্ মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্।।

(ঋঃ ১০|১৪৬|১-৬)

অর্থাৎ - এই মহাবনের মধ্যে গৌ আদি পশু ঘাসের জন্য চরে বেড়াচ্ছে। এই বন দেখতে গৃহের মতো। কেউ বাহন নিয়ে যাচ্ছে, কেউ গাভীদের ডাকছে, কেউ শুষ্ক কাষ্ঠ কাটছে আর কেউ সন্ধ্যার সময়ে ভয় পাচ্ছে। যদি কোনো ক্রূর জন্তু না থাকে তবে এই অরণ্যটি কাউকে মারে না। অরণ্যে সুস্বাদু ফল আহারের জন্য পাওয়া যায়, এটা কস্তুরী আর পুষ্পের সুগন্ধ দেয় আর বিনা খেতি করেই অনেকগুলো অন্ন দিয়ে দেয়। অনেক প্রকার পশুদের উৎপত্তির স্থান হল এই অরণ্য যা মহাপ্রশংসার যোগ্য।

এই জঙ্গলে অন্নের অতিরিক্ত আরও অনেক প্রকারের যজ্ঞান্নের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

ব্রীহয়শ্চ মে য়বাশ্চ মে মাষাশ্চ মে তিলাশ্চ মে মুদগাশ্চ
মে খল্বাশ্চ মে প্রিয়ঙ্গবশ্চ মেऽ ণবশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ মে
নীবারাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে মসূরাশ্চ মে য়জ্ঞেন কল্পন্তাম্।।

(য়জুঃ ১৮|১২)

অর্থাৎ - আমার ধান, গম, যব, মাষ কলাই, তিল, মুগ, ছোলা, কাউন, কোদো, সাঁবাঁ, পসাহী আর মসুর আদি সব অন্ন যজ্ঞ দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে।

এই অন্নের পরে সব প্রকারের জলের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

য়া আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা য়াঃ স্বয়ম্ জাঃ।
সমুদ্রার্থা য়াঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত।।

(ঋঃ ৭|৪৯|২)

অর্থাৎ - যে জল বর্ষণে পবিত্র, খনন দ্বারা প্রাপ্ত, যা স্বয়ং (নদী দ্বারা) উৎপন্ন আর যা সমুদ্র দ্বারা নির্মিত, সেসব দিব্য জল এখানে আমার রক্ষা করুক।

এইভাবে জলের বর্ণনার পরে খনিজ পদার্থের বর্ণনা বেদের মধ্যে এইভাবে রয়েছে -

অশ্মা চ মে মৃত্তিকা চ মে গিরয়শ্চ মে পর্বতাশ্চ মে
সিকতাশ্চ মে বনস্পতয়শ্চ মে হিরণ্যম্ চ মেऽ য়শ্চ
মে শ্যামঞ্চ মে লোহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে ত্রপু চ মে য়জ্ঞেন কল্পন্তাম্।।

(য়জুঃ ১৮|১৩)

অর্থাৎ - আমার এই শিলা, মাটি, গিরি, পর্বত, বালু, বনস্পতি, সোনা, ইস্পাত, লোহা, সীসা, দস্তা আদি সব যজ্ঞ দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে।

এইভাবে পৃথিবীর গঠন, দ্বীপের উৎপত্তি আর পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রকারের ফসলের জ্ঞান দিয়ে পোষণকারী মাতৃভূমির এইভাবে প্রশংসা বেদ করেছে আর উপদেশ করেছে যে, বেদ মান্যতাকারীদের মাতৃভূমির প্রতি গুণগান আর তার উপর গর্ব কিভাবে করা উচিত।

অথর্ববেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

য়স্যাম্ সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো য়স্যামন্নম্ কৃষ্টয়ঃ সম্বভূবুঃ।
য়স্যামিদম্ জিন্বতি প্রাণদেজত্ সা নো ভূমিঃ পূর্ববেয়ে দধাতু।।৩ ।।
য়স্যাম্ পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে য়স্যাম্ দেবা অসুরানভ্যবর্তয়ন্।
গবামশ্বানাম্ বয়সশ্চ বিষ্ঠা ভগম্ বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু।।৫ ।।
বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বনারম্ বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু।।৬ ।।
গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোऽ রণ্যম্ তে পৃথিবি স্যোনমস্তু।
বভ্রুম্ কৃষ্ণাম্রোহিণী বিশ্বরূপাম্ ধ্রুবাম্ ভূমিম্ পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতো ऽহতো অক্ষতো ऽধ্যষ্ঠাম্পৃথিবী মহম্।।১১ ।।
শিলাভূমিরশ্মা পাম্সুঃ সা ভূমিঃ সম্ধৃতা ধৃতা।
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরম্ নমঃ।।২৬ ।।
য়স্যাম্ বৃক্ষা বানস্পত্যা ধ্রুবাস্তিষ্ঠন্তি বিশ্বহা।
পৃথিবীম্ বিশ্বধায়সম্ ধৃতামচ্ছাবদামসি।।২৭ ।।
য়স্যাম্ গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাম্ মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ।
য়ুধ্যন্তে য়স্যামাক্রন্দো য়স্যাম্ বদতি দুন্দুভিঃ।
সা নো ভূমিঃ প্র ণুদতাম্ সপত্নানসপত্নম্ মা পৃথিবী কৃণোতু।।৪১ ।।
য়স্যামন্নম্ ব্রীহিয়বৌ য়স্যা ইমাঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ।
ভূম্যৈ পর্জন্যপত্ন্যৈ নমোऽস্তু বর্ষমেদসে।।৪২ ।।
নিধিম্ বিভ্রতী বহুধা গুহা বসু মণিম্ হিরণ্যম্ পৃথিবী দদাতু মে।
বসূনি নো বসুদা রাসমানা দেবী দধাতু সুমনস্যমানা।।৪৪ ।।
য়ে তে পন্থানো বহবো জনায়না রথস্য বর্ত্মানসশ্চ য়াতবে।
য়ৈঃ সম্চরন্ত্যুভয়ে ভদ্রপাপাস্তম্ পন্থানম্।
জয়েমানমিত্রমতস্করম্ য়চ্ছিবম্ তেন নো মৃড।।৪৭ ।।
য়ে গ্রামা য়দরণ্যম্ য়াঃ সভা অধি ভূম্যাম্।

য়ে সম্গ্রামাঃ সমিতয়স্তেষ চারু বদেম তে।।৫৬ ।।
ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সম্বিদানা দিবাকবে শ্রিয়াম্ মা ধেহি ভূত্যাম্।।৬৩ ।।
য়ত্ তে মধ্যম্ পৃথিবি য়চ্চ নভ্যম্ য়াস্ত ঊর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পয়স্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রো
অহম্ পৃথিব্যাঃ পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু।।১২ ।।
(অথর্বঃ ১২|১)

অর্থাৎ - যে ভূমিতে সমুদ্র, নদী আর কুয়ো রয়েছে, যেখানে অন্নের খেতি হয় আর যেখানে প্রাণী বসবাস করে, সেই রক্ষা করার যোগ্য ভূমি আমাদের স্থান দিক। যেখানে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ সঠিকভাবে তাদের কর্তব্য করেছে আর যেখানে দেবতাগণ অসুরদের হারিয়েছে সেই গ্রাম, অশ্ব আর অন্নের ভান্ডার আমাদের এই পৃথিবী আমাদের ঐশ্বর্য আর তেজ দিক। সকলকে সাহায্যকারী ধন আর স্বর্ণকে নিজের বুকে বহনকারী আর সুখ দাতা আমাদের এই ভূমি আমাদের বল দিক। পাহাড়, হিমবান্ পর্বত আর বন-জঙ্গল আমাদের সুখকারী হোক। পৃথিবী যে শিলা, পাথর আর ধূলিকে ধারণ করে আছে আর যে স্বর্ণকে নিজের বুকে নিয়ে আছে, সেই মাতৃভূমিকে নমস্কার করি। যার উপর বনস্পতি উৎপন্ন হয় আর যা বড়ো-বড়ো বীরদের দিয়ে ধারণ করা হয়েছে সেই পৃথিবীকে আমরা স্বাগতম করছি। যেখানে এক ভাষাকে অনেক প্রকারে বলার বক্তারা বসবাস করে, যেখানে নৃত্যকার নাচে, যেখানে যোদ্ধারা কোলাহল করে আর যেখানে নানা প্রকারের বাজনা-বাজে, আমাদের সেই পৃথিবী শত্রুহীন হোক। যেখানে অনেক প্রকারের ধানাদি অন্ন ফসল ফলে আর যার সম্বন্ধী পঞ্চতত্ব -- সেই বর্ষা প্রেমী আর মেঘ দ্বারা পালিত ভূমিকে নমস্কার করছি। নিজের গুপ্ত কোশে অনেক প্রকারের নিধির সুরক্ষিতকারী রক্ষক মাতৃভূমি আমাদের মণি আর স্বর্ণ দিক আর আমাদের পোষণ করুক। যেখানে অনেক মানুষ চলাচল করে, যেখানে রথ আর অশ্ব ছোটে, যেখানে ভালো-মন্দ উভয়ই বসবাস করে, সেই শত্রুরহিত আর তস্কর রহিত মঙ্গলময় ভূমি আমাদের বিজয় করে সুখী করুক। তোমার উপর যেসব গ্রাম, বন, সভা রয়েছে, সংগ্রাম আর সমিতি রয়েছে সেসব স্থানগুলোতে আমরা তোমার গৌরব বর্ণনা করি। হে আমাদের মাতৃভূমি! তুমি আমাদের মাতা আর আমরা হলাম তোমার পুত্র।

এইভাবে এই মন্ত্রগুলোতে মাতৃভূমির মহত্বের, তার ফসলের, তার পৌষকশক্তির আর তার প্রতি ভক্তিভাবের উপদেশ করা হয়েছে, যা থেকে ভৌগলিক আর ভৌগর্ভিক জ্ঞান ভালোভাবে উন্নতি করা যেতে পারে। এরপরে জীবিকা সম্বন্ধিত বৈশ্যধর্মের বর্ণনায় আসা যাক।

বৈশ্যধর্মের মধ্যে কৃষি, বন-জঙ্গল, খনিজ পদার্থ, পশু আর অন্য অনেক বাণিজ্য সম্বন্ধিত আর জীবিকা প্রদানকারী সাধন সম্মিলিত রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব সাধন উপস্থিত হবে না আর যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সমাজকে তার ব্যক্তিদের যোগ্যতার অনুসারে কারিগরী, শ্রম আর অন্য বৌদ্ধিক কাজে লাগানো হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের জীবিকার প্রশ্নগুলো ভালো ভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়, এইজন্য বেদ উপদেশ করেছে যে-

অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ো মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদাইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে।।
(ঋঃ ১০|৭১|৭)
সমৌ চিদ্ধস্তৌ ন সমম্ বিবিষ্টঃ সম্মাতরা চিন্ন সমম্ দুহাতে।
য়ময়োশ্চিন্ন সমাবীর্য়াণি জ্ঞাতী চিত্সন্তৌ ন সমম্ প্রণীতঃ।।
(ঋঃ ১০|১১৭|৯)

অর্থাৎ - নেত্র আদি ইন্দ্রিয় এক সমান হওয়ার জন্য সব মানুষকে দেখতে এক সমানই হয়, কিন্তু মনের বেগ আর বুদ্ধির বলে সবাই হল অসমান। কেউ মুখ পর্যন্ত জলাশয়ের সমান, কেউ বগল পর্যন্ত জলাশয়ের সমান আবার কেউ কেবল হাঁটু পর্যন্ত জলাশয়ের সমান। দুটো হাত এক সমান হওয়ার পরেও তারা সমান কর্ম করতে পারে না, একই মাতার দ্বারা উৎপন্ন দুটি গাভীও সমান দুগ্ধ দেয় না, আবার একই সময় জন্মেছে এমন দুই যমজ ভাইও এক-রকমের পরাক্রম দেখাতে পারে না আর একই জাতির হওয়ার পরেও সকলে সমান দান দেয় না।

এই দুটি মন্ত্রে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও সমস্ত মনুষ্য শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে সমান, তবে সকলের মনের শক্তি আর কর্তব্য হল ভিন্ন-ভিন্ন। পরমেশ্বরকে এই ধরনের অসমানতার মাঝেও অর্থ, কাম আর মানের সমানতা সমস্ত মানুষের মধ্যে এক সমান রাখতে হয়, এইজন্য বেদ ধনকে সমান রূপে দানের সঙ্গে উপদেশ করেছে যে -

বিভক্তারঁ হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ।
সবিতারম্ নৃচক্ষসম্।
(য়জুঃ ৩০|৪)

অর্থাৎ - নানা প্রকারের সুখদায়ক ধনের যিনি বিভাগ করেছেন, সেসবের উৎপাদক আর জ্ঞানদাতা পরমাত্মার আমরা পূজা করি।

এই উপদেশের তাৎপর্য হল এটাই যে, সমান ভোগের জন্য সম্পূর্ণ সমাজ যথাযোগ্য কাজ করে জীবিকা উৎপন্ন করবে, যার দ্বারা সমাজে যেন কোনো দরিদ্রতা না আসে। দরিদ্রতা স্বরূপের বর্ণনা করে বেদ উপদেশ করেছে যে -

অরায়ি কাণে বিকটে গিরিম্ গচ্ছ সদান্বে।
শিরিম্বিঠস্য সত্বভিস্তেভিষ্ট্বা চাতয়ামসি।।
(ঋঃ ১০|১৫৫|১)

অর্থাৎ - হে ধনহীন, বিরূপ, কুরূপ, সদা আক্রোশকারী দরিদ্র! তুমি নির্জন পর্বতে যাও। এখানে আমরা দৃঢ় অন্তঃকরণকারী মানুষের পুরুষার্থ দ্বারা তোমার নাশ করি।

এই দরিদ্রতা নাশক সর্বপ্রধান ব্যবসা হল খেতি আর তার জন্য বেদ উপদেশ করেছে -

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ম্ হিতেনেব য়জামসি।

গামশ্বম্ পোষয়িত্ব্বা স নো মৃ঳াতীদৃশে।।

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিম্ ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।

মধুশ্চুতম্ ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃ঳য়ন্তু।।

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।

ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অসত্বরিষ্যন্তো অন্বেনম্ চরেম।।

শুনম্ বাহাঃ শুনম্ নরঃ শুনম্ কৃষতু লাঙ্গলম্।

শুনম্ বরত্রা বধ্যন্তাম্ শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয়।।

অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।

য়থা নঃ সুভগাসসি য়থা নঃ সুফলাসসি।।

শুনম্ নঃ ফালা বিকৃষন্তু ভূমিম্ শুনম্ কীনাশা অভি য়ন্তু বাহৈঃ।

শুনম্ পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্।।

(ঋঃ ৪|৫৭|১,২,৩,৪,৬,৮)

অর্থাৎ - যেভাবে খেতের স্বামীর হিতের জন্য আমরা গাভী, অশ্ব আর পোষক পদার্থ দিয়েছি, সেইভাবে সেই কৃষকেরাও আমাদের সুখ দিক। হে কৃষক! হে ধনপতে! আপনি গোদুগ্ধের নেয় মিষ্টি পবিত্র জল, দুধ আর মিষ্টি আম আদি ফল আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ করুন। উত্তম ঔষধি, দ্যুলোক, জল আর মহাকাশ অনুকূল হোক, যা দিয়ে ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুর হতে পারে আর সজ্জন পুরুষগণ তার অনুকূল থাকে। বৃষ, ক্ষেতমজুর, লাঙলের অংশ, বরেত (দড়ি) আদি সব সুখকারী হোক আর খেতির অন্য অবয়বও সুখকারী হয়ে চালানো হোক। হে সৌভাগ্যবতী ফাল! তুমি নিচের দিকে চলমান হও। যেরকম তুমি আমাদের জন্য সৌভাগ্য দাতা আর সুফলা তেমনই আমরা তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাদের সুখদাতা ফাল ভূমিকে খনন করুক, খননকারী বৃষ দ্বারা আমাদের সুখ প্রাপ্ত করুক, বর্ষা উত্তম জল দ্বারা তৃপ্ত করে দিক আর খেতি আমাদের মধ্যে সুখ ধারণ করুক।

এইভাবে খেতির বর্ণনা করার পরে এখন বন-জঙ্গলের বর্ণনায় আসা যাক। বেদের মধ্যে বৃক্ষকে পশুপতি বলে তার আদর করা হয়েছে। য়জুর্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে-

নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যোঃ পশূনাম্ পতয়ে নমঃ।।

(য়জুঃ ১৬|১৭)

অর্থাৎ - হে হরিকেশ বৃক্ষ! তুমি পশুপতি, এইজন্য আমরা তোমার আদর, অর্থাৎ পালন করি।

উদ্ভিদের প্রতি আদরের কারণ হল এটাই যে সমস্ত মানুষ আর পশু বৃক্ষের জন্যই জীবিত রয়েছে। উদ্ভিদ যদি না থাকে তবে না মানুষ থাকতে পারবে আর না কোনো পশুপক্ষী, এইজন্য খেতির পাশাপাশি বন-জঙ্গল করা আর জঙ্গলের রক্ষা করাও অত্যন্ত আবশ্যক। বেদের মধ্যে বনস্পতি (উদ্ভিদ) রক্ষার পশ্চাৎ পশুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

ষষ্টিম্ সহস্রাশ্ব্যস্যায়ুতাসনমুষ্ট্রাণাম্ বিম্শতিম্ শতা।

দশ শ্যাবীনাম্ শতা দশ ত্র্যরুষীণাম্ দশ গবাম্ সহস্রা।।

(ঋঃ ৮|৪৬|২২)

অর্থাৎ - ষাট সহস্র অশ্ব, দশ সহস্র উট, তিন সহস্র ছাগ, এক সহস্র গাধী আর দশ সহস্র গাভী হবে; এইভাবে পশুধনের বৃদ্ধি হোক আর একেই ব্যবসার মাধ্যম বানানো হোক।

বেদ উপদেশ করেছে যে -

ইতা ধিয়ম্ কৃণবামা সখায়োऽপ য়া মাতাঁ ঋণুত ব্রজম্ গোঃ।

য়য়া মনুর্বিশিশিপ্রম্ জিগায় য়য়া বণিগ্বঙ্কুরাপা পুরীষম্।।

(ঋঃ ৫|৪৫|৬)

অর্থাৎ - হে মিত্র! আসো একত্রিত হয়ে আমরা ধন উপার্জনের ব্যবসাকে মিলেমিশে করি আর গাভীর বড়ো-বড়ো ব্রজ বানাই।

এইভাবে ব্যবসার কথা বলে ঐশ্বর্যের প্রশংসা করার সঙ্গে বেদ উপদেশ করেছে যে -

ভগ এব ভগবাঁ২।। অস্তু দেবাস্তেন বয়ম্ ভগবন্তঃ স্যাম।

তম্ ত্বা ভগ সর্ব ইজ্জোহবীতি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ।।

(য়জুঃ ৩৪|৩৮)

অর্থাৎ - ঐশ্বর্যই হোক ভগবান্ আর তা দিয়েই দেবতা আমাদের ভাগ্যবান্ করুক, এইজন্য হে ঐশ্বর্য! তোমাকে আমরা সকলে আহ্বান করছি আর তোমার মুখে দৃষ্টি রাখছি যেন তুমিই আমাদের অগ্রগামী হও। এই ঐশ্বর্যদাতা ব্যবসা আর ব্যবসায়ীদের উত্তেজন আর সহায়তা দেওয়ার জন্য বেদের মধ্যে রাজাকে এইভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে -

ইন্দ্রমহম্ বণিজম্ চোদয়ামি স ন ঐতু পুরএতা নো অস্তু।

নুদন্নরাতিম্ পরিপন্থিনম্ মৃগম্ স ইশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্।।

(অথর্বঃ ৩|১৫|১)

অর্থাৎ - আমি (রাজা) উত্তম ব্যবসায়ীকে আমার নিকট আহ্বান করছি আর তাকে নিজের প্রধান বানাচ্ছি, এইজন্য হে ধনদাতঃ! এই অনুদার, বটমার (চোর, ডাকাত) আর সিংহাদি ক্রূর পশুদের দূর করে আমাদের ধন দাও।

এরপর ব্যবসায়ীদের নিজের ব্যবসাতে মন লাগানোর জন্য বেদের মধ্যে এইভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে -

য়েন ধনেন প্রপণম্ চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ।

তস্মিন্ম ইন্দ্রো রুচিমা দধাতু প্রজাপতিঃ সবিতা সোমো অগ্নিঃ।।

(অথর্বঃ ৩|১৫|৬)

অর্থাৎ - ধন দিয়ে অধিক ধন পাওয়ার ইচ্ছায় ধনের দ্বারা আমরা যে ব্যবসা করছি, সেই ব্যবসাতে আমাদের রুচি হোক।

এই রুচি তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন নিজের-নিজের বুদ্ধির অনুসারে কর্ম করা হবে। বেদ উপদেশ করেছে যে, মানুষ তার বুদ্ধির অনুসারে নিজ-নিজ কর্মই করুক -

নানানম্ বা উ নো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাম্।

তক্ষা রিষ্টম্ রুতম্ ভিষগ্ব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছতি।।

(ঋঃ ৯|১১২|১)

অর্থাৎ - নিজের আর অন্য মানুষের বুদ্ধি আর কর্ম অবশ্যই ভিন্ন-ভিন্ন হয়। কাঠমিস্ত্রি কাটতে-চিরতে, বৈদ্য রোগনিবৃত্তির আর ব্রাহ্মণ যজ্ঞের ইচ্ছা করে থাকে।

জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাম্।

কর্মারো অশ্মভির্দ্যুভির্হিরণ্যবন্তমিচ্ছতি।।

(ঋঃ ৯|১১২|২)

অর্থাৎ - পরিপক্ক ঔষধি নিয়ে বৈদ্য, পক্ষীর পালক নিয়ে বস্তু নির্মাণকারী কারিগর, চকচকে রত্ন নিয়ে স্বর্ণকার অন্য বস্তু নিয়ে অন্য ব্যবসায়ী তার নিজের-নিজের দোকানে বস্তু বিক্রির ইচ্ছা করে থাকে।

এরপরে বেদ উপদেশ করেছে যে, পূর্ব সঞ্চিত কর্মানুসারে একই গৃহে জন্ম আর বসবাস করা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন কর্ম করার রুচি রয়েছে আর তারা ভিন্ন-ভিন্ন নিজের-নিজের কর্মকে করে। নিম্নলিখিত মন্ত্রটিতে এটাই উপদেশ করা হয়েছে। যথা -

কারুরহম্ ততো ভিষগুপল প্রক্ষিণী ননা।

নানা ধিয়ো বসূয়বোऽনু গাইব তস্থিম।।

(ঋঃ ৯|১১২|৩)

অর্থাৎ - আমি হলাম কাঠমিস্ত্রি, আমার পিতা বৈদ্য আর আমার মাতা চাক্কি পিষণের কাজ করেন, এইজন্য এইধরনের বিবিধ বুদ্ধি আর কলা-কৌশলরূপী মানুষের মাঝে আমরা নিবাস করি।

এর অভিপ্রায় এটাই হল যে স্বাভাবিক রুচি আর মনোবৃত্তির (tendency) অনুসারে কাজ করলে পরেই শিল্প আর ব্যবসায় উন্নতি হবে আর সকলে পর্যাপ্ত জীবিকা প্রাপ্ত করতে পারবে। এইজন্য বেদের মধ্যে বিবিধ প্রকারের কারিগরদের মান-সম্মান দেওয়ার আজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে -

নমস্তক্ষভ্যো রথকোরভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ

কর্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ

বো নমো নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ।।

(য়জুঃ ১৬|২৭)

অর্থাৎ - তক্ষ, সারথী, কুমোর, মিস্ত্রি, নিষাদ আর অন্য ছোটো-বড়ো কারিগরদের সৎকার হোক। কারিগরদের এই প্রতিষ্ঠা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভোজন, বস্ত্র, গৃহ আর গৃহস্থী সম্বন্ধিত সবধরনের পদার্থ তৈরি করার আদেশ বেদের মধ্যে রয়েছে। বস্ত্র তৈরির জন্য বেদের মধ্যে উপদেশ রয়েছে যে -

সীসেন তন্ত্রম্ মনসা মনীষিণ ঊর্ণাসূত্রেণ কবয়ো বয়ন্তি।

অশ্বিনা য়জ্ঞঁ সবিতা সরস্বতীন্দ্রস্য রূপম্ বরুণো ভিষজ্যন্।।

(য়জুঃ ১৯|৮০)

অর্থাৎ - সীসা যন্ত্রের দ্বারা মননশীল বিদ্বান উল সেইভাবে বোনে যেভাবে বরুণদেব বর্ষাতে দুই বিদ্যুৎকে ভরে দেয়।

এরপর ঢাল সেলাইয়ের উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

ব্রজম্ কৃণুধবম্ স হি বো নৃপাণো বর্ম সীব্যধবম্ বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধবমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃম্হতা তম্।।

(ঋঃ ১০|১০১|৮)

অর্থাৎ - হে রাজন্! গাভীর বড়ো-বড়ো ব্রজ নির্মাণ করুন, মোটা-মোটা চর্মের বর্ম সেলাই করুন আর লোহার দুর্গ নির্মাণ করুন, যার দ্বারা হবনের চামচ না পরে যায় অর্থাৎ রাজ্য যেন নষ্ট না হয়ে যায়।

এখানে সেলাইয়ের প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে, এছাড়াও নৌ ও বিমান নির্মাণের উপদেশ এইভাবে বেদের মধ্যে রয়েছে-

বেদা য়ো বীনাম্ পদমন্তরিক্ষেণ পততাম্।
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ।।

(ঋঃ ১|২৫|৭)

অর্থাৎ - যে পক্ষী, মেঘ আদি "বি" এর স্থানকে আর মহাকাশের মধ্যে তার চলার গতিকে জানে, সে আকাশের বিমান আর সমুদ্রের নৌকাকে জানে।

পক্ষী যে নিয়মে উড়ে, সেই নিয়মে বিমান আর নৌকাও চালানো হয়। এইজন্য বি= পক্ষী আর মান= সদৃশ, অর্থাৎ পক্ষীর সদৃশকেই বিমান বলা হয়। এর অতিরিক্ত বেদের মধ্যে হাল, রথ, বাহন (গাড়ি), ধনুষ-বাণ, যজ্ঞপাত্র আর গৃহ নির্মাণ সম্বন্ধিত অস্ত্র, শস্ত্র, বস্ত্র আর ঔষধি আদি নির্মাণের সমস্ত উপকরণের বিস্তৃত উপদেশ রয়েছে, এইজন্য বেদের মধ্যে কলা-কৌশলের পর্যাপ্ত জ্ঞান পাওয়া যায়, কিন্তু গণিত ছাড়া ব্যবসার কাজ চলতে পারে না, এইজন্য আমরা এরপর দেখবো যে বেদের মধ্যে অংকগণিত আর রেখাগণিত সম্বন্ধে কি কি বর্ণনা রয়েছে।

য়জুর্বেদ অধ্যায় ১৫ মন্ত্র ৪ এবং ৫ এর মধ্যে অনেক প্রকার ছন্দের বর্ণনার পাশাপাশি "**অক্ষরপঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ**" আর "**অঙ্কাঙ্কম্ ছন্দঃ**" এর উল্লেখ রয়েছে। এরমধ্যে অক্ষর আর অঙ্ক আলাদা-আলাদা বলা হয়েছে। এরদ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে বেদের মধ্যে অঙ্কবিদ্যা রয়েছে। অথর্ববেদে দশ পর্যন্ত অঙ্কের বর্ণনা করার সঙ্গে বলা হয়েছে -

য় এতম্ দেবমেকবৃতম্ বেদ।

(অথর্বঃ ১৩|৪|২৪)

ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে।

নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।
(অথর্বঃ ১৩|৪|১৬-১৮)

এই নয় অঙ্কেরই দশক তৈরির বৈজ্ঞানিক ক্রম অথর্ববেদ কাণ্ড ৫ সূক্ত ১৫ এর কয়েকটি মন্ত্রের মধ্যে বিস্তারপূর্বকভাবে বলা হয়েছে যে -

একা চ মে দশ চ মে০, দ্বে চ মে বিম্শতিশ্চ মে০,
তিস্রশ্চ মে ত্রিম্শচ্চ মে০, চতস্রশ্চ মে চত্বারিম্শচ্চ
মে০, পঞ্চ চ মে পঞ্চাশচ্চ মে০, ষট্ চ মে ষষ্টিশ্চ মে০,
সপ্ত চ মে সপ্ততিশ্চ মে০, অষ্ট চ মেऽ শীতিশ্চ মে০, নব
চ মে নবতিশ্চ মে০, দশ চ মে শতম্ চ মে০, শতম্ চ মে সহস্রম্০।
(অথর্বঃ ৫|১৫|১-১১)

এই মন্ত্র - খণ্ডের দ্বারা এটা জ্ঞাত হচ্ছে যে বেদের আদেশানুসারে এক থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত অঙ্কের দ্বারাই দশ, বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ আর নব্বই আদি দশক তৈরি করা হয়েছে। দশকের জন্য কোনো নতুন সজ্ঞা স্থির করা হয়নি। শুধু এটাই নয় বরং যে সঙ্কেত দ্বারা দুইয়ের বিশ, তিনের তিরিশ আর নয়ের নব্বই তৈরি হয় সেটা দিয়েই দশের শত আর শতর সহস্রও তৈরি হয়, কারণ উপরিউক্ত মন্ত্রটিতে "**দশ চ মে শতম্ চ মে শতম্ চ মে সহস্রম্ চ মে**" স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এই দশকের ক্রমকারী নিচে দেওয়া য়জুর্বেদের মন্ত্রটি খুবই স্পষ্ট করেছে -

ইমা মেऽঅগ্নऽইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশ চ দশ চ
শতম্ চ শতম্ চ সহস্রম্ চ সহস্রম্ চায়ুতম্ চায়ুতম্ চ
নিয়ুতম্ চ নিয়ুতম্ চ প্রয়ুতম্ চার্বুদম্ চ ন্যর্বুদম্ চ
সমুদ্রশ্চ মধ্যম্ চান্তশ্চ পরার্দ্ধশ্চৈতা মেऽঅগ্নऽইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বমুত্রামুষ্মিঁল্লোকে।।
(য়জুঃ ১৭|২)

এই মন্ত্রের মধ্যে দশকের চিহ্ন বাড়ানোর সঙ্গে পরার্দ্ধ পর্যন্ত সংখ্যা বলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের মধ্যে এরথেকে বড়ো সংখ্যার স্থান এখনও পর্যন্ত আর অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। এখানে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে একের দশ, দশের শত, শতর সহস্র হয়ে যায় আর এইভাবে দশক বাড়ানোর সঙ্গে পরার্দ্ধ পর্যন্ত হয়ে যায়।

এই নয় পর্যন্ত অঙ্ক, বিশ, তিরিশ, চল্লিশ তথা নব্বই পর্যন্ত দশকের আর দশ, শত, সহস্র আদি পরার্দ্ধ পর্যন্ত সংখ্যার সঙ্কেতের বর্ণনা করার পরে এখন এরপর দশকের আর অঙ্কের সংযোগের ফলে যে সংখ্যা তৈরি হয় তার উদাহরণ উদ্ধিত করবো। এটির বর্ণনা য়জুর্বেদ আর ঋগ্বেদের মধ্যে এইভাবে রয়েছে -

একা চ মে তিস্রশ্চ মে তিস্রশ্চ মে পঞ্চ চ মে পঞ্চ চ মে
সপ্ত চ মে সপ্ত চ মে নব চ মে নব চ মऽএকাদশ চ

মঽএকাদশ চ মে ত্রয়োদশ চ মে ত্রয়োদশ চ মে
পঞ্চদশ চ মে পঞ্চদশ চ মে সপ্তদশ চ মে সপ্তদশ চ মে
নবদশ চ মে নবদশ চ মেঽএকবিঁশতিশ্চ
মঽএকবিঁশতিশ্চ মে ত্রয়োবিঁশতিশ্চ মে ত্রয়োবিঁশতিশ্চ
মে পঞ্চবিঁশতিশ্চ মে পঞ্চবিঁশতিশ্চ মে সপ্তবিঁশতিশ্চ মে
সপ্তবিঁশতিশ্চ মে নববিঁশতিশ্চ মে নববিঁশতিশ্চ
মঽএকত্রিঁশচ্চ মঽএকত্রিঁশচ্চ মে ত্রয়স্ত্রিঁশচ্চ মে য়জ্ঞেন কল্পন্তাম্।।
(য়জুঃ ১৮|২৪)
চতস্রশ্চ মেঽষ্টৌ চ মেঽষ্টৌ চ মে দ্বাদশ চ মে দ্বাদশ চ
মে ষোডশ চ মে ষোডশ চ মে বিঁশতিশ্চ মে বিঁশতিশ্চ
মে চতুর্বিঁশতিশ্চ মে চতুর্বিঁশতিশ্চ মেঽষ্টাবিঁশতিশ্চ
মেঽষ্টাবিঁশতিশ্চ মে দ্বাত্রিঁশচ্চ মে দ্বাত্রিঁশচ্চ মে
ষটত্রিঁশচ্চ মে ষটত্রিঁশচ্চ মে চত্বারিঁশচ্চ মে চত্বারিঁশচ্চ
মে চতুশ্চত্বারিঁশচ্চ মে চতুশ্চত্বারিঁশচ্চ মেঽষ্টাচত্বারিঁশচ্চ মে য়জ্ঞেন কল্পন্তাম্।।
(য়জুঃ ১৮|২৫)
ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিস্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব।।
(ঋঃ ১|৮৪|১৩)

এখানে আমি তিনটি মন্ত্র উদ্ধৃত করেছি যারমধ্যে ক্রমে দুই-দুই আর চার-চার বাড়িয়ে এক, তিন, পাঁচ, এগারো, তেরো, পনেরো, সতেরো, উন্নিশ, একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, ঊনত্রিশ, একত্রিশ আর তেত্রিশ আদি তথা চার, আঠ, বারো, ষোলো, বিশ, চব্বিশ, আটাশ, বত্রিশ, ছত্রিশ, চল্লিশ, চুয়াল্লিশ আর আটচল্লিশ আদি সংখ্যার বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে ঋগ্বেদের মন্ত্রটির মধ্যে নিরানব্বই এরও বর্ণনা রয়েছে, এরদ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, বেদ এই যুক্ত এবং অন্য জ্ঞান দেওয়ার সঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এক থেকে শুরু করে নিরানব্বই পর্যন্ত যত সংখ্যা রয়েছে সেসব সেই ৯ অঙ্ক আর দশকের সঙ্কেত দ্বারাই তৈরি হয়েছে, এরজন্য অন্য কোনো সঙ্কেতের আবশ্যকতা হয়নি।

এইভাবে এই পর্যন্ত বর্ণনাতে আমরা যা পেয়েছি তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বেদের মধ্যে দুই প্রকারের সঙ্কেতই রয়েছে, একটি হল এক, দ্বি, ত্রি, চত্বারি, পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, অষ্ট আর নব আদি একাইয়ের জন্য আর দ্বিতীয়টি হল দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিয়ুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত আর পরার্দ্ধ আদি দশের ক্রমে নির্মিত সংখ্যাগুলোর জন্য। ব্যস, এর অতিরিক্ত আর কোনো প্রকারের সঙ্কেত নেই, যার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, বেদের মধ্যে এই দুই প্রকারের সঙ্কেতের দ্বারাই সমস্ত অঙ্কবিদ্যা ছড়িয়েছে, কারণ আমি মন্ত্রগুলো লিখে দেখিয়েছি যে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যাগুলো তৈরি হয়েছে সেই নয় পর্যন্ত অঙ্ক আর দশের সঙ্কেতেরই উল্টো আর বিপরীত পদ্ধতি দ্বারা। যেভাবে একাদশ, ত্রয়োদশ, সপ্তবিম্শ,

চতুশ্চত্বারিম্শ আর নবতিনব আদি সংখ্যা তৈরি হয়েছে সেইভাবে বিম্শ, ত্রিম্শ, চত্বারিম্শ, ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি আর নবতি আদি দশকগুলোও সেই দ্বি, ত্রি, চত্বারি, ষট্, সপ্ত, অষ্ট আর নব দ্বারা নির্মিত হয়েছে। তাৎপর্য হল এটাই যে, সমস্ত অঙ্কজাল উপরিউক্ত নয় পর্যন্ত অঙ্ক আর কেবল দশকের চিহ্নের দ্বারাই ছড়িয়েছে, ইচ্ছেমত অনেক নামের দ্বারা হয়নি।

এক থেকে দশ পর্যন্ত অঙ্কের মধ্যে দশ শব্দটি খুবই রহস্যপূর্ণ। বিম্শ, ত্রিম্শ, চত্বারিম্শ, ষষ্টি আর নবতি আদি শব্দ যেভাবে নিজের উচ্চারণ দ্বারা দ্বি, ত্রি, চত্বারি, ষষ্ঠ আর নব দ্বারা নির্মিত হয়েছে বলে জ্ঞাত হচ্ছে সেইভাবে নির্মিত হওয়া এই দশ সূচিত হচ্ছে না। ষষ্ঠের ষষ্ঠির সঙ্গে আর চত্বারির চত্বারিম্শের সঙ্গে যে সম্বন্ধ সূচিত হচ্ছে, সেই সম্বন্ধ এক আর দশের সঙ্গে সূচিত হচ্ছে না - একের সঙ্গে দশের যেন কোনো সম্বন্ধই নেই বলে মনে হচ্ছে। এইভাবে শত, সহস্র, অযুত আর নিযুত আদিরও এক, দ্বি, ত্রি, চত্বারি অথবা বিম্শ, ত্রিম্শ আদির সঙ্গে সম্বন্ধ মনে হচ্ছে না। এগুলোও দশের মতো স্বতন্ত্র বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু দশের সঙ্কেত অঙ্কের মতো একা নিজের কোনো অস্তিত্ব রাখে না।সেটা নয় অঙ্কেরই কোনো বিশেষ সূচনা দ্বারা দশগুণ করে দেয়। এটার এক সুন্দর উদাহরণ অথর্ববেদের মধ্যে এসেছে। সেখানে লেখা রয়েছে -

যে তে রাত্রি নৃচক্ষসো দ্রষ্টারো নবতির্নব।
অশীতিঃ সন্ত্যষ্টা উতো তে সপ্ত সপ্ততিঃ॥
ষষ্টিশ্চ ষট্ চ রেবতি পঞ্চাশত্ পঞ্চ সুম্নয়ি।
চত্বারশ্চত্বারিম্শচ্চ ত্রয়স্ত্রিম্শচ্চ বাজিনি॥
দ্বৌ চ তে বিম্শতিশ্চ তে রাত্র্যেকাদশাবমাঃ॥

(অথর্বঃ ১৯|৪৭|৩-৫)

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে ৯৯, ৮৮, ৭৭, ৬৬, ৫৫, ৪৪, ৩৩, ২২ আর ১১ এর ক্রমে বর্ণনা রয়েছে। একদিকে এগারো - এগারোর হ্রাস তো আর অন্যদিকে এগারো-এগারোর বৃদ্ধি হয়েছে। প্রত্যেক প্রকারে এটা হল এগারোর নামতা, কিন্তু এরমধ্যে দশকের (১১×১০=১১০) সংখ্যা নেই যা অত্যাবশ্যক ছিল, কিন্তু আমি পূর্বে লিখে দিয়েছি যে দশের জন্য বেদের মধ্যে কোনো বিশেষ অঙ্কের আবশ্যকতা বলা হয়নি। দশের জন্য তো শূন্যের চিহ্নই স্থির করা হয়েছে। এইজন্য এই মন্ত্রতে দশকের জন্য কিছুই বলা হয়নি। যেহেতু এই মন্ত্রটি এগারো থেকে প্রারম্ভ হয়েছে আর এগারোর পূর্বে দশ হয়ে গেছে, সুতরাং যে দশ পূর্বে স্থির হয়ে গেছে, সেটাই এখানে এগারোর উপরে রাখাতে এগারো দশক হয়ে যাবে। এটাই হল দশক না লেখার কারণ, কারণ দশক কোনো অঙ্ক নয়।সেটা তো কেবল সংখ্যার চিহ্ন মাত্র। এইজন্য সেই চিহ্নকে শূন্য মানা হয়েছে, কারণ শূন্যের অর্থই হল অঙ্কের অভাব।

উপরিউক্ত তিনটি মন্ত্রতে যেখানে এগারোর নামতা বোঝানো হয়েছে সেখানে প্রকারান্তরভাবে ৯+৯=১৮, ৮+৮=১৬, ৭+৭=১৪, ৬+৬=১২, ৫+৫=১০, ৪+৪=৮, ৩+৩=৬, ২+২=৪ আর ১+১=২ এর জোড়কেও বলে দেওয়া হয়েছে। এই জোড়ের মধ্যে ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬ আর ১৮ অঙ্কের প্রাপ্তি হচ্ছে আর মজার সঙ্গে দুইয়ের নামতা হয়ে যায়। এরও অতিরিক্ত উপরের সংখ্যাকে ৯×৯=৮১, ৮×৮=৬৪,

৭×৭= ৪৯, ৬×৬=৩৬, ৫×৫=২৫, ৪×৪=১৬, ৩×৩=৯, ২×২=৪ এই প্রকারে গুণিত করলে পরে ৮১, ৬৪, ৪৯, ৩৬, ২৫, ১৬, ৯, ৪ এই সংখ্যা প্রাপ্ত হয়ে যায়। এটা একে অপরের সঙ্গে ১৭, ১৫, ১৩, ১১, ৯, ৭, ৫, ৩ এর ক্রম দ্বারা ছোটো। এই ছোটোর অঙ্কে নীচ থেকে উপরে যেতে ঠিক দুই-দুইয়ের সংখ্যা অধিক হয় আর উপর থেকে নীচে আসলে ঠিক দুই-দুইয়ের সংখ্যা কম হয়, অর্থাৎ যখন নীচের থেকে চলে তখন তিন আর দুই পাঁচ, পাঁচ আর দুই সাত, সাত আর দুই নয় আদির ক্রমের জোড় প্রাপ্ত হয়ে যায় আর যখন উপর থেকে নীচে আসে তখন সতেরো থেকে দুই বেরিয়ে গেলে হয় পনেরো, পনেরো থেকে দুই বেরিয়ে গেলে হয় তেরো আদি ক্রমের বিজোড় সংখ্যা প্রাপ্ত হয়ে যায়। এই ক্রমটিতে গুণনও সম্মিলিত রয়েছে। যখন ৯×৯=৮১ এর ক্রম চলে তখন গুণনের বিধি হয়, কিন্তু যখন ৮১ থেকে নয়-নয় বের করার ক্রম চলে তখন সেটাই ভাগ হয়ে যায়, কারণ জোড়ের বিশাল রূপটি হল গুণন আর বিজোড়ের বিশাল রূপটি হল ভাগ, যা উপরিউক্ত মন্ত্রে পাওয়া যায়।এইভাবে **"ইন্দ্রো দধীচো"** মন্ত্রের মধ্যে নয়কে নয়ের সঙ্গে গুণনফলকে নয় দিয়েই বধ করতে বলা হয়েছে, যার তাৎপর্য হল এটা যে, নয়ের নামতার প্রত্যেক সংখ্যা পুনরায় নয়ই হয়ে যেতে দেখা যায়। অর্থাৎ ৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩, ৭২, ৮১ আর ৯০ এর যদি কোনো সংখ্যা জোড়া পাওয়া যায় তবে নয়ই হয়ে যাবে। যেমন ১৮ এর এক আর আট মিলে নয়, ২৭ এর দুই আর সাত মিলে নয়, ৬৩ এর তিন আর ছয় মিলে নয় হয়ে যায়, সেইভাবে ৮১ পর্যন্ত বুঝে নেওয়া উচিত। ৮১ এর উল্টো ১৮, ৭২ এর উল্টো ২৭, ৬৩ এর উল্টো ৩৬, আর ৫৪ এর উল্টো ৪৫ হবে। নয়ের নমতার পঞ্চমতম সংখ্যা পর্যন্ত ৯, ১৮, ২৭, ৩৬ আর ৪৫ এর অঙ্ক রয়েছে আর এটাই পরে উল্টো হয়ে ৫৪, ৬৩, ৭২, ৮১ আর ৯০ হয়ে যায়। এই মন্ত্রের মধ্যে জোড়ের সঙ্গে-সঙ্গে নয় পর্যন্ত অঙ্কের পূর্ণ মহিমা দেখানো হয়েছে আর বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত অঙ্কগণিত নয় পর্যন্ত মৌলিক অঙ্কের মধ্যেই ভরে রয়েছে। এইভাবে এদেরই দ্বারা সংখ্যা, জোড়, বিজোড়, গুণন আর ভাগ বলে দেওয়া হয়েছে, যা হল অঙ্কবিদ্যার মূল।

যেভাবে এই অঙ্কগণিতের উদাহরণ রয়েছে সেইভাবে রেখাগণিতের মৌলিক সিদ্ধান্তের উদাহরণও বেদ বলে দিয়েছে। রেখাগণিতের তিনটি সিদ্ধান্ত রয়েছে - মাপার সাধন, ত্রিকোণের সিদ্ধান্ত আর বৃত্তক্ষেত্রের গণিত। প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটি যা মাপার সাধনগুলোকে বলে দেয় -

কাসীত্প্রমা প্রতিমা কিম্ নিদানমাজ্যম্
কিমাসীত্পরিধিঃ ক আসীত্।
ছন্দঃ কিমাসীত্প্রউগম্ কিমুকথম্ য়দ্দেবা দেবময়জন্ত বিশ্বে।।
(ঋঃ ১০|১৩০|৩)

অর্থাৎ - সেই হবনকুণ্ডের মাপ কত ছিল, রূপরেখা কি ছিল, পরিধি কি ছিল, ঘী কি ছিল আর কোন মন্ত্র দ্বারা তার হবন হয়েছিল, যারমধ্যে দেবতাগণ সমস্ত দেবতাগণের য়জন (যজ্ঞানুষ্ঠান) করেছিলেন?

এখানে মাপ, রূপরেখা আর পরিধির বর্ণনা রয়েছে। আমি যজ্ঞপ্রকরণের মধ্যে দেখিয়ে ছিলাম যে হবনকুণ্ড রেখাগণিতের হিসেব দ্বারাই নির্মিত হত, এইজন্য যজ্ঞপ্রকরণের মধ্যে মাপ, রূপরেখা আর পরিধির কথা বলা হয়েছে। এই রেখাগণিতের সাধনের পরে ত্রিকোণক্ষেত্রের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

য়ো অকৃন্দয়ত্ সলিলম্ মহিত্বা য়োনিম্ কৃত্বা ত্রিভুজম্ শয়ানঃ।
বত্সঃ কামদুঘো বিরাজঃ স গুহা চক্রে তন্বঃ পরাচৈঃ।।

(অথর্বঃ ৮|৯|২)

অর্থাৎ - জলের স্তরকে সঠিক জেনে আর আধার তথা লম্বকে ঠিক করে ত্রিভুজ চক্র (ক্ষেত্র) বানাবে যার ভিতর বত্সরূপে ক্ষেত্রফল বসে আছে। এই সোমকোণ ত্রিভুজের সিদ্ধান্ত ৩, ৪ আর ৫ হবে। যদি লম্ব ৩ আর আধার ৪ হয় তবে করণ ৫ -ই হবে আর এরমধ্যেই গুণন-বিয়োগ করলে পরে ক্ষেত্রফল জ্ঞাত হয়ে যাবে। যেভাবে এই ত্রিকোণক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত বলা হয়েছে সেইভাবে ত্রিতের বর্ণনা করার সঙ্গে গোল ক্ষেত্রেরও সিদ্ধান্ত বলে দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের মধ্যে তিন প্রকারের ত্রিতের বর্ণনা রয়েছে।প্রথম ত্রিতের বিষয়ে লেখা রয়েছে যে -

অভি স্ববৃষ্টিম্ মদে অস্য য়ুধ্যতো রঘ্বীরিব প্রবণে সস্রুরূতয়ঃ।
ইন্দ্রো য়দ্বজ্রী ধৃষমাণো অন্ধসা ভিনদ্ বলস্য পরিধীঁরিব ত্রিতঃ।।

(ঋঃ ১|৫২|৫)

অর্থাৎ - বর্ষণের ইচ্ছায় যুদ্ধেরত ইন্দ্র নিজের বজ্র দিয়ে মেঘগুলোকে এরকম ভেদ করে দেয় যেরকম মাপা পরিধিকে ত্রিত ছেদ করে দেয়।

এখানে ব্যাসকে ত্রিত বলে পরিধির ছেদনকারী বলা হয়েছে। ব্যাস পরিধির প্রায়শঃ তিনগুণ হয়ে থাকে, এইজন্য তাকে ত্রিত বলা হয়েছে। পরিধি আর ব্যাসের সম্বন্ধ হল ২২/৭। যদি পরিধি ২২ হয় তবে ব্যাস ৭ হবেই, কিন্তু পরিধির উপরিউক্ত ঠিক তিনগুণ ভাগ আসল ব্যাসের কিছুটা অধিক হয়। এইজন্য লেখা হয়েছে যে, ত্রিত পরিধিকে ছেদ করে দিয়েছে - অতিক্রমণ করে দিয়েছে, অর্থাৎ সঠিক বেরোয় নি। দ্বিতীয় ত্রিতের বিষয়ে লেখা রয়েছে যে -

ত্রিতঃ কূপেऽবহিতো দেবান্হবত ঊতয়ে।
তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরু।।

(ঋঃ ১|১০৫|১৭)

অর্থাৎ - ত্রিত কূপে পড়ে যায় আর সে দেবতাদের ডাকে, কিন্তু তার ধ্বনিকে কেবল বৃহস্পতিই (জ্ঞানবান্) শুনেছে আর তাকে কূপ থেকে বের করে ঠিক করে দেয়।

তাৎপর্য এই হল যে, এটা ঠিক ছিল না কিন্তু গণিতজ্ঞ তৃতীয় ত্রিতকে ২২/৭ করে ঠিক করে দেয়।রেখাগণিতের এই সিদ্ধান্তকে প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে এক গল্পের রূপে লেখা হয়েছে যার তাৎপর্য হল ত্রিত অর্থাৎ গোল বস্তুর তিনগুণ ভাগ যদি ব্যাসের থেকে কিছু অধিক অথবা কম হয় তবে সেটা গোল বস্তুকে ছেদ করে দেয় অথবা তারমধ্যে ঢুকে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ ২২/৭ ব্যাসটি না তো ছেদন করে আর না ঢোকে বরং ঘেরাতে শক্তভাবে বসে যায় - উপযুক্ত হয়ে যায়। এটাই হল তিন ত্রিতের গল্পের সারাংশ আর এটাই হল বেদের মধ্যে ত্রিকোণ তথা ক্ষেত্র সিদ্ধান্তের বর্ণনা। রেখাগণিতের সিদ্ধান্ত হল দুটি - কোণ আর বৃত্ত,

এটাই বিস্তারভাবে জ্যামিতিশাস্ত্রের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, এইজন্য বলা যেতে পারে যে বেদ রেখাগণিতের মৌলিক সিদ্ধান্তের উপদেশ করেছে।

যেভাবে বেদের মধ্যে অঙ্ক আর রেখাগণিতের উপদেশ রয়েছে সেইভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের সিদ্ধান্তেরও উপদেশ করা হয়েছে, কারণ গণিতের বিশাল রূপ জ্যোতিষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের গণিতের মতো জ্যোতিষেরও আবশ্যকতা রয়েছে। নাবিক জ্ঞান, পদার্থের উৎপত্তির জ্ঞান আর দেশ-দেশান্তরের ঋতুর জ্ঞান যা ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক তা জ্যোতিষ থেকেই জানা যায়, এইজন্য বেদের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রের পর্যাপ্ত বর্ণনা রয়েছে। আমি যজ্ঞপ্রকরণের মধ্যে জ্যোতিষের বিস্তৃত বর্ণনা করে দিয়েছি, অতএব এখানে তাকে সারাংশ রূপেই লিখবো। জ্যোতিষে সর্বপ্রথম গ্রহের স্থিরতার বর্ণনা আসে, এইজন্য বেদ বলেছে যে -

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য়েণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ।।
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ।।

(ঋঃ ১০|৮৫|১-২)

অর্থাৎ - পৃথিবী নিরাধার কেবল সত্য, অর্থাৎ নিজের নিয়মে স্থির রয়েছে, দ্যুলোক সূর্যের উপরে স্থির রয়েছে সোমশক্তি দ্বারা বারোটি আদিত্য নিজের পথে স্থির রয়েছে। সোমশক্তির দ্বারাই সূর্য বলবান্, তার থেকেই পৃথিবী বলবান্ আর সেই সোম দ্বারা সমস্ত নক্ষত্র দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর সূর্য দ্বারা পৃথিবীর আকর্ষণের বর্ণনা রয়েছে -

চক্রাণাসঃ পরীণহম্ পৃথিব্যা হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ।
ন হিন্বানা সস্তি তিরুস্ত ইন্দ্রম্ পরিস্পশো অদধাত্সূর্য়েণ।।

(ঋঃ ১|৩৩|৮)

অর্থাৎ - বাঁধনকারী কিরণ দিয়ে সূর্যের দ্বারা মণির মতো পৃথিবী নিজের মার্গের উলঙ্ঘন না করে চক্রাকার ঘোরে।

এই মন্ত্রের মধ্যে সূর্যের দ্বারা টানা আর ঘুরন্ত পৃথিবীর বর্ণনা রয়েছে। এরপর চন্দ্রমার নতুন-নতুন হওয়ার বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

নবোনবো ভবতি জায়মানোऽহ্নাম্ কেতুরুষসামে ত্য গ্রম্।
ভাগম্ দেবেভ্যো বিদধাত্যায়নপ্র চন্দ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ।।

(ঋঃ ১০|৮৫|১৯)

অর্থাৎ - এই চন্দ্রমা প্রতিদিন নিত্যনতুন হতে দেখা যায় যা আমাদের দীর্ঘজীবন দেয়।

এই চন্দ্রমার বিষয়ে যজুর্বেদ ১৮|৪০ এরমধ্যে লেখা রয়েছে যে "**সুষুম্ণঃ সূর্য়রশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বঃ**", যার উপর নিরুক্তকার বলেছে যে "**অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসম্ প্রতিদীপ্সতি**" অর্থাৎ সূর্যের এক

কিরণ চন্দ্রমাকে প্রকাশিত করে। এরপরে নক্ষত্রের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে-

য়ানি নক্ষত্রাণি দিব্যন্তরিক্ষে অপ্সু ভূমৌ য়ানি নগেষু দিক্ষু।

প্রকল্পয়ম্শ্চন্দ্রমা য়ান্যেতি সর্বাণি মমৈতানি শিবানি সন্তু।।

অষ্টাবিম্শানি শিবানি শগ্মানি সহয়োগম্ ভজন্তু মে।

য়োগম্ প্র পদ্যে ক্ষেমম্ প্র পদ্যে য়োগম্ চ নমোऽ হোরাত্রাভ্যামস্তু।।

(অথর্বঃ ১৯|৮|১-২)

অর্থাৎ - যে নক্ষত্রকে আকাশে মধ্যলোকের মধ্যে, যাকে জলের উপর, ভূমির উপর, মেঘের উপর সবদিশাতে চন্দ্রমা সমর্থ করে চলে, সেসব আমার জন্য সুখদায়ক হোক। আঠাশ নক্ষত্র আমার জন্য কল্যাণকারী আর সুখদায়ক হোক তথা য়োগক্ষেম অথবা ক্ষেময়োগকে আমি যেন প্রাপ্ত করি।

এই পর্যন্ত বেদমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র আর নক্ষত্রের বর্ণনা হল। এই সূর্য, পৃথিবী আর চন্দ্রমা তথা নক্ষত্র দ্বারাই বর্ষ আর কালবিভাগ হয়েছে। এই সমস্ত বিভাগের গণনা এইভাবে করা হয়েছে -

সম্বত্সরোऽসি পরিবত্সরোऽসীদাবত্সরোऽ সীদ্বত্সরোऽসি বত্সরোऽসি।

উষসস্তে কল্পন্তামহোরাত্রাস্তে কল্পন্তামর্দ্ধমাসাস্তে কল্পন্তাম্

মাসাস্তে কল্পন্তামৃতবস্তে কল্পন্তাঁসম্বত্সরস্তে কল্পতাম্।

প্রেত্যাऽইত্যৈ সম্ চাঞ্চ প্র চ সারয়।

সুপর্ণচিদসি তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবঃ সীদ।।

(য়জুঃ ২৭|৪৫)

অর্থাৎ - তুমি সম্বত্সর, পরিবত্সর, ইদাবত্সর আর তুমিই বত্সর। তুমি প্রাতঃকাল, অহোরাত্র, অর্ঘমাস, মাস, ঋতু আর বর্ষ বানিয়েছ।

এরপরে অধিক মাস অর্থাৎ লৌন্দ মাসের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

অহোরাত্রৈর্বিমিতম্ ত্রিশদঙ্গম্ ত্রয়োদশম্ মাসম্ য়ো নির্মিমীতে০।

(অথর্বঃ ১৩|৩|৮)

অর্থাৎ - তার ক্রোধকে ভয় করো যিনি তিরিশ অহোরাত্র আর তেরোতম মাসের নির্মাণ করেছেন। প্রত্যেক বর্ষে প্রায় ১২ দিন অথবা ১২ রাত্রির অন্তর হয়ে যায় তখনই তৃতীয় বর্ষে অধিক মাস হয়ে যায়।

এই ১২ দিন আর ১২ রাত্রির বর্ণনা এইভাবে বেদের মধ্যে রয়েছে-

দ্বাদশ বা এতা রাত্রীর্ব্রাত্যা আহুঃ প্রজাপতেঃ।

তত্রোপ ব্রহ্ম য়ো বেদ তদ্বা অনডুহো ব্রতম্।।

(অথর্বঃ ৪|১১|১১)

অর্থাৎ - এই বারো রাত্রিকে সম্বত্সরের যজ্ঞের যোগ্য বলে ধরা হয়েছে। তাতে যে সূর্যের যজ্ঞ করে সে-ই জীবনযাপনকারী বর্ষকে জানে।

এই বারো দিনের বারো রাত্রির বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

দ্বাদশ দ্যূন্যদগোহ্যস্যাতিথ্যে রণন্নৃভবঃ সসন্তঃ।
সুক্ষেত্রাকৃণ্বন্ননয়ন্ত সিন্ধূন্ধন্বাতিষ্ঠন্নোষধীর্নিন্নমাপঃ॥

(ঋঃ ৪|৩৩|৭)

অর্থাৎ - ঘুমিয়ে থাকা ঋতু আকাশের মধ্যে প্রত্যক্ষ আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য ১২ দিন ভালোভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে। এরদ্বারা নদীর জল নিচে চলে আসে, খেতের মধ্যে ঔষধি হয় আর সব প্রকারের সুখ হয়।

এর অভিপ্রায় এটাই হল যে, ১২ দিন বছরে হ্রাস-বৃদ্ধি করে চন্দ্রমা আর সৌরবর্ষ সমান-সমান হয়ে যায়, যারদ্বারা ঋতু সঠিক সময়ে জল বর্ষণ করে আর ফল-ফুল হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য চান্দ্রবর্ষ আর সায়নবর্ষ সমান-সমান হয়ে যায়। সায়নবর্ষের ১২টি মাস আর প্রত্যেক মাসের ৩০টি অংশের বর্ণনা এইভাবে বেদের মধ্যে রয়েছে -

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকম্ ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তত্রাহতাস্ত্রীণি শতানি শঙ্কবঃ ষষ্টিশ্চ খীলা অবিচাচলা য়ে॥

(অথর্বঃ ১০|৮|৪)

অর্থাৎ - বর্ষচক্রের বারোটি মাস হল পুটঠী, সম্পূর্ণ বর্ষটি হল চাকা, ছয় ঋতু হল নাভী আর তিনশ ষাট দিন হল কাঁটা, যা বাঁকা-বাঁকা ভাবে চলে।

এর এই সায়নবর্ষের দুই আয়নের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে-

দ্বে স্রুতী অশৃণবম্ পিতৃণামহম্ দেবানামুত মর্ত্যানাম্।
তাভ্যামিদম্ বিশ্বমেজত্সমেতি য়দন্তরা পিতরম্ মাতরম্ চ॥

(ঋঃ ১০|৮৮|১৫)

অর্থাৎ - দেবয়ান আর পিতৃয়ান উভয় হল দুটি মার্গ, এর দ্বারাই মোক্ষ আর আবাগমন হয়ে থাকে। একেই উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ন বলে।

অথর্ববেদের (৮|৯|১৭) মধ্যে এরজন্যই লেখা রয়েছে যে "**ষডাহুঃশীতান্ ষডু মাস উষ্ণান্**" অর্থাৎ ছয় মাস গরম আর ছয় মাস শীত হল। এইভাবে বেদের মধ্যে অনেক ঋতুর বর্ণনা রয়েছে। য়জুর্বেদ ২২|৩১ আর ৭|৩০ এরমধ্যে ছয় ঋতুর অতিরিক্ত এক সপ্তম ঋতু "**অহসস্পতয়**" এর নামও এসেছে আর অথর্ব০ ৮|৯|১৮ তে "**মধূনি সপ্ত**" তথা "**ঋতবো হ সপ্ত**" এর বর্ণনাও রয়েছে। এইভাবে অথর্ব০ ৮|৯|১৫ তে "**ঋতবোऽ নু পঞ্চ**" বলে পঞ্চম ঋতুরও বর্ণনা করা হয়েছে। ছয়টি ঋতু তো প্রসিদ্ধই। এইভাবে সংসারের অনেক পরিস্থিতির কারণে অনেক প্রকারের ঋতুর কথা বলা হয়েছে। এরপর রাশিচক্রের বর্ণনা বেদের মধ্যে এইভাবে রয়েছে -

নাভিম্ য়জ্ঞানাম্ সদনম্ রয়ীণাম্ মহামহাবভি সম্ নবন্ত।
বৈশ্বানরম্ রথ্যমধবরাণা য়জ্ঞস্য কেতুম্ জনয়ন্ত দেবাঃ॥

(ঋঃ ৬|৭|২)

অর্থাৎ - যজ্ঞের নাভি, ধনের গৃহ, বৃহৎ হতে বৃহৎ অধ্বরের মার্গ আর যজ্ঞের পতাকা বৈশ্বানরকে দেবতা

জানেন আর আমরা তার স্তুতি করি। ভূমির এই মার্গে ভ্রমণ করার কারণে যে দিন-রাতের অন্তর হয় - হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে যায়, তার বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে -

সদৃশীরদ্য সদৃশীরিদু শ্বো দীর্ঘম্ সচন্তে বরুণস্য ধাম।

অনবদ্যাস্ত্রিম্শতম্ য়োজনান্যেকৈকা ক্রতুম্ পরি য়ন্তি সদ্যঃ।।

(ঋঃ ১|১২৩|৮)

অর্থাৎ - আজ আর কাল একই সমান রাত প্রতিত হয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে মহান্ ভেদ হয় আর বরুণস্থানের মধ্যে শীঘ্রতার কারণে এক-এক থেকে তিরিশ-তিরিশ যোজনের অন্তর পড়ে যায়। তাৎপর্য হল এটা যে, তিরিশ যোজন পথ চলতে যতটা সময় লাগে তত সময়ের হিসাবেই প্রত্যেক রাত্রি একে-অন্যের ছোট অথবা বড়ো হতে থাকে। এই গণনার অনুসারেই গ্রহণকে জানা যায়। ঋগ্বেদের মধ্যে গ্রহণ জানবার জন্য যন্ত্র নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছে -

স্বর্ভানোরধ য়দিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন্।

গূঢহম্ সূর্য়ম্ তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ।।

(ঋঃ ৫|৪০|৬)

অর্থাৎ - চন্দ্রমার ছায়া দ্বারা যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন তাকে তুরীয়যন্ত্র দিয়ে চক্ষু দেখে।

এইভাবে বেদ জ্যোতিষজ্ঞানের বিশেষ-বিশেষ আবশ্যক সিদ্ধান্তের বর্ণনা করেছে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারাই মনুষ্য নিজের সমুদ্রীয় যাত্রা আর অনেক প্রকারের অন্নের ফসল তথা দেশ-দেশান্তরের বাতাবরণকে জানতে পারে আর ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জীবিকা সম্বন্ধিত আবশ্যক জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে।

এইভাবে সমস্ত আবশ্যক জ্ঞান-বিজ্ঞান আর কলার মধ্যে ললিতকলার গণনাও রয়েছে ললিতজ্ঞানে কাব্য আর সঙ্গীতই হল প্রধান। বেদের মধ্যে কাব্য আর সঙ্গীতের অনেক বর্ণনা রয়েছে। অথর্ববেদের মধ্যে কাব্যের জন্য লেখা রয়েছে যে **"দেবস্য পশ্য কাব্যম্ ন মমার ন জীর্য়তি"** অর্থাৎ পরমেশ্বরের সংসাররূপী কাব্য পড়ো যা না কখনও পুরোনো হয় আর না নষ্ট হয়। এইভাবে কাব্য আর সঙ্গীতের জন্য ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোऽর্চন্ত্যের্কমর্কিণঃ।

ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বম্শমিব য়েমিরে।।

(ঋঃ ১|১০|১)

অর্থাৎ - হে শতক্রত! তোমার গীত গায়ত্রী আদি গান করে, সূর্য পূজো করে আর ব্রাহ্মণ তোমার বংশের ব্যাখ্যা করে।

এই মন্ত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক কাব্য গানের একসাথেই বর্ণনা করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত চার বেদ কবিতার মধ্যেই বর্ণিত আর সামবেদ তো একদম গানের জন্যই রাখা হয়েছে। বেদের মধ্যে বীণাবাদনেরও বর্ণনা রয়েছে, যার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে বেদের মধ্যে কাব্য আর সঙ্গীতের শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কাব্য আর সঙ্গীতও জীবন প্রদানকারী, এইজন্য জীবিকার মধ্যে তারও সমাবেশ রয়েছে। এইভাবে জীবিকা

সম্বন্ধিত বিস্তৃত জ্ঞান বেদ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে, আর জ্ঞাত হচ্ছে যে, বেদমন্ত্রের অনুসারে উদ্যোগকারী সমাজ ধন-ধান্যে পূর্ণ থাকতে পারবে, তবে প্রশ্ন এটা দাঁড়াচ্ছে যে এরকম সুখী, সদাচারী আর সরলতাপূর্ণ সমাজে রক্ষার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বেদ কি কি বলেছে?

সমাজ আর সাম্রাজ্যের রক্ষা

উপরিউক্ত আদর্শ বৈদিক আর্য সমাজের পবিত্র চিত্র দেখে তার রক্ষার প্রশ্ন সম্মুখে এসে দাঁড়ায় আর সেই প্রশ্নের উত্তর এটাই হতে পারে যে, যেখানে-যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে-সেখানে রক্ষার প্রবন্ধ করা উচিত। বেদের মধ্যে রক্ষা সম্বন্ধিত অনেক প্রকারের উপদেশ রয়েছে যা স্থূলরূপে চার ভাগে বিভাজিত করা যেতে পারে, যথা - (১) রোগ থেকে রক্ষা, (২) প্রাকৃতিক সংকট থেকে রক্ষা, (৩) সমাজের আন্তরিক দুষ্টদের থেকে রক্ষা আর (৪) বাইরের শত্রু থেকে রক্ষা। এই চার প্রকারের রক্ষাকে আয়ুর্বেদ, যজ্ঞ, প্রার্থনা আর রাজ প্রবন্ধের অন্তর্গত রাখা হয়েছে। এরমধ্যে সর্বপ্রথম হল আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ হল দুই প্রকারের - (১) ব্যক্তির আর (২) সমাজের। ব্যক্তির আয়ুর্বেদ হল বৈদ্যকশাস্ত্র আর সমাজের আয়ুর্বেদ হল যজ্ঞ। ব্যক্তিগত ব্যাধিগুলো বৈদ্যকশাস্ত্র দ্বারা আর ঋতু-সম্বন্ধিত বা মহামারী আদি সামাজিক ব্যাধিগুলো যজ্ঞ দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। বেদের মধ্যে উভয় প্রকারের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি প্রথমে বৈদ্যকজ্ঞানের উদাহরণ উদ্ধৃত করবো। বেদে সবার আগে জীবনের উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

ইমম্ জীবেভ্যঃ পরিধিম্ দধামি মৈষাম্ নু গাদপরো অর্থমেতম্।
শতম্ জীবন্তু শরদঃ পুরুচীরন্তর্মৃত্যুম্ দধতাম্ পর্বতেন।।

(ঋঃ ১০|১৮|৪)

অর্থাৎ - আমি মনুষ্যের আয়ুর মর্যাদা শত বর্ষ স্থির করেছি। এরপূর্বে এই জীবনধনকে হারিয়ে ফেল না , শত বর্ষ বাঁচো আর অপমৃত্যুকে পর্বত দিয়ে দাবিয়ে দাও।

এই মন্ত্রটিতে অপমৃত্যু থেকে বাঁচার উপদেশ রয়েছে। অপমৃত্যু রোগ থেকেই হয় আর রোগ দোষেরই কোপ থেকে হয়, এইজন্য বেদের মধ্যে দোষের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে -

ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী।
বাজেবাজে হব্যা ভূত্।।

(ঋঃ ৬|৬১|১২)

অর্থাৎ - তিন স্থানের (বাত, পিত্ত আর কাফ) মধ্যে থাকা সাত ধাতু পাঁচ তত্ব দ্বারা উৎপন্ন হয়ে বৃদ্ধি পায় আর অন্ন দ্বারা পুষ্ঠ হয়।

এর তাৎপর্য হল এটাই যে পাঁচ তত্ব দ্বারা নির্মিত হওয়া আহার-পানীয় পদার্থ দ্বারাই সাত ধাতু উৎপন্ন হয় যা বাত, পিত্ত আর কাফের মধ্যে স্থিত রয়েছে। এরপরে হৃদয় আর নাড়ী আদির বিষয়ে লেখা রয়েছে যে-
ইদম্ য়মস্য সাদনম্ দেবমানম্ য়দুচ্যতে।

ইয়মস্য ধম্যতে নাঋীরয়ম্ গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ।।

(ঋঃ ১০|১৩৫|৭)

অর্থাৎ - এই হৃদয় দেবমান -- নিয়মিত গতি জানিয়ে দেওয়া যমের ঘর আর এটাই নাড়ীকে ধুয়ে দেয়।

এই মন্ত্রে হৃদয়ের চলনের এক নিয়মিত রূপ বলে নাড়ীজ্ঞানের উপদেশ করা হয়েছে। এরপরে পথ্যাহারের বর্ণনা এই ভাবে রয়েছে -

ত্রীণি চ্ছন্দাম্সি কবয়ো বি য়েতিরে পুরুরূপম্ দর্শতম্ বিশ্বচক্ষণম্।
আপো বাতা ওষধয়স্তান্যেকস্মিন্ ভুবন অর্পিতানি।।

(অথর্বঃ ১৮|১|১৭)

অর্থাৎ - বিদ্বানগণ অনেকভাবে নিরূপণ করার যোগ্য, অদ্ভুত গুণকারী, সবার জানার যোগ্য আর আনন্দদায়ী তিন পদার্থকে জানেন। সেই তিনটি পদার্থ হল জল, বায়ু আর ঔষধি, যা সংসারকে দেওয়া হয়েছে আর প্রত্যেক স্থানে বিদ্যমান রয়েছে।

এখানে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধিত আর প্রত্যেক সময় উপযুক্ত বায়ু, জল আর অন্নের বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ মানুষের স্বাস্থ্য এরই অধীনে। এরপরে আহারের নিয়ম বলে বেদ উপদেশ করেছে যে -

য়দশ্নামি বলম্ কুর্ব ইত্থম্ বজ্রমা দদে।
স্কন্ধানমুষ্য শাতয়ন্ বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ।।
য়ত্ পিবামি সম্ পিবামি সমুদ্রইব সম্পিবঃ।
প্রাণানমুষ্য সম্পায় সম্ পিবামো অমুম্ বয়ম্।।
য়দ্ গিরামি সম্গিরামি সমুদ্রইব সম্গিরঃ।
প্রাণানমুষ্য সম্ গীর্য় সম্ গিরামো অমুম্ বয়ম্।।

(অথর্বঃ ৬|১৩৫|১-৩)

অর্থাৎ - আমি যেসব আহার করি তাকে শক্তি করে দেই, তাই আমি শত্রুর কাঁধকে ভঙ্গ করার মতো বজ্র সেইভাবে গ্রহণ করতে পারবো যেভাবে বৃত্রের জন্য ইন্দ্র তার নিজের বজ্রকে গ্রহণ করে। সেইভাবে আমি যা কিছু পান করি সেটাও যথাবিধি পান করি, যেরকম সমুদ্র যথাবিধি পান করে, এইজন্য যা কিছু আমি পান করবো সেই পদার্থের সারভাগকে চুষে নিয়ে পান করবো। এইভাবে যা কিছু আমি চাবাবো তা যথাবিধি চাবাবো যেরকম সমুদ্র চিবিয়ে হজম করে নেয়, এইজন্য পদার্থের প্রাণস্বরূপ সারকে দাঁত দিয়ে পিষে খুব করে চাবানো উচিত।

এই মন্ত্রগুলোতে খুব করে চিবিয়ে ততখানিই আহারের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যতটা হজম হবে আর বল উৎপন্নকারী হবে। সমুদ্রের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, কখনও অজীর্ণ হওয়া উচিত নয়, কারণ

জলের প্রতি সমুদ্রের কখনও অজীর্ণ হয় না। এরপর সংসারের দুই শক্তি -- শীত আর উষ্ণ সম্বন্ধে এইভাবে বলা হয়েছে-

অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিম্ চ বিশ্বশম্ভুবম্।
(ঋঃ ১০|৯|৬)

অর্থাৎ - আমাকে সোম বলেছে যে জলের মধ্যে সমস্ত ঔষধি রয়েছে আর অগ্নি সকলকে আরোগ্যতা দেয়। এই মন্ত্রটিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, অগ্নি আর জল অর্থাৎ শীত আর উষ্ণই হল দুটি ঔষধ, এইজন্য শতপথব্রাহ্মণ ১|৬|৩|৮ এরমধ্যে লেখা রয়েছে যে - "**অগ্নীষোমাবেবাভি সম্বভূব সর্বা বিদ্যাঃ সর্বম্ য়শঃ সর্বমন্নাদ্যঁ সর্বাঁ শ্রীম্**", অর্থাৎ সংসারে অগ্নি আর সোম (জল) দুটি পদার্থই রয়েছে, এরথেকেই সমস্ত বৈদ্যবিদ্যা, য়শ, অন্ন আর শোভা প্রাপ্ত হয়, এইজন্য বেদের মধ্যে শীতের ঔষধ উষ্ণ আর উষ্ণের ঔষধ শীত বলা হয়েছে। বেদে লেখা রয়েছে যে -

কঃ স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ।
কিঁ স্বিদ্ধিমস্য ভেষজম্ কিম্বা বপনম্ মহত্।।
সূর্য় একাকী চরতী চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্ ভূমিরাবপনম্ মহত্।।
(য়জুঃ ২৩|৯-১০)

অর্থাৎ - কে একলা চলে, কে বার-বার জন্মায়, শীতের ঔষধ কি আর বীজ বপনের সবথেকে বড়ো স্থান কোনটি? সূর্য একলা চলে, চন্দ্রমা বার-বার জন্মায়, অগ্নি (উষ্ণ) হল শীতের ঔষধ আর পৃথিবীই হল বীজ বপনের সবথেকে বড়ো স্থান।

এই মন্ত্রে শীতের ঔষধ উষ্ণ বলা হয়েছে, কিন্তু অর্থাপত্তি দ্বারা এটা বলে দেওয়া হয়েছে যে উষ্ণের ঔষধ হল শীত। এরপরে সমস্ত শরীরের ভিতর-বাইরের অঙ্গের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে -

কেন পার্ষ্ণী আভৃতে পূরুষস্য কেন মাম্সম্ সম্ভৃতম্ কেন গুল্ফৌ।
কেনাঙ্গুলীঃ পেশনীঃ কেন খানি কেনোচ্ছলঙ্খৌ মধ্যতঃ কঃ প্রতিষ্ঠাম্।।
কস্মানু গুল্ফাবধরাবকৃণ্বন্নষ্ঠীবন্তাবুত্তরৌ পূরুষস্য।
জঙ্ঘে নির্ঋত্য ন্যদধুঃ ক্বস্বিজ্জানুনোঃ সন্ধী ক উ তচ্চিকেত।।
চতুষ্টয়ম্ য়ুজ্যতে সম্হিতান্তম্ জানুভ্যামূর্ধবম্ শিথিরম্ কবন্ধম্।
শ্রোণী য়দূরূ ক উ তজ্জজান য়াভ্যাম্ কুসিন্ধম্ সুদৃঢ়ম্ বভূব।।
কতিদেবাঃ কতমে ত আসন্ য় উরো গ্রীবাশ্চিক্যুঃ পূরুষস্য।
কতি স্তনৌ ব্যদধুঃ কঃ কফোডৌ কতি স্কন্ধান্ কতি পৃষ্টীরচিন্বন্।।
কো অস্য বাহূ সমভরদ্ বীর্য়ম্ করবাদিতি।

অস্গৌ কো অস্য তদ্দেবঃ কুসিন্ধে অন্ধ্যা দধৌ।।
কঃ সপ্ত খানি বি ততর্দ শীর্ষণি কর্ণাবিমৌ নাসিকে চক্ষিণী মুখম্।
য়েষাম্ পুরুত্রা বিজয়স্য মহ্মনি চতুষ্পাদো দ্বিপদো য়ন্তি য়ামম্।।
হন্বোর্হি জিহ্বামদধাত্ পুরুচীমধা মহীমধি শিশ্রায় বাচম্।
স আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তরপো বসানঃ ক উ তচ্চিকেত।।
মস্তিকমস্য য়তমো ললাটম্ ককাটিকাম্ প্রথমো য়ঃ কপালম্।
চিত্বা চিত্যম্ হন্বোঃ পূরুষস্য দিবম্ রুরোহ কতমঃ স দেবঃ।।
(অথর্বঃ ১০|২|১-৮)

অর্থাৎ - কে পায়ের দুই গোড়ালিতে মাংস ভরে পুষ্ট করেছে, কে মাংস জুড়ে দিয়েছে, কে দুই গোড়ালিকে জুড়ে দিয়েছে, কে আঙ্গুলের জোড়কে জুড়েছে, কে নখ আর কে পায়ের দুই তলাকে জুড়েছে? কে পায়ের নিচে দুই গোড়ালি, উপরের দুই হাঁটু, দুই পা আর দুই হাঁটুর ভিতরে দুই জোড়কে জুড়েছে? কে দুই পশ্চাদ্দেশ আর উরুকে চার প্রকারে সংলগ্ন নৌকোর উপর এই আলগা ধড়টিকে জুড়েছে? কে মানুষের বুক আর গলাকে মিলিয়েছে, কে দুটি স্তনকে বানিয়েছে, আর কে দুই গাল, কাঁধ আর পাঁজরকে একত্র করেছে? কে এই বীর কর্মকারী বাহুকে পুষ্ট করেছে আর কাঁধের সঙ্গে মিলিয়েছে? কে মস্তকে দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাসাছিদ্র আর একটি মুখকে বানিয়ে সাত গোলকে জুড়েছে, যার সাহায্যে দ্বিপদ আর চতুষ্পদ প্রাণী তাদের নিজের-নিজের কর্ম-নির্বাহ করে? কে দুই চোয়ালের মাঝে অনেক ধ্বানিকার এমন জিহ্বাকে জুড়েছে? কে এটির মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের সম্মুখ, পশ্চাৎভাগ আর কপালের দুই চোয়ালের সঙ্গে মিলিয়েছে? এই পর্যন্ত এই মন্ত্রগুলোতে মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত আবশ্যক অঙ্গের বর্ণনা রয়েছে। এইভাবে বেদে শারীরিক বর্ণনা আরও অনেক স্থানে এসেছে যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বেদের মধ্যে শরীরের অবয়বের বর্ণনা রয়েছে। এইজন্য সুশ্রুত, শরীরস্থান ৫|১৮ তে লেখা রয়েছে যে **"ত্রীণি সষষ্ঠান্যস্থিশতানি বেদবাদিনো ভাষন্তে"** অর্থাৎ বৈদিক বিদ্বান শরীরের হাঁড়ের সংখ্যা তিনশ ষাট বলেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে যে বেদের মধ্যে শরীরের সম্পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে, কারণ শরীরের অন্তর্ভাগের মধ্যেই তো বৈদিক বিদ্বানগণ জীব আর ব্রহ্মকে খুঁজে বের করতেন। এই শরীর প্রকরণের পরে লেখা রয়েছে যে-

মূর্ধানমস্য সম্সীব্যাথর্বা হৃদয়ম্ চ য়ত্।
মস্তিষ্কাদূর্ধ্বঃ প্রৈরয়ত্ পবমানোऽধি শীর্ষতঃ।।
তদ্ বা অথর্বণঃ শিরো দেবকোশঃ সমুব্জিতঃ।
তত্ প্রাণো অভি রক্ষতি শিরো অন্নমথো মনঃ।।
ঊর্ধ্বো নু সৃষ্টা৩স্তির্য়ঙনু সৃষ্টা৩স্সর্বা দিশঃ পুরুষ আ বভূবাঁ৩।
পুরম্ য়ো ব্রহ্মণো বেদ য়স্যাঃ পুরুষ উচ্যতে।।
য়ো বৈ তাম্ ব্রহ্মণো বেদামৃতেনাবৃতাম্ পুরম্।

তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণম্ প্রজাম্ দদুঃ।।
ন বৈ তম্ চক্ষুর্জহাতি ন প্রাণো জরসঃ পুরা।
পুরম্ য়ো ব্রাহ্মণো বেদ য়স্যাঃ পুরুষ উচ্যতে।।
অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাম্ পূরয়োধ্যা।
তস্যাম্ হিরণ্যেয়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ।।
তস্মিন্হিরণ্যেয় কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্য়দ্যক্ষমাত্মন্বত্তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।।

(অথর্বঃ ১০|২|২৬-৩২)

অর্থাৎ - পরমেশ্বর মস্তিষ্ককে হৃদয়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন যা অগ্নি বিশেষের দ্বারা শরীরকে প্রেরিত করে। এই মস্তকটি হল দেবকোশ। এরমধ্যেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান বসবাস করে। প্রাণ, মন আর অন্ন এটিকে রক্ষা করে। পরমাত্মাই এই উল্টো, বাঁকা আর সোজা শরীরগুলোকে নিজের ব্যাপকতা দ্বারা নির্মাণ করেন। এইজন্য যে এই পুররূপী শরীরকে জানে, তাকেই পুরুষ বলে। যে সেই অমৃত ব্রহ্মের এই শরীর -- পুরকে জানে সে-ই বেদকে, পরমাত্মাকে, স্বাস্হ্যকে, শক্তিকে আর সন্ততিকে প্রাপ্ত করে। সেই মানুষের, বুড়ো হওয়ার পূর্বে, না নেত্র খারাপ হয় আর না শক্তি কম হয়, যে এই ব্রহ্মপুর -- শরীরকে সঠিকভাবে জানবে। এই আট চক্র আর নয় দ্বারওয়ালা অযোধ্যানগরে প্রকাশমান্ কোশ রয়েছে যা স্বর্গীয় জ্যোতি দিয়ে ছেয়ে রয়েছে। সেই তিনগুণ আর তিন দিশায় রক্ষিত কোশে যে আত্মার মতো মহান্ য়ক্ষ বসে রয়েছে, তাকেই ব্রহ্ম অনুসন্ধানী প্রাপ্ত করে।

এই মন্ত্রগুলোতে মস্তককে বিজ্ঞানের কোশ আর হৃদয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া বলে বোঝানো হয়েছে যে, শরীরের হৃদয়াকাশের মধ্যেই সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা বিরাজমান করছে, যাকে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীই খুঁজে বের করতে পারে। এইভাবে শরীর, মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের স্থূল আর সূক্ষ্ম অবয়বের বর্ণনা করার পরে এখন বৈদ্যের বর্ণনাতে আসা যাক। ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

য়ত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ।।

(ঋঃ ১০|৯৭|৬)

অর্থাৎ - যেভাবে রাজসভাতে সভাসদ্ একত্রিত হন, সেইভাবে যার কাছে ঔষধি একত্রিত থাকে, তাকে বিদ্বানগণ রোগ দূরকারী আর অপমৃত্যুর নাশক -- বৈদ্য বলে।

বৈদ্যের নিকট একত্রিত থাকা সহস্র ঔষধের বর্ণনা বেদের মধ্যে রয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ দুই-তিনটির বর্ণনা উদ্ধৃত করবো। বেদের মধ্যে অপামার্গ -- লটজীরার (Achyranthes aspera) জন্য লেখা রয়েছে -

ক্ষুধামারম্ তৃষ্ণামারমগোতামনপত্যতাম্।

অপামার্গ ত্বয়া বয়ম্ সর্বম্ তদপ মৃজমহে৷৷

(অথর্বঃ ৪|১৭|৬)

অর্থাৎ - ক্ষুধার হত্যাকারী, তৃষ্ণার হত্যাকারী, নির্ধনতা আর নির্বংশতা দূরকারী হে অপামার্গ (লটজীরা)! তোমাকে আমি খুঁজছি।

এই মন্ত্রের দ্বারা লটজীরার মধ্যে উপরিউক্ত গুণ বলে দেওয়া হয়েছে। এরপর পিপ্পলীর (Long pepper) গুণ এইভাবে লেখা রয়েছে -

পিপ্পলী ক্ষিপ্তভেষজ্য৩তাতিবিদ্ধভেষজী।

তাম্ দেবাঃ সমকল্পয়ন্নিয়ম্ জীবিতবা অলম্৷৷

(অথর্বঃ ৬|১০৯|১)

অর্থাৎ - বিদ্বানগণ পিপ্পলীকে উন্মত্তের ঔষধি, বড়ো ঘায়ের ঔষধ আর জীবনদাতা বলে স্বীকার করে। পীপলের গুণ এইভাবে বৈদ্যকের মধ্যেও লেখা রয়েছে। এরপর কেশ বৃদ্ধি, শ্যাম রাখতে আর দৃঢ় করার ঔষধের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

দৃংহ মূলমাগ্রম্ য়চ্ছ বি মধ্যম্ য়াময়ৌষধে।

কেশা নডাইব বর্ধন্তাম্ শীর্ষ্ণস্তে অসিতাঃ পরি৷৷

(অথর্বঃ ৬|১৩৭|৩)

অর্থাৎ - হে ঔষধি! তুমি কেশের মূলকে দৃঢ় করো, অগ্রভাগকে বাড়াও আর মধ্যভাগকে লম্বা করো যেন কেশ কালো হয়ে লম্বা ঘাসের সমান বাড়ে।

ঔষধি ছাড়াও বায়ুসেবন দ্বারা রোগ নিবৃত্তি করার উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

আত্মা দেবানাম্ ভুবনস্য গর্ভো য়থাবশম্ চরতি দেব এষঃ।

ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপম্ তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম৷৷

(ঋঃ ১০|১৬৮|৪)

অর্থাৎ - দেবের আত্মা আর ভুবনের গর্ভ এই বায়ুদেব তার নিজের ইচ্ছাতে চলে। এর কেবল শব্দই শোনা যায়, রূপ দেখা যায় না। সেই বায়ুর জন্য আমরা হবিষ দেই।

য়দদো বাত তে গৃহে৩১মৃতস্য নির্ধির্হিতঃ।

ততো নো দেহি জীবসে৷৷

(ঋঃ ১০|১৮৬|৩)

অর্থাৎ - হে বায়ু! আপনার গৃহে যে অমৃতের ধন রয়েছে, সেটি আমাদের বাঁচার জন্য দিন।

বাত আ বাতু ভেষজম্ শম্ভু ময়োভু নো হৃদে।

প্রা ণ আয়ূঁষি তারিষত্৷৷

(ঋঃ ১০|১৮৬|১)

অর্থাৎ - বায়ু হল আরোগ্যতার জন্য ঔষধ। যা দিয়ে হৃদয়ের আরোগ্যতা বাড়ে, বল প্রাপ্ত আর আয়ু বৃদ্ধি হয়।

উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা।

স নো জীবাতবে কৃধি।।

(ঋঃ ১০|১৮৬|২)

অর্থাৎ - হে বাত! তুমি আমার পিতা, আমার ভাই আর আমার সখা, অতঃ তুমি আমাকে জীবনের জন্য তৈরি করো।

এরপর জল দ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত করার উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজম্।

অপামুত প্রশস্তিভিরশ্বা ভবথ বাজিনো গাবো ভবথ বাজিনীঃ।।

(অথর্বঃ ১|৪|৪)

অর্থাৎ - জলের মধ্যে অমৃত আর ঔষধি রয়েছে, এইজন্য জলের এই গুণ দ্বারা গৌ, বৃষ আর অশ্ব বলবান্ হয়।

যেভাবে জল দ্বারা আরোগ্যতা হয়, সেভাবে সূর্যতাপ দ্বারাও আরোগ্যতা হয়। এমন একটি মন্ত্রে বেদ উপদেশ করেছে যে -

উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাম্ দিবম্।

হৃদ্রোগম্ মম সূর্য় হরিমাণম্ চ নাশয়।।

(ঋঃ ১|৫০|১১)

অর্থাৎ - আজ আর নিত্য প্রাতঃকালে আসা হে সূর্য! আমার হৃদয়ের রোগ আর রাতের চোরকে নাশ করো।

এর তাৎপর্য হল এটাই যে, সূর্য দেবতা উদয় হয়ে হৃদয়রোগ আর চোর উভয়ের নাশ করে|এরপর শল্যকর্মের (Surgery) উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

শল্যাদ্ বিষম্ নিরবোচম্ প্রাঞ্জনাদুত পর্ণধেঃ।

অপাষ্ঠাচ্ছৃঙ্গাত্ কুল্মলান্নির্বোচমহম্ বিষম্।।

(অথর্বঃ ৪|৬|৫)

অর্থাৎ - শল্যকর্ম দ্বারা, আবরণ দ্বারা, পালক দ্বারা, শৃঙ্গী (শৃঙ্গী দিয়ে চুষে), ছুরি দ্বারা আর বাণ দ্বারা বিষকে বের করে দেই।

এই মন্ত্রের মধ্যে কাটা-ছেরা, পুল্টিস, শৃঙ্গী আর বাণের অগ্রভাগ দ্বারা পুঁজ বের করে নেওয়ার উপদেশ রয়েছে।

এরপর আটকে যাওয়া মূত্রকে খোলার জন্য এইভাবে বলা হয়েছে -

বিদ্ম শরস্য পিতরম্ পর্জন্যম্ শতবৃষ্ণ্যম্।

তেনা তে তন্বেত শম্ করম্ পৃথিব্যাম্ তে নিষেচনম্ বহিষ্টে অস্তু বালিতি।।

(অথর্বঃ ১|৩|১)

অর্থাৎ - আমরা জানি যে বৃষ্টির অধিকতার জন্য সরকণ্ডা হয়। সেই সরকণ্ডা দিয়ে তোমার শরীরকে আরোগ্য

করবো। এখন তোমার মূত্রের প্রবাহ পৃথিবীতে হোক আর দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসুক।

এরপরে ভেঙে যাওয়া হাড় জুড়ে দেওয়ার উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

য় ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্য আতৃদঃ।
সন্ধাতা সন্ধিম্ মঘবা পুরূবসুর্নিষকর্তা বিহ্রুতম্ পুনঃ।।
(অথর্বঃ ১৪|২|৪৭)

অর্থাৎ - যে বৈদ্য আঘাত দ্বারা ভেঙে যাওয়া গ্রীবা আদি জোড়ের হাড়কে যথাস্থানে জুড়ে দেন, তিনিই বাঁকা আর অকৃত থাকা অঙ্গকেও সোজা করে দেন।

এই মন্ত্রের মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে যে আঘাত আদি দ্বারা ভেঙে যাওয়া হাড়কে সঠিকভাবে জুড়ে দিতে পারে এমন ব্যক্তি বাঁকা অঙ্গকেও ঠিক করতে পারে। এরপর বিনা ঔষধে কেবল রোগীর মনকে উত্তেজনা, উৎসাহ আর প্রেরণা (Suggestion) দিয়ে রোগকে নির্মূল করার উপদেশ এইভাবে দেওয়া হয়েছে -

অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নোলোম্নো জাতম্ পর্বণিপর্বণি।
য়ক্ষ্মম্ সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদম্ বিবৃহামি তে।।
(ঋঃ ১০|১৬৩|৬)

অর্থাৎ - আমি আমার আত্মবল দ্বারা অঙ্গ-অঙ্গ, লোমে-লোমে, জোড়-জোড় দিয়ে যক্ষ্মারোগকে বের করে দেই। এই প্রেরণাকে আকর্ষণশক্তির সঙ্গে কিভাবে করা উচিত সেই ক্রিয়ার উপদেশ এইভাবে করা হয়েছে - অয়ম্ মে হস্তো ভগবানয়ম্ মে ভগবত্তরঃ।

অয়ম্ মে বিশ্বভেষজোऽয়ম্ শিবাভিমর্শনঃ।।
হস্তাভ্যাম্ দশশাখাভ্যাম্ জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী।
অনাময়িত্নুভ্যাম্ হস্তাভ্যাম্ তাভ্যাম্ ত্বাভি মৃশামসি।।
(অথর্বঃ ৪|১৩|৬-৭)

অর্থাৎ - আমার এই হাত প্রভাবশালী, আমার এই হাত অধিক গুণকারী, আমার এই হাত সব রোগের ঔষধ আর আমার এই হাতের স্পর্শ দ্বারা আরোগ্যতা হয়। আমি প্রেরণাত্মক বাণী আর দশশাখাওয়ালা (আঙ্গুল) তথা আরোগ্যদাতা উভয় দুটি হাত দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করছি।

এই মন্ত্রের মধ্যে স্পর্শের দ্বারা প্রেরণাত্মক বাণী বলে রোগীকে আরোগ্য করার উপদেশ রয়েছে। এরপর বাজীকরণ ঔষধির বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

য়থা নকুলো বিচ্ছিদ্য সন্দধাত্যহিম্ পুনঃ।
এবা কামস্য বিচ্ছিন্নম্ সম্ ধেহি বীর্য়াবতি।।
(অথর্বঃ ৬|১৩৯|৫)

অর্থাৎ - যেভাবে বেজী সাপকে মেরে নিজে সুস্থ আর শান্ত হয়ে যায়, সেভাবেই আমি তোমার গুপ্তেন্দ্রিয়ের ক্ষীণতাকে ঠিক করছি।

য়েন কৃশম্ বাজয়ন্তি য়েন হিন্বন্ত্যাতুরম্।
তেনাস্য ব্রহ্মণস্পতে ধনুরিবা তানয়া পসঃ।।
(অথর্বঃ ৬|১০১|২)
য়থা পসস্তায়াদরম্ বাতেন স্থূলভম্ কৃতম্।
য়াবত্ পরস্বতঃ পসস্তাবত্ তে বর্ধতাম্ পসঃ।।
য়াবদঙ্গীনম্ পারস্বতম্ হাস্তিনম্ গার্দভম্ চ য়ত্।
য়াবদশ্বস্য বাজিনস্তাবত্ তে বর্ধতাম্ পসঃ।।
(অথর্বঃ ৬|৭২|২-৩)

অর্থাৎ - যারজন্য কৃশ রয়ে যায় আর দ্রুত পাত হয়ে যায় সেই কারণটিকে দূর করে তোমার উপস্থকে ধনুষের নেয় প্রসারিত করি। সেটি যেন এরকম স্থূল হয়ে যায় আর যতটা আবশ্যক ততটাই বেড়ে যায়, সে উপায় করে দিচ্ছি। যতটা সামর্থ্য পুরুষদের হওয়া উচিত ততটা (গার্দভ) বড়ো, (হাস্তিন) স্থূল আর (বাজিন) তেজ হয়ে যাক, সে উপায় করে দিচ্ছি।

য়াম্ ত্বা গন্ধর্বো অখনদ্ বরুণায় মৃতভ্রজে।
তাম্ ত্বা বয়ম্ খনামস্যৌষধিম্ শেপহর্ষণীম্।।
(অথর্বঃ ৪|৪|১)

অর্থাৎ - যে ঔষধিকে মৃত বরুণের জন্য গন্ধর্ব খনন করেছিল, সেই বাজীকরণ ঔষধিকে আমি তোমার জন্য খনন করি।

এইভাবে এই বাজীকরণ চিকিৎসা দ্বারা নপুংসকত্বাদি দোষকে দূর করে পুরুষদের ভালো সন্তান উৎপন্ন করার যোগ্য বানানো হল বেদের তাৎপর্য। এইজন্য এই চিকিৎসাটি অন্য সকল চিকিৎসাগুলো থেকে অধিক মূল্যবান, কারণ এর দ্বারাই ভবিষ্য প্রজানির্মাণের কাজ সম্পাদন হয়। আমি এইভাবে এই পর্যন্ত বেদের দ্বারা আয়ুর্বেদ সম্বন্ধিত আবশ্যক উপদেশগুলোকে একত্রিত করেছি। এতখানি আয়ুর্বৈদিক জ্ঞান থেকে মানুষ আরোগ্যতার নিয়ম বুঝতে পারবে আর রোগ থেকে আরোগ্যতা প্রাপ্ত করতে পারবে। এটা ব্যক্তিচিকিৎসার উপদেশ হয়ে গেল, এখন সামাজিক চিকিৎসার বর্ণনা করবো।

ব্যক্তিব্যাধির আয়ুর্বৈদিক চিকিৎসার পরে বেদের মধ্যে সামাজিক ব্যাধিগুলোর নিবৃত্তিরও উপদেশ করা হয়েছে। প্রায়শঃ দেখা যায় যে, অনেক ধরনের চেপী ব্যাধি (মহামারী) উঠে দাঁড়ায়, যা আয়ুর্বেদ চিকিৎসা দ্বারা দূর হয় না আর সর্বত্র ছড়িয়ে অসংখ্য মানুষের সংহার করে ফেলে। যজ্ঞই হল তাকে দূর করার একমাত্র উপায়। আমি যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা পূর্বেই করে এসেছি আর বলে দিয়েছিলাম যে যজ্ঞের সিদ্ধান্ত শিল্প আর বিজ্ঞানের মূলে স্থির রয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ডে যজ্ঞের জন্য নানা প্রকারের শিল্প আর বিজ্ঞানের আবশ্যকতা বলা হয়েছে (বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড ১৩|৬-৯)। শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে বলা হয়েছে যে ঋতু-সম্বন্ধীয় সার্বজনীন রোগগুলো যজ্ঞ দ্বারা দূর হয়ে যায় (শতপথব্রাহ্মণ)।বেদ স্বয়ং উপদেশ করেছে যে অজ্ঞাত আর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া চেপী আর মারক রোগগুলো যজ্ঞ দ্বারা দূর হয়। অথর্ববেদের মধ্যে লেখা

রয়েছে যে -

মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতয়ক্ষ্মাদুত রাজয়ক্ষ্মাত্।
গ্রাহির্জগ্রাহ য়দ্যেতদেনম্ তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্।।

(অথর্বঃ ৩|১১|১)

সহস্রাক্ষেণ শতবীর্য়েণ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্।
ইন্দ্রো য়থৈনম্ শরদো নয়াত্যতি বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্।।

(অথর্বঃ ৩|১১|৩)

অর্থাৎ - হে মনুষ্য! তোমাকে আমি হবন দ্বারা অজ্ঞাত মহামারী রোগ থেকে আর ক্ষয়রোগ থেকে সুখময় জীবনের জন্য উদ্ধার করছি। এই রোগীকে অসাধ্য রোগ ধরে রেখেছে, এইজন্য হে ইন্দ্র আর অগ্নে! আপনি একে আরোগ্য করুন। আমি এই হবনীয় হবিষের সহস্র গুণদায়ক আর আয়ু বৃদ্ধিকারক ঔষধি মিশ্রিত করে তৈরি করেছি, এইজন্য হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! আপনি এই সংসারে ছড়িয়ে পড়া রোগকে দূর করে এই রোগীকে শত বর্ষের আয়ু প্রদান করুন।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে অনেক ধরনের ঔষধের হবন করে অজ্ঞাত আর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া মহামারী আর মারক রোগগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার উপদেশ রয়েছে। এরকম যজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার সঙ্গে বেদ উপদেশ করেছে যে -

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবান্ য়জ্ঞেন বোধয়।
আয়ুঃ প্রাণম্ প্রজাম্ পশুম্ কীর্তিম্ য়জমানম্ চ বর্ধয়।।

(অথর্বঃ ১৯|৬৩|১)

অর্থাৎ - হে ব্রহ্মণস্পতে! উঠো আর যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের জাগিয়ে দাও, যারদ্বারা আয়ু, প্রাণ, প্রজা, পশু, কীর্তি আর রাজার উন্নতি হয়।

এইভাবে যজ্ঞের মাহাত্ম্য বলার পর এখন যজ্ঞের মধ্যে সবথেকে প্রধান বস্তু অগ্নির বর্ণনাতে আসা যাক। য়জুর্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

দিবস্পরি প্রথমম্ জজ্ঞে১অগ্নিরস্পদ্ দ্বিতীয়ম্ পরি জাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমণা১অজস্রমিন্ধান১এনম্ জরতে স্বাধীঃ।।

(য়জুঃ ১২|১৮)

অর্থাৎ - প্রথম অগ্নি -- সূর্য দ্যৌ দ্বারা জন্মেছে, দ্বিতীয় জাতবেদ আমার দ্বারা (পৃথিবীতে) জন্মেছে, তৃতীয় (বিদ্যুত্) মহাকাশের জলতত্ব দ্বারা জন্মেছে।

এই মন্ত্রটিতে অগ্নির তিনটি রূপকে তিনটি স্থানে বলা হয়েছে। এরপর অগ্নিকে দেবতাদের নিকট হুতদ্রব্য বহনকারী দূত বলা হয়েছে। য়জুর্বেদের মধ্যে বলা হয়েছে যে -

অগ্নিম্ দূতম্ পুরো দধে হব্যবাহমুপ ব্রুবে।

দেবাঁ২১আ সাদয়াদিহ।।

(য়জুঃ ২২|১৭)

অর্থাৎ - পূর্বেই অগ্নিদূতকে ধারণ করা হয়েছে আর এটি হব্য পদার্থের বহনকারী বলা হয়েছে। এটি দেবতাদের নিকট পদার্থকে পৌঁছে দেয়, অতঃ যজ্ঞের জন্য এই অগ্নির স্থাপনা এইভাবে বলা হয়েছে -

ভূর্ভুবঃ স্বর্দ্যৌরিব ভূম্না পৃথিবীব বরিম্ণা।

তস্যাস্তে পৃথিবি দেবয়জনি পৃষ্ঠে১গ্নিমন্নাদমন্না- দ্যায়াদধে।।

(য়জুঃ ৩|৫)

অর্থাৎ - যেভাবে আকাশে স্থিত মহান্ সূর্য এই বিস্তৃত পৃথিবীর উপরে দেবযজ্ঞ করে চলেছে, সেইভাবে ভোজ্য পদার্থের জন্য আমরাও এই অগ্নির স্থাপনা করছি।

এরপর অগ্নিকে প্রদীপ্ত করার জন্য লেখা রয়েছে যে -

উদ্ বুধ্যস্বাগ্নে প্রতি জাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সঁসৃজেথাময়ম্ চ।

অস্মিন্ত্সধস্থে১অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বে দেবা য়জমানশ্চ সীদত।।

(য়জুঃ ১৫|৫৪)

অর্থাৎ - হে অগ্নে! তুমি প্রদীপ্ত হও আর আমাদের সতেজ করো তথা তোমার সঙ্গে আমরা মিলে ইষ্ট-সুখের যুক্তি আরও প্রাপ্ত করি, যার দ্বারা এখানে আমরা আর অন্য যজমান তথা অন্য বিদ্বানগণও যজ্ঞ করুক।

এরপর সমিধাতে ঘী দেওয়ার বিধি বলে দেওয়া হয়েছে-

সমিধাগ্নিম্ দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্।

আস্মিন্ হব্যা জুহোতন।।

(য়জুঃ ১২|৩০)

অর্থাৎ - সমিধা দিয়ে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করো, ঘৃতাদি দিয়ে তাকে প্রজ্বলিত করো আর সেই প্রদীপ্ত হওয়া অগ্নিতে হবন করো।

এরপর বলা হয়েছে যে হবন করা পদার্থ কিভাবে বায়ুর মলিনতাকে (অশুদ্ধিকে) দূর করে দেয় -

তন্ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্ধয়ামসি।

বৃহচ্ছোচা য়বিষ্ঠয়।।

(য়জুঃ ৩|৩)

অর্থাৎ - হে অঙ্গার! উজ্বলিত অগ্নি! তুমি সব পদার্থকে (বিষ্ঠয়) ছেদন-ভেদন করে (বৃহত্ শোচঃ) মহান্ শুদ্ধিকারী হও, এইজন্য সমিধা আর ঘৃত দিয়ে তোমাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি।

এই মন্ত্রের মধ্যে অগ্নিকে জ্বালাতে, প্রদীপ্ত করতে আর তার দ্বারা পদার্থের ছেদন-ভেদনের ক্রিয়াকে বলার পর এটাও বলা হয়েছে যে অগ্নি বায়ুকে হুত পদার্থ দেয়। ঋগ্বেদে লেখা রয়েছে -

আত্মা দেবানাম্ ভুবনস্য গর্ভো য়থাবশম্ চরতি দেব এষঃ।

ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপম্ তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম।।

(ঋঃ ১০|১৬৮|৪)

অর্থাৎ - দেবতাগণের আত্মা আর ভুবনের গর্ভ এই বায়ু তার নিজের ইচ্ছা দ্বারা চলে। যদিও এটির কেবল শব্দই শোনা যায়, রূপ দেখা যায় না, তথাপি আমরা তারজন্য হবিষ দেই।

দেবা গাতুবিদো গাতুম্ বিত্ত্বা গাতুমিত।

মনসম্পত১ইমম্ দেব য়জ্ঞ স্বাহা বাতে ধাঃ।।

(য়জুঃ ৮|২১)

অর্থাৎ - হে আমাদের মনের পতি! এই যজ্ঞকে সুহুত বানিয়ে হুত দ্রব্যকে বায়ুতে স্থাপিত করো আর মার্গের নির্দেশক হুত দ্রব্যের নিকট বলো যে সে যেন তার নিজের মার্গে যায়।

এই মন্ত্রটির মধ্যে যজ্ঞের হুত পদার্থকে বায়ুর মধ্যে যেতে দেওয়ার উপদেশ করা হয়েছে। এরপর যজ্ঞে কি কি পদার্থের আহুতি দেওয়া উচিত, তা বলা হয়েছে -

ধানাবন্তম্ করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্।

ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।।

(ঋঃ ৩|৫২|১)

অর্থাৎ - আমাদের ধানওয়ালা, দধি (দুধওয়ালা), মালপোয়ালা আর স্তোত্রওয়ালা সকলকে হে ইন্দ্র! প্রাতঃ কালের সময় সেবন করুন।

পূষণ্বতে তে চকৃমা করম্ভম্ হরিবতে হর্য়শ্বায় ধানাঃ।

অপূপমদ্ধি সগণো মরুদ্ভিঃ সোমম্ পিব বৃত্রহা শূর বিদ্বান্।।

(ঋঃ ৩|৫২|৭)

অর্থাৎ - হে বৃত্রের নাশক বিদ্বান্ শূর! তোমার পোষণকারী কিরণের জন্য আমরা যা দিয়েছি সেই দুধ, দধি, ধান আর মালপোয়া আদিকে গ্রহণ করো তথা মরুতের সঙ্গে সোমকে পান করো।

এরপর হবন করা পদার্থের বিষয়ে বেদ উপদেশ করেছে যে, যেই ধন যজ্ঞের মধ্যে লাগানো হয়, সেটাই সুকৃত হয়ে যায়, কারণ -

ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করো নাসামামিত্রো ব্যথিরা দধর্ষতি।

দেবাঁশ্চ য়াভির্য়জতে দদাতি চ জ্যোগিত্তাভিঃ সচতে গোপতিঃ সহ।।

(ঋঃ ৬|২৮|৩)

অর্থাৎ - যা দেবগণকে দেওয়া হয় আর যার দ্বারা যজ্ঞ করা হয় তার না তো কখনও নাশ হয়, না তাকে কোনো চোর চুরি করতে পারে, না তার কোনো শত্রু হয় আর না তাকে কেউ বিপদে ফেলতে পারে। তার দ্বারা যজমান সর্বদাই গোপতির সঙ্গে থাকে, অর্থাৎ সে ধনবান্ হয়ে থাকে।

সত্যি তো, এরকম সার্বজনিক পুণ্যকর্মের মধ্যে ধন খরচ করাকেই ধনের সদুপয়োগ বলা যেতে পারে। ধনের সদুপয়োগ দ্বারা অধিক ধনের বৃদ্ধি হয়, তাতে সন্দেহ নেই। এইভাবে যজ্ঞের দ্বারা সার্বজনিক রোগ

থেকে রক্ষার বিধি বলার পর এখন প্রাকৃতিক উৎপাতের থেকে রক্ষা প্রাপ্ত করার যে উপায় বেদ বলেছে, তার বর্ণনাতে আসা যাক।

বৈদ্যক আর যজ্ঞের দ্বারা ব্যক্তিগত ব্যাধি আর সমাজগত চেপী (মহামারী) রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, তবে এর দ্বারা প্রাকৃতিক বিপ্লবগুলো থেকে যেমন ভূমিকম্প, জ্বালাপ্রপাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি আর বজ্রপাত আদি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে না। এই উৎপাতের থেকে রক্ষাকারী কেবল পরমাত্মাই। এইজন্য এরকম সময়ে পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করারই উপদেশ বেদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি এরকম প্রার্থনার কিছু উদাহরণ লিখে দিচ্ছি, যা হল এরকম -

মধু বাতাऽঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধবীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমত্পার্থিব রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ২ऽঅস্তু সূর্য়ঃ।
মাধবীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।

(য়জুঃ ১৩|২৭-২৯)

অর্থাৎ - হে পরমাত্মন্! সংসারে বায়ু মধুর হয়ে প্রবাহিত হোক, নদী মধুর হয়ে প্রবাহিত হোক, ঔষধি মধুর হয়ে জন্মাক। রাত্রি মধুর হোক, প্রভাত মধুর হোক, পৃথিবী মধুর হোক আর আমাদের দ্যৌ পিতা মধুর হোক। বনস্পতি মধুর হোক, সূর্য মধুর হোক আর গাভী আদি মধুর হোক।

এরপর আরও প্রার্থনা রয়েছে -

য়তো য়তঃ সমীহসে ততো নো অভয়ম্ কুরু।
শম্ নঃ কুরু প্রজাভ্যোऽভয়ম্ নঃ পশুভ্যঃ।।

(য়জুঃ ৩৬|২২)

অর্থাৎ - যেখানে-যেখানে আমাদের জন্য যেরকম পরিস্থিতি উৎপন্ন হবে সেখানে-সেখানে আমাদের সবদিক দিয়ে অভয় করুন তথা পশুদের থেকেও আমাদের সুখী আর অভয় করুন।

অভয়ম্ নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ম্ দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ম্ পশ্চাদভয়ম্ পুরস্তাদুত্তরাদধরাদভয়ম্ নো অস্তু।।
অভয়ম্ মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ম্ জ্ঞাতাদভয়ম্ পরোক্ষাত্।
অভয়ম্ নক্তমভয়ম্ দিবা নঃ সর্বা আশা মম মিত্রম্ ভবন্তু।।

(অথর্বঃ ১৯|১৫|৫-৬)

অর্থাৎ - মহাকাশ আমাদের অভয় করুক, দ্যাবা তথা পৃথিবী আমাদের অভয় করুক আর নিচে-উপরে তথা আগে-পিছে থেকেও আমাদের অভয় প্রাপ্ত হোক। মিত্র থেকে অভয় হোক, অমিত্র থেকে অভয় হোক।

জ্ঞাত থেকে অভয় হোক আর অজ্ঞাত থেকে অভয় হোক। রাতে অভয় হোক আর দিনে অভয় হোক, অর্থাৎ আমাদের সমস্ত আশা আর দিশা অভয় হোক।

এরপর সংসারের সমস্ত জড় শক্তির কল্যাণকারী আর শান্ত হওয়ার অভিলাষা করা হয়েছে আর পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে -

শন্নো মিত্রঃ শম্ বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য়মা।
শন্নऽইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।।
শন্নো বাতঃ পবতা□শন্নস্তপতু সূর্য়ঃ।
শন্নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যোऽঅভি বর্ষতু।।
অহানি শম্ ভবন্তু নঃ শ□রাত্রীঃ প্রতি ধীয়তাম্।
শন্নऽইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শন্নऽইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শন্নऽইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শম্যোঃ।।
শন্নো দেবীরভিষ্টয়ऽআপো ভবন্তু পীতয়ে।
শম্যোরভি স্রবন্তু নঃ।।
স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
য়চ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ।।
আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা নऽঊর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে।।
দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষ□শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব□শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি।।

(য়জুঃ ৩৬|৯-১৪, ১৭)

অর্থাৎ - মিত্র, বরুণ, অর্য়মা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিষ্ণু আর উরুক্রম আদি দেবতা আমাদের কল্যাণ করুক। বায়ুর মার্গ কল্যাণদায়ক হোক, সূর্যের তাপ কল্যাণদায়ক হোক আর শব্দের সঙ্গে পর্জন্যদেবের বর্ষাও কল্যাণকারী হোক। দিন কল্যাণকারী হোক, রাত্রি কল্যাণকারী হোক আর ইন্দ্র, অগ্নি তথা বরুণ আদি দেবতাও কল্যাণকারী হোক। পানীয় জল কল্যাণকারী হোক আর বর্ষার জলও কল্যাণকারী হোক। পৃথিবী আমাদের জন্য কন্টকরহিত আর উত্তম বসবাসের যোগ্য হোক। জল আমাদের জন্য সুখকারী হোক, তাকে আমরা শক্তির জন্য ধারণ করি আর প্রাকৃতিক যুদ্ধে আমাদের বিজয় হোক। দ্যৌলোক শান্ত হোক, মহাকাশ শান্ত হোক, পৃথিবী শান্ত হোক, জল শান্ত হোক, ঔষধি শান্ত হোক, বনস্পতি শান্ত হোক, সংসারের সমস্ত শক্তিগুলো শান্ত হোক, জ্ঞান শান্ত হোক, সবকিছু শান্ত হোক, শান্তিও শান্ত হোক আর সেই শান্ত শান্তি সারাজীবন ধরে থাকুক।

এইভাবে যে সময় সমস্ত জনসমূহের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রার্থনাপূর্বক প্রেরণা করা হয় সেসময় ঈশ্বরের আশীর্বাদে বড়ো-বড়ো প্রাকৃতিক শক্তির উপরেও প্রভাব পড়ে যায় আর বিঘ্ন শান্ত হয়ে যায়। এই প্রাকৃতিক বিপ্লব জীবদের সামুদায়িক পাপের কারণে অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয়, এইজন্য কেবলমাত্র পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা ছাড়া এর থেকে বাঁচার আর অন্য কোনো উপায় নেই। প্রার্থনার তাৎপর্য হল উপায় আর উদ্যোগ, কিন্তু এখানে প্রার্থনাই হল উপায় আর উদ্যোগ, কারণ সামূহিক প্রার্থনার -- জনসমূহের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তিরও অনেক বড়ো প্রভাব হয়ে থাকে।

এই পর্যন্ত বৈয়ক্তিক ব্যাধি, সামাজিক ব্যাধি আর প্রাকৃতিক উৎপাতের থেকে রক্ষা প্রাপ্ত করার উপায় বলার পর এখন বেদ মানুষের দ্বারা উৎপন্ন করা বিপ্লবের থেকে রক্ষা প্রাপ্ত করার উপায় সম্বন্ধে কি বলেছে তাতে আসবো। মানুষ দ্বারা যেসব উৎপাত হয় তার দুটো বিভাগ রয়েছে। প্রথম উৎপাতটি হল সামাজিক। এটা ঈর্ষা-দ্বেষ, আলস্য, মূর্খতা আর বিলাসিতা দ্বারা উৎপন্ন হয়, আর নানা প্রকারের পাপকে করায়। দ্বিতীয়টি হল বাহ্য শত্রুর দ্বারা উৎপন্ন উৎপাত, যা নানা প্রকারে কষ্ট দিয়ে থাকে। বেদের মধ্যে এই দুটি থেকে বাঁচার জন্য রাজ্যব্যবস্থার উত্তম উপদেশ করে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল সমাজের রক্ষা করা। রক্ষিত সমাজই উন্নত আর আদর্শরূপ হয়ে থাকে। সমাজের রক্ষা হল দুই প্রকারের -- ভিতরের আর বাইরের। ভিতরের রক্ষা সমাজের দুষ্টের সঙ্গে করা হয় আর বাইরের রক্ষা বাইরের শত্রুদের সঙ্গে করা হয়। যে সমাজের রক্ষা এইভাবে হয় সে সমাজ অধিক দিব্য হয়ে থাকে। বেদের মধ্যে এরকম দিব্য সমাজের কামনার বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তামা রাষ্ট্রে
রাজন্যঃ শূরऽইষব্যোऽতিব্যাধী মহাররথো জায়তাম্
দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়ানড্বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্য়োষা জিষ্ণূ
রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো য়ুবাস্য য়জমানস্য বীরো জায়তাম্
নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু ফলবত্যো
নऽওষধয়ঃ পচ্যন্তাম্ য়োগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্॥

(য়জুঃ ২২|২২)

অর্থাৎ - হে জগদীশ দয়ালু ব্রহ্ম প্রভু! আমাদের বিনয় শুনুন, দেশে ধর্ম-কর্ম-ব্রতধারী ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হোক, ক্ষত্রিয় হোক রণধীর মহারথ ধনুর্বেদের অধিকারী, ধেনু দুধওয়ালী হোক সুন্দর আর বৃষভ হোক তুরঙ্গ বলধারী, তুরঙ্গ গতিচপল হোক, অঙ্গনা হোক স্বরূপ গুণকারী। বিজয়ী রথি পুত্র জনপদের রত্ন হোক তেজস্বী আর বলশালী, যখনই জলের কামনা করা হবে জলধর জলের বর্ষণ করুক। মিষ্ট পাকা ফল হোক আর অনেক সুখের বনস্পতি হোক, য়োগক্ষেম দ্বারা সব পূর্ণ হোক।

কিন্তু এসব বিষয় তখনই হওয়া সম্ভব যখন শাসন ভালো রাজতন্ত্রের দ্বারা হবে। ভালো রাজতন্ত্র তখনই হওয়া সম্ভব যখন রাজা প্রজা দ্বারা মনোনীত হবে। প্রজা দ্বারা এরকম রাজা চয়ন করার জন্য বেদ উপদেশ করেছে যে -

আ ত্বা হার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশত্॥
ইহৈবৈধি মাপ চ্যোষ্ঠাঃ পর্বতইবাবিচাচলিঃ।
ইন্দ্রইবেহ ধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমু ধারয়॥

(ঋঃ ১০|১৭৩|১-২)

অর্থাৎ - হে মহাপুরুষ! আমরা আপনাকে নিয়ে এসেছি, এইজন্য ভেতরে আসুন আর চঞ্চল না হয়ে স্থির হন, যার দ্বারা আপনার প্রতি সমস্ত প্রজার আগ্রহ বজায় থাকে আর আপনার দ্বারা রাষ্ট্রের কখনও পতন না হয়। এখানে এসে পর্বতের নেয় স্থির হয়ে বিরাজ করুন আর ইন্দ্রের সমান স্থির হয়ে রাষ্ট্রকে ধারণ করুন, যেন রাষ্ট্রের কখনও পতন না হয়ে যায়।

এই মন্ত্রগুলোতে প্রজা দ্বারা রাজাকে মনোনীত করার আজ্ঞা রয়েছে। এরপর বেদ বলেছে যে কিরকম প্রকারের পুরুষকে রাজা করা উচিত। অথর্ববেদে লেখা রয়েছে -

ভূতো ভূতেষু পয় আ দধাতি স ভূতানামধিপতির্বভূব।
তস্য মৃত্যুশ্চরতি রাজসূয়ম্ স রাজা রাজ্যমনু মন্যতামিদম্॥

(অথর্বঃ ৪|৮|১)

অর্থাৎ - তিনিই সব প্রাণীর অধিপতি হওয়ার যোগ্য, যে সমস্ত সংসারের দুগ্ধাদি অন্নের থেকে ভালো প্রকারে পোষণ করতে পারেন। তার মৃত্যু রাজসূয়কে প্রাপ্ত হয়, এইজন্য তিনিই রাজা হয়ে এই রাজ্যকে অঙ্গীকার করুক।

এই মন্ত্রটিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যে মহাপুরুষ প্রজাপালনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে তৎপর হবে সে-ই রাজা হওয়ার যোগ্য। এরকম রাজাকে পেয়ে প্রজাদের উচিত যে তারা যেন তাকে খুব বলবান্ বানায়। এই বিষয়ে বেদ উপদেশ করেছে যে -

ইমমিন্দ্র বর্ধয় ক্ষত্রিয়ম্ ম ইমম্ বিশামেকবৃষম্ কৃণু ত্বম্।
নিরমিত্রানক্ষ্ণুহ্যস্য সর্বাস্তান্ রন্ধয়াস্মা অহমুত্তরেষু॥

(অথর্বঃ ৪|২২|১)

অর্থাৎ - হে ইন্দ্র! আপনি আমাদের এই ক্ষত্রিয়কে বলবান্ করুন, এই একজনকে সকল প্রজার নেতা করুন, এর শত্রুকে দূর করুন আর তাদের সর্বদা নাশ করুন।

এই মন্ত্রের দ্বারা বেদ প্রজার হয়ে রাজাকে বলবান্ বানানোর আজ্ঞা দিয়েছে। এরপর পরবর্তী মন্ত্রের মধ্যে প্রজাকে আশ্বাসন দেওয়ার জন্য রাজাকে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। রাজা বলবেন -

প্রতি ক্ষত্রে প্রতি তিষ্ঠামি রাষ্ট্রে প্রত্যশ্বেষু প্রতি তিষ্ঠামি গোষু।
প্রত্যঙ্গেষু প্রতি তিষ্ঠাম্যাত্মন্ প্রতি প্রাণেষু প্রতি
তিষ্ঠামি পুষ্টে প্রতি দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রতি তিষ্ঠামি য়জ্ঞে॥

(য়জুঃ ২০|১০)

অর্থাৎ - আমি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, অশ্বের মধ্যে, গাভীর মধ্যে, অঙ্গের মধ্যে, চিত্তের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে, পুষ্টির মধ্যে, দ্যৌ এর মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠাওয়ালা হবো।

এই মন্ত্রটির মধ্যে রাজা বলে দিয়েছেন যে, আমি এরকম কর্ম করবো যা দিয়ে আমার সর্বত্র প্রতিষ্ঠা হবে। এবারে পরের মন্ত্রগুলোতে বলা হয়েছে যে, রাজ্যের উত্তম কর্ম চালনার জন্য রাজপুরুষ আর প্রজাপুরুষদের সভার আয়োজন হওয়া উচিত। অথর্ববেদে লেখা রয়েছে -

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাম্ প্রজাপতের্দুহিতরৌ সম্বিদানে।
য়েনা সম্গচ্ছা উপ মা স শিক্ষচ্চারু বদানি পিতরঃ সম্গতেষু।।

(অথর্বঃ ৭|১২|১)

বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
য়ে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ।।

(অথর্বঃ ৭|১২|২)

য়দ্রাজানো বিভজন্ত ইষ্টাপূর্তস্য ষোডশম্ য়মস্যামী সভাসদঃ।
অবিস্তস্মাত্প্র মুন্চতি দত্তঃশিতিপাত্ স্বধা।।

(অথর্বঃ ৩|২৯|১)

সর্বান্ কামান্ পূরয়ত্যাভবন্ প্রভবন্ ভবন্।
আকূতিপ্রোऽবির্দত্তঃ শিতিপান্নোপ দস্যতি।।

(অথর্বঃ ৩|২৯|২)

অর্থাৎ - রাজার সভা আর সমিতিরূপী দুই কন্যা আমার রক্ষা করুক। এরা উভয়ে নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্কিত হোক, যারদ্বারা আমি যে সভাসদের সঙ্গে মিলিত হবো সেটি আমাকে জ্ঞান দিবে, অতঃ হে সভাসদ্! আপনারা সঙ্গতে আর সভাতে সঠিকভাবে বলুন। হে সভা! আমরা তোমার নাম জানি, অতঃ যেসব তোমার সভাসদ্ রয়েছে সেসব আমার সঙ্গে সত্য বচনের বক্তা হোক। রাষ্ট্রপতির যেসব বড়ো-বড়ো রাজে (প্রান্তিক সরকার) সভাসদ্ রয়েছে, সেসব ইষ্টাপূর্ত্তের ষোলভাগ কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাগ করে দেয়। সেই বিভাজিত ধন তাদের রক্ষক হয়, তাদের হানি থেকে বাঁচায় আর আত্মনির্ভয়ের জন্য বল দিয়ে দেয়। আর সংকল্পকে পূর্ণ করার সঙ্গে সব কামনাগুলোতে বিজয়ী, প্রভাবশালী আর বৃদ্ধিযুক্ত করে পূর্ণ করে দেয়।

এই মন্ত্রগুলোতে রাজসভা আর সভাসদের কর্তব্য বর্ণনা করে এখন পরবর্তী মন্ত্রে বেদ আজ্ঞা দিয়েছে যে, রাষ্ট্রের উচিত যে সেটি সবার আগে নিজের অন্তর্গত ঢুকে থাকা দুষ্ট লোকেদের খুঁজে, জেনে আর তাদের ন্যায় দ্বারা দণ্ড দিয়ে শিক্ষা দিক। ঋগ্বেদ লেখা রয়েছে -

বি জানীহ্যার্য়ান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব য়জমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন।।

(ঋঃ ১|৫১|৮)

বধীর্হি দস্যুম্ ধনিনম্ ঘনেনঁ একশ্চরন্নুপশাকেভিরিন্দ্র।

ধনোরধি বিষুণক্তে ব্যায়ন্নয়জ্বানঃ সনকা প্রেতিমীয়ুঃ।।

(ঋঃ ১|৩৩|৪)

ইমে তুরম্ মরুতো রাময়ন্তীমে সহঃ সহস আ নমন্তি।
ইমে শন্সম্ বনুষ্যতো নি পান্তি গুরু দ্বেষো অররুষে দধন্তি।।

(ঋঃ ৭|৫৬|১৯)

অন্যব্রতমমানুষময়জ্বানমদেবয়ুম্।
অব স্বঃ সখা দুধুবীত পর্বতঃ সুঘ্নায় দস্যুম্ পর্বতঃ।।

(ঋঃ ৮|৭০|১১)

তাবিদ্ দুঃশন্সম্ মর্ত্যম্ দুর্বিদ্বান্সম্ রক্ষস্বিনম্।
আভোগম্ হন্মনা হতমুদধিম্ হন্মনা হতম্।।

(ঋঃ ৭|৯৪|১২)

অর্থাৎ - হে রাজন্! আপনি উত্তম গুণকারী আর্যদের জানুন আর ধর্মের রক্ষার জন্য অব্রতী দস্যুদের (ডাকাতদের) শাসিত করুন আর বধ করুন যারদ্বারা আপনার রাজ্যে ধর্মের কর্মে কোনো বাধা উৎপন্ন না হয়। হে রাজন্! আপনি এক ঝটকায় ধনুষ-বাণের দ্বারা ঠগ আর যজ্ঞ না করা ধনী দুষ্টদের বধ করে দিন। যে গুরুর সঙ্গে দ্বেষ করে আর হাওয়ার নেয় দ্রুত সাহসের সঙ্গে বল দেখায় তথা লোকের সম্মুখ ব্যর্থ প্রশংসা হেঁকে বেড়ায় আর যে নাস্তিক, পশুস্বভাবের আর যজ্ঞ করে না তাদের পাহাড়ে বন্দী করুন। যেসব মন্দ ভাষণকারী, দুষ্ট জ্ঞান ধারণকারী রয়েছে, যে নিজের রমণ (ভোগের) জন্য অন্যের ক্ষয় করে এমন ব্যক্তি রয়েছে আর যে কেবল সব প্রকারে নিজেরই ভোগের চিন্তায় মগ্ন থাকে এমন দুষ্ট-দুর্জন রয়েছে, বিচার করে তাদের অবশ্যই হনন করুন।

এইভাবে এই মন্ত্রগুলোতে আর্য আর দস্যুদের অর্থাৎ ভালো আর মন্দকে জেনে দুষ্টদের বিচারপূর্বক শাসিত করার উপদেশ রয়েছে। একইভাবে দুষ্টস্বভাবকারী অন্য দুরাচারীদেরও দণ্ড দেওয়ার উপদেশ এইভাবে দেওয়া হয়েছে -

য়দি স্ত্রী য়দি বা পুমান্ কৃত্যাম্ চকার পাপ্মনে।
তামু তস্মৈ নয়ামস্যশ্বমিবাশ্বাভিধান্যা।।

(অথর্বঃ ৫|১৪|৬)

অর্থাৎ - সেটা স্ত্রী হোক অথবা পুরুষ হোক যে পাপের কৃত্য করেছে তাকে পশুর নেয় বেঁধে সেভাবেই নিয়ে যাওয়া উচিত যেভাবে অশ্বকে ময়দানে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

য়স্ত ঊরূ বিহরত্যন্তরা দম্পতী শয়ে।
য়োনিম্ য়ো অন্তরারেঢ়ি তমিতো নাশয়ামসি।।
য়স্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাম্ য়স্যে জিঘান্সতি তমিতো নাশয়ামসি।।

য়স্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাম্ য়স্তে জিঘাম্সতি তমিতো নাশয়ামসি।।
(অথর্বঃ ২০|৯৬|১৪-১৬)
য় আমম্ মাম্সমদন্তি পৌরুষেয়ম্ চ য়ে ক্রবিঃ।
গর্ভানখাদন্তি কেশবাস্তানিতো নাশয়ামসি।।
(অথর্বঃ ৮|৬|২৩)

অর্থাৎ - দম্পতির মাঝে শয়ন করে যে তোমার উরুকে প্রসারিত করে আর যে তোমার য়োনিকে ভিতর থেকে সিঞ্চন করে তাকে আমি বধ করি। যে ভাই ব্যভিচারী হয়ে অথবা পতি হয়ে তোমার নিকট আসে আর তোমার সন্তানকে হত্যা করতে চায়, তার আমি নাশ করি। যে কোনো নিদ্রিত নেশা খাইয়ে অন্ধকারে তোমার নিকট আসে আর তোমার সন্তানকে হত্যা করতে চায় তাকে আমি নাশ করি। যারা পশুর মাংসকে, যারা মানুষের মাংসকে আর যারা গর্ভকে (ডিম্বকে) ভক্ষণ করে, তাদের আমি নাশ করি।

এইভাবে শাসনের দ্বারা প্রথমে সমাজকে সংশোধন করে ভালো ব্যক্তিদের দুষ্টদের পীড়ন থেকে বাঁচানো উচিত, কিন্তু স্মরণে রাখা উচিত যে দুষ্টের সুধার কেবলমাত্র কঠোর শাসন দ্বারাই হওয়া সম্ভব নয়। এরজন্য রাজ্যের মধ্যে জ্ঞান, বিদ্যা, সভ্যতা, সদাচার আর আস্তিকতারও প্রচার করা আবশ্যক রয়েছে। এই কাজটি ব্রাহ্মণ দ্বারাই হওয়া সম্ভব, অতঃ রাজার উচিত যে তিনি যেন ব্রাহ্মণ, বিদ্বান্ আর সদাচারী পুরুষদের আদর বাড়িয়ে দেন। এই বিষয়ে বেদ কি কি উপদেশ দিয়েছে তা আমরা পরবর্তী পর্বে জানবো।

ব্রাহ্মণ, বিদ্বান্ আর সদাচারী ব্যক্তিদের প্রতি আদর সৎকার সম্বন্ধিত বিষয়ে বেদ উপদেশ করেছে যে -

ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যো৩ ন বৈশ্যঃ।
তত্ সূর্য়ঃ প্রব্রুবন্নেতি পঞ্চভ্যো মানবেভ্যঃ।।
পুনর্বৈ দেবা অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা অদদুঃ।
রাজানঃ সত্যম্ গৃহ্বানা ব্রহ্মজায়াম্ পুনর্দদুঃ।।
পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াম্ কৃত্বা দেবৈর্নিকিল্বিষম্।
ঊর্জম্ পৃথিব্যা ভক্ত্বোরুগায়মুপাসতে।।
নাস্য জায়া শতবাহী কল্যাণী তল্পমা শয়ে।
য়স্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা।।
ন বিকর্ণঃ পৃথুশিরাস্তস্মিন্ বেশমনি জায়তে।
য়স্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা।।
নাস্য ক্ষত্তা নিষ্কগ্রীবঃ সূনানামেত্যগ্রতঃ।
য়স্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা।।
নাস্য শ্বেতঃ কৃষ্ণকর্ণো ধুরি য়ুক্তো মহীয়তে।

য়স্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা।।
নাস্য ক্ষেত্রে পুষ্করিণী নাণ্ডীকম্ জায়তে বিসম্।
য়স্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা।।
নাস্মৈ পৃশ্নিম্ বি দুহন্তি য়েऽস্যা দোহমুপাসতে।
য়স্মিন্ রাষ্ট্রে নিরুধ্যতে ব্রহ্মজায়াচিত্ত্যা।।
নাস্য ধেনুঃ কল্যাণী নানঙ্বাভ্সহতে ধুরম্।
বিজানির্য়ত্র ব্রাহ্মণো রাত্রি বসতি পাপয়া।।

(অথর্বঃ ৫|১৭|৯-১৮)

অর্থাৎ - ব্রাহ্মণই হল মানব সমাজের অধিপতি, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য নয়। যেভাবে সূর্য পঞ্চ গ্রহকে আজ্ঞা করে চলতে থাকে, সেইভাবে বিদ্যাবল দ্বারা সকলকে ব্রাহ্মণই চালনা করে। এই বিদ্যাকে দেবতাগণ সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের দেন, ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের আর ক্ষত্রিয়রা অন্যদের দেন। এইভাবে বিদ্যাকে সকলের মধ্যে বিভক্ত করেই মনুষ্য বল আর কীর্তিকে প্রাপ্ত করে।যে রাষ্ট্রে বিদ্যার প্রসারে বাধা দেওয়া হয় সেখানে সেটি সহস্র ধারায় বাহিত হয়ে আর কল্যাণকারী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না, যে রাষ্ট্রে বিদ্যার প্রসারে বাধা দেওয়া হয় সেখানে বহুশ্রুত (সূক্ষ্মদর্শী) আর বড়ো বিদ্বান্ কোনো মনুষ্যের জন্মই হয় না। যে রাজ্যে বিদ্যার প্রচার বন্ধ রয়েছে, এরকম রাজার অলংকৃত সেবকও ঐশ্বর্যশালী পুরুষের সম্মুখ যেতে পারে না। যে রাষ্ট্রে বিদ্যার প্রকাশে বাধা দেওয়া হয়, সেখানে শ্যামকর্ণ অশ্বও রথে জুড়ে গর্ব প্রাপ্ত করতে পারে না। যেখানে বিদ্যার প্রচার হয় না সেখানে না খেতের মধ্যে পুষ্করিণী হয় আর না ভূমিতে কিছু জন্মায়। পৃথিবীর উপজ আহারকারী সেই কৃষক যাদের মধ্যে বিদ্যার লেশ মাত্র নেই, ভূমিতে অধিক অন্ন উৎপন্ন করতে পারে না। যেখানে ব্রাহ্মণ রাতে খালি পেটে ঘুমায় সেখানে না গাভীর দুগ্ধ হয় আর না বৃষ গাড়ি টানতে পারে, অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ আর বিদ্যার নিরাদর হয় সেখানে প্রত্যেক প্রকারে সর্বনাশ হয়।

নবৈব তা নবতয়ো য়া ভূমির্ব্যধূনুত।
প্রজাম্ হিম্সিত্বা ব্রাহ্মণীমসম্ভব্যম্ পরাভবন্।।

(অথর্বঃ ৫|১৯|১১)

অর্থাৎ - একশর মধ্যে নিরানব্বই দেশের রাজার পরাভব হয়েছে, যারা জ্ঞানীদের বিরক্ত করেছে। এই বিষয়ে অথর্ববেদ ১২|৫|৭-১১ তে লেখা রয়েছে যে -

ওজশ্চ তেজশ্চ সহশ্চ বলম্ চ বাকেচন্দ্রিয়ম্ চ শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ।।
ব্রহ্ম চ ক্ষত্রম্ চ রাষ্ট্রম্ চ বিশশ্চ ত্বিষিশ্চ য়শশ্চ বর্চশ্চ দ্রবিণম্ চ।।
আয়ুশ্চ রূপম্ চ নাম চ কীর্তিশ্চ প্রাণশ্চাপানশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রম্ চ।।
পয়শ্চ রসশ্চান্নম্ চান্নাদ্যম্ চর্তম্ চ সত্যম্ চেষ্টম্ চ পূর্তম্ চ প্রজা চ পশবশ্চ।।
তানি সর্বাণ্যপ ক্রামন্তি ব্রহ্মগবীমাদদানস্য জিনতো ব্রাহ্মণম্ ক্ষত্রিয়স্য।।

অর্থাৎ - ওজ, তেজ, সহনশক্তি, বল, বাণী, ইন্দ্রিয়, শ্রী, ধর্ম, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাষ্ট্র, প্রজা, কান্তি, গৌরব, বর্চস্,

ধন, আয়ু, রূপ, নাম, কীর্তি, প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র, দুধ, রস, অন্ন, যব, সত্য, ঋত (নীতি), যজ্ঞ, বাপী, কূপ, পুষ্করিণী, বাতিকাদি, প্রজা আর পশু আদি সমস্ত পদার্থ সেই রাজার নষ্ট হয়ে যায়, যে ব্রাহ্মণকে বিরক্ত করে আর বিদ্যাকে কেড়ে নেয়, অর্থাৎ পড়া-পড়ানো বন্ধ করে দেয়।

এইভাবে বিদ্যার অবহেলা আর জ্ঞানীদের তিরস্কারের দুষ্ট পরিণাম বলার পরে ব্রাহ্মণদের উপযোগিতার বর্ণনা সম্বন্ধে বেদ উপদেশ করেছে -

তীক্ষ্ণেষবো ব্রাহ্মণা হেতিমন্তো য়ামস্যন্তি শরব্যাম্৩ ন সা মৃষা।
অনুহায় তপসা মন্যুনা চোত দূরাহব ভিন্দন্ত্যনেম্॥

(অথর্বঃ ৫|১৮|৯)

অর্থাৎ - যার বাণ তীক্ষ্ণ আর যে অস্ত্র ধারণ করে, এরকম ব্রাহ্মণের নিক্ষেপ করা জ্ঞানশাস্ত্র ব্যর্থ যায় না। তারা তেজস্বী বলের সঙ্গে তপ করে শত্রুর অনুসরণ করে আর নিশ্চয়ই দূর থেকে তার ভেদন করে দেয়। এইজন্য বেদ উপদেশ করেছে যে -

য়ত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রম্ চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ।
তম্ লোকম্ পুণ্যম্ প্রজ্ঞেষম্ য়ত্র দেবাঃ সহাগ্নিনা॥

(য়জুঃ ২০|২৫)

অর্থাৎ - যেখানে ব্রহ্মবল আর ক্ষত্রবল সঙ্গে-সঙ্গে সঠিক ভাবে প্রীতিযুক্ত করে ব্যবহারে নেওয়া হয় আর যেখানে অগ্নি দেবতা সঙ্গে থাকে, সেই দেশটিই হল পুণ্যলোক।

এটা বলার তাৎপর্য হল যে, যেখানে কেবল শাসনই রয়েছে সেখানে উত্তম মনুষ্য হয় না, প্রত্যুৎ যেখানে শাসন আর শিক্ষা উভয়ই রয়েছে, সেই সমাজই পুণ্যময় হয়। এইজন্য বেদ বলেছে -

ইদম্ মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রম্ চোভে শ্রিয়মশ্নুতাম্।
ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাম্ তস্যৈ তে স্বাহা॥

(য়জুঃ ৩২|১৬)

অর্থাৎ - আমার এই ব্রহ্মবল আর ক্ষত্রবল উভয়ের শ্রেয় প্রাপ্ত হোক। যেভাবে এটি আমাকে শোভা আর লক্ষ্মী দ্বারা বিভূষিত করে সেইভাবে তোমার মতো ব্রাহ্মণকেও সুশোভিত করুক।

এই পর্যন্ত সমাজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলো থেকে যেসব কষ্ট হয়, সেসব দূর করার উপায়কে বলার পর এখন বেদ উপদেশ করেছে যে, যদি বাইরের শত্রু এই আর্য সমাজকে নষ্ট করতে আর তার উপর শাসন করার জন্য আসে তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো আর তাদের পরাস্ত করো।এই বিষয়ে ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে-

হত্বায় দেবা অসুরান্যদায়ন্দেবা দেবত্বমভিরক্ষমাণাঃ॥

(ঋঃ ১০|১৫৭|৪)

অর্থাৎ - যে তেজস্বী ক্ষত্রিয় দেবত্বের বিরোধী শত্রুদের (অসুরদের) যুদ্ধে বধ করে বিজয়ী হয়, তারাই রক্ষা পেয়ে সুখে বাস করে। কারণ ঋগ্বেদে লেখা রয়েছে -

যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনুত্যজঃ।
যে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাঁশ্চিদেবাপি গচ্ছতাত্।।

(ঋঃ ১০|১৫৪|৩)

অর্থাৎ - যে শূরবীর ক্ষত্রিয়, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে সম্মুখ লড়াই করে শরীর পরিত্যাগ করে দেয়, সে অতিত্তম সুখদায়ী ভুবনকে প্রাপ্ত করে থাকে। এইজন্য বেদের মধ্যে যুদ্ধ বিজয়ের খুবই প্রবল কামনার উপদেশ রয়েছে। যজুর্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

ধন্বনা গা ধন্বনাজিম্ জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপ কামম্ কৃণোমি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম।।

(য়জুঃ ২৯|৩৯)

অর্থাৎ - আমরা যেন ধনুষ দিয়ে পৃথিবী আর সংগ্রামে বিজয়ী হই আর আমরা যেন ধনুষ দিয়ে দ্রুত গমনকারী সেনার নিকটও বিজয়ী হই। এই ধনুষ শত্রুর কামনাকে নষ্ট করে দিক, অতঃ আমরা ধনুষ দিয়ে সব দিশাকে - বিদিশাকে জিতে নিবো।

বিজয়ী যোদ্ধাদের জন্য লেখা রয়েছে যে -

ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্য সহ ক্ষত্রেণ বর্চসা বলেন।
সমাগৃভায় বসু ভূরি পুষ্টমর্বাঙ্ ত্বমেহ্যুপ জীবলোকম্।।

(অথর্বঃ ১৮|২|৬০)

অর্থাৎ - হে বীর! তুমি নিজের ক্ষাত্রধর্ম, তেজ আর বল দ্বারা এই সংগ্রামে মৃত শত্রুর হাত থেকে ধনুষকে আর অন্য পুষ্টকারী অনেক ধরনের বস্তুকে নিয়ে এই পরাজিতদের সম্মুখ হয়ে আদরের সঙ্গে আসো।

এরপরে সেনার বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

য়াঃ সেনা১অভীত্বরীরাব্যাধিনীরুগণা১উত।
যে স্তেনা যে চ তস্করাস্তাঁস্তে১অগ্নে১পিদধাম্যাস্যে।।
দ□ষ্ট্রাভ্যাম্ মলিম্লূন্ জম্ভ্যৈস্তকরাঁ২১উত।
হনুভ্যা□স্তেনান্ ভগবস্তাঁস্ত্বম্ খাদ সুখাদিতান্।।
যে জনেষু মলিম্লব স্তেনাসস্তস্করা বনে।
যে কক্ষেষ্বঘায়বস্তাঁস্তে দধামি জম্ভয়োঃ।।
য়ো১অস্মভ্যমরাতীয়াদ্যশ্চ নো দ্বেষতে জনঃ।
নিন্দাদ্যো১অস্মান্ ধিপ্সাচ্চ সর্বম্ তম্ ভস্মসা কুরু।।

(য়জুঃ ১১|৭৭-৮০)

অর্থাৎ - যে সেনা অলস্য, অসুস্থ, অযোগ্য আর চোর, তাকে আমি জলন্ত জ্বালাতে ছেড়ে দেই। হে অগ্নে! আপনি এই চোর, ব্যভিচারী আর মন্দ কর্মকারী ব্যক্তিদের আপনার পেষক দন্ত, চোয়াল আর দাঁত দিয়ে

খেয়ে ফেলুন। হে অগ্নে! যে মুখোশধারী, ডাকাত, ঠগ আর পাপ কর্ম দ্বারা জীবনযাপন করে, সেই অধার্মিকদের আপনি চিবিয়ে ফেলুন। যারা শত্রুতা করে, দ্বেষ করে, নিন্দা করে আর দম্ভ দেখায় এরকম দুষ্টদের আপনি ভস্ম করে দিন।

বেদ এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে বলে দিয়েছে যে, অযোগ্য সেনাকে নষ্ট করে দেওয়া উচিত আর সমস্ত সমাজের উচিত যে তারা যেন যুদ্ধের জন্য রাজাকে সর্বদা উত্তেজিত করে। উত্তেজনার উপদেশ এইভাবে রয়েছে -

তমু ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমম্।

ধনঞ্জয়□রণে রণে।।

(য়জুঃ ১১|৩৪)

অর্থাৎ - হে দস্যুর নাশক, ধনের বিজেতা আর অন্নের দাতা রাজন্! তোমাকে আমরা প্রদীপ্ত করে রণের সময়ে উত্তেজিত করি।

এই রাষ্ট্রীয় সেনার প্রত্যেক যোদ্ধাকে কিরকম উৎসাহিত হতে হবে, তার উপদেশ বেদের মধ্যে এইভাবে রয়েছে -

অভীতদমেকমেকো অস্মি নিংষাळভী দ্বা কিমু ত্রয়ঃ করন্তি।

খলে ন পর্ষানপ্রতি হন্মি ভূরি কিম্ মা নিন্দন্তি শত্রবোऽনিন্দ্রাঃ।।

(ঋঃ ১০|৪৮|৭)

অর্থাৎ - আমি যদিও একা তবুও এক, দুই, তিন শত্রুও আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি শত্রুদের এমনভাবে পিষে ফেলবো যেভাবে খলিহানে অন্ন পিষা হয়, কারণ যার কোনো মার্গদর্শক সেনাপতিই নেই, সে শত্রু আমার কি নিন্দা করতে পারে।

কৃত্যাঃ সন্তু কৃত্যাকৃতে শপথঃ শপথীয়তে।

সুখো রথইব বর্ততাম্ কৃত্যা কৃত্যাকৃতম্ পুনঃ।।

(অথর্বঃ ৫|১৪|৫)

অর্থাৎ - এই শত্রুনাশক সেনা হিংসাকারী আর দুর্বচন বলা শত্রুর জন্য হোক। এই শত্রুনাশক সেনা হিংসাকারীদের মাঝে এরকমভাবে চক্কর লাগাবে যেভাবে রথের চাকা চক্কর লাগায়।

এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে সেনাগুলো হিংশক, দুষ্ট আর দুর্বৃত্তদের দমনের জন্যই, অতঃ রথের নেয় তারা উক্ত দুর্বৃত্তদের অঙ্গে আর দেশের মধ্যে চক্কর লাগাতে থাকবে। এইভাবে আবশ্যকতা পড়লে পরে যোদ্ধা রাজার উচিত যে তিনি যেন তার যুদ্ধোপকরণকে মাটির গৃহে না রাখেন। এরজন্য তিনি যেন ভালো মজবুত পাকা মহল নির্মাণ করেন। বেদ উপদেশ করেছে যে -

মো ষু বরুণ মৃণ্ময়ম্ গৃহম্ রাজন্নহম্ গমম্।

মळা সুক্ষত্র মৃळয়।।

(ঋঃ ৭|৮৯|১)

অর্থাৎ - হে রাজন্! আপনি মাটির গৃহে নিবাস করবেন না, কারণ মাটির গৃহকে বর্ষা ঋতু মাটি করে দেয় - ফেলে দেয়। মাটির সাধারণ গৃহে তো আপনার প্রজাদেরই নিবাস করা উচিত।

এই মন্ত্রের অতিরিক্ত বেদের মধ্যে রাজার জন্য লৌহ মহল নির্মাণের আজ্ঞা রয়েছে। অথর্ববেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

ব্রজম্ কৃণুধবম্ স হি বো নৃপাণো বর্মা সীব্যধবম্ বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধবমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃম্হতা তম্।।

(অথর্বঃ ১৯|৫৮|৪)

অর্থাৎ - হে রাজন্! আপনি বড়ো-বড়ো ব্রজ (চারণভূমি) নির্মাণ করুন, অনেক শক্ত মোটা-মোটা বর্ম (কবচ) সেলাই করুন আর আপনার পুরকে লোহার বড়ো-বড়ো দুর্গ দিয়ে ঘিরে দিন, যাতে আপনার যজ্ঞের চামচ না পরে যায়। তার দৃঢ়তার জন্য এটাই প্রবন্ধ করুন। এসব বস্তু আপনার রক্ষা করবে।

এই মন্ত্রটিতে রাজ্যের এই প্রস্তুতির কারণ চামচের রক্ষা করা বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য হল এটাই যে, রাজ্যে যেন কোনোরূপ ছিদ্র না হয়ে যায় আর বৈদিক সভ্যতার রক্ষা হতে থাকে। এর অতিরিক্ত রাজাকে আর কি কি প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তার বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

শিরো মে শ্রীর্য়শো মুখম্ ত্বিষিঃ কেশাশ্চ শ্মশ্রূণি।
রাজা মে প্রাণোঽঅমৃত সম্রাট্ চক্ষুর্বিরাট্ শ্রোত্রম্।।
জিহ্বা মেম্ ভদ্রম্ বাঙ্ মহো মনো মন্যুঃ স্বরাড় ভামঃ।
মোদাঃ প্রমোদাঽঅঙ্গুলীরঙ্গানি মিত্রম্ মে সহঃ।।
বাহূ মেম্ বলমিন্দ্রিয় হস্তৌ মে কর্ম বীর্য়ম্।
আত্মা ক্ষত্রমুরো মম।।
পৃষ্টির্মে রাষ্ট্রমুদরম সৌ গ্রীবাশ্চ শ্রোণী।
ঊরূঽঅরত্নী জানুনী বিশো মেঽঙ্গানি সর্বতঃ।।

(য়জুঃ ২০|৫-৮)

অর্থাৎ - শ্রী হল আমার মস্তক, গৌরব হল মুখ, কেশ আর গোঁফ-দাড়ি হল প্রকাশ, রাজা হল প্রাণ, সম্রাট হল চক্ষু, বিরাট্ হল কান আর এসবই হল অমরতা। ভদ্রতা হল জিহ্বা, কীর্তি হল বাণী, ক্রোধ হল মন, স্বতন্ত্রতা হল প্রকাশ, আমোদ-প্রমোদ হল আঙ্গুল আর অঙ্গ তথা সহনশীলতা হল মিত্র। বলই হল বহু, কর্ম হল ইন্দ্রিয়, বীর্যই হল হাত, ক্ষত্রই হল হৃদয় আর আত্মা। রাষ্ট্র হল পিঠ, প্রজা হল উদর, গ্রীবা আর পা, উরু, হাঁটু আর অন্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

এই মন্ত্রগুলোতে রাষ্ট্রের বিশালতার বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ধন বিনা এইসব বিশাল রাজ্যকর্ম হওয়া সম্ভব নয়, এইজন্য বেদ বলেছে যে, রাজা প্রজার কাছ থেকে কিছু-কিছু করে কর নিয়ে এই মহাকর্মটিকে যেন সম্পাদন করে।

দূরে পূর্ণেন বসতি দূর ঊনেন হীয়তে।

মহদ্যক্ষম্ ভুবনস্য মধ্যে তস্মৈ বলিম্ রাষ্ট্র ভৃতো ভরন্তি।।

(অথর্বঃ ১০|৮|১৫)

অর্থাৎ - পূর্ণের দ্বারা দূর পর্যন্ত আর অর্ধেকের দ্বারা নিকট পর্যন্ত ভুবনের মাঝে রাজ্যের প্রবন্ধকারী বসে রয়েছে। তার জন্য সমস্ত রাষ্ট্র বলি অর্থাৎ কর দেয়।

এইভাবে রাষ্ট্রীয় উপদেশ করার পর অন্তিমে বেদ উপদেশ দিয়েছে যে, খণ্ড রাজ্যের মধ্যে সর্বদা বৈমনস্যের জন্য উৎপাতের ভয় লেগেই থাকে। এইজন্য সকলকে সার্বভৌম রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে থাকা উচিত, অর্থাৎ সার্বভৌম চক্রবর্তী রাজ্যের চেষ্টা করা উচিত। য়জুর্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

স্বরাডসি সপত্নহা সত্ররাডস্যভিমাতিহা।

জনরাডসি রক্ষোহা সর্বরাডস্যমিত্রহা।।

(য়জুঃ ৫|২৪)

অর্থাৎ - স্বরাজ্য হল শত্রুর নাশকারী, সত্ররাজ্য হল অভিমানিদের মদকে নাশকারী, জনরাজ্য হল দুষ্টের নাশকারী আর সর্বরাজ্য হল অমিত্রের নাশকারী।

এই মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে যে, সর্বরাজ্য দ্বারা শত্রু থাকে না। এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, শত্রুদের সর্বথা নাশ তো সর্বরাজ্য অর্থাৎ সার্বভৌমরাজ্য দ্বারাই হয় |এরপর বেদ আরও উপদেশ দিয়েছে যে-

অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য।

সম্রাডেকো বিরাজতি।।

(য়জুঃ ১২|১১৭)

অর্থাৎ - হে অগ্নে! তুমি ভূত, ভবিষ্যত আর প্রিয় তথা প্রিয় স্থানেতে বিনা কোনো পরিবর্তনে এক সমান একলা একই রাজরাজেশ্বর বিরাজমান হয়ে আছো।

এই মন্ত্রটির দ্বারা অগ্নির উপমা দিয়ে বেদ বলে দিয়েছে যে, সমানতার স্থিরতা তো তখনই হওয়া সম্ভব যখন অগ্নির সমান সমস্ত পৃথিবীর একটাই সম্রাট হবে। এরপরে বেদের মধ্যে রাজার জন্য আপদ্ধর্মের উপদেশ এইভাবে দেওয়া হয়েছে -

ঋতস্য পন্থামনু তিস্র আগুস্ত্রিয়ো ঘর্মা অনু রেত আগুঃ।

প্রজামেকা জিন্বত্যূর্জমেকা রাষ্ট্রমেকা রক্ষতি দেবযূনাম্।।

(অথর্বঃ ৮|৯|১৩)

অর্থাৎ - ঋতের তিনটি বিধি চলে আসছে আর তিনটি মার্গ হল অনুধর্মা। একটি বিধি প্রজার (সমাজের) , একটি রাষ্ট্রের আর একটি ধর্মের রক্ষা করে।

এখানে ঋত অর্থাৎ আপদ্ধর্মের তিন শাখার বর্ণনা করা হয়েছে। আপদ্ধর্মের আবশ্যকতা ধার্মিক, সামাজিক আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসেই থাকে, এইজন্য আবশ্যকতা পড়লে পরে সত্যের জোড়া ঋত দ্বারাও কাজ করা উচিত। এরপর বেদ উপদেশ করেছে -

ইন্দ্র প্র ণঃ পুরএতেব পশ্য প্র নো নয় প্রতরম্ বস্যো অচ্ছ।
ভবা সুপারো অতিপারয়ো নো ভবা সুনীতিরুত বামনীতিঃ॥

(ঋঃ ৬|৪৭|৭)

অর্থাৎ - হে রাজন্! আমাদের নেতার মতো দেখুন আর শত্রুর বলকে উলঙ্ঘনকারী আমাদের ধর্মবলের সঠিকভাবে পরীক্ষা করুন যেন তারদ্বারা আমাদের সবকিছু সঠিকভাবে পারে লেগে যায় অথবা একদম পার লাগার যোগ্যই হয়ে যায়, এইজন্য আমাদের কাছে সুনীতি আর বামনীতি উভয়ই হওয়া উচিত।

এই মন্ত্রটিতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদি সুপার হয় অর্থাৎ সরল হয় তবে সুনীতি দ্বারা -- ধর্ম দ্বারা চলো, কিন্তু যদি অতিপার হয়, অর্থাৎ দুর্গম হয় তবে বামনীতি দ্বারা (আপদ্ধর্ম দ্বারা) চলো। এইভাবে বেদ এই রাজ্যপ্রকরণের দ্বারা সমাজের ভিতরের আর বাইরের সংকট থেকে রক্ষা করার উপদেশ দিয়েছে। এই উপদেশ থেকে মানুষ নিজের আর তার সমাজের রক্ষা করতে পারবে, কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে যে, মৃত্যু থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সবাইকে এক-না-একদিন মরতেই হবে, এইজন্য মৃত্যুর পরের রহস্যের যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক-ঠিক জ্ঞান হবে না আর যতক্ষণ পর্যন্ত না পরলোকের জটিল গ্রন্থি সমাধান না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভুবনের সমস্ত সুখ আর প্রবন্ধ বেকার হবে। এইজন্য এখন আমরা দেখবো যে, বেদের মধ্যে পরলোকের কি কি শিক্ষা রয়েছে?

বৈদিক উপনিষদ্

সবদিক থেকে উন্নত সমাজের লক্ষণ হল এটাই যে, সেটি সদাচারী হবে, বিদ্বান হবে, উদ্যোগী হবে আর সবদিক থেকে তার নিজের রক্ষা করতে পারবে। এরকম সমাজের জন্য ভুবনের কোনো অভিলাষা শেষ থাকে না। এরকম উন্নত দশাতে পৌঁছে সেই সমাজের উন্নত মস্তিষ্কের মানুষদের মধ্যে পরলোক - বিচারের চর্চা উৎপন্ন হয়। তারা ভাবতে শুরু করে যে মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায়টি কি আর মৃত্যুর পর কি হয় তথা এই সংসারের উৎপত্তির কারণ কি? তাদের হৃদয়ের মধ্যে এই প্রশ্ন খুব দ্রুত ভাবে প্রভাব উৎপন্ন করতে শুরু করে যে, জড় আর চেতনের ভেদ কি আর এদের মূল-কারণ প্রত্যক্ষ করার যুক্তি কি? বিদ্বানগণ এই প্রকারের জিজ্ঞাসাগুলোর ঊহাপোহের নাম দর্শন রেখেছেন আর এই ঊহাপোহের অন্তিম উত্তরগুলোকেই উপনিষদ্ বলে।

এই উপনিষদ্ জ্ঞানের দুটি বিভাগ রয়েছে। সৃষ্টির উৎপত্তি আর ধ্বংসের কারণের অনুসন্ধান করা হল প্রথম বিভাগ আর সেই কারণের প্রত্যক্ষকারী সাধনের ব্যবহার করা হল দ্বিতীয় বিভাগ। এখানে আমি এই উভয় বিভাগ সম্বন্ধিত বেদ মন্ত্রগুলোকে একত্রিত করে দেখাবো যে, বেদ এই বিষয়ের কত বড়ো বিশাল

জ্ঞান দিয়েছে। এই সৃষ্টিকে দেখে যেকোনো বিচারবান্ মানুষের হৃদয়ে যা সবার আগে স্বাভাবিক প্রশ্ন উৎপন্ন হয় তাকে বেদ এইভাবে বলেছে -

কিম্ স্বিদ্বনম্ ক উ স বৃক্ষ আস য়তো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্।।

(ঋঃ ১০|৮১|৪)

অর্থাৎ - সেই বন কোনটি আর সেই বৃক্ষ কোনটি যার কাঠ দিয়ে এই দ্যুলোক আর পৃথিবীলোক নির্মাণ করা হয়েছে? হে বুদ্ধিমান মানব! নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো যে এই ভুবনের ধারণকর্তা আর তার অধিষ্ঠাতা কে? এটার উত্তর দেওয়ার সঙ্গে বেদ উপদেশ করেছে যে -

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্ নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো য়ত্।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদগহনম্ গভীরম্।।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতম্ ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীত্প্রকেতঃ।
আনীদবাতম্ স্বধয়া তদেকম্ তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিম্ চনাস।।
তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেऽপ্রকেতম্ সলিলম্ সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতম্ য়দাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্।।

(ঋঃ ১০|১২৯|১-৩)

অর্থাৎ - এটি সৃষ্টির পূর্বে না তো সত্ অর্থাৎ নির্মিত দশাতে ছিল, না অসত্ অর্থাৎ অভাব অথবা শূন্য দশাতে ছিল, না রজ অর্থাৎ নির্মাণের আরম্ভিক দশাতে ছিল আর না সেই সময় এই উপরের নীল আকাশ ছিল। সেই সময় না ছিল মৃত্যু, না ছিল জন্ম আর না ছিল রাত্রি, না ছিল দিন। সেই সময় তম অর্থাৎ আরম্ভের পূর্বকাল কেবল অন্ধকার ছিল আর এক অসক্রিয় স্বধা (মেটার, মাদ্দা, মায়া, প্রকৃতি) কুহরের নেয় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। এই মন্ত্রগুলোতে এই সৃষ্টির পূর্বরূপের বর্ণনা করার পরে বেদ বলেছে যে, এই সৃষ্টি তিনটি অনাদি স্বয়ম্ভূ পদার্থের মিলন দ্বারা নির্মিত হয়। ঋগ্বেদে লেখা রয়েছে যে -

দ্বা সুপর্ণা সয়ুজা সখায়া সমানম্ বৃক্ষম্ পরি ষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলম্ স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি।।

(ঋঃ ১|১৬৪|২০)

অর্থাৎ - দুটি পক্ষী একত্রিত হয়ে মিত্রভাবে তাদেরই সমান একটি বৃক্ষে বসে রয়েছে। এদের মধ্যে একটি মিত্র সেই বৃক্ষের ফলকে খায় আর সুখ-দুঃখ ভোগ করে আর অন্য মিত্রটি ফল না খেয়ে কেবল দেখতে থাকে। এই মন্ত্রটিতে পরমেশ্বর, জীব আর প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে। এই তিনটি পদার্থই হল সংসারের কারণ। এদের দ্বারাই সংসারের উৎপত্তি-বিনাশ হতে থাকে। এই তিনটির মধ্যে পরমেশ্বরের বিষয়ে বেদ উপদেশ করেছে-

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মনাত্মানমভি সম্ বিবেশ।।

(য়জুঃ ৩২|১১)

অর্থাৎ - পরমেশ্বর সর্বভূতে, ভুবনে আর সর্বদিশা - বিদিশাতে সবদিক থেকে ব্যাপ্ত করে সত্য আর অনাদি স্বয়ম্ভূ আত্মার মধ্যেও সঠিক ভাবে প্রবেশ করে আছে।

এই মন্ত্রটিতে পরমেশ্বরকে সর্বত্র ব্যাপকত্ব বলা হয়েছে। এই ব্যাপক পরমেশ্বরের অতিরিক্ত অন্য ব্যাপ্য চেতন জীবের বর্ণনা এইভাবে রয়েছে -

সত্যেনোর্ধ্বস্তপতি ব্রহ্মণাऽর্বাঙ্ বি পশ্যতি।
প্রাণেন তির্য়ঙ্ প্রাণতি য়স্মিঞ্জ্যেষ্ঠমধি শ্রিতম্।।
য়ো বৈ তে বিদ্যাদরণী য়াভ্যাম্ নির্মথ্যতে বসু।
স বিদ্বাঞ্জ্যেষ্ঠম্ মন্যতে স বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণম্ মহত্।।
(অথর্বঃ ১০|৮|১৯-২০)

সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাত্ পুনর্ণবঃ।
অহোরাত্রে প্র জায়েতে অন্যো অন্যস্য রূপয়োঃ।।
শতম্ সহস্রময়ুতম্ ন্যর্বুদমসম্খ্যেয়ম্ স্বমস্মিন্ নিবিষ্টম্।
তদস্য ঘ্নন্ত্যভিপশ্যত এব তস্মাদ্ দেবো রোচত এষ এতত্।।
বালাদেকমণীয়স্কমুতৈকম্ নেব দৃশ্যতে।
ততঃ পরিষ্বজয়িসী দেবতা সা মম প্রিয়া।।
ইয়ম্ কল্যাণয়জরা মর্ত্যস্যামৃতা গৃহে।
য়স্মৈ কৃতা শয়ে স য়শ্চকার জজার সঃ।।
ত্বম্ স্ত্রী ত্বম্ পুমানসি ত্বম্ কুমার উত বা কুমারী।
ত্বম্ জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বম্ জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।
(অথর্বঃ ১০|৮|২৩-২৭)

অর্থাৎ - এই জীব যার ভিতর জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম রয়েছে, সে সত্য দ্বারা উঁচু হয়ে প্রতাপী হয় আর অসত্য দ্বারা নিচু হয়ে প্রাণের সঙ্গে তির্যক্ যোনির মধ্যে জীবন ধারণ করে। যে এই দুই (জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম আর প্রাণ ধারণকারী জীবকে) যজ্ঞের অরণিয়ের মতো জেনে নেয়, সে জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকেও জেনে নেয়, আর অন্য সনাতন জীবটিকেও জেনে নেয়। এই সনাতন জীবটি দিন-রাতের মতো ভিন্ন-ভিন্ন রূপকে ধারণ করে আর নিত্য নতুন থাকে। এই সনাতন জীব শত, সহস্র, দশ সহস্র, দশ কোটি আর অসংখ্য সংখ্যাতে সেই ব্যাপক পরমাত্মার মধ্যেও ভরে পরে রয়েছে। যখন এটি সেই সর্বজ্ঞ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে তখনই পরম সুখ প্রাপ্ত করে। এই দুই ব্যাপ্য-ব্যাপক ঈশ্বর আর জীবের মধ্যে একটি তো কেশের অনী থেকেও ছোটো আর অন্যটি তো একদমই অদৃশ্য। এই জীবটি হল সেই অদৃশ্য প্রিয় দেবতার মধ্যে ব্যাপ্য। এটি সেই কল্যাণকারিণী অজরা আর অমৃতা প্রকৃতি মাতার গর্ভরূপী গৃহে ঘুমায়। হে জীব! তুমি কখনও স্ত্রী, কখনও পুরুষ, কখনও কুমার তো কখনও কুমারী হও আর কখনও বৃদ্ধ হয়ে হাতে লাঠি নিয়ে চলো, এইজন্য তুমি জন্মধারণকারী সর্বতোমুখ।

বেদ এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে জীবকে সনাতন অসংখ্য, ব্যাপ্য, জন্মধারণকারী আর পরমেশ্বরের প্রাপ্তি দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তকারী বলেছে। এরপর এই সৃষ্টির তৃতীয় কারণ প্রকৃতির বর্ণনা হল এই রকম -

অদিতির্দ্যৌদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।।
(য়জুঃ ২৫|২৩)

অর্থাৎ - অদিতিই হল দ্যৌ, অদিতিই হল মহাকাশ, অদিতিই হল মাতা, অদিতিই হল পিতা, অদিতিই হল পুত্র, অদিতিই হল বিশ্বের দেবতা, অদিতিই হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আর অনার্য আর অদিতিই হল জন্মদাতা তথা সে-ই জন্ম ধারণকারী অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ জগৎ হল অদিতিরই প্রপঞ্চ।

এই মন্ত্রটিতে অদিতি -- মায়ার বিশাল রূপ দেখানো হয়েছে। আসলে সংসারের সমস্ত নামরূপাত্মক পদার্থই হল প্রকৃতি। এটাই সৃষ্টি আর ধ্বংস হয় আর এরদ্বারাই সংসারের প্রাদুর্ভাব আর তিরোভাব হয়। বলার তাৎপর্য হল যে, পরমাত্মা জীবদের কর্মানুসার তাদের এই অদিতি নামক প্রকৃতির শরীররূপী ঘেরার মধ্যে আবদ্ধ করে আর সেই প্রকৃতির এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বড়ো ঘেরাতে ছেড়ে দেয়। এরই নাম হল সৃষ্টির উৎপত্তি , কিন্তু পরমাত্মা এই সৃষ্টিকে কিভাবে উৎপন্ন করে, সেই বিষয়ের বর্ণনা বেদের মধ্যে এইভাবে রয়েছে -

ঋতম্ চ সত্যম্ চাভীদ্ধাত্তপসোऽধ্যজায়ত্।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।।
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বত্সরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।।
(ঋঃ ১০|১৯০|১-২)

ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।।
(য়জুঃ ৩১|৫)

সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ত্।
দিবম্ চ পৃথিবীম্ চান্তারিক্ষমথো স্বঃ।।
(ঋঃ ১০|১৯০|৩)

তস্মাদ্যজ্ঞাত্সর্বহুতঃ সম্ভৃতম্ পৃষদাজ্যম্।
পশূঁস্তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ য়ে।।
(য়জুঃ ৩১|৬)

তম্ য়জ্ঞম্ বর্হিষি প্রৌক্ষনপুরুষম্ জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অয়জন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ য়ে।।
(য়জুঃ ৩১|৯)

ব্রাহ্মণোऽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।

ঊরূ তদস্য উদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যা শূদ্রো অজায়ত।।

(য়জুঃ ৩১|১১)

তস্মাদ্যজ্ঞাত্ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জঞ্জিরে।

ছন্দা সি জঞ্জিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত।।

(য়জুঃ ৩১|৭)

অর্থাৎ - ঋত আর সত্যকে (নীতি আর ধর্ম) বিচারপূর্বক পরমাত্মা তপ (ইক্ষণ) করেছে। সেই ইক্ষণ হতে কম্পন উৎপন্ন হয় আর প্রকৃতিরূপী অন্ধকার হয় তথা তা থেকে আকাশ নির্মিত হয়। সেই আকাশ হতে বায়ু আর মেঘরূপ উপরের সমুদ্র আর সম্বত্সররূপী সূর্য হয় আর সেই সূর্য হতে পৃথিবীর সমুদ্র হয় আর দিন-রাত হয়। এরপর বিরাট্ হয় আর বিরাটের পরে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। পরমাত্মা এই সূর্য, চন্দ্র, মহাকাশ, দিন আর পৃথিবী আদিকে সেইভাবে রচনা করেছে যেভাবে সে এই সৃষ্টির পূর্বে অন্য ভূতসৃষ্টিগুলো রচনা করেছিল। পৃথিবী উৎপন্ন হওয়ার পর তার উপর বনস্পতি উৎপন্ন হয়। বনস্পতির পর পশু-পক্ষী উৎপন্ন হয় আর পশু-পক্ষীর পর দেব, ঋষি, সাধ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র উৎপন্ন হয় তথা সেই শ্রেষ্ঠ মানবদের হৃদয়ে ঋগ্বেদ, য়জুর্বেদ, সামবেদ আর অথর্ববেদের উপদেশ হয়।

উপরিউক্ত মন্ত্রগুলোর মধ্যে সৃষ্টি উৎপত্তির ক্রমের অনেক সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। এই মন্ত্রে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পরমাত্মা তার ইক্ষণ শক্তি দিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রেরণা করে। প্রেরণা হতে গতি উৎপন্ন হয় আর গতি থেকে আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। আকর্ষণ দ্বারা প্রকৃতি - পরমাণু নিজেদের মধ্যে মিশ্রিত হয় তাতে রাতের সমান এক গম্ভীর স্থিতি উৎপন্ন হয়। সেই স্থিতি যখন চক্রাকার গতিতে ঘোরে তখন আরও সঘন উৎপন্ন হয় আর তার চতুর্দিকে আকাশ উৎপন্ন হয়ে যায়। সেই রিক্ত স্থান -- আকাশে বায়ুর সমুদ্র ভরে যায় আর বায়ু সমুদ্র দ্বারাই সূর্য উৎপন্ন হয়, যা থেকে মেঘ, বর্ষা, নক্ষত্র, পৃথিবী আর দিন-রাত উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ এই সমস্ত সৃষ্টি উপরিউক্ত ক্রমের সঙ্গে পরমাত্মার প্রেরণার দ্বারাই উৎপন্ন হয় আর এটির উৎপন্ন হওয়ার প্রধান কারণই হল জীবদের কর্ম আর পরমাত্মার ন্যায়ব্যবস্থা। সেই ন্যায়কারী , দয়াময় আর কারণেরও কারণ পরমপিতা পরমাত্মার বর্ণনা বেদের মধ্যে এইভাবে রয়েছে -

ইন্দ্রম্ মিত্রম্ বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।

একম্ সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিম্ য়মম্ মাতরিশ্বানমাহুঃ।।

(ঋঃ ১|১৬৪|৪৬)

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।

তদেব শুক্রম্ তদ্ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ।।

সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।

নৈনমূর্ধ্বম্ ন তিয়র্য়ঞ্চম্ ন মধ্যে পরি জগ্রভত্।।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি য়স্য নাম মহদ্যশঃ।

হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হি□সীদিত্যেষা য়স্মান্ন জাত ইত্যেষঃ।।
এষো হ দেবঃ প্রদিশোऽনু সর্বাঃ পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সর্বতো মুখঃ।।
য়স্মাজ্জাতম্ ন পুরা কিঞ্চনৈব য় আবভূব ভুবনানি বিশ্বা।
প্রজাপতিঃ প্রজয়া স□ররাণস্ত্রীণি জ্যোতী□সি সচতে স ষোডশী।।
(য়জুঃ ৩২|১-৫)
স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
য়ত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত।।
(য়জুঃ ৩২|১০)
স পর্য়গাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবির□শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্য়াথাতথ্যতোऽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।
(য়জুঃ ৪০|৮)

অর্থাৎ - ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গুরুত্মান্, অগ্নি, যম আর মাতরিশ্বা আদি নামগুলো হল সেই একই পরমাত্মার। তাকেই অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্রমা, শুক্র, ব্রহ্ম, আপ আর প্রজাপতি আদি নামে ডাকা হয়। সকল নিমেষাদি কালবিভাগ সে-ই নির্মাণ করেছে। তাকে উপর-নিচে, তির্যকভাবে আর মাঝখান থেকে ধরা যাওয়া সম্ভব নয়। তার কোনো পরিমাপ নেই, কারণ য়শকারী হল তার নাম, এইজন্য অনেক বেদমন্ত্র তার স্তুতি করে। সেই দেবই সকল দিশা-বিদিশাতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে আর সে সকলের ভিতরে আগে থেকেই বসে রয়েছে। সে সবদিক থেকে প্রাণীদের মাঝে উপস্থিত রয়েছে আর সে-ই সর্বপ্রথম সংসারে প্রসিদ্ধ হয় আর সকলকে জন্ম দেয়। যার পূর্বে কোনো কিছুই উৎপন্ন হয়নি আর যে সব ভুবনে ভালোভাবে স্থির রয়েছে সেই ষোলো কলাকারী পূর্ণ প্রজাপতি সমস্ত প্রজার মধ্যে রমণ করার সঙ্গে তিন প্রকারের জ্যোতির (অগ্নি, বিদ্যুৎ আর সূর্য) নির্মাণ করে। সে হল শরীররহিত, ছিদ্ররহিত, নাড়ীরহিত, পাপরহিত। সে হল দুষ্টদের থেকে দূরে, শক্তিস্বরূপ, শুদ্ধ, কবি, মনীষী, স্বয়ংসিদ্ধ আর শাশ্বত প্রজার জন্য সবদিক থেকে ব্যাপ্ত হয়ে যথাযোগ্য অর্থের উৎপন্ন করে। সে-ই আমাদের বন্ধু, পিতা, মাতা, বিধাতা আর সব ভুবনের জ্ঞাতা, এইজন্য আমি প্রার্থনা করছি যে সে আমাকে তৃতীয় ভুবনে যেখানে দেবতা মোক্ষ প্রাপ্ত করে, সেখানে যেন পৌঁছে দেয়। এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ আর তার কর্মের বর্ণনা করে মোক্ষ সুখের অনুরোধ করা হয়েছে। বেদের মধ্যে এই ধরনের মন্ত্রের অনেক বড়ো সংগ্রহ রয়েছে। এই সবগুলোর মধ্যে তার স্বরূপের বর্ণনা আর নিজের কল্যাণের অনুরোধের বর্ণনা রয়েছে। জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে মোক্ষের অভিলাষা উৎপন্ন হয়ে থাকে তা এই বর্ণনাগুলো থেকে সংসারের কারণের আর কারণেরও কারণ পরমাত্মার মহত্তার জ্ঞান হয়ে যায়। এটি হল বৈদিক উপনিষদের পূর্বার্দ্ধ। এরপর সেই কারণস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে অনন্ত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত করার বিধিকেও বেদের মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে।

যজুর্বেদে লেখা রয়েছে যে -

বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তমাদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাত্।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।
(যজুঃ ৩১|১৮)

অর্থাৎ - সেই আদিত্যস্বরূপ, প্রকাশমান পরমাত্মাকে আমি জানি। তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেই মানুষের মুক্তি প্রাপ্ত হয়, এছাড়া আর অন্য কোনো দ্বিতীয় উপায় নেই।

য়ো বিদ্যাত্ সূত্রম্ বিততম্ য়স্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রম্ সূত্রস্য য়ো বিদ্যাত্ স বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণম্ মহত্।।
(অথর্বঃ ১০|৮|৩৭)

অর্থাৎ - যে সূত্রের মধ্যে এই সমস্ত প্রাণী গাঁথা রয়েছে, যে ব্যক্তি সেই ছড়িয়ে পড়া সূত্রকে জানে আর যে সেই সূত্রেরও সূত্রটিকে জানে, সেই ব্যক্তিই ওই মহান্ ব্রহ্মকে জানতে পারে।

এই মন্ত্রটিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এরপরের মন্ত্রে বেদ উপদেশ করেছে যে, পরমাত্মা সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে-

ইদম্ জনাসো বিদথ মহদ্ ব্রহ্ম বদিষ্যতি।
ন তত্ পৃথিব্যাম্ নো দিবি য়েন প্রাণন্তি বীরুধঃ।।
(অথর্বঃ ১|৩২|১)

অর্থাৎ - হে মানব! যা দিয়ে বনস্পতি আদি প্রাণী প্রাণধারণ করে, সেই পরমাত্মা না কেবল পৃথিবীতে রয়েছে আর না কেবল দ্যুলোকের মধ্যেই রয়েছে, বরং সে সর্বত্র পরিপূর্ণ রয়েছে।

এই মন্ত্রটির মধ্যে তার সর্বত্র উপস্থিতি বলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হল এটা যে তাকে কি সর্বত্র খুঁজে বেড়াবো? এর উত্তর দেওয়ার সঙ্গে বেদ উপদেশ করেছে যে -

পুণ্ডরীকম্ নবদ্বারম্ ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্।
তস্মিন্ য়দ্ য়ক্ষমাত্মন্বত্ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।।
অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোরাত্মানম্ ধীরমজরম্ য়ুবানম্।।
(অথর্বঃ ১০|৮|৪৩-৪৪)

অর্থাৎ - এই নব দ্বারওয়ালা ত্রিগুণাত্মক শরীরের মধ্যে যে আত্মার মতো য়ক্ষ বসে রয়েছে, তাকে ব্রহ্মবেত্তাই জানে। সেটি হল নিষ্কাম, ধীর, অমর, স্বয়ম্ভূ, রসে তৃপ্ত আর পূর্ণ, অতঃ সেই ধীর, অজর, যুব আত্মাকে জানার পর বিদ্বান্ নির্ভয় হয়ে যায়। এরপর বেদ আরও বলেছে যে -

য়ে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।
য়ো বেদ পরমেষ্ঠিনম্ য়শ্চ বেদ প্রজাপতিম্।

জ্যেষ্ঠম্ যে ব্রাহ্মণম্ বিদুস্তে স্কম্ভমনুসম্বিদুঃ।।

(অথর্বঃ ১০|৭|১৭)

অর্থাৎ - যে এই পুরুষের ভিতর ব্রহ্মকে জানে, সে পরমেষ্ঠিকে জানে আর যে পরমেষ্ঠি, প্রজাপতি আর ব্রহ্মকে জানে সে সমস্ত স্কম্ভকে জানে।

এই মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মার ব্যাপ্য আর ব্যাপকতা সম্বন্ধে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, যিনি ব্যাপক ব্রহ্মকে জানতে পারেন তিনি ব্যাপ্য জীবকেও জেনে যান আর একে - অপরের পরিচয় দ্বারা সবকিছুর জ্ঞাত হয়ে যায় আর মোক্ষ হয়ে যায়, কিন্তু প্রশ্ন হল এটা যে এই শরীরের ভিতর পরমাত্মাকে কিভাবে খোঁজা যাবে। এর উত্তর দেওয়ার সঙ্গে বেদ উপদেশ করেছে যে, পরমাত্মাকে এই শরীরে খোঁজার প্রস্তুতির সঙ্গে-সঙ্গে অর্থ আর কামের ফাঁদ থেকে আলাদা থাকা উচিত।

ইশা বাস্যমিদ সর্বম্ য়ত্কিঞ্চ জগত্যাম্ জগত্।

ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছত সমাঃ।

এবম্ ত্বয়ি নান্যথেতো৲স্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।

(য়জুঃ ৪০|১-২)

ব্রহ্মচর্য়েণ তপসা দেবামৃত্যুমপাঘ্নত।

ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্য়েণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরত্।।

(অথর্বঃ ১১|৫|১৯)

অর্থাৎ - পরমেশ্বরকে সর্বত্র পরিপূর্ণ বুঝে নিয়ে তার দেওয়াতেই সন্তোষ থাকা উচিত আর অন্যের ধনের প্রতি কখনও ইচ্ছা করা উচিত নয়। এই রকমের জীবন বানিয়ে শেষ আয়ু পর্যন্ত কর্ম করলে মোক্ষ হয়ে যাবে, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই। যেভাবে ব্রহ্মচর্য দ্বারাই ইন্দ্র দেবতাদের দিয়ে দ্যুলোককে পূর্ণ করে, সেইভাবে ব্রহ্মচর্য আর তপ দ্বারাই বিদ্বান্ মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারে।

এই মন্ত্রগুলোতে মুমুক্ষুর জন্য অর্থ (ধন) আর কাম (রতি) পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। যখন অর্থ আর কামের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়ে যাবে তখন কোনো এক ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞানীর নিকট গিয়ে সৎসঙ্গ করা উচিত। অথর্ববেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

য়ত্র দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।

য়ো বৈ তান্ বিদ্যাত্ প্রত্যক্ষম্ স ব্রহ্মা বেদিতা স্যাত্।।

(অথর্বঃ ১০|৭|২৪)

অর্থাৎ - যেখানে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মের উপাসনা করে, সেখানে গিয়ে যে মুমুক্ষু তাকে জানে -- সাক্ষাৎ করে, সেই সৎসঙ্গীকে ব্রহ্মা, অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ বলে জানা উচিত।

এই মন্ত্রটির মধ্যে ব্রহ্মবিদের সৎসঙ্গ আবশ্যক বলে দেওয়া হয়েছে। যখন সৎসঙ্গতে মুমুক্ষু

ব্রহ্মবিদ্যাতে নির্ভ্রান্ত হয়ে যাবে তখন তার উচিত যে সে যেন একান্ত কোনো স্থানে নিবাস করে। এরকম স্থানের নির্দেশ করার সঙ্গে বেদ উপদেশ করেছে যে -

উপহ্বরে গিরীণাম্ সম্গথে চ নদীনাম্।
ধিয়া বিপ্রো অজায়ত।।

(অথর্বঃ ৮|৬|২৮)

অর্থাৎ - পাহাড়ের গুহা আর নদীর সঙ্গমেই মুমুক্ষুর বুদ্ধির বিকাশ হয়। এরকম শান্ত আর উপদ্রবরহিত স্থানে নিবাস করে য়োগের অনুষ্ঠান করা উচিত। বেদ উপদেশ করেছে যে -

তদ্বা অথর্বণঃ শিরো দেবকোশঃ সমুব্জিতঃ।
তত্ প্রাণো অভি রক্ষতি শিরো অন্নমথো মনঃ।।

(অথর্বঃ১০|২|২৭)

অর্থাৎ - মানুষের যে মস্তিষ্ক, সেটি হল জ্ঞান - বিজ্ঞানের কোশ। সেই মস্তিষ্কের রক্ষা প্রাণ, মন আর অন্ন করে থাকে।

এই মন্ত্রটিতে বিচার করার অঙ্গ মস্তিষ্ককে বলা হয়েছে আর তার সঙ্গে অন্ন, মন আর প্রাণের সম্বন্ধও বলে দেওয়া হয়েছে। এরদ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, অন্ন, প্রাণ আর মন হল বিচারের শৃঙ্খলার ক্রম, কারণ বিচার প্রতিরোধকারীকে মন থামাতে হয়, মন প্রতিরোধকারীকে প্রাণ থামাতে হয় আর প্রাণ প্রতিরোধকারীকে অন্নের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তাৎপর্য হল এটা যে, মুমুক্ষুকে একান্তে যুক্তাহার হয়ে প্রাণের নিগ্রহে লেগে পড়া উচিত আর মন তথা বিচারের প্রবাহকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এই য়োগক্রিয়ার জন্য বেদ উপদেশ করেছে যে -

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী বেদস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ।।

(ঋঃ ৫|৮১|৮)

যুক্তেন মনসা বয়ম্ দেবস্য সবিতুঃ সবে।
স্বর্গ্যায় শক্ত্যা।।

(য়জুঃ ১১|২)

যুজে বাম্ ব্রহ্ম পূর্ব্যম্ নমোভির্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ য়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।।

(য়জুঃ ১১|৫)

অর্থাৎ - বড়ো-বড়ো যজ্ঞ - য়াগকারী আর বিদ্বানদের থেকেও অধিক বিদ্বান্ তার নিজের মন আর বুদ্ধি সেই একই মহান্ দেবাধিদেব পরমাত্মার মধ্যে যুক্ত করেন। পুরো শক্তি দিয়ে আমরা সকলে স্বর্গীয় সুখের জন্য নিজের মনকে সবিতা দেবের মধ্যে জুড়ে দেই। সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন যে, পূর্বজগণ য়োগবল দ্বারাই সূর্যমার্গ দিয়ে যাত্রা করেছে, এইজন্য যিনি য়োগ করবেন -- ব্রহ্মের মধ্যে মন লাগাবেন -- তিনিই সেই উত্তম

গতিকে প্রাপ্ত করবেন।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে যোগের অনেক বড়ো মহত্ব বলে দেওয়া হয়েছে, কারণ যোগের সম্বন্ধ হল মনের সঙ্গে। আর মনকে একাগ্র করে তাকে পরমাত্মার মধ্যে লাগিয়ে দেওয়াই হল যোগ (Yoga), এইজন্য বেদের মধ্যে মনকে কল্যাণকারী বানানোর অনেক বড়ো উপদেশ রয়েছে। যজুর্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

য়জ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবম্ তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমম্ জ্যোতিষাম্ জ্যোতিরেকম্ তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।
য়েন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো য়জ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ।
য়দপূর্বম্ য়ক্ষমন্তঃ প্রজানাম্ তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।
য়ত্প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ য়জ্জ্যোতিরন্তরমৃতম্ প্রজাসু।
য়স্মান্নঽঋতে কিম্ চন কর্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।
য়েনেদম্ ভূতম্ ভুবনম্ ভবিষ্যত্পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্।
য়েন য়জ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।
য়স্মিন্নৃচঃ সাম য়জূ□ষি য়স্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।
য়স্মিঁশ্চিত্ত□সর্বমোতম্ প্রজানাম্ তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।
সুষারথিরশ্বানিব য়ন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিন ইব।
হৃত্প্রতিষ্ঠম্ য়দজিরম্ জবিষ্ঠম্ তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।
(য়জুঃ ৩৪|১-৬)

অর্থাৎ - যা ঘুমন্ত আর জাগ্রত অবস্থায় দূরে-দূরে যায়, সেই দূর-দূর পর্যন্ত গমনকারী জ্যোতিরূপ আমার মন শুভ সংকল্পকারী হোক। যার দ্বারা বুদ্ধিমান্ আর ধীর পুরুষ নানা প্রকারের সুকর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সকলের ভিতর বসে থাকা অপূর্ব ক্ষমতাশালী আমার মন উত্তম বিচারশীল হোক। যেটি প্রজ্ঞান, চেতনা আর ধারণা ক্ষমতাশালী, যা অন্তর্জ্যোতি, যা সকল প্রাণীর মধ্যে অবিনাশী সত্তারূপে বিরাজমান রয়েছে আর যাকে ছাড়া কিঞ্চিৎমাত্রও কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, আমার সেই মন শিবসঙ্কল্পকারী হোক। যে নিজের অমরতা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যত্ আর বর্তমানকে গ্রহণ করে রেখেছে আর যার সহায়তায় চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ আর জিহ্বা আদি সাত কর্মকর্তা এই শরীরের ব্যবহারকে করছে, আমার সেই মন কল্যাণকারী বিচারশীল হোক। যার মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ আর সামবেদ রথচক্রের আরের নেয় জুড়ে রয়েছে আর যার মধ্যে সকল প্রাণীর চিত্ত ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে, আমার সেই মন শুভ বিচারশীল হোক। যেভাবে ভালো সারথী রথের অশ্বকে চালায়, সেভাবে হৃদয়ে বসে থাকা আর নিজের ক্রিয়াবল দ্বারা মানুষকে নিয়মে নিয়ন্ত্রণকারী আমার মন শুভ সংকল্পকারী হোক।

এই মন্ত্রগুলোতে মনের মহত্তা বলার সঙ্গে তাকে উত্তম বিচারশীল বানানোর উপদেশ করা হয়েছে,

যারদ্বারা যোগসিদ্ধিতে যেন দ্রুত সহায়তা পাওয়া যায়। এই যোগ হল মানুষের অন্তিম পুরুষার্থ। মানুষ যোগানুষ্ঠান করে জপ, তপ, তিতিক্ষা আর সমাধি পর্যন্ত নিজের পুরুষার্থ করতে পারে, কিন্তু যদি পরমাত্মা এতকিছুর পরও মুমুক্ষুর হৃদয়ে স্বয়ং প্রকট হয়ে তাকে দর্শন না দেন আর মোক্ষ প্রাপ্ত না হয় তবে সে নিজের পুরুষার্থ দ্বারা তাঁকে প্রকট হওয়ার জন্য আর মোক্ষ দেওয়ার জন্য বিবশ করতে পারবে না। এইজন্য তাঁর শরণাগত হয়ে আর মোক্ষের জন্য প্রার্থনা করতে থাকা উচিত। বেদের মধ্যে পরমাত্মার স্তুতি আর প্রার্থনা করার উপদেশ এইভাবে রয়েছে-

যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্যাম্ত বাচম্ বদন্।
গ্রাবণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দম্ জনয়ন্নিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।
যত্র জ্যোতিরজস্রম্ য়স্মিঁল্লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্মাম্ ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েন্দ্রো পরি স্রব।।
যত্র রাজা বৈবস্বতো য়ত্রাবরোধনম্ দিবঃ।
য়ত্রামূর্য়হ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতম্ কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।
য়ত্রানুকামম্ চরণম্ ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা য়ত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতম্ কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।
য়ত্র কামা নিকামাশ্চ য়ত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ য়ত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতম্ কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।
য়ত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে
কামস্য য়ত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতম্ কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।
(ঋঃ ৯|১১৩|৬-১১)

য়ত্র ব্রহ্মবিদো য়ান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ ব্রহ্মা মা তত্র নয়তু ব্রহ্মা ব্রহ্ম দধাতু মে।
ব্রহ্মণে স্বাহা।।
(অথর্বঃ ১৯|৪৩|৮)

অর্থাৎ - যেখানে বেদবেত্তা ব্রহ্মা অথর্ববাণীকে বলার সঙ্গে যোগ দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে আর পরমাত্মা হতে আনন্দ পায়, সেরূপ হে পরমাত্মন্! এই যোগীকেও অমৃতবিন্দু দিয়ে -- দর্শন দিয়ে পৌঁছে দিন। যেখানে নিরন্তর জ্যোতির প্রকাশ হয়, যেখানের দ্যুলোক দ্বার রয়েছে আর যেখানে অমৃত জলের বৃষ্টি হয়, সেখানে আমাকে অমর করুন। যেখানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায় আর যেখানে জ্যোতিরূপ রয়েছে, এরকম তৃতীয় দ্যুলোকের ওই পারে আমাকে অমর করুন। যেখানে সব কামনা পূর্ণ হয়ে যায়, যেখানে সবথেকে বড়ো সুখ প্রাপ্ত হয় আর যেখানে স্বধা তথা প্রত্যেক ধরনের তৃপ্তি রয়েছে, সেখানে আমাকে অমর করুন। যেখানে পূর্ণ হর্ষ, পূর্ণ প্রসন্নতা, পূর্ণ সুখ আর পূর্ণ আনন্দ রয়েছে আর যেখানে সবধরনের ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হয়ে যায়, হে পরমাত্মন্! দর্শন দিয়ে আমাকে সেখানে পৌঁছে দিন। যেখানে ব্রহ্মবিদ্ বিদ্বান্ তপ আর দীক্ষার প্রতাপ দ্বারা গমন করে, হে ব্রহ্মা! আমার মধ্যে ব্রহ্মকে ধারণ করে সেখানে পৌঁছে দিন।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে যে, আমাকে প্রথমে দর্শন দিন, যাতে আমি জীবনমুক্ত হই আর তারপর মৃত্যুর পরে তৃতীয়লোকের বাইরে যেখানে প্রাকৃতিক জগতের লেশ মাত্রও নেই, আর যেখানে কেবল ব্রহ্মই-ব্রহ্ম রয়েছে সেখানে সর্বদার জন্য পৌঁছে দিন। এই ধরনের নিরন্তর প্রার্থনার দ্বারা সমাধিস্থ নিশ্চল আত্মার মধ্যে পরমাত্মা প্রকট হয়ে যায়। সেই সময় সেই জীবনমুক্ত বলেন যে -

য়ো ভূতানামধিপতির্য়স্মিঁল্লোকাऽঅধি শ্রিতাঃ।

য়ऽইশে মহতো মহাঁস্তেন গৃহ্ণামি ত্বামহম্ ময়ি গৃহ্ণামি ত্বামহম্॥

(য়জুঃ ২০|৩২)

অর্থাৎ - যিনি সকল ভূতের অধিপতি, যার মধ্যে সব ভুবন অবস্থান করছে, যিনি বড়ো থেকেও বড়োদের স্বামী, সেই পরমাত্মাকে আমি গ্রহণ করছি -- নিজের ভিতর আপনাকে গ্রহণ করছি।

এই মন্ত্রটির মধ্যে জীবনের অন্তিম সফলতার বর্ণনা রয়েছে। এইভাবে মানুষ ঈশ্বর দর্শন দ্বারা কৃতার্থ হয়ে, সব প্রকারের শঙ্কা থেকে নিবৃত্ত হয়ে আর সবকিছু জেনে শেষ জীবনে লোকেদের ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করার সঙ্গে প্রন্নতার সঙ্গে মৃত্যু প্রাপ্ত করে আর মুক্ত হয়ে যায়। এটাই হল বৈদিক উপনিষদের উত্তরার্দ্ধ।

বেদের মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এইরকমের শিক্ষা রয়েছে, যার উদাহরণ আমি শিক্ষার পৃথক্-পৃথক আট বিভাগের মধ্যে ভালো করে দেখিয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যত বিস্তৃত শিক্ষা বেদের মধ্যে রয়েছে যদি তত শিক্ষা বিধিপূর্বক যেকোনো মনুষ্যসমাজকে দেওয়া যায় তাহলে সেই সমাজ প্রত্যেক বিভাগে সরলতার সঙ্গে নিজের উন্নতি সুন্দরভাবে করতে পারবে, কিন্তু আজকালকার বিস্তৃত উন্নতি বেদের দৃষ্টিতে সমস্ত মনুষ্যজাতি আর সমস্ত প্রাণীসমূহের জন্য কল্যাণকারী নয়, এইজন্য বৈদিকগণ কেবলমাত্র বেদকেই এক পূর্ণ সাহিত্যের কার্যকর বলে মেনেছে। বেদ স্বয়ং সমস্ত মনুষ্যোপযোগী শিক্ষা দিয়ে দেয়, এইজন্য সেটি কোনো অন্য গ্রন্থ বা অন্য সাহিত্যের অধীন নয়। বেদ একাই নিজের শিক্ষা দ্বারা মানুষকে এই যোগ্য বানিয়ে তোলে যে সে নিজের প্রত্যেক আবশ্যক কর্ম সরলতার সঙ্গে করে ফেলতে পারে আর নিজের জ্ঞানকে বিস্তৃতও করতে পারে। যজ্ঞের বর্ণনা করার সময় দ্বিতীয় খণ্ডে আমি লিখে এসেছি যে আদিমকাল থেকে মধ্যকাল পর্যন্ত বৈদিক আর্যরা এই মৌলিক জ্ঞানের কারণেই অনেক বড়ো উন্নতি করেছিল আর নিজের এক বিশেষ সভ্যতা স্থাপিত করেছিল, যারমধ্যে আদি থেকে অন্তিম পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেদেরই চরিতার্থ ছিল। এরপর আমি সেই আদিম বৈদিক আর্য সভ্যতার আদর্শের বর্ণনা করবো আর দেখাবো যে কিভাবে একা বৈদিক জ্ঞান মানব সমাজকে উন্নতির আদর্শ শিখর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

বৈদিক আর্যদের সভ্যতা

আমি গত পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে বেদমন্ত্রের শিক্ষার যে সারাংশ দেখিয়েছি তা কেবল বেদের শোভা, প্রতিষ্ঠা আর মহত্ব বাড়ানোর জন্যই নয়, বরং এটা বলার জন্য যে বেদের এই রকমের শিক্ষার দ্বারা বৈদিক আর্যরা নিজেদের এক বিশেষ সভ্যতা স্থির করেছে যা আদি সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত জীবিত রয়েছে। আমি যে মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা থেকে মোক্ষ সুখ পর্যন্ত বেদমন্ত্রের শিক্ষার ক্রম দিয়েছি, তার অন্তিম পরলৌকিক মোক্ষপ্রাপ্তির সুদৃঢ় ভূমিকার উপর আর্যরা নিজেদের সভ্যতার ভবন স্থির করেছে। তারা তাদের অন্তিম ধ্যেয় মোক্ষকেই মেনেছে, কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে যে মোক্ষ এই সংসার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়, এইজন্য মুমুক্ষুকে এই সংসারের তত্বের আর তার উচিত প্রয়োগের জ্ঞান প্রাপ্ত করাটা অনিবার্য হবে। সংসারের তত্বজ্ঞান আর তার উচিত প্রয়োগই হল মোক্ষের সাধন, এইজন্য আর্যরা সংসারের প্রয়োগ করার সঙ্গে মোক্ষ প্রাপ্ত করার বিধিকে নিজেদের সভ্যতার মূল করে রেখেছে আর সেই বিধিকে চার ভাগে যথা ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ নাম দ্বারা বিভক্ত করেছে।

ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ

ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ হল আর্যদের সভ্যতার আধারশিলা। এরমধ্যে মানুষের সেই সমস্ত অভিলাষা অন্তর্ভূত হয়ে যায় যার উল্লেখ বেদমন্ত্র সংগ্রহের আদির মধ্যে করা হয়েছে, কারণ মানুষের শরীরের মধ্যে আবশ্যকতার ইচ্ছাকারী চারটি স্থানই রয়েছে আর এই চারটি পদার্থ তার পূর্তি করে দেয়। ভগবান্ মনু তাঁর এক শ্লোকে বলেছেন যে -

অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাম্ ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুদ্ধ্যতি॥
(মনুস্মৃতি ৫|১০৯)

অর্থাৎ - শরীর আর শরীরের অঙ্গ জল দ্বারা শুদ্ধ -- নির্মল হয়ে যায়, মন সত্য সংকল্প, সত্যভাষণ আর সত্যাচরণ দ্বারা শুদ্ধ হয়ে যায়, জীবাত্মা বিদ্যাপ্রাপ্তি আর ধর্মপালন রূপ তপ দ্বারা, তথা বুদ্ধি অধিকাধিক সত্যজ্ঞানের অর্জন দ্বারা শুদ্ধ বা নির্মল হয়ে যায়।

এই শ্লোকটিতে শরীর, মন, বুদ্ধি আর আত্মার গণনা ভিন্ন-ভিন্ন করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই চারটি যেখানে জল আদি ভিন্ন-ভিন্ন চার পদার্থ দ্বারা শুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে এই শরীরাদি চার অঙ্গকে ভিন্ন-ভিন্ন চার পদার্থের আবশ্যকতাও দেখাচ্ছে। এই চার আবশ্যক পদার্থই হল ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ। শরীর পোষণের জন্য অর্থের, মন সন্তুষ্টির জন্য কামের, বুদ্ধির জন্য ধর্মের আর আত্মার শান্তির জন্য মোক্ষের

আবশ্যকতা রয়েছে, কারণ ভোজনাদি (অর্থ) রহিত শরীর অকেজো হয়ে যায়, কাম (স্ত্রী) রহিত মন অকেজো হয়ে যায়, মোক্ষ (অমরতা) রহিত আত্মা অকেজো হয়ে যায় আর ধর্ম (সত্য আর ন্যায়) রহিত বুদ্ধি অকেজো হয়ে যায়। অর্থ আর শরীরের, কাম আর মনের তথা মোক্ষ আর আত্মার সম্বন্ধ তো প্রত্যক্ষই রয়েছে, এরমধ্যে কারও কোনো শঙ্কা হবে না, কিন্তু ধর্ম আর বুদ্ধির সম্বন্ধকে শুনে লোকে বলতে পারে যে এটা ঠিক নয়, কারণ সংসারে ধর্মকে বুদ্ধির সঙ্গ হতে দেখা যায় না, কিন্তু আমি যে বৈদিক ধর্মের কথা বলছি তার দশা এরকমটা নয়। বৈদিক ধর্ম হল বুদ্ধিপূর্বক, এর কারণ হল এটাই যে বৈদিক ধর্ম বেদের দ্বারা স্থির করা হয়েছে আর বেদ হল "**বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্বেদে**" - এর অনুসারে বুদ্ধিপূর্বক, এইজন্য এই ধর্মে সেসব শঙ্কা হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কথা হল যে, বুদ্ধির সম্বন্ধ হল জ্ঞানের সঙ্গে, যেভাবে-যেভাবে জ্ঞানের বৃদ্ধি হতে থাকে সেভাবেই বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকে, এইজন্য বুদ্ধি আর জ্ঞান হচ্ছে একই বস্তুর দুটি বিভাগ। যেভাবে বুদ্ধি আর জ্ঞান একই বস্তুর দুটি বিভাগ ঠিক সেইভাবে ধর্ম আর জ্ঞানও একই বস্তুর দুটি বিভাগ, কারণ দেখা যায় যে যেভাবে - যেভাবে জ্ঞানের বৃদ্ধি হতে থাকে সেভাবে - সেভাবে ধর্মেরও বৃদ্ধি হতে থাকে। ধর্মের মধ্যে যতই জ্ঞানাংশ হবে আর জ্ঞানের মধ্যে যতই ধর্মাংশ হবে বুদ্ধিতে ততই স্থিরতা হবে। এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর পৌঁছেই ইউরোপের প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ হক্সলে বলেছেন যে, *"সত্য বিজ্ঞান আর সত্য ধর্ম হল দুটি যমজ ভাই। এদের মধ্যে যদি একটিকে অপরটির থেকে আলাদা করা হয় তবে উভয়েরই মৃত্যু হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের মধ্যে যতই অধিক ধার্মিকতা হবে, ততই অধিক তার উন্নতি হবে। বিজ্ঞানের অভ্যাস করার সময় মনের ধার্মিক বৃত্তি যতই অধিক হবে বিজ্ঞানবিষয়ক অনুসন্ধান ততই অধিক গভীর হবে আর তার আধার যতই অধিক দৃঢ় হবে ধর্মের বিকাশও ততই অধিক হবে। তত্ত্ববেত্তাগণ আজ পর্যন্ত যেসব বড়ো-বড়ো কাজ করেছেন সেগুলোকে কেবল তাদের বুদ্ধিবৈভবেরই ফল ভাবা উচিত নয়, কারণ তাদের ধার্মিক বৃত্তিই হল এসবের মধ্যে অধিক কারণীভূত"* ® ।এইজন্য ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানের আর জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যেভাবে ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ রয়েছে, সেইভাবে অর্থের সঙ্গে শরীরের, কামের সঙ্গে মনের আর মোক্ষের সঙ্গে আত্মারও সম্বন্ধ রয়েছে। এই ধর্ম, অর্থ, কামাদির মধ্যেই মানুষের জীবন, রতি, মান, জ্ঞান, ন্যায় আর পরলোক আদির সমস্ত কামনাগুলোর সমাবেশ হয়ে যায়, অর্থাৎ জীবনের অভিলাষা অর্থতে, স্ত্রী-পুত্রাদি কামতে, মান -- জ্ঞান আর ন্যায় ধর্মতে আর পরলোকের কামনা মোক্ষতে সমাবেশ হয়ে যায়, অর্থাৎ সমস্ত এষণাগুলোর সমাবেশ ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষের মধ্যে হয়ে যায় আর এই চার পদার্থ একে-অপরের আধার-আধেয় হয়ে যায়। যেভাবে অর্থ অর্থাৎ ভোজন বস্ত্রাদি ছাড়া শরীরের স্থিতি থাকবে না আর না কাম অর্থাৎ রতি ছাড়া শরীর উৎপন্ন হতে পারবে আর না শরীর আর শরীর-নির্বাহ ছাড়া মোক্ষসাধন হতে পারবে, সেইভাবে বিনা মোক্ষসাধন -- বিনা মোক্ষমার্গ - নির্ধারণ করে অর্থ আর কামের সহায়তাও পাওয়া যাবে না, কারণ অর্থ আর কামের সমস্ত পদার্থ প্রায়শঃ মানুষ, পশু আর উদ্ভিদ থেকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

®হর্বর্ট স্পেন্সর রচিত "এজুকেশন" নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত

এসবই হল জীব আর তারা নিজেদের কর্মফল ভোগ করছে। এদেরও উদ্ধার তখনই হওয়া সম্ভব যখন এরা কর্মফল ভোগ করে মানুষের শরীরে আসবে আর এখানে মোক্ষের মার্গ খুলতে পারবে, এইজন্য মোক্ষের সত্য কামনা দ্বারাই অর্থ আর কামের অর্থাৎ মানুষ, পশু আর উদ্ভিদের সহায়তা পাওয়া সম্ভব। মোক্ষের সত্য কামনাকে ছাড়া অর্থ আর কামের উচিত প্রয়োগ হওয়া সম্ভবই নয় আর বিনা উচিত প্রয়োগে অর্থী স্বার্থী হয়ে যাবে আর কামনাকারী কামী হয়ে যাবে তথা স্বার্থী আর কামী মিলে সমাজকে নষ্ট করে দিবে। এইজন্য বলা হয়েছে যে, মোক্ষ দ্বারা অর্থ আর কামের সহায়তা মিলে, কিন্তু প্রশ্ন হল এটা যে, অর্থ-কাম দ্বারা মোক্ষকে আর মোক্ষ দ্বারা অর্থ-কামকে পরস্পর উচিত সহায়তা দেওয়ার মতো নিয়ম কোনটি? এর উত্তর স্পষ্ট যে অর্থ, কাম আর মোক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য উৎপন্নকারী হল ধর্ম। ধর্মপূর্বক মোক্ষসাধনের দ্বারা অর্থ আর কামের উচিত ব্যবস্থা হয়ে যাবে আর ধর্মপূর্বক অর্থ - কামকে গ্রহণ করলে মোক্ষ সুলভ হয়ে যাবে। এইভাবে এই চার পদার্থ একে-অপরের সহায়ক হয়ে যাবে। যদিও এই চার পদার্থ পরস্পর একে-অপরের সহায়ক আর নিজের-নিজের কাজের মধ্যে এই চারটি বড়ো মহত্বের, কিন্তু চারটির মধ্যে মোক্ষই হল সবার থেকে উপরে। মোক্ষের মহত্তার কারণ হল মৃত্যুর দুঃখ থেকে বেঁচে যাওয়া। মানুষের সমস্ত অভিলাষাগুলোর মধ্যে দীর্ঘাতিদীর্ঘ জীবনের অভিলাষাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ জীবনের তুলনায় অর্থ, কাম, মান, ন্যায় আর জ্ঞানের পরোয়া করে না। একথার প্রমাণ মৃত্যুর সময়েই পাওয়া যায়, এইজন্য যেই সাধন দ্বারা মৃত্যুর ভয় সর্বদার জন্য দূর হয়ে যাবে -- যাকে প্রাপ্ত করলে পরে মৃত্যুর কারণরূপ এই জন্মেরই অভাব হয়ে যাবে -- কে সেই মোক্ষের সমতা করতে পারে? এটাই হল কারণ যে আর্যরা নিজের সভ্যতাকে মোক্ষপ্রাপ্তির উচ্চ আদর্শে স্থির করেছে আর কেবল ধর্মপূর্বক প্রাপ্ত অর্থ আর কামকেই তার সহায়ক মেনেছে, ধর্ম বিরুদ্ধকে নয়। ধর্মপূর্বক অর্থ আর কামকে গ্রহণ করে মোক্ষ প্রাপ্ত করার জন্যই আর্যদের নিজেদের জীবন ধার্মিক বানানোর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এইজন্য তারা ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে শুরু করে সন্ন্যাস পর্যন্ত সন্ধ্যোপাসন, প্রাণায়াম আর য়োগাভ্যাস দ্বারা নিজেদের জীবনকে মোক্ষাভিমুখী বানিয়ে তোলে।

মোক্ষের প্রাধান্য

মোক্ষপ্রাপ্তির মার্গে চলা ব্যক্তির দুটি বিষয়ের আবশ্যকতা হয় -- প্রথমটি হল সৃষ্টি উৎপত্তির কারণকে জানা আর কারণের কারণ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করা, দ্বিতীয়টি হল সৃষ্টির প্রয়োগ করার বিধিকে বুঝে নেওয়া। সৃষ্টির কারণ আর ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়ের জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি, প্রলয়, জীব, ঈশ্বর, কর্ম, কর্মফল আর ঈশ্বর ও জীবের সংযোগ তথা তাদের প্রাপ্তি আদির রহস্য খুলে যায় আর সৃষ্টির প্রয়োগ করার বিধির জ্ঞান দ্বারা অর্থ আর কামের উপভোগের তাৎপর্য বুঝতে সুবিধা হয় তথা উভয়ের মৌলিক জ্ঞান আর উচিত ব্যবহার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অর্থ আর কামের চক্র থেকে মুক্তির নাম হল মোক্ষ, কিন্তু বিনা এই দুইয়ের চক্রে পড়ে মোক্ষও হয় না।

এরকম অবস্থায় ধর্মের সাহায্য নিয়েই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য উৎপন্ন করা যেতে পারে, কারণ সকলের অর্থের আবশ্যকতা রয়েছে। ভোজন, বস্ত্র, গৃহ আর গৃহস্থীকে ছাড়া কারও নির্বাহই হবে না। এইসব পদার্থ সংসার (সৃষ্টি) থেকেই নিতে হয়। ঠিক একইভাবে সকলের কামেরও আবশ্যকতা রয়েছে। সকল মানুষেরই ইচ্ছা স্ত্রী, পুত্র, শোভা, শৃঙ্গার আর সাজ-সজ্জার। এসব পদার্থও সৃষ্টি থেকেই নেওয়া হয়, অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি বা সমাজকে যা কিছুর আবশ্যকতা হয় সেসব সংসার থেকেই (সৃষ্টি থেকেই) নেওয়া হয়, এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না সংসারের কারণের জ্ঞান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাজের যথার্থ প্রয়োগ হওয়া সম্ভবই হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা জ্ঞাতই হবে না যে আমাদের এই সৃষ্টি থেকে -- এই সংসার থেকে কি-কি, কত-কত, কখন-কখন আর কোন-কোন প্রকারের গ্রহণ করা উচিত, এইজন্য আর্যরা সর্বপ্রথম সংসারের কারণের খোঁজ করেছে। এখানে আমি অর্থ আর কামের দেওয়া সৃষ্টির কারণের বর্ণনা করবো আর দেখাবো যে সেই কারণ থেকে উৎপন্ন কার্যই অর্থ আর কামরূপে সংসারে বিদ্যমান রয়েছে, অতঃ এর উচিত প্রয়োগ করেই মোক্ষ প্রাপ্ত করা উচিত।

কারণ দ্বারাই কার্য হয় আর কারণই কার্যের মধ্যে অবতরিত হয়ে অনেক প্রকারের নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে যায়, এইজন্য যখন কার্য হতে কারণের অনুসন্ধান করা হয় তখন কার্যের নিয়মেরই নিরীক্ষণ করা হয়। আমাদেরকে সৃষ্টির কারণকে জানতে হবে, অতএব আমাদের উচিত যে আমরাও যেন এই কার্যরূপ সৃষ্টির কারণের অনুসন্ধান করি।

নিয়ম দ্বারা কারণকে খোঁজা

এই কার্যরূপ সৃষ্টিতে তিনটি নিয়ম খুবই স্পষ্টরূপে দেখা যায়। প্রথমটি হল এই সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থ নিয়মপূর্বক পরিবর্তনশীল, দ্বিতীয়টি হল প্রত্যেক জাতির প্রাণী নিজের জাতির ভিতরেই উত্তম, মধ্যম আর নিকৃষ্ট স্বভাবের জন্মে থাকে আর তৃতীয়টি হল এই বিশাল সৃষ্টিতে যা কিছু কার্য হচ্ছে, সেইসব হল নিয়মিত, বুদ্ধিপূর্বক আর আবশ্যক।

এই তিনটি প্রত্যক্ষ নিয়মের মধ্যে প্রথম নিয়মটি হল নিয়মিত পরিবর্তনশীলতার। বড়ো-বড়ো সূর্যাদি গ্রহ-উপগ্রহ থেকে শুরু করে মানুষ, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ আর তৃণ-পল্লব পর্যন্ত সবার মধ্যেই নিত্য পরিবর্তন হতে দেখা যায়। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে যে পদার্থের যেরকম স্থিতি ছিল, সেটা আজ আর নেই এবং যা আজ আছে তা শতবর্ষ পশ্চাৎ থাকবে না। জন্ম, বালক, যুবক বিকাশের ক্রম চলতে থাকে আর **"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ"** (গীতা ২|২৭) এর অনুসারে উৎপন্ন হয়ে নষ্ট হওয়ার নিয়মিত নিয়ম পরিবর্তনরূপে চলছে, কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে যে, এই পরিবর্তনের নিয়ম এই সৃষ্টির স্বাভাবিক গুণ নয়, কারণ স্বভাবে পরিবর্তন হয় না। যারা বলে যে এই সৃষ্টির পরিবর্তনই হল স্বভাব, তারা ভুল করছে। তারা ভুলে

গেছে যে পরিবর্তনের নাম হল অস্থিরতা আর স্বভাবে অস্থিরতা হয় না। ফেরবদল, উল্টো-পালটা আদি অস্থির গুণ তো হল নৈমিত্তিক, স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক গুণ তো হল সেটাই যার নিজের দ্রব্যের সঙ্গে সমবায়সম্বন্ধ রয়েছে -- নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে, এইজন্য এই সৃষ্টির পরিবর্তনই হল স্বভাব এমনটা মানা উচিত নয়। পরিবর্তনই স্বভাব মানলে পরে প্রকৃতিতে অনন্ত পরিবর্তন, অর্থাৎ অনন্ত গতি মানতে হবে আর এক সমান অনন্ত গতি মানলে পরে সংসারের মধ্যে কোনো প্রকারের হ্রাস-বৃদ্ধিকে মানার অবকাশ থাকবে না, কিন্তু সৃষ্টিতে পদার্থের উৎপত্তি আর ধ্বংসের ক্রম নিত্য দেখা যায়, এইজন্য সৃষ্টির পরিবর্তন নৈমিত্তিকই প্রতীত হয়, স্বাভাবিক নয়।

উৎপত্তি আর ধ্বংস তথা জন্ম আর মৃত্যুর নিত্য দর্শন হতে জ্ঞাত হচ্ছে যে এই সৃষ্টি অনেক ছোটো-বড়ো টুকরো দিয়ে নির্মিত হয়েছে। সংসারের আপনি যেকোনো পদার্থই নিন না কেন তা ঝুঁকে যাবে, বেঁকে যাবে আর ভেঙে যাবে। এমনকি বিদ্যুৎ আর ইথনও ভেঙে যায়, অতএব সিদ্ধ হচ্ছে যে সমস্ত সংসার ছোটো-ছোটো পরমাণুর দ্বারাই নির্মিত হয়েছে, কারণ যদি পরমাণু-সংঘাত দ্বারা সংসার নির্মিত না হতো আর কেবল এক কঠিন বস্তু দ্বারা নির্মিত হতো তাহলে না তো এরমধ্যে পরিবর্তন হতো আর না কখনও কোনো বস্তুর উৎপত্তি-ধ্বংস হতো, কিন্তু আমরা পদার্থকে নিত্য উৎপন্ন হতে -- ধ্বংস হতে আর পরিবর্তন হতে দেখি, এইজন্য সৃষ্টির এই পরিবর্তনরূপী প্রধান নিয়মের দ্বারা বলা যেতে পারে যে সৃষ্টির মূলকারণগুলোর মধ্যে এটি হল প্রধানকারণ যা খণ্ড-খণ্ড, পরিবর্তনশীল আর পরমাণুরূপে বিদ্যমান, কিন্তু প্রশ্ন হল এটা যে এই পরমাণু কি চেতন আর জ্ঞানবান্? এর উত্তর খুবই সহজ। যদি এই পরিবর্তনশীল পরমাণু জ্ঞানবানও হতো তবে সেটি নিয়মপূর্বক কাজ করতো না, কারণ চেতন আর জ্ঞানবানকে অন্যের বানানো নিয়মে বাঁধাই যায় না। সেটি সর্বদা নিজের জ্ঞান - স্বতন্ত্রতা দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে বাঁধা পৌঁছায়, কিন্তু আমরা দেখি যে সৃষ্টির পরমাণু খুবই সঠিকভাবে তার কাজ করে চলেছে। শরীরে অথবা সৃষ্টির অন্য বড়ো জড় পদার্থের মধ্যে যে স্থানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে চোখ বুজে নিজের কাজ করে চলেছে আর একটুকুও এদিক - সেদিক হচ্ছে না। এতে জ্ঞাত হচ্ছে যে এই সৃষ্টির পরিবর্তনশীল কারণ যা পরমাণুরূপে বিদ্যমান রয়েছে, তা জ্ঞানবান্ নয় কিন্তু জড়। এই জড়, পরিবর্তনশীল আর পরমাণুরূপ উপাদান কারণকে মায়া, প্রকৃতি, পরমাণু, মাদ্যা আর মেটর নামে ডাকা হয় আর সংসারের কারণগুলোর মধ্যে এটিকে একটি ধরা হয়।

সৃষ্টির দ্বিতীয় নিয়মটি হল প্রাণীদের উত্তম আর নিকৃষ্ট স্বভাব। অনেক মানুষ রয়েছে যারা স্বভাবেই বড়ো প্রতিভাবান্, সৌম্য আর দয়াবান্ আবার অনেক মূর্খ, উদ্দণ্ড তথা নির্দয়ও হয়ে থাকে। এইভাবে অনেক গৌ, অশ্ব আদি পশু স্বভাবেই সরল - সাধারণ হয়ে থাকে আবার অনেক ক্রোধি আর দৌড়ে হত্যা করে এরকমও রয়েছে। এরকমই অনেক বৃক্ষ রয়েছে যা মিষ্টি ফল দিয়ে মানুষকে তৃপ্ত করে আবার এমনও অনেক বৃক্ষ রয়েছে যার নিকটে যাওয়া প্রাণীদেরকে ধরে চুষে নেয় আর খেয়ে ফেলে। এইভাবে সমস্ত প্রাণীসমূহের স্বভাবের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এই স্বভাববিরোধ শারীরিক অর্থাৎ ভৌতিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক যা চৈতন্য, বুদ্ধি আর জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। এই ধরনের বুদ্ধি-সম্বন্ধিত প্রমাণ বৃক্ষের মধ্যে দেখা যায়। ২৪ ফেব্রুয়ারী সন ১৯৩০ এর লিডার পত্রের মধ্যে ছাপা হয়েছিল যে *"বাগানের মধ্যে পড়ে থাকা নলের ছিদ্রকে*

বৃক্ষ জেনে যায় আর সেই ছিদ্রগুলোতে নিজের শিকড় ঢুকিয়ে দেয়। এই ধরনের একটা বেল (লতাবৃক্ষ) এমনও আছে যা যেকোনো বৃক্ষের আগাতে গিয়ে ভূমিতে আবার ফিরে আসে আর তারপর অন্য বৃক্ষে চড়ার জন্য ছোটে, সেই বৃক্ষ ৫০ গজ দূরেই হোক না কেন", কিন্তু এটা মোটেও ভাবা উচিত নয় যে এই জ্ঞান প্রাণীর সম্পূর্ণ শরীরে ব্যাপ্ত, এটা সম্পূর্ণ শরীরে ব্যাপ্ত নয়, কারণ যদি সম্পূর্ণ শরীরে ব্যাপ্ত হতো তাহলে হাত, পা, নাক আর কান কেটে গেলে পরে সেটাও বিভক্ত হয়ে যেত আর কেটে যাওয়া জ্ঞানাংশ কম হয়ে যেত, কিন্তু আমরা দেখি যে দুই পা মূল থেকে কেটে গেলে পরেও কোনো গণিতজ্ঞের গণিত সম্বন্ধিত জ্ঞানে অথবা ইতিহাসজ্ঞের ইতিহাস সম্বন্ধিত স্মরণশক্তিতে কোনো কিছুই পার্থক্য পড়ে না আর না তার এটা অনুভব হয় যে আমার জ্ঞান পূর্বের তুলনায় কম হয়েছে। এইজন্য এটা নিশ্চিত আর নির্বিবাদ যে জ্ঞানকারী শক্তি সারা শরীরে ব্যাপ্ত নয়, বরং তা একদেশী, পরিচ্ছিন্ন আর অণুরূপ, কারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৃমির মধ্যেও তা বিদ্যমান রয়েছে|যদি সারা শরীরে ব্যাপ্ত হতো তবে শরীর বাড়ার সঙ্গে তাকেও বাড়তে হতো আর শরীর কাটার সঙ্গে তাকেও সঙ্কুচিত হতে হতো, অর্থাৎ তার দশা ঠিক রবার বা স্প্রিংয়ের মতো হতো আর বিনা অনেক পরমাণু - সংঘাতে এই ধরণের হ্রাস বিকাশ হতো না, কিন্তু যেমনটা আমি পূর্বেই লিখে এসেছি যে জ্ঞানবান্ তত্ব সংযুক্ত পরমাণুর দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে না আর না অনেক অজ্ঞানী পরমাণু এক স্থানে একত্রিত হয়ে একে অপরের জ্ঞানসংবাদ জারি রাখতে পারে, এইজন্য এই শক্তি রবারের মতো বৃদ্ধি-হ্রাসকারী আর অনেক পরমাণুর সংযোগ দ্বারা নির্মিত বস্তু নয়, বরং এটি হল স্বয়ং সিদ্ধ, অসংযুক্ত, অণু আর জ্ঞানবান্ বস্তু। এর অতিরিক্ত সেই শক্তিটি অসংখ্যা বলে মনে হয়, কারণ একটি মানুষের অনুভব সমস্ত মানুষের আর প্রাণীদের মধ্যে আপনা - আপনি ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় না। কলকাতার কোনো ব্যক্তি যেসময় হাওড়ার ব্রিজ থেকে যে নৌকোটিকে দেখছে, সেই সময় সমস্ত সংসারের মানুষ সেই নৌকোটিকে দেখছে না। এর থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে প্রত্যেক শরীরের মধ্যে একটি করে অণু, পরিচ্ছিন্ন আর জ্ঞানবান্ স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান রয়েছে যা তার স্বভাবের অনুসারে উত্তম অথবা নিকৃষ্ট আচরণ দ্বারা সূচিত হয়। এটিকেই লোকেরা জীব, আত্মা, রূহ আর সোল এর নামে ডাকে আর এটাই হল সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ যা সৃষ্টির এই ব্যাপক নিয়ম দ্বারাই জ্ঞাত হচ্ছে।

সৃষ্টির তৃতীয় নিয়মটি এই হল যে এই বিস্তৃত সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু কার্য হচ্ছে তা নিয়মিত, বুদ্ধিপূর্বক আর আবশ্যক। সূর্য, চন্দ্র আর সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ নিজের - নিজের সঠিক দূরত্বের সীমানাতে ঘুরে চলেছে। উষ্ণ, শীত আর বর্ষা নিশ্চিত সময়ে হয়। মানুষ আর পশু - পক্ষী আদির শরীরের গঠন, বৃক্ষের মধ্যে ফুল ও ফলের উৎপত্তি, বীজ হতে বৃক্ষ আর বৃক্ষ হতে বীজের নিয়ম আর প্রত্যেক জাতির আয়ু আর ভোগের ব্যবস্থা আদির মতো যত এই সৃষ্টির স্থূল-সূক্ষ্ম ব্যবহার রয়েছে, সবগুলোর মধ্যে ব্যবস্থা, প্রবন্ধ আর নিয়ম পাওয়া যায়। নিয়ামকের নিয়মের সবথেকে বড়ো চমৎকার তো প্রত্যেক প্রাণীর শরীরের বৃদ্ধি আর হ্রাসের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, কেন একটি বালক নিশ্চিত সময় পর্যন্ত বাড়ে আর কেন একটি যুবক ধীরে-ধীরে হ্রাসের দিকে -- বৃদ্ধাবস্থার দিকে যায়, এটাকে কেউই বলতে পারে না। যদি কেউ বলে যে বৃদ্ধি আর হ্রাসের কারণ আহার আদি পোষক পদার্থ তাহলে সেটা ঠিক নয়, কারণ আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই যে একই গৃহে,

একই পরিস্থিতিতে আর একই আহার-বিহারের সঙ্গে থাকার পরেও ছোটো-ছোটো বাচ্চা বাড়তে থাকে আর যুবক বৃদ্ধ হতে থাকে তথা বৃদ্ধ অধিক জর্জরিত হতে থাকে। এই প্রবল আর চমৎকারিক নিয়মের দ্বারা বোঝা যায় যে এই সৃষ্টির ভিতর এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপক, পরিপূর্ণ আর জ্ঞানরূপা চেতনশক্তি বিদ্যমান রয়েছে, যা অনন্ত আকাশে ছড়িয়ে অসংখ্য লোকলোকান্তরের ভিতর আর বাহিরে প্রবন্ধ করে রয়েছে, কারণ নিয়ামক ছাড়া নিয়ম, জ্ঞান ছাড়া নিয়ামক আর জ্ঞানী ছাড়া জ্ঞান দাঁড়াবে না, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে নিয়মপূর্বক ব্যবস্থা দেখছি, এইজন্য সৃষ্টির এই তৃতীয় কারণটিও সৃষ্টির নিয়মগুলো থেকেই সিদ্ধ হচ্ছে। এটিকেই পরমাত্মা, ঈশ্বর, খুদা আর গোড আদি বলে। এইভাবে সংসারের তিনটি নিয়ম থেকে তিনটি কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। সৃষ্টির এই তিনটি কারণ হল স্বয়ংসিদ্ধ আর অনাদি, আর তাই এই প্রবাহ থেকে অনাদি সৃষ্টিও বুদ্ধিপূর্বক নিয়মে আবদ্ধ হয়ে কাজ করে চলেছে, কারণ যত পদার্থ স্বয়ংসিদ্ধ, কারণরূপ আর স্বয়ংভূ হয় তাদেরই গুণ-কর্ম-স্বভাব নিশ্চিত হয় আর সেই গুণ থেকেই যে কার্য উৎপন্ন হয় তা নিয়মপূর্বক কার্য করে। এই কার্যরূপ সৃষ্টি প্রত্যক্ষই সুব্যবস্থিত, বুদ্ধিপূর্বক আর নিয়মিত কার্য করছে, এইজন্য এই তিন কারণের স্বয়ংসিদ্ধ হওয়াতে কিছুই সন্দেহ বাকি থাকে না, তাই এই কারণগুলো থেকে কার্যের বর্ণনা এরপর করবো।

কারণ দ্বারা কার্যের উৎপত্তি

উপরিউক্ত তিনটি কারণের মধ্যে প্রথম কারণটি হল জড়, পরমাণুরূপ আর নিয়ম দ্বারা পরিবর্তনকারী প্রকৃতি, দ্বিতীয় কারণটি হল অসংখ্য, পরিচ্ছিন্ন আর চেতন জীব আর তৃতীয় কারণটি হল ব্যাপক, পরিপূর্ণ আর জ্ঞানী পরমাত্মা (ঋঃ ১|১৬৪|২০), (শ্বেতাঃ উপঃ ৪|৭, ৪|৫, ১|৯)। এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতি আর জীব এই অনন্ত সৃষ্টির পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত করে এটিকে নিয়মে রাখতে পারবে না, কারণ এরা উভয়ই হল অণু, পরিচ্ছিন্ন আর একদেশি। যদিও সমস্ত জীব জ্ঞানবান্, তবে অণু হওয়াতে তাতে জ্ঞানও অণু মাত্রই রয়েছে, এইজন্য এই অনন্ত জগৎকে তারা সকলে মিলেও নিয়মে রাখতে পারবে না। এটির নিয়ামক তো পরমাত্মাই হতে পারে যা তার অনন্ত সত্তা আর অনন্ত জ্ঞান দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হল এটা যে পরমাত্মা এই সৃষ্টির নির্মাণ কেন করেন?

আমি লিখে এসেছি যে এই সৃষ্টির তিনটি কারণের মধ্যে একটি কারণ অসংখ্য অল্পজ্ঞ জীবদেরও রয়েছে। এই জীব যখন মানুষরূপে শরীর ধারণ করে তখন একদেশি হওয়ার কারণে নিজের থেকে ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রাপ্তির ইচ্ছায় সর্বদা কিছু না কিছু প্রচেষ্টা করে থাকে। এর এই চেষ্টা দ্বারা পরস্পর সংঘর্ষ উৎপন্ন হয় আর সেই সংঘর্ষ দ্বারা অনেকেরই খুব কষ্ট হয়। কখনও কখনও তো এরমধ্যে এত অধিক অত্যাচারী মানুষ উৎপন্ন হয়ে যায় যে তাদের সম্মিলিত ক্রিয়া দ্বারা সংসারের মধ্যে বড়ো বড়ো অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে

আর সৃষ্টির মধ্যে অভূতপূর্ব অপবাদ উৎপন্ন হয়ে যায় তথা ভালো প্রাণীদের ঘোর যন্ত্রণা ভুগতে হয়। এইরকম অবস্থাতে নিজের উচ্চ সভ্যতা, ন্যায় আর দয়া দ্বারা প্রেরিত হয়ে পরমাত্মা সৃষ্টিনিয়ম রক্ষা করার জন্য আর হানিকারকদের থেকে হানিবাহকদের ন্যায় দেওয়ার জন্য বিবশ হয়ে যান। যেভাবে লড়াই করতে থাকা দুইজন মানুষের মধ্যে একজনকে অন্যায় করতে দেখে এক ভদ্র পুরুষ অন্যায়কারীর থেকে অন্যায়-প্রাপ্তকে প্রতিফল দিয়ে ঝগড়া শান্ত করার প্রচেষ্টা করে, ঠিক সেইভাবে দয়া, ধর্ম আর ন্যায়রূপ পরমাত্মাও অত্যাচারী জীবদের দণ্ড দিয়ে, অর্থাৎ অত্যাচার সহনকারীদের প্রতিফল দিয়ে সৃষ্টিনিয়মের রক্ষা করেন। এই ন্যায় তিনি নানা প্রকারের য়োনির নির্মাণ দ্বারা করেন আর এক য়োনি থেকে অন্যকে লাভ পৌঁছে দেন অর্থাৎ পূর্বজন্মের প্রতিফল দেন। এটাই হল তার নিয়ামক হওয়ার কারণ।

এতে কিছু লোক বলে যে যখন এটা জ্ঞাত হওয়ার পর যে অমুক সময়ে, অমুক স্থানে ডাকাতি হবে, সাধারণ পুলিশ দ্রুত প্রবন্ধ করে নেয় তাহলে ভবিষ্যতে হবে এরকম অত্যাচারের প্রবন্ধ পরমাত্মা কেন করে না? এটার উত্তর হল এটাই যে মানুষের বুদ্ধি সর্বদা পরিবর্তন হতে থাকে। চোর চুরি করার জন্য বের হয়, কিন্তু কখনও মাঝপথ থেকে ফিরে আসে। এরকম অবস্থাতে যদি সংকল্প করা মাত্রই অথবা চুরির জন্য বের হওয়া মাত্রই দণ্ড দেওয়া হয় তবে অন্যায়ই বলা হবে, কারণ সংকল্পের কোনো দণ্ড হয় না। যদি কেউ কোটি টাকার দান করার সংকল্প করে তাহলে কি তাতেই সে দানের ফল পেয়ে যাবে? কক্ষনো না। এইজন্য কর্ম হয়ে যাওয়ার পরেই ফলের ব্যবস্থা করা উচিত। বাকি রইলো পরমাত্মা জীবদের মন্দ কর্মের চেষ্টা থেকে পৃথক কেন করে না? এটার উত্তর স্পষ্ট যে প্রথম তো স্বাভাবিক চেতন জীব এরকম নিশ্চেষ্ট হতেই পারবে না, অন্যদিকে যদি পরমেশ্বর জীবদের বৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে তাদের দাবাতে থাকেন তবে স্বয়ং তিনিই মহা সংকটে পরে যাবেন, যাকে পরমাত্মা কেন কোনো মূর্খ মানুষও করতে পারবে না, এইজন্য কর্মের পূর্বেই ফল দেওয়া অথবা কর্ম করাতেই বাঁধা দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। যুক্তি আর ন্যায় হল এটাই যে জীব স্বতন্ত্রতার সঙ্গে কর্ম করবে আর ঈশ্বর স্বতন্ত্রতার সঙ্গে তার ন্যায় করবে। এটাই আজ পর্যন্ত হয়ে আসছে আর এটাই হল সংসার উৎপত্তির প্রধান কারণ আর ঈশ্বরের সর্বত্র ব্যাপকতার পূর্ণ প্রমাণ।

পরমেশ্বরের এই সর্বত্র ব্যাপকতার উপরে কিছু লোক এটাও প্রশ্ন করে যে যখন পরমেশ্বর এই অনন্ত আকাশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য জীবদের ন্যায় করছেন তাহলে কি তিনি নিজের লম্বা-চওড়াকে জানেন, তিনি কি জানেন যে "আমি" কতদূর ছড়িয়ে আছি? এই প্রশ্নের উত্তর হল এটাই যে যেভাবে জীব অনন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু নিজের ক্ষুদ্রতাকে সঠিকভাবে জানে না যে আমি কত ক্ষুদ্র, সেইভাবে পরমাত্মা হল অনেক বিশাল, কিন্তু নিজের বিশালতার অন্ত তিনিও জানেন না যে আমি কত বিশাল, কারণ নিজে নিজেকে জানার মধ্যে সবাই অল্পজ্ঞই হয়। যেরকম চক্ষু নিজে নিজেকে দেখতে আর জানতে অসমর্থ সেইভাবে জীব আর পরমেশ্বরও নিজের ক্ষুদ্রতা আর বিশালতাকে জানতে অসমর্থ, এইজন্য নিজে নিজের সম্পূর্ণ মর্যাদার পূর্ণ জ্ঞান না হওয়া নিজের অভাবের যুক্তি নয়, কারণ যখন জীব নিজের ক্ষুদ্রতা না জানার পরেও রয়েছে আর নিজে নিজের ভাবকে জানে আর যখন চক্ষু নিজে নিজেকে না দেখতে পেরেও রয়েছে আর নিজের ভাবকে জানে তখন পরমেশ্বরও নিজের অনন্ততাকে না জেনেও রয়েছেন আর নিজের ভাবকে জানেন। তাৎপর্য হল

যে বস্তুটি যেরকম হয় সেটি সেরকমই প্রতিত হয়। যেরকম জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু সে নিজের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতাকে জানতে পারবে না। যদি জেনে যায় তাহলে তার অনন্ততাই থাকবে না, বরং সান্ততা এসে যাবে, এইজন্য নিজে-নিজের পূর্ণ জ্ঞান না হওয়াতে নিজে নিজের মধ্যে কোনো পার্থক্য আসবে না। পরমাত্মা হল অনন্ত আর অনন্ততা থেকে সর্বত্র ব্যাপক হয়ে সকল জীবের ন্যায় ব্যবস্থা করেন, করতে থাকেন আর করতে থাকবেন। এটাই হল সৃষ্টির কারণের আর তার নিয়মের দিগদর্শন। এরপর এখন এটা দেখানোর চেষ্টা করবো যে এই সৃষ্টি কিভাবে নির্মিত হয়েছে।

জড় সৃষ্টির উৎপত্তি

সৃষ্টির পরিবর্তন আর প্রাণীদের উত্তম আর অধম স্বভাব থেকে বোঝা যায় যে এই সৃষ্টি একসময় পরিবর্তনরহিত স্থির দশাতে ছিল আর সমস্ত প্রাণী স্থূল শরীরবিহীন নিজের কৃত কর্মের ফল ভোগার জন্য কোনো কারাগারে যাওয়ার যোগ্য হচ্ছিল। আমি এরপূর্বে লিখে এসেছি যে পরিবর্তনশীল পদার্থ ভবিষ্যতে পরিবর্তনশূন্য হয়ে স্থির হয়ে যায় আর ভূতকালেও বিনা পরিবর্তনে স্থির দশাতেই থাকে। এই সিদ্ধান্তানুসার এই পরিবর্তনশীল সংসারও ভূতকালে বিনা পরিবর্তনে নিজের কারণদশাতেই স্থির ছিল। এইভাবে সমস্ত প্রাণীর পরিবর্তনশীল শরীরও নিজের কারণের মধ্যেই মিশে ছিল আর সমস্ত চেতনশক্তিগুলো শরীরহীন অবস্থাতেই ছিল তথা পরবর্তী ফল ভোগার জন্য উৎসুক হচ্ছিল, অর্থাৎ সব বস্তু নতুন সৃষ্টি নির্মাণের যোগ্য প্রস্তুত ছিল। এরকম দশাতে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকই উপস্থিত হবে যে সৃষ্টির উৎপত্তি কিভাবে আরম্ভ হয়েছে আর কিভাবে তৈরি হয়েছে?

যদিও বলা যেতে পারে যে, যেভাবে অনাদি প্রবাহ থেকে সৃষ্টি সর্বদা হচ্ছে সেইভাবে এবারেও হয়েছে তথাপি এতেও সেই সমস্যার সমাধান হবে না যা সৃষ্টি উৎপত্তির বিষয়ে উৎপন্ন করা হয়েছে। সৃষ্টি উৎপত্তির সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে অনেক রকমের ধারণা রয়েছে। কেউ বলে যে সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক শক্তি স্বয়ং বানিয়েছে, কেউ বলে সৃষ্টিকে জীবাত্মাগুলো মিলে বানিয়েছে আবার কেউ বলে সৃষ্টিকে পরমাত্মাই বানিয়েছে। এরকম দশাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তিন সম্মতির আলোচনা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত স্থির হবে না, এই জন্য আমরা এখানে ক্রম থেকে তিনটি মতের আলোচনা করবো।

যারা বলে যে প্রাকৃতিক শক্তি স্বয়ং এই সৃষ্টিকে উৎপন্ন করেছে, তারা ভুল করছে, কারণ প্রকৃতির শক্তি পরমাণুর ভিতরেই রয়েছে আর সব পরমাণুই হল এক (সমান)। এরকম অবস্থাতে সমান শক্তিশালী পরমাণু নিজে-নিজেই না তো নিজেদের মধ্যে মিলতে পারবে আর না আলাদা হতে পারবে, কিন্তু সংসারে পদার্থকে মিলতে আর আলাদা হতে -- নির্মাণ আর ধ্বংস হতে নিত্য দেখা যায়, যারদ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে যে পরমাণুর মধ্যে না বল এক সমান রয়েছে আর না তাদের মধ্যে আপনা-আপনি কোনো কার্য নির্মাণ আর

ধ্বংস হতে পারে। যদি কোনো পরমাণুকে প্রবল আর কিছুকে হীন শক্তির মানা হয় তাতেও কাজ হবে না, কারণ প্রবল পরমাণু হীন শক্তির পরমাণুকে টেনে নিবে আর কখনও ছাড়বে না। আর তার ফল এমন হবে যে না কোনো পদার্থে পরিবর্তন হবে আর না কোনো পদার্থ নষ্ট হবে, বরং সমস্ত জগৎ বিনা কোনো প্রকার পরিবর্তনে ঠোস ও স্থিররূপে থাকবে, কিন্তু আমরা সংসারের সমস্ত পদার্থের মধ্যে পরিবর্তন আর বিনাশ দেখি, এরথেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে পরমাণুর মধ্যে না তো শক্তি ন্যুনাধিক রয়েছে আর না এই সৃষ্টিতে ন্যুনাধিক শক্তির প্রভাব রয়েছে। এই সম আর বিষম দুই প্রকারের শক্তির অতিরিক্ত প্রাকৃতিক পরমাণুতে তৃতীয় প্রকারের অন্য শক্তির কল্পনা হবে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দূরে-দূরে থাকা পরমাণু বিনা কোনো মাধ্যমে একে-অপরের উপর প্রভাব ফেলে না তো আকর্ষিত করতে পারবে আর না আকৃষ্ট পরমাণুগুলোকে পৃথক্ করতে পারবে, এইজন্য কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তি সৃষ্টিকে উৎপন্ন করতে পারবে না।

এছাড়া যারা বলে যে সমস্ত জীব মিলে সৃষ্টিকে উৎপন্ন করেছে তারাও ভুল বলছে, কারণ যে পদার্থ অণু, পরিচ্ছিন্ন, একদেশী হয়, সেটা চেতন আর অসংখ্য হলে পরেও, সেটা অনন্ত সৃষ্টিকে বুদ্ধিপূর্বক না তো বানাতে পারবে আর না তাকে নিয়মে রাখতে পারবে। এর কারণ হল জীবের অল্পজ্ঞতা আর অণুরূপতা। সংসারকে বানানো তো দূরের কথা সেটা আদিতে নিজের শরীরকে পর্যন্ত বানাতে পারে না, এইজন্য অনেক চেতন মিলেও সৃষ্টিকে বানাতে পারবে না।

আবার যারা বলে যে পরমেশ্বরই সৃষ্টিকে বানিয়েছে তারা এই বিষয়টা ভুলে যায় যে পরমাত্মা হল সর্বত্র ব্যাপ্ত আর পরিপূর্ণ। যে বস্তু সর্বত্র ব্যাপ্ত আর পরিপূর্ণ হয় সেটা নড়াচড়া করতে পারবে না, কিন্তু সৃষ্টি উৎপন্ন করার জন্য প্রকৃতি -- পরমাণুর মধ্যে গতি উৎপন্ন করতে হবে আর অন্য পদার্থের মধ্যে গতি সে-ই উৎপন্ন করতে পারবে যে আগে স্বয়ং গতিমান্ হয়ে আছে, এইজন্য বিনা স্বয়ং নড়াচড়া করে পরমাত্মাও পরমাণুকে নড়াতে পারবে না। এতে কিছু ব্যক্তি বলে যে যেভাবে চুম্বক স্বয়ং নড়াচড়া ছাড়াই লোহাতে গতি উৎপন্ন করে সেইভাবে পরমাত্মাও বিনা নড়াচড়া করে পরমাণুর মধ্যে গতি উৎপন্ন করে দিয়েছে। এই যুক্তিতে এটা আক্ষেপ হতে পারে যে প্রকৃতি -- পরমাণুকে তো পরমেশ্বর সমানরূপে নিত্যই প্রাপ্ত, এইজন্য নিত্য একই প্রকারের গতি হতে পারে, দুই প্রকারের পরস্পর বিরোধী গতি নাও হতে পারে, অর্থাৎ হয় সৃষ্টি উৎপন্ন হয়েই যাবে অথবা নষ্টই হয়ে যাবে -- হয় উৎপত্তি হয়ে যাবে অথবা ধ্বংসই হয়ে যাবে, কিন্তু এমনটা হবে না যে পরমেশ্বর যখন যেমনটা চায় তেমন হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন বানাতে চায় তখন হয়ে যায় আর যখন ধ্বংস করতে চায় তখন নষ্ট হয়ে যায়, কারণ চেতনের ইচ্ছার প্রভাব জড় প্রকৃতির উপর পড়ে না, এইজন্য পরমেশ্বরও সৃষ্টিকে উৎপন্ন করতে পারবে না। এরকম অবস্থাতে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে এই সৃষ্টিকে তাহলে কে কিভাবে উৎপন্ন করেছে?

উপরিউক্ত রকমের কল্পনা দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে যে তিনটি পদার্থের মধ্যে এমন একটাও নেই যেটা একা এই সৃষ্টি রচনার আরম্ভ করতে পারে, কিন্তু তিনটি পদার্থের এক বিশেষ প্রকারে ক্রমের কল্পনা করলে পরে প্রতিত হয় যে এই তিনটির সংযুক্ত সহযোগশক্তির দ্বারাই সৃষ্টি উৎপত্তির আরম্ভ হতে পারে, কারণ সৃষ্টি উৎপন্ন করার জন্য পরমেশ্বরের মতো সর্বজ্ঞ, সর্বত্র ব্যাপ্ত আর পরিপূর্ণ পদার্থ আগে থেকে বিদ্যমান রয়েছে,

পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি হতে প্রভাবিত হয়ে অসংখ্য চেতনশক্তিও জীবরূপে তার মধ্যেই রয়েছে আর সেই শক্তির আঘাত-প্রতিঘাত থেকে গতিকারক প্রকৃতিও (পরমাণু) উপস্থিত রয়েছে। এরকম দশাতে সৃষ্টির উৎপন্নকারী বস্তুকে বাইরে কোনো স্থান থেকে নিয়ে আসার আবশ্যকতা নেই। বরং তিনটির এক বিশেষ ক্রম দ্বারাই চলতে পারে। আর্যরা সেই ক্রমকে জেনে গেছে আর সেই তিন পদার্থের গুণ, কর্ম আর স্বভাবকে ধ্যানে রেখে বেদের আদেশানুসারে এই জটিল আর মৌলিক প্রশ্নটির সমাধান করেছে। য়জুর্বেদ ৩২|৫ এরমধ্যে লেখা রয়েছে যে -

য়স্মাজ্জাতম্ ন পুরা কিম্ চনৈব য় আবভূব ভুবনানি বিশ্বা।
প্রজাপতিঃ প্রজয়া স□ররাণস্ত্রীণি জ্যোতি□ষি সচতে স ষোডশী।।

অর্থাৎ - যার পূর্বে কোনো কিছুই উৎপন্ন হয়নি, সেই ষোলো কলাকারী প্রজাপতি (পরমেশ্বর) প্রজার সঙ্গে সম্যক্ রমণ করে অগ্নি, বিদ্যুত্ আর সূর্যকে বানিয়েছে।

এই মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে যে আরম্ভে পরমেশ্বর জীবের মধ্যে প্রেরণা করে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে কম্পন উৎপন্ন করে, এইজন্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে - "**তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভয়ঃ পৃথিবী**", অর্থাৎ পরমাত্মা আর আত্মা দ্বারা আকাশ (ইথর), আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল আর জল থেকে পৃথিবী নির্মিত হয়েছে। এই বর্ণনাটিতেও পরমাত্মা অথবা আত্মা দ্বারাই প্রকৃতিতে গতির উৎপত্তি বলা হয়েছে। এর অতিরিক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে যে - "**অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি**", অর্থাৎ পরমাত্মা জীবের মধ্যে বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হয়ে এই নামরূপাত্মক সংসারের রচনা করেছে। একইভাবে মহর্ষি মনুও বলেছেন যে সৃষ্টির আরম্ভে পরমাত্মা সবার আগে মন (জীবদের) উদ্বোধিত করে আর মন দ্বারা সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে কম্পন উৎপন্ন হয় (মনুঃ ১|৭৪-৭৫)। বলার তাৎপর্য হল যে বেদ থেকে শুরু করে উপনিষদ আর মনুস্মৃতি আদি পর্যন্ত সমস্ত আর্ষগ্রন্থ এক স্বরে বলছে যে পরমাত্মা আগে নিজের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চেতন জীবদের উদ্বোধিত করে আর জীবগুলো নিজেদের সক্রিয়তার দ্বারা সমস্ত প্রকৃতি পরমাণুর মধ্যে গতি উৎপন্ন করে দেয়। একথা ঠিকই প্রতিত হচ্ছে, কারণ পরিপূর্ণ পরমাত্মা নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে জীবের মধ্যে উত্তেজনা করতে পারে আর তার ইচ্ছাশক্তির প্রভাব চেতন জীবের উপর পড়তে পারে। একইভাবে জীবের গতির প্রভাবও পরমাণুর উপর পড়তে পারে। এর উদাহরণ আমরা নিত্য নিজের শরীরের মধ্যে দেখতে পারি। যেভাবে আমাদের হর্ষ, শোক আর চিন্তার প্রভাব শরীরের পরমাণুর উপরে পরে আর মুখমুদ্রাতে পার্থক্য হয় আর যেভাবে আমাদের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই হাত, পা আর অন্য অঙ্গের পরমাণুও গতি করে আর শরীরের সমস্ত ব্যবহার হয় ঠিক সেইভাবে শুরুতে জীবদের সক্রিয়তার দ্বারাও সমস্ত পরমাণুসমুহতে কম্পন উৎপন্ন হতে পারে, অতএব শুরুতে এই ধরনের ক্রিয়া হয়। যখন পরমাত্মা জীবদের প্রেরিত করে তখন তাদের মধ্যে এত বেগ উৎপন্ন হয় যে সমস্ত প্রাকৃতিক পরমাণু অত্যন্ত বেগে গতিমান হয়ে যায়।

এই গতি দ্বারা প্রকৃতির পঞ্চ কর্ম উৎপন্ন হয়। বৈশেষিক দর্শনে "**উত্ক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনপ্রসারণম্ গমনমিতি কর্মাণি**" লিখে পাঁচ কর্মের নির্দেশ করা হয়েছে। এই পাঁচ কর্ম হল পাঁচ ভৌতিক তত্ব। অগ্নি

যেখানেই জ্বালানো হোক তার গতি উপরের দিকেই হবে আর জল যেখানেই রাখা হোক তার গতি নিচের দিকেই হবে। একইভাবে পৃথিবী আকর্ষণ করে, হাওয়া ছড়ায় আর আকাশ গমনাগমনের জন্য স্থান দেয়। অগ্নির গুণ হল উপরে যাওয়া, এইজন্য অগ্নির পরমাণু উপরের দিকে চলে আর জলের গুণ হল নিচে যাওয়া, এইজন্য জলের পরমাণু নিচের দিকে চলে আর দুই শক্তির সংঘর্ষ হয়। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষের ফলে এক বিশাল ঠেলপেল আরম্ভ হয়। এই সময় পৃথিবীর আকর্ষণ গুণকারী পরমাণু এই বিশাল ঠেলপেলকে ধরে রাখে, বায়ুর প্রসারণ গুণকারী পরমাণু সেই সঘন ঠেলপেলের মধ্যে ধাক্কা লাগিয়ে দেয় আর আকাশ (ইথর) এর পরমাণু সেই ঠেলপেলকে গমন করার জন্য স্থান দিয়ে দেয়। এরফলে এটা হয় যে সেই সমস্ত পরমাণুসমুহ চক্রাকার গতিতে ঘুরতে থাকে। যেভাবে মার্বেল খেলোক কোনো ছেলে আঙ্গুল দিয়ে মার্বেলের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ গতিকে দিয়ে, কব্জি দ্বারা ধরে রেখে আর হাত আগে নিয়ে মার্বেলকে ভূমিতে ফেলে দেয় আর সেই মার্বেল নাচতে থাকে সেইভাবে প্রকৃতির পাঁচ কর্ম প্রকৃতি -- পরমাণু -- পুঞ্জকে চক্রাকার গতিতে নাচিয়ে দেয়। এই চক্রাকার গতিতে গমনকারী আদিম প্রকৃতি -- পুঞ্জ বেদের মধ্যে হিরণ্যগর্ভ আর ভুবনে ব্রহ্মা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে"**, অর্থাৎ সবার আগে হিরণ্যগর্ভ নামের মহান্ চকচকে আর অনেক বড়ো প্রাকৃতিক গোলা উৎপন্ন হয়। সেই হিরণ্যগর্ভ গোলকের বিষয়ে ভগবান্ মনু বলেছেন যে -

তদণ্ডমভবদ্ধৈমম্ সহস্রাম্শুসমপ্রভম্।
তস্মিঞ্জজ্ঞে স্বয়ম্ ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহ।।

(মনুস্মৃতি ১|৯)

অর্থাৎ - সহস্র সূর্যের সমান প্রকাশকারক সেই গোলার মধ্যে সর্বলোকপিতামহ (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হয়।
ব্রহ্মার নাম গনার সঙ্গে অমরকোশে লেখা রয়েছে যে -

ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।
হিরণ্যগর্ভো লোকেশঃ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ।।

(অমর০ ১|১|১৬)

অর্থাৎ - ব্রহ্মা, আত্মভূ, সুরশ্রেষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, স্বয়ম্ভূ আর চতুরানন --- একই পদার্থের নাম।

এখানে ব্রহ্মা আর হিরণ্যগর্ভকে একটাই পদার্থ বলা হয়েছে। বেদের মধ্যে অন্য স্থানে সেই গোলককে **"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্"** (য়জুঃ ৩১|১), অর্থাৎ সহস্র মস্তকের, সহস্র চক্ষুর আর সহস্র পায়ের বলা হয়েছে, অর্থাৎ এই আদিম সৃষ্টিগর্ভকে ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্রশীর্ষ, হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভূ, হেমাণ্ড আর ব্রহ্মা আদি নামে ডাকা হয়েছে আর তাকেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নেব্যুলা থিওরিতে গৈসেসমাস বলে। এটাই হল বর্তমান সৃষ্টির মূল আর বীজ। বলা হয়েছে যে সময় পেয়ে সেই গোলা থেকে অনেক গোলক উৎপন্ন হয়ে যায় আর আলাদা-আলাদা অনেক সূর্যের নামে আকাশে ছড়িয়ে যায়। এইধরনের প্রত্যেক সৌরজগৎকে বিরাট্ বলা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে লেখা রয়েছে যে সেই হিরণ্যগর্ভের দুটো

ভাগ হয়ে যায় তার থেকেই বিরাট্ উৎপন্ন হয় (মনুঃ ১|৩২)। বেদের মধ্যেও লেখা রয়েছে যে "**ততো বিরাডজায়ত**" (য়জুঃ ৩১|৫), অর্থাৎ সেই সহস্র মস্তকওয়ালা হিরণ্যগর্ভ থেকে বিরাট্ জন্ম নেয় আর "**পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ**" (য়জুঃ ৩১|৫), অর্থাৎ এরপর ভূমি উৎপন্ন হয়। এই বর্ণনা থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে এই অনন্ত সৃষ্টিতে অনেক বিরাট্ রয়েছে, কারণ বিরাট্ পুরুষের শরীরের যে মর্যাদা বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে তা ততই রয়েছে যতটা এক সৌরজগতের রয়েছে। বিরাট্ পুরুষের বর্ণনা করার সঙ্গে বেদের মধ্যে বলা হয়েছে যে "**শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত** (য়জুঃ ৩১|১৩), **য়স্য বাতঃ প্রাণাপানা** (অথর্বঃ ১০|৭|২৪), **চক্ষোঃ সূর্য়োঽজায়ত** (য়জুঃ ৩১|১২), **দিশঃ শ্রোত্রাত্** (য়জুঃ ৩১|১৩), **নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষম্** (য়জুঃ ৩১|১৩), **পদ্ভয়াম্ ভূমিঃ** (য়জুঃ ৩১|১৩), অর্থাৎ বিরাটের মস্তক হল দ্যৌ --- আকাশ (অমরকোশ ১|২|১), বায়ু হল প্রাণ --- বাহুবল (শত০ ব্রা০ ১৪|৮|১৫|৬), সূর্য হল নেত্র, দিশা হল কান, মহাকাশ হল নাভী আর পৃথিবী হল পা। যেভাবে মানুষের পেটে জঠরাগ্নি আর অন্নরস থাকে, সেইভাবে বিরাটের মহাকাশরূপী পেটের মধ্যে বিদ্যুদ্রূপী জঠরাগ্নি আর রসরূপী মেঘজল থাকে। বিরাটের এইসমস্ত বর্ণনা মানুষের রূপে মিলানো হয়েছে আর আদিম ব্রহ্মারূপী পিতামহের উৎপত্তি থেকে পিতা বিরাট্ আর মাতা পৃথিবীর উৎপত্তি পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই উৎপত্তি ক্রমে আগে হিরণ্যগর্ভ --- ব্রহ্মার উৎপত্তি বলা হয়েছে, তারপর ব্রহ্মা থেকে বিরাট্ পুরুষ অর্থাৎ সৌরজগতের উৎপত্তি বলা হয়েছে আর শেষে বলা হয়েছে যে পৃথিবী উৎপন্ন হল। এইভাবে জড় সৃষ্টির উৎপত্তির বর্ণনা করার পর এরপর চেতন সৃষ্টির উৎপত্তির বর্ণনা করবো।

চেতন সৃষ্টির উৎপত্তি

আমি গত পৃষ্ঠাতে বলেছি যে এই সৃষ্টির উৎপত্তির প্রধান কারণ হল জীবদের কর্ম আর পরমেশ্বরের ন্যায়ব্যবস্থা। জীব অনাদি কাল থেকে কর্ম করে আসছে আর পরমাত্মাও অনাদি কাল থেকে তাদের কর্মফল দিয়ে আসছে, এইজন্য প্রত্যেক প্রলয়ের পরে নতুন সৃষ্টি হয় আর যখন সূর্য, চন্দ্র আর পৃথিবী আদির রচনা হয়ে যায় তখন পৃথিবী অনুকূল হয়ে গেলে পরে পরমাত্মা জীবদের শেষ কর্মের অনুসারে তাদের নানা প্রকারের য়োনির মধ্যে উৎপন্ন করে। মনুস্মৃতি (১|২৮) এরমধ্যে লেখা রয়েছে -

য়ম্ তু কর্মাণি য়স্মিন্স ন্যয়ুঙ্ক্ত প্রথমম্ প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ম্ ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।।

অর্থাৎ - সেই প্রভু (পরমাত্মা) সৃষ্টির আদিতে যে প্রাণীকে যে কর্মে লাগিয়েছে প্রত্যেক সৃষ্টি উৎপত্তি সময়ে সে আবার উৎপন্ন হয়ে অর্থাৎ জন্ম ধারণ করে সেই কর্মকেই নিজে-নিজে প্রাপ্ত করতে থাকে।

তাৎপর্য হল যে যাকে যেই য়োনির যোগ্য বুঝেছে তাকে সেই য়োনিতে উৎপন্ন করেছে। এই কর্ম আর কর্মানুসার শরীরধারণের সিদ্ধান্তানুসারে সমস্ত কর্ম আর সমস্ত শরীরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে

পারে, অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে সমস্ত কর্মের তিনটি বর্গ রয়েছে, তদনুসারে সমস্ত প্রাণী শরীরেরও তিনটি বর্গ রয়েছে। কর্মের তিনটি বর্গ হল সাত্ত্বিক, রাজস্ আর তামস্। একেই অন্য শব্দতে আচার, অনাচার আর অত্যাচার বলা হয়। এই তিন ধরনের কর্ম বুদ্ধি, নির্বুদ্ধি আর প্রমাদ দ্বারা করা হয়ে থাকে। সৃষ্টি নিয়মের অনুসারে আর ধর্মানুকূল বুদ্ধিপূর্বক আচরণ (ব্যবহারের) নাম হল আচার আর তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। সৃষ্টি নিয়মকে না জেনে নির্বুদ্ধিতাপূর্বক কিছু-না-কিছু করার নাম হল অনাচার আর তাকে রাজস্ কর্ম বলে আর প্রমাদ, আলস্য তথা অভিমান দ্বারা করা সৃষ্টির প্রতিকূল অধর্মাচরণের নাম হল অত্যাচার আর তাকে তামস্ কর্ম বলে। এই তিন প্রকারের কর্মের অনুসারে তিন প্রকারের শরীর নির্মিত হয়।

জ্ঞানযুক্ত সাত্ত্বিক কর্ম করলে জ্ঞানযুক্ত মানব-শরীর নির্মিত হয়, অজ্ঞানযুক্ত কিছু-না-কিছু উল্টো-পাল্টা কর্ম করলে অজ্ঞানযুক্ত পশু-শরীর নির্মিত হয় আর আলস্য, প্রমাদ তথা অভিমানযুক্ত দুষ্কর্ম করলে জ্ঞান আর কর্মহীন অন্ধকারময় বৃক্ষ-শরীর নির্মিত হয়। জ্ঞানপূর্বক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করার ফলে মানুষকে জ্ঞান আর কর্মকে ধারণ করবে এমন পরিপূর্ণ অঙ্গ দেওয়া হয়েছে, অজ্ঞানবশ কেবল কিছু-না-কিছু করার ফলে পশুদের জ্ঞানহীন কেবল কিছু-না-কিছু করবে এরকম অপূর্ণ অঙ্গ দেওয়া হয়েছে আর জ্ঞান তথা কর্ম উভয়কে জেনেশুনে দুরুপয়োগ করার ফলে বৃক্ষকে জ্ঞান আর কর্ম উভয় থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে তিন প্রকারের কর্মের কারণে তিনটি বর্গের প্রাণী যথা মানব, পশু আর বৃক্ষ নির্মিত হয়েছে। এই তিনটির মধ্যে মানুষ হল জ্ঞানযুক্ত আর কর্ম করতে সমর্থ, পশু জ্ঞানহীন ও কর্ম করতে সমর্থ আর বৃক্ষ জ্ঞান তথা কর্ম উভয়ের মধ্যে অসমর্থ।

সংসারের এই নিয়ম হল যে যা জ্ঞানের মধ্যে আর কর্ম করার মধ্যে পূর্ণ হয় সেটা হল জ্ঞানশূন্যের ভোক্তা আর জ্ঞানশূন্য তার ভোগ্য হয়।এইভাবে যে কর্ম করতে পারবে সেটা হল জ্ঞান আর কর্মশূন্যের ভোক্তা আর জ্ঞানকর্মশূন্য হল তার ভোগ্য। এছাড়া সংসারের আরেকটি নিয়ম হল যে আগে ভোগ্য উৎপন্ন হয় তারপর ভোক্তা জন্ম নেয়। যেভাবে আগে দুধ উৎপন্ন হয় তারপর বাচ্চা জন্ম হয়, সেইভাবে যখন পশুদের ভোগ্য বৃক্ষ আগে উৎপন্ন হয়ে যায় তারপর পশু উৎপন্ন হয় আর যখন মানুষের ভোগ্য বৃক্ষ আর পশু উৎপন্ন হয়ে যায় তখন উভয়ের উপভোগকারী মানুষ উৎপন্ন হয়। এই নিয়মের অনুসারে এই চেতন সৃষ্টিতে সবার আগে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছে, বৃক্ষের পরে পশু-পক্ষী উৎপন্ন হয় আর পশুপক্ষীর পরে মানুষ উৎপন্ন হয়। বেদের মধ্যে চেতন সৃষ্টির উৎপত্তি এই ক্রম থেকেই লেখা রয়েছে। য়জুর্বেদে লেখা রয়েছে যে-

তস্মাদ্যজ্ঞাত্সর্বহুতঃ সম্ভৃতম্ পৃষদাজ্যম্।

পশূঁস্তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ য়ে।।

(য়জুঃ ৩১|৬)

ব্রাহ্মণোऽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজ য়ঃ কৃতঃ।

ঊরূ তদস্য য়দ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যা□ম্ শূদ্রোऽঅজায়ত।।

(য়জুঃ ৩১|১১)

অর্থাৎ - সর্বপ্রথম পৃষদ্ নামক ভক্ষ্যান্ন --- বনস্পতি (উদ্ভিদ) উৎপন্ন হয় (পৃষদিতি ভক্ষ্যান্নোপলক্ষণম্ -

ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা), তারপর পক্ষী, অরণ্যে চরে বেড়ায় এরকম আর গ্রামে থাকা পশু উৎপন্ন হয় আর এরপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র অর্থাৎ মানুষ উৎপন্ন হয়। এইভাবে সমস্ত চেতন সৃষ্টির উৎপন্ন হয় আর স্বাভাবিক স্থিতিতে স্থির হয়, কিন্তু সৃষ্টি উৎপত্তির আরও একটি অস্বাভাবিক ক্রম রয়েছে যার প্রয়োগ আপত্তির সময়েই হয়ে থাকে। এই নিয়মের সিদ্ধান্ত হল এটাই, যে যাকে কষ্ট দেয় তার থেকে সে কষ্ঠ পায়। এই সিদ্ধান্তের অনুসারেই যেসময় সমস্ত মানব সমাজ অনাচারী, অত্যাচারী, কামুক, অসংখ্য সন্ততির বিস্তারকারী, মাংসাহারী আর শিকার যুদ্ধাদি হয়ে প্রাণীদের সংহার করে আর যেসময় মানব সমাজ জঙ্গল কেটে পাহাড়, সমুদ্র আর ভৌগর্ভিক ওলট-পালটকে করে সংসারে প্রাকৃতিক বিপ্লবকে (Disturbances) উৎপন্ন করেও প্রাণীদের সংহার করে দেয়, সেই সময় সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম নষ্ট হয়ে যায় আর প্রাণীদের কষ্ট হয়, অতঃ সেই নিয়মকে রক্ষা করার জন্য সৃষ্টির নিয়ামক অত্যাচারী প্রাণীদের বৃদ্ধি করে দেয়, অর্থাৎ মাংসাহারী মানুষদের ছাগ আর গৌ আদিতে আর ছাগ তথা গৌ আদিদের নেকড়ে আর সিংহ আদি হিংস্র পশুতে উৎপন্ন করে দেয়। এইভাবে অনেক পীড়িত প্রাণীদের রোগের কৃমিতে (Germs) আর অনেক পীড়া দিয়েছে এরকম প্রাণীদের কীটপতঙ্গতে উৎপন্ন করে দেয়। এরফলে যেখানে সরল সাধারণ মানুষদের আর পশুদের অত্যাচারী কষ্ট দেয় আর অনুচিতরূপে নিজের স্বার্থসাধন করে, সেখানে পীড়িত প্রাণীও নিজের প্রতিশোধ নিয়ে পীড়াদায়ী প্রাণীদেরও পীড়া দেয়, অর্থাৎ যারা যাদের মেরে খেয়েছে, তারাও তাদের মেরে খায়। ভগবান্ মনু বলেছেন -

মাম্ স ভক্ষয়িতাऽমুত্র য়স্য মাম্সমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাম্সস্য মাম্সত্বম্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

(মনুঃ ৫|৫৫)

অর্থাৎ - যার মাংস আমি এখানে ভক্ষণ করবো সেও পরলোকে আমার মাংসকে ভক্ষণ করবে। বিদ্বানরা মাংস শব্দের এটাই নিরুক্তি করেছেন।

এটাই হল সৃষ্টির দুই প্রশস্ত ক্রম আর এই কর্মের অনুসারেই স্বাভাবিক আর আপৎকালিক সৃষ্টির উৎপত্তি হয়। এই স্বাভাবিক আর আপৎকালিক ক্রম হল অনাদি। যখন-যখন এই প্রকারের মানুষ উৎপন্ন হয় তখন-তখন এরকম প্রকারেরই সৃষ্টি হয়। আর এই নিয়মের অনুসারেই এই বর্তমান সৃষ্টিতেও দুই প্রকারের প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সোজা, বেঁকা আর উল্টো শরীরের য়োনিগুলো উৎপন্ন হয় আর আপৎকালিক নিয়মানুসারে মাকড়সা, বক আর হাঁস আদির মতো কিছু য়োনিও সৃষ্ট্যারম্ভতেই উৎপন্ন হয় যা স্বভাবতঃ অন্য প্রাণীদের নাশ করতে থাকে, কিন্তু সৃষ্ট্যারম্ভের অনেক দিন পশ্চাৎ যখন মানুষের মধ্যে মহাত্যাচারীদের বৃদ্ধি অধিক হয় তখন পরমাত্মা সেই সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুদের মধ্যে উৎপন্ন করে দেয় যারা প্রাণীদের মেরে খায় তারা আগে কেবল মৃতক প্রাণীদের মাংস খেয়ে সংসারকে পরিষ্কার করতো, জীবিত পশুদের মেরে খেতো না। এটাই হল বর্তমান চেতন সৃষ্টি উৎপত্তির রহস্য, কিন্তু প্রশ্ন হল এটা যে প্রথমে বলা জড় সৃষ্টির সঙ্গে চেতন সৃষ্টির সম্বন্ধ কি?

<u>জড় সৃষ্টির সঙ্গে চেতন সৃষ্টির সম্বন্ধ</u>

জড় সৃষ্টির উৎপত্তির বর্ণনা করার সঙ্গে আমি লিখে এসেছি যে আমাদের এই সৌরজগতই হল বিরাট্। এই বিরাটের মস্তক হল দ্যৌ, অর্থাৎ সূর্যস্থানী আকাশ, নেত্র হল সূর্য, প্রাণ হল হাওয়া, পেট হল বিদ্যুত্ ও মেঘ আর পা হল পৃথিবী। পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত এই বিরাটের সোজা আকারের এই রূপক মানুষের সোজা শরীরের সঙ্গে মিলে যায়, অর্থাৎ মানুষেরও মস্তক দ্যৌয়ের দিকে আর পা পৃথিবীর দিকেই রয়েছে আর সেটাও বিরাটের মতো সোজা শরীরধারী। এর কারণ হল বিরাট্ আর মানুষের পিতা - পুত্র সম্বন্ধ। আদিম অমৈথুন সৃষ্টি বিরাট্ দ্বারাই উৎপন্ন হয়, এইজন্য মনু ভগবান্ বলেছেন যে, আমি (মানুষ) বিরাট্ থেকেই উৎপন্ন হয়েছি (মনুঃ ১|৩৩)।মানুষ বিরাটেরই আকৃতির। **"অঙ্গদঙ্গাত্সম্ভবসি"** এর অনুসারে বিরাটের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ উৎপন্ন হয়েছে আর উভয়ের অঙ্গের আধার-আধেয় সম্বন্ধ রয়েছে। মানুষের মস্তকের আধার হল দ্যৌ, অতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত মস্তক দ্যৌয়ের দিকে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্ক আর মেধা কাজ করে, কিন্তু যখনই দ্যৌয়ের দিক থেকে সরে যায়, তখনই মস্তিষ্কের মেধা অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি মন্দ আর অন্ধকারাচ্ছন্দ হয়ে যায়।

এই বিষয়টি আমাদের দুই অনুভব দ্বারা জ্ঞাত হয়, একটি তো যখন আমরা নিজের মস্তককে দ্যৌয়ের দিক থেকে সরিয়ে শুয়ে পরি তখন ঘুম আসতে শুরু করে আর জ্ঞান- শক্তি মন্দ হতে থাকে, অর্থাৎ আমরা বিনা দ্যৌয়ের দিকে মস্তককে সরিয়ে শুতে পারবো না -- অজ্ঞান হতে পারবো না। দ্বিতীয়ত যখন আমরা কোনো নেশা আদি পান করি আমাদের বুদ্ধি মন্দ হতে থাকে, তখন আমাদের পা নড়বড়ে হতে থাকে আর আমরা পরে যাই অথবা কোনো কিছুকে ধরে শুয়ে পরি, অর্থাৎ আমরা বুদ্ধি হারিয়ে আর অজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। এই দুইয়ের নিত্য অনুভব দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে যে আমাদের মস্তক আর বুদ্ধির আধারাধেয় সম্বন্ধ দ্যৌলোকের সঙ্গে রয়েছে। যেভাবে দ্যৌয়ের সম্বন্ধ মস্তকের সঙ্গে রয়েছে ঠিক সেইভাবে সূর্যেরও সম্বন্ধ নেত্রের সঙ্গে রয়েছে। যখন পর্যন্ত সূর্য থাকে তখন পর্যন্ত নেত্র কাজ করে, যখন সূর্য অস্ত যায় আর অন্ধকার হয়ে যায় তখন নেত্রও অন্ধ হয়ে যায়। সংসারে যত ধরনের প্রকাশ রয়েছে সেটা বিদ্যুৎ হোক অথবা অগ্নি, সবকিছু সূর্য থেকে প্রাপ্ত, এইজন্য বেদের মধ্যে সূর্য আর অগ্নিকে একই বলা হয়েছে (য়জুঃ ৩|৯)। এই সূর্যরূপী অগ্নি থেকেই বিদ্যুৎ, গ্যাস আর তেলের প্রদীপ জ্বলে, প্রদীপ জ্বালিয়েই সূর্যের স্থানাপন্ন প্রকাশ উৎপন্ন করা হয় তখন নেত্র কাজ করে। বলার তাৎপর্য হল যে সূর্য আর নেত্রেরও আধারাধেয় সম্বন্ধ রয়েছে। বায়ু আর প্রাণের তথা প্রাণের আর বাহুবলেরও সেই সম্বন্ধ রয়েছে। যদি সংসার থেকে বায়ু টেনে নেওয়া হয় তখন আমরা একবারও নিঃশ্বাস নিতে পারবো না আর বিনা প্রাণে আমরা একটুকুও বল প্রাপ্ত করতে পারবো না, এইজন্য **"প্রাণো বৈ বলম্"** বলা হয়েছে। প্রাণ আর বলের সম্বন্ধ সেইসময় অধিক স্পষ্ট হয়ে যায় যখন কাজ করতে - করতে মানুষের দম ফুরিয়ে যায়। দম ফুরোতেই মানুষ নির্বল হয়ে যায়, এইজন্য বায়ু আর প্রাণের তথা প্রাণ আর বলেরও আধারাধেয় সম্বন্ধ সিদ্ধ হচ্ছে। পৃথিবী আর পায়ের যেরকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, সেটা প্রত্যক্ষই, অর্থাৎ বিনা পৃথিবী কেউই দাঁড়াতে পারবে না। বলার

তাৎপর্য হল যে আমাদের যত অঙ্গ-উপাঙ্গ রয়েছে সেসব বিরাটের অঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে আর তার দ্বারাই স্থির রয়েছে।

আমি লিখে এসেছি যে মানুষের এই শরীর বুদ্ধিপূর্বক সাত্ত্বিক কর্ম করার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ বুদ্ধির সদব্যবহার দ্বারাই বিরাট্ আকৃতির হতে পারে আর এইভাবে বিরাটের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত করতে পারে, কিন্তু যে মানুষ বুদ্ধির উচিত ব্যবহার করেনি, কেবল অন্ধপরম্পরায় কিছু না কিছু করতে থাকে তাদের বুদ্ধির মুখ্য স্থান দ্যৌলোকের দিক থেকে সরিয়ে ক্ষিতিজের দিকে বেঁকা করে দেওয়া হয়েছে আর সকলকে পশু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুলবুলি থেকে উঠপাখি পর্যন্ত, মাছ থেকে কুমির পর্যন্ত, হাতী থেকে উকুন পর্যন্ত আর বানর থেকে গোরিলা পর্যন্ত যত পশুধারী প্রাণী রয়েছে সবাই হল বাঁকা শরীরধারী। এদের মধ্যে কারও মস্তক আকাশের দিকে নেই। হ্যাঁ, এরা চলাফেরা করে অবশ্যই। এরথেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে এদের কর্মেন্দ্রিয়ের হ্রাস হয়নি। এর কারণ হল এটাই যে এরা জেনেশুনে অনাচার করেনি, কিন্তু যেসব মানুষ প্রমাদ আর অভিমান দ্বারা জেনেশুনে দুষ্কর্ম করেছে তাদের কর্মেন্দ্রিয়ও ছিনে নেওয়া হয়েছে আর তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রমুখ স্থান "মস্তক" ভূমিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে আর সকলকে বৃক্ষ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইমর্সন নামক বিদ্বানও বলেছেন যে "Trees are imperfect men, অর্থাৎ বৃক্ষ হল অপূর্ণ মানুষ।" এইজন্য তারা না তো কোনো জ্ঞান রাখে আর না এদিক-সেদিক চলতে পারে। এই ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টির বিষয়ে কপিলমুনি বলেছেন যে -

ঊর্ধবম্ সত্ত্ববিশালা ।।৪৮।।

তমোবিশালা মূলতঃ ।।৪৯।।

মধ্যে রজো বিশালা ।।৫০।।

আবৃত্তিস্তত্রাপ্যুত্তরোত্তরয়োনিয়োগাদ্ধেয়ঃ।। ৫২।।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য়ন্তম্ তত্কৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাত্।। ৪৭।।

(সাং০ দ০ ৩|৪৮-৫০, ৫২, ৪৭)

অর্থাৎ - সত্ত্বগুণী কর্মকারী উপরের দিকে যায়, রজোগুণী মাঝের দিকে যায় আর তমোগুণী নিচের দিকে যায়। এইভাবে এই য়োনিগুলোর একে-অপরের মধ্যে যাওয়ার চক্কর চলতে থাকে, কিন্তু ব্রহ্মা অর্থাৎ মানবজাতির আদি পিতামহ থেকে স্তম্ব অর্থাৎ বৃক্ষ পর্যন্ত বিবেক করলে পরে এই চক্কর ছেড়ে যায়। এই সূত্রের মধ্যে মানুষ থেকে বৃক্ষ পর্যন্ত চক্করকে বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে সত্ত্বগুণী সোজা মানব শরীরধারী, রজোগুণী পশুপক্ষী বেঁকা শরীরধারী আর তমোগুণী বৃক্ষ হল উল্টো শরীরধারী। আর নিজের - নিজের কর্মের অনুসারে বিরাট্ অর্থাৎ জড় সৃষ্টির সঙ্গে অনুকূল অথবা প্রতিকূল সম্বন্ধ রাখে।

চেতন সৃষ্টির পারস্পরিক সম্বন্ধ

যেভাবে প্রাণীদের জড় সৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে সেইভাবে তাদের নিজেদের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। আমি পূর্বেই লিখে এসেছি যে পরমাত্মা জীবদের কর্মানুসারে প্রাণীদের শরীর তৈরি করেন আর দণ্ড ভোগের সঙ্গে-সঙ্গে দুঃখ দাতা থেকে দুঃখ প্রাপ্তকে প্রতিফলও দিয়ে দেন। এই প্রতিফল হল এক ধরনের ঋণ। এটাই হল কারণ যে অনাচারী আর অত্যাচারীদের জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্কোচ করে তিনি তাদের এরকম বানিয়ে দেন যে তারা সহজভাবে উৎকৃষ্টেন্দ্রিয় প্রাণীদের বশে এসে যায় আর তাদের ভোগ্য হয়ে ঋণ শোধ করে। এটাই হল কারণ যে ভোগ্য আগে আর ভোক্তা পরে উৎপন্ন হয়।

আমি লিখে এসেছি যে আদি সৃষ্টিতে প্রথমে বৃক্ষ তারপর পশুপক্ষী আর পশুপক্ষীর পরে মানুষ উৎপন্ন হয়। এর কারণ হল এটাই যে পশু আর বৃক্ষগুলো পূর্বজন্মে নিজের মানুষ শরীর দ্বারা অন্য মানুষদের হানি করেছে, এইজন্য মানুষের অপেক্ষা হীনেন্দ্রিয় হয়ে আর তাদের বশে এসে মানুষের ঋণ শোধ করছে আর বৃক্ষ নিজের পূর্বকালীন মানুষ-শরীর দ্বারা পশু ও মানুষ উভয়ের হানি করেছিল, এইজন্য সে পশু আর মানুষের বশে এসে তাদের উপভোগে আসছে, আর ঋণ শোধ করছে, তবে পশুরা পূর্বজন্মে বৃক্ষশরীরধারী পূর্বজন্মের পশুদের হানি করেনি, এইজন্য তারা এই জন্মে বৃক্ষদেরকে কিছুই দেয় না, বরং বৃক্ষদের থেকে নেয়। এইভাবে বৃক্ষ আর পশু হল মানুষের ঋণী, কিন্তু মানুষ এই উভয়ের মধ্যে কারও ঋণী নয়। এইভাবে পশুও মানুষের ঋণী, কিন্তু বৃক্ষের ঋণী নয়, তবে বৃক্ষ হল পশু ও মানুষ উভয়ের ঋণী আর তাদের ঋণী কেউ নয়, এইজন্য সমস্ত প্রাণী পরস্পর বিনা কোনো বাঁধায় নিজের-নিজের দেনা-পাওনা দেয় আর নেয়, অর্থাৎ সবাই একে-অপরের সহায়তায় বাঁচে। আমি এখানে কিছু প্রাণীদের বর্ণনা করে দেখাবো যে তারা কিভাবে নিজেদের থেকে উৎকৃষ্টেন্দ্রিয় মানুষদের সেবা করছে।

গাভী, মহিষী, ছাগী আর ভেড়ী দুধ দিয়ে, আর মেষ আর ছাগ বস্ত্রের জন্য উল দিয়ে, অশ্ব, বৃষ, খচ্চর, উট আর হাতি আদি বাহন তথা মালপত্র বোঝাই করার কাজে লেগে আর কুকুর চৌকিদার --- পাহারা তথা এক ভালো সঙ্গীর কাজে লেগে মানুষের ঋণ শোধ করছে। সেইভাবে সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, বিড়াল আর গীধ (শকুন-চিল) আদি মাংসাহারী প্রাণী মৃতক শরীরের মাংস খেয়ে পরিষ্কারের কাজ করছে। যদি এসব প্রাণী মৃতক প্রাণীদের খেয়ে পরিষ্কার না করে তাহলে শবের পাহাড় লেগে যাবে আর তার দুর্গন্ধে মানুষদের বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। এইজন্য বরাহ (শুকর), মুরগি, চিল, কাক আর পিঁপড়ে আদিও মল আর পচা মাংসকে খেয়ে আর পৃথিবীকে পবিত্র বানিয়ে মানুষের সেবা করছে। এছাড়া মাছ তথা অন্য সব জলজ প্রাণী জলকে পরিষ্কার করে। সমুদ্রে যদি মাছ না থাকে তাহলে তার জল মলিনতার (অশুদ্ধি) কারণে এত স্থূল হয়ে যাবে যে সেটা সূর্যতাপ দ্বারা তপ্তই হবে না আর সেখানে মেঘও হবে না। "অহিম্সাধর্মপ্রকাশ" এর উত্তরার্ধ (পৃষ্ঠ ৭৬) লেখা রয়েছে যে তুর্কিস্থানের নিকটবর্তি রক্তসমুদ্রতে মাছ নেই, সেই কারণে সেখানে জল অত্যধিক নোংরা হয়ে গেছে আর সেখানে বর্ষা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। যেভাবে জলজন্তু জলকে স্বচ্ছ করে সেইভাবে বায়ুতে উড়ন্ত পক্ষী আর কৃমিও বায়ুর মলকে খেয়ে ফেলে আর বায়ুকে শুদ্ধ করে দেয়। এইভাবে

সাপ আর বিচ্ছু আদি বিষাক্ত প্রাণীও জল, স্থল আর বায়ুর বিষকে খেয়ে ফেলে আর সংসারকে বিষহীন করে রাখে।

এইসব সেবা ছাড়াও অনেক পশু, পক্ষী আর কীটপতঙ্গ মানুষকে বৈজ্ঞানিক বিষয়েও অনেক সহায়তা করে। মেষ এরকম স্থানে বসে না যেখানে ভূমির নিচে পোল রয়েছে। যদি পুরোনো কুয়ো প্রাচীর পড়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মেষ সেই গোল ভূমিটিকে ছেড়ে দিয়ে বসে। এতে ভূগর্ভবিদ্যা সম্বন্ধিত অনেক বিষয় জানা যায়। এইভাবে জোক বড়ো-বড়ো তুফানের আগাম সংকেত জানিয়ে দেয়। আপনি একটি গ্লাসে জল রাখুন আর একটি জোককে সেটির মধ্যে ছেড়ে দিন। যদি তুফান আসবে তবে জোকটি নিচে বসে যাবে আর যদি তুফান না আসে তাহলে জোকটি জলের উপরেই সাঁতার কাটতে থাকবে কিন্তু যদি তুফান আসতে এখনও দেরি আর দেরিতে আসবে তাহলে জোকটি জলের মাঝামাঝি বিকল হয়ে চটপট করতে থাকবে। এছাড়া জোক খারাপ রক্তকে বের করারও কাজ করে। এইভাবে অগ্নিপ্রপাত, ভূকম্প, তুফান আর বর্ষা আসার পূর্বেই ছোটো-ছোটো পিঁপড়ে নিজেদের ডিমকে নিয়ে ছোটে, যা থেকে বর্ষার জ্ঞাত হয়ে যায়। হিমালয়ের পক্ষী বরফ পড়ার আগাম সূচনা দিয়ে দেয় আর খঞ্জন (Wagtails) পক্ষী এই সুচনাকে প্রতিবছর এখানে পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এইভাবে ব্যাঙও জল শুকানোর সূচনা দিয়ে দেয়। এক পুকুরের জল ফুরিয়ে গেলে অন্য পুকুরে চলে যায় আর দূরে অবস্থিত জলের রাস্তা আপনা-আপনি জেনে যায় তথা যে জলের মধ্যে থাকে সেই জল শুকিয়ে যাওয়ার সূচনাও তারা আগেই জেনে যায়। এইসব বিষয় থেকে মানুষ লাভ নিতে পারে। এইভাবে কবুতর পক্ষী সংবাদ আর ডাকের কাজে লাগে। যেখানে চিঠি যাওয়া অসম্ভব সেখানে কবুতরই সংবাদ পৌঁছে দেয়।

যেভাবে এই পশু-পক্ষী মানুষদের নানা ভাবে সেবা করে সেইভাবে বৃক্ষও ফল-ফুল দিয়ে, অন্ন দিয়ে, ঔষধি দিয়ে আর বর্ষা আদি অনেক প্রকারের অমূল্য সাধনগুলোকে দিয়ে মানুষের সেবা করে। এই বৃক্ষ কেবল মানুষকেই নয় বরং নানা প্রকারের ফল-ফুল, তৃণ আর অন্ন আদি দিয়ে পশু-পক্ষীদেরও সেবা করে। বলার তাৎপর্য হল যে সমস্ত হীনাঙ্গ প্রাণী নিজের থেকে উত্তমাঙ্গ প্রাণীর সেবা করে তার ঋণ থেকে মুক্ত হয়। যেসব ক্রম আমরা এই তিন প্রধান ভান্ডারে দেখতে পারি না সেসবও এই তিন মহাবিভাগের অন্তর্গত আবান্তর উপবিভাগের মধ্যেও দেখা যায়। যেভাবে এক প্রতিভাবান্ পুরুষের প্রভাবে সাধারণ বুদ্ধির অনেক ব্যক্তি এসে যায় আর স্বভাব দ্বারাই তার আদর সৎকার করতে থাকে, সেইভাবে পশু আর বৃক্ষের অন্তর্গত তার সমস্ত উপশাখাগুলিও একে-অপরকে সহায়তা দেয়। সিংহাদি মাংসাহারীদেরকে নিজের মাংস দিয়ে যদি অন্য প্রাণী সহায়তা না করে তাহলে কি একটা দিনও হিংসক জন্তু সংসারে থাকতে পারবে? এইভাবে উইপোকা যদি ঘর বানিয়ে সাপকে না দেয় আর কাক যদি কোকিলের বাচ্চাকে না পালন করে তাহলে কি সাপ আর কোকিল কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে? লোকে বলে যে যদি বাঁদর না থাকে তাহলে ঘোড়ার কোনো নাম - চিহ্ন থাকবে না, কারণ ঘোড়ার অসাধ্য রোগ বাঁদরের সঙ্গে থেকে ভালো হয়ে যায়। আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি যে বড়ো-বড়ো রাজাদের আস্তাবলে ঘোড়ার সঙ্গে বাঁদরও বেঁধে রাখা হতো। এর থেকে বলা যেতে পারে যে বিষয়টা অসত্য নয়।

যেভাবে পশুদের সমস্ত অবান্তর ভেদ পরস্পর একে - অপরের সেবা করছে সেইভাবে বৃক্ষও অবান্তর য়োনির পরস্পর সহায়তা করছে। এই বিষয়টি আমরা লতাগুলোকে লক্ষ্য করলে অনেক ভালোভাবে স্পষ্ট বুঝতে পারবো, আমরা দেখি যে প্রায়শঃ সমস্ত লতা বৃক্ষেরই সাহায্যে থাকে, এমনকি নাগবেল আদি লতার পালনই অন্য বৃক্ষের উপর হয় আর বাবুল বৃক্ষের সহায়তায় তো বর্জ্য ভূমিতেও ঘাস হওয়া শুরু করে। বলার তাৎপর্য হল যে সমস্ত অবান্তর য়োনিগুলো পরস্পর সাহায্য-সহায়ক হয়ে আর নিজের থেকে উচ্চ বিভাগের ঋণ শোধ করে সেবা করে আর এই বিষয়টি ঘোষণাপূর্বক জানিয়ে দেয় যে এই সৃষ্টিতে এমন একটাও য়োনি নেই যেটা নিরর্থক আর তার সার্থক হওয়ার কোনো কারণ নেই। চেতনসৃষ্টির এই সুসংগঠিত নির্মাণ থেকে আর জড়সৃষ্টির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থেকে মনে হচ্ছে যে এই সংসার যেন একটি অনেক বড়ো যন্ত্র, যার সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, বায়ু আর জলাদি জড় সৃষ্টি হল কাঠামো আর সেই কাঠামোতে জুড়ে থাকা সমস্ত চেতন য়োনি হল তার সংশ্লিষ্ট অংশ। এই যন্ত্রের কারিগর এরমধ্যে এরকম একটাও অংশ লাগায়নি যেটা ব্যর্থ আর অকারণ, এইজন্য এর প্রয়োগ ভালো করে জেনে বুঝে তারপর করা উচিত।

<u>অধ্যয়ন আর বিচার</u>

মোক্ষের সঙ্গে সম্বন্ধিত এরকম উপরিউক্ত সমস্ত মৌলিক সিদ্ধান্তকে শোনা আর তার উপর মনোযোগ দিয়ে বিচার করাই হল আর্য সভ্যতার সবথেকে প্রধান লক্ষণ। এটাই হল কারণ যে একটি আর্য বালক আচার্যকূলে গিয়ে যজ্ঞোপবীতের দিন থেকেই সন্ধ্যোপাসনার সময় **"সুর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ত্"** এর পাঠ নিত্য পড়ে আর গুরুমুখ থেকে নিত্য এটার অর্থকে শোনে যে এই সূর্য-চন্দ্রাদি সৃষ্টিকে পরমাত্মা ঠিক সেইভাবে বানিয়েছেন, যেভাবে এর পূর্বেও তিনি অনেকবার বানিয়েছেন। এই নিত্য শ্রবণাধ্যয়ন দ্বারা ধীরে-ধীরে বিদ্যার্থীর সৃষ্টির কারণ আর তার উৎপত্তিক্রমের জ্ঞান হতে থাকে আর আমি গত পৃষ্ঠাতে যে বৈদিক, আর্ষ আর আর্যরীতি দ্বারা সৃষ্টির কারণের আর তার উৎপত্তিক্রমের বর্ণনা করেছি সেই রীতি দ্বারা সৃষ্টির রহস্য খুলে যায় আর তার হৃদয়ের মধ্যে তিনটি কথা নির্ভ্রান্তরূপে ঘর করে নেয়।

প্রথম কথা তো তার মনের মধ্যে এটা জমে যায় যে, এই সৃষ্টিকে অনিয়মিত, অস্বাভাবিক আর ক্ষুভিতকারী হল কেবল মানুষই। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ উৎপন্ন হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টিতে কোনো কিছু অস্বাভাবিকতা অথবা পাপ হয় না, বরং সব প্রাণী সৃষ্টির নিয়মে বাঁধা নিজের- নিজের নিয়মিত কাজ করে আর কেউ কাউকে দুঃখ দেয় না, কিন্তু মানুষ উৎপন্ন হতেই সংসারের মধ্যে অস্বাভাবিকতা এসে যায়। গোয়থ (Goeth) -ও বলেছেন যে "All the prospect pleases, only man is vile" অর্থাৎ সমস্ত নষ্টের মূলই

হল মানুষ। মানুষের জ্ঞানস্বতন্ত্রতাই হল এর কারণ। এরা নিজের জ্ঞানস্বতন্ত্রতা দ্বারা সৃষ্টির নিয়মকে ভঙ্গ করে আর সমস্ত প্রাণীদের দুঃখী করে। দ্বিতীয় কথা, তার মনে এটা বসে যায় যে, মানুষের অতিরিক্ত যত প্রাণী রয়েছে সেসব হল পূর্বজন্মের মানুষ। মানুষ তার জ্ঞানস্বতন্ত্রতা থেকে যে সৃষ্টি নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম করেছে তারই ফল ভোগার্থ সে এরকম শরীর পেয়েছে, কারণ এই প্রাণীদের শরীরের গঠন মানুষের শরীরের সঙ্গে প্রায় অনুরূপ। পার্থক্য কেবল এটাই যে এটি যে-যে অঙ্গের অপব্যবহার করেছে সেই-সেই অঙ্গ মন্দ হয়ে গেছে আর এখন এটি সোজা শরীরধারী না থেকে বেঁকা আর উল্টো শরীরধারী হয়ে গেছে। তৃতীয় কথা, তার মনে এটা স্থির হয়ে যায় যে, মানুষ তার নিজেরই দুষ্কর্মের কারণে পশু, পক্ষী আর বৃক্ষ হয়ে নানা প্রকারের কষ্ট ভোগে তাই এখন এরকম কর্ম করা উচিত নয়, যার দ্বারা পশু অথবা বৃক্ষ হতে হয়, কিন্তু এরকম কর্ম করা উচিত যে যার দ্বারা পশু আর বৃক্ষের মূলকারণ মানব-শরীর সেটিকেও যেন ধারণ করতে না হয়। এছাড়া মানুষের শরীরের মধ্যেও তো সব দুঃখ আর দুঃখই ভরে রয়েছে। রোগ, দোষ, হানি, বিচ্ছেদ, ভয়, চিন্তা আর মরণ আদি অনিবার্য কষ্ট থেকে পরিত্রাণ তো এরমধ্যেও নেই। এছাড়া এরমধ্যেও তো রাজা আর সৃষ্টিশাসনের অনিবার্য পরতন্ত্রতা ভুগতে হয়, এইজন্য এখন এই শরীরের চক্র থেকে বেরিয়ে যাওয়াই উচিত আর আজ থেকে এখন থেকে এরকম কর্ম করা উচিত যার দ্বারা ভবিষ্যতে না তো স্বয়ং শরীর ধারণ করতে হবে আর না অন্য প্রাণীদেরও কষ্ট হবে, বরং একটি এরকম মোক্ষমার্গ হয়ে যাবে যে যারদ্বারা আমরাও মোক্ষ পেয়ে যাবো আর এই প্রাণীরাও মানব-শরীরে এসে মোক্ষমার্গী হয়ে যাবে, কিন্তু প্রায়শঃ ব্যক্তিদের থেকে এই কর্মযোনি আর ভোগযোনির পুনর্জন্মসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের উপর এটা আপত্তি করা হয় যে যখন মানুষই হল কর্মযোনি আর তারাই কর্মবশ কর্মফল ভোগার জন্য অন্য ভোগযোনির মধ্যে আসে আর যখন অন্যত্র এক ছোট্টো নোংরা জলাশয়ে কৃমিরূপে এত অধিক সংখ্যাতে বিদ্যমান রয়েছে, যে সংখ্যা বর্তমান পৌনে দুই অরব মানুষের থেকেও অধিক, তাহলে কি এটা সম্ভব যে এত অধিক সংখ্যক মানুষ কখনও ছিল, যার সংখ্যা বর্তমান সমস্ত ভোগযোনিদের থেকেও অধিক আর এই সমস্ত ভোগযোনিগুলো মানুষই ছিল? এই আপত্তির উত্তর খুবই সহজ। আমরা প্রকৃতিতে দেখি যে খুবই ছোটো ভুলের শাস্তি অনেক বেশি হয়, যদিও ভুলকে ছোটো বলা উচিত নয়। রাস্তায় চলার সময় একটু হোচট খেলে মানুষ পরে যায় আর নিজের হাত-পা ভেঙে ফেলে। সেইভাবে এক বেশ্যাগামী একটুখানি ভুলে এমন- এমন ব্যাধিতে পরে যায় যে যারদ্বারা তার সারা জীবনটাই নষ্ট হয়ে যায়। অল্প পাপের বড়ো শাস্তির এই নিয়মানুসারে মানুষ যখন পাপ করে নিম্ন যোনিতে যায় তখন তাকে এক - একটি যোনিতে কয়েক-কয়েকবার জন্ম নিতে হয় আর সমস্ত যোনিগুলোর চক্কর লাগিয়েই মানবযোনিতে আসার সুযোগ পায়। এর মাঝে যদি কোনো দুষ্ট দ্বারা অকালেই আবার মৃত্যু হয় তবে সেই অত্যাচারী মানুষের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আপত্কালের ঈশ্বরীয় নিয়মানুসারে কোনো হিংস্র যোনিতে জন্ম নিয়ে নিজের কর্মকেও ভোগে আর সেই দুষ্টেরও সংহার করে। এছাড়া যখন সমস্ত মানবসমাজ অত্যাচারী হয়ে যায় আর অসংখ্যক প্রাণীদের নাশ করে তখন নবীন উৎপন্ন হবে এরকম প্রাণীদের জন্য মাতা-পিতারও অভাব হয়ে যায়।এর ফল এই দাঁড়ায় যে, জন্মাবে এরকম বাকি বেঁচে থাকা কিছু মাতা-পিতাদের দ্বারা অনেক বড়ো সংখ্যাতে জন্মগ্রহণ হয়, আর আহারন্যুনতার কারণে

অকালেই মারা যায় আর তারপর ঐ য়োনিগুলোতে উৎপন্ন হয়। বলার তাৎপর্য হল যে, মানবয়োনি থেকে সরে গেলে প্রাণী বড়ো চক্করে পরে যায় আর সেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যায়। এদিকে মানুষ কথায়-কথায় ভুল করে আর ছোটো ভুলে বড়ো শাস্তির নিয়মানুসারে কর্মফল ভোগার জন্য তাড়াতাড়ি অন্য য়োনিগুলোতে যায় আর সেখানে অনেক সময় পর্যন্ত থাকে। পরিণাম এটা দাঁড়ায় যে আয় কম ব্যয় অধিক হওয়ার কারণে পশু-সমুদায়ের বৃদ্ধি আর মানব-সমুদায়ের ন্যুনতা স্থির থাকে। এই বিষয়টিকে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি - কল্পনা করুন যে আপনি কিছু কাপড় ধোবীকে ধোয়ার জন্য দিয়েছেন, কিন্তু সে তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিয়ে আসেনি আর আপনাকে অন্য কাপড় আবার দিতে হল, কিন্তু তবুও ধুয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসেনি আর আবারও দিতে হল। এইভাবে দুই-চারবারেই ঘরের সমস্ত কাপড় ধোবীর ওখানে জমা হয়ে গেল। এখন কিছু দিনের মধ্যে সে চার-ছয়টি কাপড় নিয়ে আসলো, কিন্তু ততক্ষণে আপনি আরও দশটি কাপড় নোংরা করে ফেলেছেন আর ধোবীকে দিয়ে দিলেন। ফল দাঁড়ালো এই যে আপনার ঘরের তুলনায় ধোবীর ঘরে অধিক কাপড় হয়ে গেল। এই উদাহরণের যেরকম অবস্থা ঠিক সেইরকম মানবয়োনির ন্যুনতা আর অন্য য়োনির অধিকতার রয়েছে। এই ক্রম অনাদি কাল থেকে চলে আসছে আর অনন্ত কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে, এইজন্য উপরিউক্ত শঙ্কা কর্ময়োনি আর ভোগয়োনির সিদ্ধান্তকে অসিদ্ধ করতে পারবে না আর না এই কথাকে সরিয়ে ফেলতে পারবে যে কর্ময়োনি মানুষই এই ভোগয়োনির মধ্যে যায়।

আর্যরা তাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন আর শ্রবণ-মননের দ্বারা নিজেদের সভ্যতার মূলাধার মোক্ষের প্রশস্ত মার্গকে এইভাবে নিশ্চিত করেছে। তারা ভালোভাবে বুঝে গেছে যে অজ্ঞান আর অভিমান দ্বারা যেসব কাজ করা হয় তার থেকে প্রাণীদের দুঃখ হয় আর সেই দুঃখের প্রতিফল দেওয়ার জন্য নানা প্রকারের য়োনিগুলোতে জন্মধারণ করতে হয়, এইজন্য কোনো প্রাণীকেই সেটা মানুষ হোক অথবা পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ, তৃণ-পল্লব আদি যাই হোক না কেন কাউকেই কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কিছু ব্যক্তি বলে যে, যখন এটা সিদ্ধ হয়ে গেছে যে সমস্ত পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ আর তৃণ-পল্লব পূর্বজন্মের অপরাধী -- মানুষের ঋণী, তাহলে তাদের সুখ-দুঃখ আর হানি-লাভ নিয়ে চিন্তা করাই বৃথা।আমরা যেভাবে ইচ্ছে তাদের ব্যবহার করতে পারি আর নিজের ঋণ সুদ সমেত প্রাপ্ত করতে পারি। এই প্রাপ্তিতে যদি তাদের মেরেও ফেলতে হয় তাহলে কোনো পাপের প্রসঙ্গই আসবে না।

একথাটি শুনতে কিছু অংশে ঠিক বলে মনে হয়, তবে চিন্তন মনন করলে জ্ঞাত হয় যে এইধরনের আক্ষেপকারী না তো অপরাধ আর দণ্ডবিধানের উপর ধ্যান দিয়েছে আর না ঋণ আর ঋণদাতার উপর। অপরাধ আর দণ্ডবিধান বাদী আর প্রতিবাদীর অধীন নয়, বরং সেটি ন্যায়াধীশের অধীন। প্রত্যেক অপরাধী নিজের বাদীর অপরাধী নয়, বরং সে ঐ বিধানের অপরাধী যা ন্যায়াধীশের পক্ষ থেকে স্থির করা হয়েছে, এইজন্য কোনো বাদী অধিকার ন্যায়াধীশেরই রয়েছে যে সে যা কিছু দণ্ড (জরিমানা) করবে তার থেকে অমুক ভাগ বাদীকেও দিয়ে দিবে, তবে বাদী নিজের ইচ্ছেমত কিছুই করতে পারবে না। এইভাবে ঋণদাতা ঋণী থেকে চাইতেই পারবে, তাকে দণ্ড দিতে পারবে না আর না তাকে মেরে তার চর্ম দিয়ে নিজের অর্থ প্রাপ্ত করতে পারবে। এরকম অবস্থাতে কোনো মানুষই কোনো পশু আদি প্রাণীদের না তো কষ্ট দিতে

পারবে আর না তাদের বধ করতে পারবে, এইজন্য মানুষের উচিত যে তারা যেন কোনো প্রাণীকেই কষ্ট না দিয়ে যা কিছু কাজ তাদের থেকে নেওয়া সম্ভব তা নিবে। কাজ নেওয়ার সবথেকে উত্তম নিয়ম এই সৃষ্টির নিয়ামক স্বয়ংই করে দিয়েছে। সেখান থেকে প্রত্যেক প্রাণীর জাতি, আয়ু আর ভোগকে নির্ধারিত করে বলে দেওয়া হয়েছে যে যেই প্রাণী থেকে তুমি কাজ নিতে চাও তার জাতির অনুসারে তাকে পূর্ণ আয়ু বাঁচতে দাও আর তার জাতির অনুসারে তার যা কিছু ভোগ নির্ধারিত করা হয়েছে তা ভোগার জন্য বাঁধা দিওনা, কিন্তু তার ভোগের জন্য সংগ্রহের প্রবন্ধ করো।

জাতি, আয়ু আর ভোগ

যোগশাস্ত্রের মধ্যে লেখা রয়েছে যে "**সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ**" অর্থাৎ পূর্বকর্মানুসারে প্রাণীদের জাতি, আয়ু আর ভোগ দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রাণী কোনো না কোনো জাতির হয়ে থাকে। জাতির পরিচয় বলার সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রে গৌতমমুনি বলেছেন যে "**সমানপ্রসবাত্মিকা জাতি**" অর্থাৎ যার সমান প্রসব হয় সেটি হল জাতি। সমান প্রসব বলতে তাকে বলা হয়েছে যে যার সংযোগ দ্বারা বংশ চলে। গাভী আর বৃষের সংযোগ দ্বারা বংশ চলে, এইজন্য তারা হল একটি জাতি, কিন্তু ঘোড়া আর কুকুর দিয়ে বংশ চলে না, এইজন্য এরা দুই জাতি নয়। কিছু ব্যক্তি জাতির অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদি, আয়ুর অর্থ ফলিতজ্যোতিষ অনুসারে বর্ষ, মাস, দিন আদি আর ভোগের অর্থ সুখ-দুঃখ, অর্থাৎ প্রারব্ধ আদিকে বলে থাকে, কিন্তু এটা মোটেও ঠিক নয়, কারণ এখানে সমানপ্রসব দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রাণীর সমান প্রসব হয়ে থাকে, এইজন্য উভয় হল একই জাতির, আলাদা নয়। এইভাবে আয়ু আর ভোগও ভিন্ন-ভিন্ন যোনির সঙ্গেই সম্বন্ধিত, ঘড়ি - সময় অথবা প্রারব্ধ আদির সঙ্গে নয়।

এই জাতির অপর একটি পরিচয় হল আয়ু। যেসব প্রাণীদের সমান প্রসব হয় তাদের আয়ুও সমান হয়। যতদিন একটি গাভী বাঁচে প্রায় ততদিন একটি বৃষও বাঁচে, কিন্তু যতদিন একটি ঘোড়া বাঁচে ততদিন কোনো কুকুর বাঁচে না। জাতির তৃতীয় পরিচয় হল ভোগ। যাদের সমান প্রসব আর সমান আয়ু রয়েছে তাদের ভোগও সমান হয়। গাভী আর বৃষের সমান প্রসব আর সমান আয়ু রয়েছে, এইজন্য উভয়ের ভোগও (আহার - বিহার) সমানই হয়, কিন্তু ঘোড়ী আর কুকুরের যেখানে সমান প্রসব আর সমান আয়ু নেই সেখানে ভোগও সমান নেই। ঘোড়ী ঘাস খায় আর কুকুর ঘাস খায় না কিন্তু মাংস খায়। বলার তাৎপর্য হল যে প্রত্যেক জাতির প্রসব, আয়ু আর ভোগ একই সমান হয় আর এই তিন গুণ দ্বারাই যোনি চেনা যায়, এইজন্য মানুষের উচিত যে তারা যেই প্রাণীকে দিয়ে কাজ করতে চায় তার জাতির অনুসারে তাকে ভোগ দেওয়ার সঙ্গে তাকে যেন তার পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত বাঁচতে সুযোগ দেয়।

যেভাবে কোনো শাস্তি পাওয়া কয়েদীর জন্য তিনটি বিষয় নিশ্চিত থাকে, সেইভাবে প্রাণীদের জাতি,

আয়ু আর ভোগ দেওয়া হয়েছে। কয়েদীদের জন্য লেখা থাকে যে এই অমুক শ্রেণীর কারাগারে যাবে, অমুক আহার- বিহারের সঙ্গে অমুক কাজ করবে আর অমুক সময় পর্যন্ত সেখানে থাকবে। এখানে কয়েদীর শ্রেণীই হল প্রানীদের জাতি, কয়েদীদের কাজ আর আহার- বিহারই হল প্রাণীদের ভোগ আর কয়েদীর বন্ধি থাকার অবধিই হল প্রাণীদের আয়ু। যেভাবে কয়েদীদের তাদের ভোগ দিয়ে ততদিন পর্যন্ত অমুক কারাগারে রাখা যেতে পারে, সেইভাবে এই সমস্ত প্রাণীকেও তাদের ভোগ দিয়েই তাদের পূর্ণআয়ু (সারাজীবন) পর্যন্ত কাজে নেওয়া যেতে পারে। যদি কারাগারের দারোগা কয়েদীর ভোগ আর স্বাস্থ্য, অর্থাৎ আয়ুতে বিঘ্ন করে তাহলে তাকে অপরাধী মানা হবে, কারণ রাজার এটা অভিপ্রায় নয় যে কয়েদীকে মেরে ফেলা হোক। এইভাবে যেসব মানুষ যারা প্রাণীদের দুঃখ দেয়, পরমাত্মার ন্যায়ের বিরুদ্ধে করে, অতএব তারা হল পাপী। যেরকম অন্য প্রানীদের ভোগ আর আয়ুতে বাঁধা দিলে পাপ হয় সেইভাবে মানুষের সমানতার মধ্যেও বাঁধা দিলে পাপ হয়। যেভাবে এক সমানপ্রসব জাতি সমান আয়ুকে প্রাপ্ত করে সমান ভোগকে ভোগে ঠিক সেইভাবে মানুষদেরও বোঝা উচিত যে সমস্ত মানুষও সমানপ্রসব আর সমান আয়ুর, এইজন্য তাদের ভোগও সমান হওয়া উচিত।

যে নিয়ম সমানপ্রসব, সমান আয়ু আর সমান ভোগকারী মানুষ আর প্রাণীদের অপরাধ আর দণ্ড তথা কারাগার আর দণ্ডের রয়েছে, সেই নিয়মটি ঋণী আর ধনীর লেন - দেনেরও রয়েছে। মানুষ যখন কারও ঋণী হয় তখন মহাজনও তাকে নিজের নিকট রাখে আর তাকে দিয়ে কাজ করিয়েই নিজের টাকা প্রাপ্ত করে আর ঋণীকে যে- যে পদার্থের আবশ্যকতা হয় সেসব পদার্থ মহাজনই দেয়, কারণ সে জানে যে বিনা টাকা দিয়ে যদি সে না খেয়ে মরে যায় অথবা অন্য দুঃখে ভয় পেয়ে যদি চলে যায় তাহলে আমার টাকা ডুবে যাবে। এইজন্য যদি মানুষকে মানুষ, পশু আর বৃক্ষের থেকে কিছু নিতে হয় তাহলে তাদের সবদিক দিয়ে সুখী রাখা উচিত। সুখী রাখার নিয়ম সৃষ্টি বলে দিয়েছে যে প্রত্যেক প্রাণীর জাতি, আয়ু আর ভোগ নির্ধারিত রয়েছে, অতঃ তুমি তাকে ভোগ দেওয়ার সঙ্গে আর তার পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত রক্ষা করার সঙ্গে নিজের ঋণ নিতে থাকো আর এরকম প্রবন্ধ করো যে কখনও যেন কোনো প্রাণীর অকালমৃত্যু না হয়। এতে প্রায়শঃ কিছু ব্যক্তি বলে যে যদি কারও অকালমৃত্যু পরমেশ্বর স্বীকার না করতেন তবে কেন তিনি বর্ষাঋতুতে বন্যা আদি করে, জঙ্গলে আগুন জ্বালিয়ে আর ঝড়-ভূমিকম্প উৎপন্ন করে লক্ষ প্রাণীর অকালেই সংহার করেন?

এর উত্তর খুবই সরল। আমি গত পৃষ্ঠাতে কর্মানুসারে চেতনসৃষ্টির উৎপত্তি কর্মের বর্ণনা করার সঙ্গে দুই প্রকারের সৃষ্ট্যুৎপত্তি ক্রমের বর্ণনা করে এসেছি। প্রথম ক্রম সতোগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণের অনুসারে সোজা, বেঁকা আর উল্টো সৃষ্টির উৎপত্তির আর দ্বিতীয় হল আপত্কালক্রম যা সৃষ্টির অস্বাভাবিকতাকে থামানোর জন্য কাজে নিয়ে আসা হয়, অর্থাৎ যখন মানুষ নিজের হিংসাবৃত্তি দ্বারা প্রাণীদের সংহার এতটাই বাড়িয়ে দেয় যে তাদের নিজের কর্মফল ভোগার জন্য সম্পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত বেঁচে থাকাও কঠিন হয়ে যায় আর যখন মানবসমাজ জঙ্গল কেটে, পাহাড় ভেঙে, সমুদ্রকে দূষিত আর ভৌগলিক পদার্থকে বের করে সৃষ্টির মধ্যে ব্যতিক্রম উৎপন্ন করে দেয়, যার দ্বারা সৃষ্টির নিয়মে বাঁধা পড়ে আর প্রাণীদের কষ্ট হয়, তখন পরমাত্মা সেই অত্যাচারী মানুষদের পোকা-মাকড় আর কীটপতঙ্গ বানিয়ে সেই বর্ষা, অগ্নি

আর তুফান আদি প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা প্রতিবছর মেরে দেন যারা জঙ্গল আদি কেটে নষ্ট করেছিল। একইভাবে মাংসাহারী মানুষদের পশু বানিয়ে আর পীড়িত পশুদের হিংস্র প্রাণী বানিয়ে তাদের অত্যাচারের প্রতিফল দিয়ে দেন। যেভাবে এই দুই প্রবন্ধ হয় সেইভাবে যখন প্রাণীদের নাশ এত অধিক হয়ে যায় যে জীবদের জন্ম ধারণের জন্য সব মাতা-পিতারও হ্রাস হয়ে যায় তখন এই অল্প সংখ্যক মাতা-পিতাদের মধ্যেই অধিক সন্তান উৎপন্ন হতে থাকে, কিন্তু যখন অল্প সংখ্যক মাতা- পিতাও সমস্ত জীবদের উৎপন্ন করতে পারে না তখন পরমেশ্বর সেই অত্যাচারী মানবসমাজের নাশ করার জন্য সেই আগন্তুক প্রাণীদের এরকম বিষাক্ত বানিয়ে দেন যে নানা প্রকারের ব্যাধির জের্মস হয়ে মানুষের নাশ করে দেয় আর এরকম বৃক্ষও উৎপন্ন করে দেন যা মানুষ আদি প্রাণীদের ধরে-ধরে খেয়ে ফেলে আর পশুদের তথা জঙ্গলের রক্ষা করে। এই সমস্ত প্রবন্ধ সৃষ্টির নিয়ম রক্ষার জন্য করা হয়। সৃষ্টির এই নিয়ম হল অনাদি, কারণ পূর্ব সৃষ্টির অত্যাচারীদের প্রতিফল দেওয়ার জন্য পরমাত্মা আদি সৃষ্টির মধ্যেও মাকড়সা আর হংসের মতো কিছু এরকম য়োনির উৎপন্ন করে দেন যা স্বভাবতঃই প্রাণীদের নাশ করে দেয়, এইজন্য পরমেশ্বরের অপরাধীকে নিজের অপরাধী ভেবে তাদের উপর অত্যাচার করা মানুষের মোটেও উচিত নয়।

যেভাবে কোনো অপরাধী বা ঋণী বিচারকের আজ্ঞাতেই দণ্ড পেতে পারে, বাদীর পক্ষ থেকে নয়, সেইভাবে বর্ষা, অগ্নি, ঝড় আর ভূমিকম্পের দ্বারা অথবা সিংহ-ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুদের দ্বারা পরমেশ্বরই প্রাণীদের অকালে সংহার করতে পারে, অন্য কেউ নয়। এইজন্য ঈশ্বরীয় ন্যায়ব্যবস্থার তাৎপর্য এটা ভাবা উচিত নয় যে যখন পরমেশ্বর লক্ষ-লক্ষ প্রাণীদের অকালেই মারে তো মানুষও তাদের অকালে মেরে ফেলুক। বরং এটা তাৎপর্য তো অবশ্যই ভাবা উচিত যে, মানুষী দূরবস্থার কারণে পরমেশ্বরীয় ব্যবস্থাকে ছেড়ে দিয়ে, যেসব প্রাণীরা অন্য প্রাণীদের অকালেই মেরে খাওয়ার অভ্যাস করে ফেলেছে, সেই অভ্যাসকে ছাড়ার চেষ্টা মানুষ অবশ্যই করুক।

আমি চেতনসৃষ্টির উৎপত্তিতে লিখে এসেছি যে পরমাত্মা পূর্বসৃষ্টির অবশিষ্ট থাকা দুষ্টের দুষ্কর্মের ফল দেওয়ার জন্য মাকড়সা আর হংস আদি কিছুটা এরকমও য়োনি উৎপন্ন করেছেন যা স্বভাবতঃ জীবিত প্রাণীদের মেরে খায় আর বাকি সিংহাদি মাংসাহারী প্রাণী মৃতের মাংস খেয়ে কেবল সংসারের সচ্ছতা করার জন্যই বানানো হয়েছে, জীবিত প্রাণীদের মেরে মাংস খাওয়ার জন্য নয়। সঙ্গে আমি এটাও লিখে এসেছি যে তাদের মধ্যে জীবিত প্রাণীদের ধরে খাওয়ার মতো তখনই উৎপন্ন হয় যখন মানুষের মধ্যে প্রাণীসংহারের প্রবৃত্তি অত্যধিক বেড়ে যায়, এইজন্য মানুষের উচিত যে তারা যেন প্রাণীদের মারা আর তাদের মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়, যাতে হিংস্র জন্তুদের থেকে হিংসা করার স্বভাবটা যেতে থাকে, কারণ যখন মানুষ অন্য প্রাণীদের মেরে তাদের মাংস খায় তখন সেসব পশুদের ভোজনে ন্যুনতা উৎপন্ন হয়, যাদের ভোজন সংসারের সচ্ছতার উদ্দেশ্যে মৃত প্রাণীদের মাংস বানানো হয়েছিল। ভোজনের অভাবের কারণেই তারা চোর আর ডাকুদের মতো অন্য প্রানীদের চুরি করার মতো করে মেরে খায়। এইরকম অবস্থায় এটাই বলতে হচ্ছে যে জীবিত প্রাণীদের ধরে খাওয়ার স্বভাব তাদের স্বাভাবিক নয়, বরং মানুষের কারণেই হয়েছে। এখানে আমি হিংস্র পশুদের স্বভাব সম্বন্ধিত দুই-একটি ঘটনার বর্ণনা করে দেখাবো যে জীবিত প্রাণীদের ধরে

খাওয়ার স্বভাব তাদের স্বাভাবিক নয়।

প্রায় ২৫ বছরের পুরোনো ঘটনা হবে, মধ্যপ্রদেশের রায়গঢ় রাজসভায় একটি ছোট্ট বাঘের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে আসা হয়। রাজা মশাই তাকে পালন করতে লাগলেন আর তাকে খাওয়ার জন্য মাংসের ব্যবস্থাও করে দিলেন, তদনুসারে তাকে নিত্য মাংসের টুকরো বাইরে থেকে দেওয়া শুরু হলো।এই ক্রম কয়েক বছর ধরে চলছিল। যখন সে অনেক বড়ো হয়ে যায় তো একদিন তার খাঁচাতে একটি জীবিত ছাগ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ছাগকে দেখামাত্রই বাঘটি এক কোনাতে গিয়ে বসে পড়লো আর ছাগটি এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগলো। এই সংবাদ রাজাকে দেওয়া হল। রাজা মশাই সেদিন থেকে জীবিত ছাগ দেওয়া বন্ধ করে দেন, কিন্তু বিনোদের জন্য যখন ইচ্ছে হতো তখন জীবিত ছাগ খাঁচাতে ভরে তামাশা দেখতেন। এই ঘটনাটি যেরকম ঠিক সেরকমই একটি ঘটনার বর্ণনা নভেম্বর সন ১৯১৩ এর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সংবাদপত্র "লিটিল পেপার" এরমধ্যে এইভাবে ছাপা হয়েছিল যে *"পশুদের মধ্যে বাচ্চা পালনের অদ্ভুত প্রেম দেখা যায়। বেড়াল ইদুর, শশক আর অন্য প্রাণীদের বাচ্চাকে পালন করে। গাভী ছাগের বাচ্চাকে পালন করে। কুত্তী শেয়াল, খরগোশ আর মেষের বাচ্চাকে পালন করে আর শূকরীও বেড়ালের বাচ্চাকে পালন করে। সবথেকে বড়ো প্রসিদ্ধ উদাহরণ হলো ডাবলিন (জার্মানি) চিড়িয়াখানার বৃদ্ধা সিংহীর, যেটি নিজের গুহাতে কুকুর পালতো যা তার গুহার ইদুরকে মারতো।"*[®]

এরকম ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ মহাভারতের মধ্যেও লেখা রয়েছে -

সা হি মাম্সার্গলম্ ভীষ্ম মুখাত্সিম্হস্য খাদতঃ।
দন্তান্তরবিলগ্নম্ য়ত্তদাদত্তেऽল্পচেতনা।।
(মহা০ সভাপর্বঃ ৪০|৩০)

অর্থাৎ - ভূলিঙ্গ পক্ষী সিংহের মুখে নিজের মুখ ঢুকিয়ে তার দাঁতের মধ্য থেকে মাংস বের করে খায়। ভূলিঙ্গ পক্ষী অনেক বড়ো হয়, তারমধ্যে এত মাংস রয়েছে যে সিংহ তাকে খেয়ে নিজের পেট ভরাতে পারে, কিন্তু তার মুখের ভিতর যাওয়ার পরেও তাকে মারে না।

এই প্রমাণগুলো থেকে বোঝা যায় যে জীবিত প্রাণীদের হত্যা করা ব্যাঘ্রাদির স্বভাব নয়। সংসারের বিখ্যাত প্রাণীশাস্ত্রী আলফ্রেড রসাল ওয়ালিস ঠিকই বলেছেন যে *"মাংসাহারী জন্তু কেবল খিদে পেলেই অন্য প্রাণীদের হত্যা করে, মনোবিনোদের জন্য নয়। পালিতো বেড়াল আর ইঁদুরের যেসব উদাহরণ দেওয়া হয়, তা ভ্রমমূলক।"*[©] ঠিকই তো, হিংস্রপশু যদি মনোবিনোদের জন্য প্রাণীদের হিংসা করতো তাহলে সার্কাসের লোকেরা সিংহ-বাঘেদের সঙ্গে কিভাবে কুস্তি লোড়তো? এরথেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে হিংস্রপশু খিদের

[®]The love of the young among the animals:-- Animals have the same wonderful spirit of affection for the young. Cats have reared rats and hares and rabbits and squirrels, cows have reared lambs, dogs have fed and brought up foxes and hares and wolves and kittens, a mother ferret has brought up a young rabbits; and there is a famous instance of a grand old lioness at the Dublin zoo which adopted a dog that killed the rats in her den. - (Little Paper) of Nov. 1913.
[©]It must be remembered that in a state of nature the carnivora hunt and kill to satisfy hunger, not for amusement, and all conclusion derived from the house-fed cat and mouse are fallacious. -- The World of wild life, p.377.

কারণেই প্রাণীদের হিংসা করে, কিন্তু যদি সমস্ত সংসারের মানুষ মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয় আর প্রতিদিনের মরে যাওয়া পশুদের মাংস জঙ্গলে আর গ্রামের সীমানায় ফেলে দেয় তাহলে সমস্ত মাংসহারী প্রাণী নিজের খিদে নিবৃত্ত করতে পারবে আর অন্য প্রাণীদের অকালে মেরে ফেলা বন্ধ করে দিবে। বলার তাৎপর্য এই হলো যে যখন হিংস্রপশুদের স্বভাবই নয় হিংসে করার, যখন তারা মাংস পেলে কারও হিংসাই করে না আর যখন পর্যাপ্ত মাংস পেলে তারা প্রাণীদের মারা ছেড়ে দিতে পারে তখন এমনটা বলা ঠিক হবে না যে প্রাণীদের মারা তাদের স্বভাব। তারা প্রাণীদের তখনই মারে যখন মানুষ অন্য প্রাণীদের মেরে খেয়ে ফেলে। যদি মানুষ অন্য প্রাণীদের মেরে খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে হিংস্রপশুও জীবিত প্রাণীদের মারা ছেড়ে দিবে, কিন্তু যখন মানুষ প্রাণীদের মেরে খাওয়া ছাড়ে না তখন পরমেশ্বরও হিংসক পশুদের দ্বারা হওয়া হিংসার চিকিৎসা করতে পারবেন না। এটাই হল কারণ যে সংসারের মধ্যে হিংসার সাম্রাজ্য হয়ে গেছে আর এটা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কতটা হিংসা ঈশ্বরীয় ন্যায়ব্যবস্থা দ্বারা হচ্ছে আর কতটা মানুষের অত্যাচার দ্বারা।

মানবকৃত আর ঈশ্বরকৃত হিংসার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কারণ যেটি মানবকৃত সেটাই হল ঈশ্বরকৃত। মানুষ কর্ম করে আর পরমেশ্বর সেই কর্মের অনুসারে ফল দিয়ে দেয়, অর্থাৎ আগে-আগে মানুষের কর্ম আর পিছনে- পিছনে পরমেশ্বরের ব্যবস্থা কাজ করছে, এইজন্য মানবকৃত আর ঈশ্বরকৃত হিংসার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই সিদ্ধান্তের অনুসারে যদি পরমেশ্বর হিংস্র পশুদের দ্বারা মানুষ আর মানুষদের প্রিয় পশুদের অল্প আয়ুতে মেরে মানুষকে তার হিংসা প্রবৃত্তির প্রতিফল দেয় তাহলে এই হিংসা মানুষেরই হয়েছে বোঝা যেতে পারে, ঈশ্বরের করা নয়, এইজন্য মানুষের উচিত যে তারা কোনো প্রাণীরই যেন হিংসা না করে আর প্রত্যেক প্রাণীকে এরকম সুযোগ দেয় যে সে তার ভোগকে ভোগার সঙ্গে নিজের পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত যেন বাঁচে আর নিজের শ্রম দ্বারা ঋণ শোধ করে চলে যায়। এই ধরনের সৃষ্টি সম্বন্ধিত জ্ঞান প্রাপ্ত করলে -- সৃষ্টির কারণ-কার্যের মীমাংসাকে হৃদয়ঙ্গম করলে -- মানুষ এই সৃষ্টির উচিত ব্যবহার করতে পারবে আর সংসারের উচিত ব্যবহার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারবে, তবে স্মরণে রাখতে হবে যে মানুষ কেবল উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের জ্ঞান নেওয়া মাত্রই সৃষ্টির উচিত ব্যবহার করতে পারবে না আর না সে কেবল সৃষ্টির কারণ - কার্যের শৃঙ্খলাকে বুঝে নিয়েই ন্যায়যুক্ত ব্যবহার করতে পারবে, কারণ জানা হল এক বিষয় আর করা হল অন্য বিষয়। এইজন্য মানুষের উচিত যে সে মোক্ষ সাধনের সঙ্গে-সঙ্গে সৃষ্টির ব্যবহারও করুক। এর কারণ হল এটাই যে সৃষ্টির উচিত প্রয়োগ মোক্ষ সাধনার সঙ্গেই হতে পারবে, অতএব এখানে মোক্ষের আভ্যন্তরিক বিষয়েরও কিছুটা সারাংশ লিখে দেওয়া আবশ্যক বলে মনে হচ্ছে।

মোক্ষের স্বরূপ, স্থান আর সাধন

মোক্ষ হল দুই প্রকারের, দুঃখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল প্রথম আর আনন্দ প্রাপ্ত করা হল দ্বিতীয় স্বরূপ। প্রথম স্বরূপের পক্ষপাতীরা বলে যে দুঃখেরই অত্যন্তাভাবের মধ্যে আনন্দ ভরে রয়েছে। তারা বলে যে সুষুপ্তি হল এর উদাহরণ, এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে **"সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা"** (সাংখ্য০ ৫|১১০) অর্থাৎ সমাধি আর সুষুপ্তি আদির মতোই মোক্ষের মধ্যে ব্রহ্মরূপতা হতে থাকে, কিন্তু আনন্দপক্ষরা বলে যে সুষুপ্তির মধ্যে কেবল দুঃখেরই তিরোভাব হয়ে থাকে, আনন্দের প্রাপ্তি হয় না। যেসব ব্যক্তি বলে যে জেগে গেলে মানুষ এমনটা বলে যে ভালো ঘুম হয়েছে এটাই হল আনন্দের সূচনা, তারা বালকলীলাই করে থাকে, কারণ সুষুপ্তির সময় না তো সুখের ভান হয় আর না দুঃখের। যদি সুখ আর দুঃখের অত্যন্তাভাবই আনন্দ হয় তবে ক্লোরোফর্ম শুঁকা মানুষ আর মরে যাওয়া মানুষ সবাইকে আনন্দই বলে বোঝা উচিত আর পাথর, মাটি তথা প্রাচীরকেও মুক্ত বলে মানা উচিত, কিন্তু মুক্তির অর্থ হল আনন্দ প্রাপ্ত করা, এইজন্য মোক্ষের সেই স্বরূপ হল মিথ্যা। মোক্ষের দ্বিতীয় স্বরূপ হল আনন্দ, কিন্তু বিনা দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিতে আনন্দও হতে পারবে না, এইজন্য মোক্ষের আসল স্বরূপ দুঃখের নিবৃত্তি আর আনন্দের প্রাপ্তিই হবে, সুতরাং আমরা এখানে দেখবো যে দুঃখের নিবৃত্তি আর আনন্দ প্রাপ্তির রহস্যটা কি?
দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির অর্থ হল প্রকৃতিবন্ধন অর্থাৎ মায়াবেষ্টন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। স্থূল আর সূক্ষ্ম শরীর থেকে যখন মুক্তি মিলে যায় তখন দুঃখের অত্যন্তাভাব হয়ে যায়, কারণ ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে লেখা রয়েছে যে দুঃখের কারণই হল শরীর। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আর আধিভৌতিক আদি যত দুঃখ রয়েছে সবগুলো শরীর দ্বারাই হয়। এইজন্য শরীরের অত্যন্তাভাব দ্বারাই দুঃখের অত্যন্তাভাব হয়ে যায়, কিন্তু যেমনটা আমি বলেছি যে কেবলমাত্র দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি দ্বারাই আনন্দের প্রাপ্তি হয়ে যায় না, এইজন্য দেখা উচিত যে আনন্দটা কি?

আনন্দ হল দুই প্রকারের, প্রথম প্রকারটি হল যে আমার যেন কোনো প্রকারের দুঃখ না হয় আর আমি জ্ঞানযুক্ত হয়ে সংসারের আর স্বয়ং নিজের রসাস্বাদন করি। দ্বিতীয় প্রকারটি হল যে আমার যেন কোনো প্রকারের দুঃখ না হয় আর আমি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করে তার রসাস্বাদন করি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারটিতে সংসার আর স্বয়ং নিজের রসাস্বাদনের লালসা রয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে পরমাত্মার রসাস্বাদনের অভিলাষা রয়েছে, এইজন্য আমরা দেখবো যে এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি হল প্রশস্ত।

এরমধ্যে সংসারের রসাস্বাদনে আনন্দ নেই, কারণ সংসারের রসাস্বাদন বিনা শরীরে হতেই পারবে না আর শরীরই হল দুঃখের ঘর, এইজন্য দুঃখদায়ী শরীরের সঙ্গে যা কম-বেশী সংসারের সুখ অনুভব হয় তা দুঃখমিশ্রিত হওয়ায় কষ্ট কারকই হয়, এইজন্য সংসারের রসাস্বাদনের নাম আনন্দ হতে পারে না। বাকি রইলো স্বয়ং নিজের রসাস্বাদন, সেটাও আনন্দ বলা যেতে পারে না, কারণ প্রথম তো নিজে-নিজের থেকে কেউ কখনও অধিক সময় পর্যন্ত তৃপ্ত থাকতে পারে না, দ্বিতীয় তো নিজে-নিজের অনুভব করার জন্য মস্তিষ্কের আবশ্যকতা হবে যার দ্বারা নিজে-নিজের অনুভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মস্তিষ্ক হবে ততক্ষণ

পর্যন্ত বিচারই উৎপন্ন হতে পারবে না, এইজন্য এই বিচারানন্দও শরীরের আশ্রিত হওয়ায় সর্বদা দুঃখমিশ্রিতই থাকবে। তৃতীয় কথা হল, নিজে-নিজের মধ্যে যে আনন্দের ভঙ্গকারী সেটা হল আত্মার পরিকাঠামো অর্থাৎ তার স্বভাব। তার স্বভাবের মধ্যে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ আর জ্ঞান তথা প্রসন্ন সর্বদা স্থির থাকে -

ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রয়ত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানাত্মনো লিঙ্গম্।

- বৈশেষিকদর্শন

এইজন্য এটি শান্তিতে স্বয়ং নিজের রসাস্বাদন করতেই পারবে না। এটাই হল কারণ যে স্বয়ং নিজের রসাস্বাদনও আনন্দ বলবে না। এখন রইলো দ্বিতীয় প্রকারের আনন্দের কথা, এই আনন্দটি পরমাত্মার সকাশের মধ্যে, তার সম্মেলনের মধ্যে আর তদাকার হয়ে যাওয়ার মধ্যে বলা হয়ে থাকে, আর যাকে ঠিক বলে মনে হচ্ছে, কারণ শুদ্ধ আর স্থায়ী আনন্দের জন্য শুদ্ধ আর স্থায়ী আনন্দদায়ী পদার্থেরও আবশ্যকতা রয়েছে, এইজন্য উপনিষদের মধ্যে বলা হয়েছে যে **"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যান্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতম্ য়দ্বিভাতি"** (মুণ্ডক০ ২|২|৭), অর্থাৎ যে আনন্দরূপ অমৃত রয়েছে তাকে বিজ্ঞান দ্বারাই বিদ্বান্ দেখে। এর কারণ হল এটাই যে সেটি প্রকৃতিবন্ধন থেকে রহিত পূর্ণ জ্ঞানী আর সর্বব্যাপক, সুতরাং তারমধ্যে আনন্দের অতিরিক্ত দুঃখের সম্ভাবনাই নেই। দ্বিতীয় কারণ আনন্দের এই হল যে পরমেশ্বরের প্রাপ্তি দ্বারা সব শঙ্কার নিবৃত্তি হয়ে যায় আর সংসারের কোনো বিষয় জ্ঞাতব্য থাকে না (মুণ্ডক০ ২|২|৮)। এইজন্য এখানে দ্বৈত-অদ্বৈতের ঝগড়া নিয়ে দৌড়ানো উচিত নয়, কিন্তু দেখতে হবে এটা যে বেদ আর উপনিষদের মধ্যে কিভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক আর তার সম্মেলন দ্বারাই আনন্দ বলা হয়েছে। এখানে আমি এই বিষয়ের কিছু সংখ্যক বাক্যই উদ্ধৃত করছি -

তমেব বিদিত্বাऽতিমৃত্যুমেতি।। (য়জুঃ ৩১|১৮)

আশ্চর্য়বত্পশ্যতি বীতশোকঃ।।

য়ম্ পশ্যন্তি য়তয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।। (মুণ্ডক০ ৩|১|৫)

তমাত্মস্থম্ য়েऽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ।। (কঠো০ ৫|১২)

তস্যৈষ আত্মাবিশতে ব্রহ্মধাম।। (মুণ্ডক০ ৩|২|৪)

তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূম্ স্বাম্।। (মুণ্ডক০ ৩|২|৩)

য়দা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্।। (মুণ্ডক০ ৩|১|৩)

জুষ্টম্ য়দা পশ্যত্যন্যমীশম্।। (শ্বেতা০ ৪|৭)

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকঃ।। (কঠো০ ২|২০)

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যেয়া বুদ্ধ্যা।। (কঠো০ ৩|১২)

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।। (মুণ্ডক০ ৩|২|৯)

অয়মাত্মা ব্রহ্ম।। (বৃহদারণ্যক০ ২|৫|১৯)

এই উপনিষদ্ বাক্যের মধ্যে পরমাত্মার প্রাপ্তি, দর্শন, সম্মেলন আর তার সঙ্গে একীকরণের বর্ণনা

রয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে তাকে প্রাপ্ত করেই আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, এইজন্য প্রকৃতিসম্বন্ধ থেকে বিচ্ছেদ অর্থাৎ জন্ম-মরণের চক্কর থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার প্রাপ্তি করারই নাম হল মোক্ষ আর এটাই হল বৈদিক তথা শুদ্ধ স্বরূপ। এইভাবে মোক্ষের স্বরূপ নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পরে এখন দেখা উচিত যে মোক্ষের স্থানটি কোথায়?

যত দূর পর্যন্ত প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার বেষ্টন রয়েছে তত দূর পর্যন্ত দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হবে না, কারণ প্রকৃতি হল পরিণামিনী, একরস থাকার নয়। যে পদার্থ একরস থাকে না আর পরিণামী হয় তার সংসর্গ থেকে সর্বদা অনুকূলতা - প্রতিকূলতা হতে থাকে আর প্রতিকূল বেদনা দ্বারা দুঃখও থাকে, এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত জীব প্রকৃতির তিন বেষ্টন থেকে আলাদা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখ থেকে বাঁচতে পারবে না। প্রকৃতির প্রথম বেষ্টন হল সূক্ষ্মশরীর, দ্বিতীয় বেষ্টন স্থূলশরীর আর তৃতীয় বেষ্টন হল এই বাইরের শরীর (ব্রহ্মাণ্ড), যারমধ্যে এই (পিণ্ড) শরীর বাঁধা রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই তিন শরীর থেকে অর্থাৎ সমস্ত মায়িক জগৎ থেকে জীব পৃথক না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে না, এইজন্য প্রাকৃতিক জগৎ আর শুদ্ধ ব্রহ্মের মর্যাদার বর্ণনা করার সঙ্গে বেদ বলেছে যে **"পাদোऽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতম্ দিবি"** (যজুঃ ৩১|৩) অর্থাৎ পরমাত্মার এক চরণের মধ্যে এই সমস্ত মায়িক জগৎ রয়েছে আর তিন চরণ দ্যৌয়ের মধ্যে অমর রয়েছে। এর তাৎপর্য এই হল যে প্রাকৃতিক জগৎ হল পরিণামী আর মরণধর্মের আর অপ্রাকৃতিক দ্যুলোক যেখানে প্রকৃতিরহিত কেবলমাত্র পরমাত্মাই রয়েছে, সেটাই হল অমৃত, এইজন্য জীবনমুক্ত পুরুষ মরে গেলে সেই দুঃখরহিত দ্যুলোকের মধ্যেই যায়, যেখানে কেবল আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাই রয়েছে, প্রাকৃতিক জগৎ নয়।

বেদের মধ্যে দ্যাবাপৃথিবীরূপী এই ব্রহ্মাণ্ডের (সম্পুট) বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এই সম্পুটের ভাগ হল তিনটি -- একটি নিচের, দ্বিতীয়টি মধ্যের আর তৃতীয়টি হল উপরের। নিচের ভাগকে পৃথিবী, মধ্যের ভাগকে মহাকাশ আর উপরের ভাগকে দ্যৌ বলে। অথর্ববেদ ৪|৩৯ এরমধ্যে লেখা রয়েছে যে **"পৃথিবী ধেনুস্তস্যা অগ্নির্বত্সঃ। অন্তরিক্ষম্ ধেনুস্তস্যা বায়ুর্বত্সঃ। দ্যৌর্ধেনুস্তস্যা আদিত্যো বত্সঃ"** অর্থাৎ পৃথিবীধেনুর অগ্নি হল শাবক, অন্তরীক্ষধেনুর বায়ু হল শাবক আর দ্যৌধেনুর সূর্য হল শাবক। ভুবন হল এই তিনটি আর এই তিনটিই হল তিন দেবতা। এদের মধ্যে দ্যুলোকের দেবতা হল সূর্য। সূর্যের আসে পাশেই প্রাকৃতিক জগৎ রয়েছে তবে সূর্যের অনেক নিকটে নেই। সূর্যের সম্মুখীন সীমারই নাম হল দ্যুলোক আর সেটিকেই বেদের মধ্যে স্বর্গ আর ব্রহ্মলোকের নামে বলা হয়েছে, সুতরাং সেটিই হল মোক্ষের স্থান, এইজন্য উপনিষদের মধ্যে বলা হয়েছে যে **"সূর্যদ্বারেণ তে বিরজা প্রয়ান্তি"** অর্থাৎ জীবনমুক্ত পুরুষ সূর্যদ্বার দিয়েই মোক্ষধামে যায়। এর তাৎপর্য হল এটাই যে সূর্যই হল মায়াবেষ্টনের সীমানা, সুতরাং সূর্যই হল মোক্ষধামের দ্বার আর সূর্যের পৃষ্ঠভাগই হল স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক। অমরকোষের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

স্বরব্যয়ম্ স্বর্গ - নাক - ত্রিদিব - ত্রিদশলয়ঃ।
সুরলোকো দ্যৌর্দিবো দ্বে স্ত্রিয়াম্ ক্লীবে ত্রিবিষ্টপম্।।
(অমর০ প্রথম০ স্বর্গ০ ১|৬)

অর্থাৎ - স্বঃ, অব্যয়, স্বর্গ, নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়, সুরলোক, দ্যৌ, দিব আর ত্রিবিষ্টপ আদি শব্দ হল একই পদার্থের বাচক। এই সব শব্দের মধ্যে স্বঃ, স্বর্গ, নাক আর দ্যৌ শব্দ হল বিশেষ ধ্যান দেওয়ার যোগ্য। প্রত্যেক সন্ধ্যাকারী ভূঃ, ভুবঃ আর স্বঃ -কে নিত্য প্রতিদিন পড়ে। এরমধ্যে ভূঃ হল পৃথিবীবাচী, ভুবঃ হল অন্তরীক্ষবাচী আর স্বঃ হল দ্যুলোকবাচী। তাকেই স্বর্গ বলা হয়েছে। এইভাবে নাক শব্দের নিরুক্তি করে য়াস্কাচার্য বলেছেন যে **"নাক আদিত্যো ভবতি"**, অর্থাৎ সূর্যই হল নাক। এইভাবে সূর্য হল দ্যুলোকেরই সূচক আর দ্যৌ তো হল দ্যৌই। এইজন্য দ্যুলোক যে স্বর্গ সেটা হওয়াতে কোনো শঙ্কাই বাকি রইলো না, কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে যে এটা বৈদিক স্বর্গ নয় যার বর্ণনা সেমিটিক দর্শন থেকে শুরু করে গীতা আদি পুরানগুলোতে করা হয়েছে, কারণ এই সেমিটিক স্বর্গের নিবাসী দেবতা হল খুবই দুঃখী। সে সর্বদা নিজের শত্রুদের থেকে পীড়িত থাকে। তার ঘরে এক ফোঁটা ঘী-দুধেরও ঠিকানা নেই, সে হল পান - তম্বাকুর প্রলুব্ধ , গুড়, চিনির ভিখারী, স্ত্রীদের কটাক্ষ আর বালকের তোতাপাখি ভাষার মতো লালায়িত তথা কাব্যকলা থেকে বঞ্চিত। তাদের রাজা ইন্দ্র তো হল বড়ই ভীরু, লম্পট, লুচ্চা আর প্রতারক। এইজন্য বৈদিক স্বর্গের সঙ্গে এই স্বর্গের কোনো কিছুই সম্বন্ধ নেই। বৈদিক স্বর্গ তো হল সেটা যারমধ্যে জীবনমুক্ত উত্তম কর্মকে করে সূর্যের দ্বার দিয়ে চলে যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"তেন ধীরা অপিয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গলোকমিত ঊর্ধবম্ বিমুক্তাঃ"** (বৃহদা০ ৪|৮), অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ মুক্ত হয়ে উপরের দিকে স্বর্গলোকে যায়। এই স্বর্গকে ব্রহ্মলোকও বলা হয়েছে আর সূর্যের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ বলা হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

ইহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য়স্য রশ্মিভির্য়জমানম্ বহন্তি।
প্রিয়াম্ বাচমভিবদন্ত্যোঽচ্চর্য়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ।।
এতেষু য়শ্চরতে ভ্রাজমানেষু য়থাকালম্ চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য়স্য রশ্ময়ো য়ত্র দেবানাম্ পতিরেকোঽধিবাসঃ।।
(মুণ্ডক উপ০ ১|২|৬, ৫)

অর্থাৎ - আসুন! আসুন! এটাই হল ব্রহ্মলোক, এমনটা বলে যজ্ঞাহুতি সূর্যের কিরণের দ্বারা যজমানকে ব্রহ্মলোকের মধ্যে নিয়ে যায়। যিনি যথা সময়ে অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মকে করেন তাকে সূর্যের কিরণ সেখানেই পৌঁছে দেয় যেখানে সেই দেবাধিদেব পরমাত্মা রয়েছেন।

এই প্রমাণের দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে অগ্নিহোত্রীকে অগ্নির সাত জ্বালা সূর্যের সাত কিরণের দ্বারা সেই স্বর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের মধ্যে পৌঁছে দেয়, যা সূর্যের উপরে। য়জুর্বেদে (৪০|১৭) পরমাত্মা স্বয়ং বলছেন যে **"য়োসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽ সাবহম্"**, অর্থাৎ সূর্য দ্বার দিয়ে যে নির্মল আর অমৃতপুরুষ দৃশ্যমান, আমি হলাম সেটাই। বলার তাৎপর্য এই হল যে স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক হল একই স্থানের নাম আর এই স্থান হল সূর্যের উপরে তথা সেখানেই মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদন করে|উপনিষদগুলো খুবই স্পষ্ট রীতিতে বর্ণন করে দিয়েছে যে স্বর্গ আর ব্রহ্মলোকের মধ্যে মুক্তাত্মাগুলো কিভাবে আনন্দ প্রাপ্ত করে। এখানে আমি সেই উপনিষদ্ শ্রুতিগুলো উল্লেখ করবো, যথা -

স্বর্গেলোকে ন ভয়ম্ কিম্চনাস্তি, ন তত্র ত্বম্ ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাऽশনায়াপিপাসে, শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।।
(কঠো উপ০ ১|১২)

স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য, শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।
(কঠো উপ০ ১|১৮)

স্বর্গলোকা অমৃতত্বম্ ভজন্ত।
(কঠো উপ০ ১|১৩)

তত্প্রজ্ঞানেত্রম্ প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্ প্রজ্ঞানেত্রো
লোকাঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম।।
(ঐতরেয় ব্রা০ ৫|৩)

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুত্ক্রম্যামুষ্মিন্
স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাऽমৃতঃ সমভবত্ সমভবত্।।
(ঐতরেয় ব্রা০ ৫|৪)

স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ।
য়থা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে এবম্ হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স
সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্ স এতস্মাজ্জীবঘনাত্মপরাত্পরম্ পুরিশয়ম্ পুরুষমীক্ষতে।।
(প্রশ্ন উপ০ ৫|৫৭)

তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাম্ ন পুনরাবৃত্তিঃ।।
(বৃহ০ উপ০ ৬|২|১৫)

এবম্ বর্তয়ন্যাবদায়ুষম্ ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে।
ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।
(ছান্দ০ উপ০ ৮|১৫|১)

অর্থাৎ - স্বর্গলোকে না তো ভয় রয়েছে আর না বৃদ্ধাবস্থার আতঙ্ক। সেখানে তো খিদে-তৃষ্ণার দুঃখ থেকে বেরিয়ে কেবল আনন্দ আর আনন্দই রয়েছে। স্বর্গলোক যাত্রী মৃত্যুর জালকে ছিড়ে সেখানে আনন্দ করে। যেভাবে সাপ নিজের খোলস পরিত্যাগ করে দেয় সেইভাবে জীবনমুক্ত জীব সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে আনন্দময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে। এইভাবে যে ব্রহ্মলোকে যায় সে আর ফিরে আসে না, অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোকে যায় সে ফিরে আসে না! আসে না!

এই উপরিউক্ত সমস্ত প্রমানের দ্বারা স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক সম্বন্ধিত তিন শর্তের পূর্তি প্রমাণিত হয়ে যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ স্বর্গে যায়, সে সব প্রকারের ভয়, শোক আর জরা-মৃত্যু আদি দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর সমস্ত কামনা থেকে নিবৃত্তি হয়ে আনন্দিত হয়ে যায়। এটাই হল মোক্ষ আর এটাই হল আর্যদের অন্তিম অভিলাষা, কিন্তু এর উপর কিছু লোক এই আপত্তি করে যে গীতা আর উপনিষদের মধ্যে স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক

থেকে ফিরে আসাও লেখা রয়েছে, এইজন্য স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক মোক্ষধাম হতে পারে না আর না স্বর্গ তথা ব্রহ্মলোক যাত্রীকে মুক্ত মানা যেতে পারে। তারা তাদের এই বিরোধের পুষ্টিতে নিম্ন প্রমাণ উপস্থিত করে থাকে -

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেऽনুভূত্বেমম্ লোকম্ হীনতরঞ্চাবিশন্তি।

(মুণ্ডক উপ০ ১|২|১০)

তে তম্ ভুক্ত্বা স্বর্গলোকম্ বিশালম্ ক্ষীণে পুণ্যে মৃত্যুলোকম্ বিশন্তি।।

(গীতাঃ ৯|২১)

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে।

(মুণ্ডক উপ০ ৩|২|৬)

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোऽর্জুন।।

(গীতাঃ ৮|১৬)

অর্থাৎ - সূর্যের পৃষ্ঠভাগ --- স্বর্গে আনন্দ ভোগার পরে প্রাণী হীনতর লোকের মধ্যে যায়। স্বর্গলোকের সুখ ভোগ করে মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয়। পরান্তকালের মধ্যে ব্রহ্মলোকের থেকেও সরে যেতে হয় আর ব্রহ্মলোক থেকেও পুনরাবর্তন হয়।

আরোপকর্তা বলে যে এই প্রমাণগুলোর মধ্যে স্পষ্টভাবে স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে, এইজন্য স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক মোক্ষধাম হতে পারে না। এর উপর আমার বিনম্র নিবেদন যে, এটা হল বেদের সিদ্ধান্ত, এইজন্য কেবল পুনর্ব্যবহারের যুক্তি দিয়ে খণ্ডিত করা যেতে পারে না। বেদের মধ্যে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে -

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যত্র দেবাऽঅমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত।।

(যজুঃ ৩২|১০)

যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনম্ দিবঃ।
যত্রামূর্য়হ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতম্ কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।
যত্রানুকামম্ চরণম্ ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতম্ কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।

(ঋঃ ৯|১১৩|৮-৯)

অর্থাৎ - পরমাত্মা হলেন আমার ভাই, পিতা আর বিধাতা। তিনি সমস্ত লোকলোকান্তকে জানেন, এইজন্য যেখানে দেবতা অমৃতত্বকে প্রাপ্ত করেন সেই তৃতীয় ধামে আমাকে পৌঁছে দিন। যেখানকার রাজা হলেন সূর্য, যেখানকার দ্বার দ্যৌ দিয়ে আচ্ছাদিত আর যেখানে সূর্যের কিরণ শীতল হয়ে পৌঁছায় সেখানে আমাকে অমর করুন। যেই তৃতীয়লোক স্বর্গে সকল কামনায় তৃপ্ত হয়ে দেবগণ বিচরণ করেন আর যেখানে দিব্য জ্যোতি দিয়ে ভরা স্থান রয়েছে, সেখানে আমাকে অমর করুন।

এই মন্ত্রগুলোতে স্পষ্টভাবে তৃতীয়লোকে গিয়ে অমর হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে। স্বর্গ অর্থাৎ দ্যৌ-ই হল তৃতীয়লোক, এতে তো কারও আপত্তি হতে পারে না, এইজন্য মোক্ষধামই হল স্বর্গ, এতে সন্দেহ নেই। (এইজন্য তো গীতাতে বৈদিকদের "স্বর্গপরা" বলা হয়েছে। হ্যাঁ, **পুনরাবর্তন** আর **ন চ পুনরাবর্তন** থেকে কিছু বিরোধাভাস দেখা যায়, তবে বিদ্বানেরা তারও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। একটু আগে আমি লিখে এসেছি যে **"ব্রহ্মলোকম্ সম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে"**, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গিয়ে তারপর ফিরে আসে না আর আপত্তিকর্তার দেওয়া শ্রুতি বলছে যে **"নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেऽনুভূয়েম্ লোকম্ হীনতরম্ চাবিবেশ"**, অর্থাৎ স্বর্গলোক থেকে এসে হীনতরলোকে যায়। এইজন্য এখন এই প্রশ্নটি উৎপন্ন হচ্ছে যে এই দুই বিরোধী কথার সামঞ্জস্য কি?

আমি দেখেছি যে পূর্বাচার্যগণ এই দুই পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তকে খুবই সুন্দরভাবে সমাধান করে দিয়েছেন আর উপনিষদের মধ্যেই লিখে দিয়েছেন যে **"পরান্তকালে পরিমুচ্যন্তি"** আর **"পরাপরাবতঃ ন পুনরাবৃত্তিঃ"**, অর্থাৎ পরান্তকালে ফিরে আসে আর পরান্তকালের পূর্বে ফেরে না। তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে গেল, যে বাক্যটি না ফিরে আসার সেটা হল পরান্তকালের সীমানা। উভয়ের মথিতার্থ এই হল যে, মোক্ষ থেকে পরান্তকাল পর্যন্ত জীব ফিরে আসে না, কিন্তু পরান্তকালের পশ্চাৎ ফিরে আসে। বাকি রইলো এটা যে মোক্ষ থেকে কেউই ফিরে আসে না, এর উপর আমার বিনম্র নিবেদন এতটুকুই যে যখন গীতার অনুসারে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবানই বলছেন যে **"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি"** অর্থাৎ আমার অনেকবার জন্ম হয়েছে আর অনেকবার আমি ধর্মের স্থাপনার জন্যই এসেছি তখন অন্য জীবদের মোক্ষ থেকে ফিরে আসাতে কিভাবে আপত্তি হতে পারে? মোক্ষ থেকে পুনঃ ফিরে আসার সিদ্ধান্তটি তো হল সনাতনের, যেসব ব্যক্তি মনে করেন যে এই সিদ্ধান্তটিকে স্বামী দয়ানন্দ বের করেছেন, তারা ভুল করছে। মোক্ষের সিদ্ধান্ত কারও দ্বারা বের করা সিদ্ধান্ত নয়, বরং সেটা হল এক বাস্তবিক ঘটনা যা সনাতন থেকে ঋষি-মুনিদের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে চলে আসছে, এইজন্য উপনিষদের মধ্যে তত্সম্বন্ধীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই প্রমাণগুলোকে সকলে দেখেছেন আর অনুভব করেছেন। এইজন্য শ্রীস্বামী আদি শঙ্করাচার্য মৃদু আর স্বামী আনন্দগিরি প্রবল শব্দে প্রতিপাদন করেছেন যে উপনিষদের অনুসারে মোক্ষ থেকে ফিরে আসা সিদ্ধ হচ্ছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪|১৫|৬ তে লেখা রয়েছে যে **"স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমম্ মানবমাবর্তম্ নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে"**, অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে মন্বন্তরের এই চক্করে ফিরে আসে না। এই শ্রুতির মধ্যে এই ভাব গর্ভিত রয়েছে যে - এই মন্বন্তরে ফিরে আসে না, কিন্তু অন্য মন্বন্তরে ফিরে আসে। এই শ্রুতির ভাষ্য করে স্বামী শঙ্করাচার্য লিখেছেন যে **"এতেন প্রতিপদ্যমানা গচ্ছন্তো ব্রহ্মেমম্ মানবম্ মনুসম্বন্ধিনম্ মনোঃ সৃষ্টি- লক্ষণমাবর্তম্ নাऽऽবর্তন্তে"**। এই বাক্যটির মধ্যে **"ইমম্ মানবমাবর্তম্"** পদের উপর স্বামী শঙ্করাচার্য অধিক লেখেন নি। তিনি কেবল এটাই বলেছেন যে **"ইমম্ মানবম্ মনুসম্বন্ধিনম্"** অর্থাৎ এই মনুসম্বন্ধী চক্করের মধ্যে। যদিও এতে হালকা প্রকাশ পড়েছে, তবে বিষয়টি স্পষ্ট হয় নি, কিন্তু এর উপর স্বামী আনন্দগিরি স্পষ্টভাবে বলে

দিয়েছেন যে **"ইমমিতি বিশেষণাদনাবৃত্তিরস্মিন্ কল্পে, কল্পান্তরে ত্বাবৃত্তিরিতি সূচ্যতে"**, অর্থাৎ এই **"ইমম্"** বিশেষণ দ্বারা এই কল্পের মধ্যে অনাবৃত্তি সিদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু কল্পান্তরে তো আবৃত্তিই সূচিত হচ্ছে। স্বামী আনন্দগিরির এই নিষ্পত্তি থেকে আবৃত্তিবাদের উপর খুবই বড়ো সুন্দর প্রভাব পরে আর স্পষ্ট হয়ে যায় যে কল্পান্তরে জীব মোক্ষ হতে অবশ্যই ফিরে আসে। এইজন্য মোক্ষ হতে ফিরে আসলে পরেও স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক মোক্ষধামই সিদ্ধ হচ্ছে আর সূর্যের পৃষ্ঠভাগই স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক সিদ্ধ হচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কিছু লোক বলে যে মোক্ষ হতে ফিরে আসা মেনে নিলে ব্রহ্ম আর জীবের একতার মধ্যে বিঘাত আসবে, কারণ বেদান্তের সিদ্ধান্ত হল এটাই যে মোক্ষের মধ্যে জীব ব্রহ্মই-ব্রহ্ম হয়ে যায়, অতএব মোক্ষ হতে পুনরাবৃত্তিকে মানা উচিত নয়, কিন্তু আমরা দেখছি যে **"সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ত্"** এর অনুসারে এই সৃষ্টি অনাদি কাল থেকে চলে আসছে আর এটা চলার কারণই হল কেবলমাত্র জীবদের কর্ম আর পরমেশ্বরের ন্যায়ব্যবস্থা। এরকম অবস্থায় এটা তো নির্বিবাদই যে জীব অনাদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ব্রহ্ম থেকে পৃথক ছিল আর পৃথক আছে। এখন বিবাদ কেবল ভবিষ্যতে উভয়ের এক হয়ে যাওয়া নিয়ে। একটি দল বলছে যে যখন জীব আর ব্রহ্ম দুটোই অনাদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত পৃথক রয়েছে তাহলে ভবিষ্যতেও এক হবে না আর অন্য দল বলছে যে প্রাগ্ভাবের সিদ্ধান্তানুসারে যেভাবে ঘড়া নির্মাণের পূর্বে অনাদিকাল থেকে ছিল না, কিন্তু নির্মাণের পরে হয়েছে আর অনাদিকালের স্থিতি নষ্ট হয়ে যাবে, এইভাবে জীব যদিও অনাদিকাল থেকে পৃথক ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে এক হতে পারে, আর অনাদিকালের স্থিতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তবে বৈদিকদের মতে এই উভয় যুক্তি দুটি জিজ্ঞাসুকে বিভ্রান্তিতে রাখে আর মোক্ষের অনুষ্ঠান থেকেই উপেক্ষা করে দেয়, তাই এর আদর করা উচিত নয়।

বৈদিকদের মন্তব্যানুসারে প্রথম যুক্তির মধ্যে দোষ এই হল যে - যখন জীবের মধ্যে ব্রহ্ম ব্যাপক রয়েছে তখন সেটি তার থেকে পৃথক কিভাবে হতে পারে আর দ্বিতীয় দলের যুক্তিতে এই দোষ রয়েছে যে প্রাগ্ভাবের সিদ্ধান্ত সর্বদা কারণ-কার্যের মধ্যেই হয় ভিন্ন পদার্থের মধ্যে হয় না। মাটি হল ঘড়ের কারণ। এইজন্য ঘড়া যদিও কাল থেকে প্রত্যক্ষ ছিল না, তবে নিজের কারণের মধ্যে অবশ্য ছিল, তাই কারণ থেকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু জীবের কারণ ব্রহ্ম নয় --- ব্রহ্ম থেকে তৈরি হয় নি। সেটি অনাদিকাল থেকে নিজের অস্তিত্ব পৃথক রেখেছে, এইজন্য পরবর্তীতেও ব্রহ্মতে ঢুকে যেতে পারবে না, কারণ কার্যই নিজের কারণের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, অন্য পদার্থ পারে না। এইভাবে উভয় যুক্তি দুটি নির্জীব সিদ্ধ হচ্ছে। এছাড়াও মোক্ষ অবস্থার যত যুক্তি রয়েছে সেসবগুলো অশ্লীলতাপূর্ণ আর একটাও বিশ্বাসের যোগ্য নয়। এর কারণ এই হল যে মোক্ষের স্থিতি যুক্তির বিষয় নয়, কিন্তু স্বয়ং প্রাপ্ত করে অনুভব করার বিষয়।যুক্তি তো ততটুকু কাজের জন্যই যা দিয়ে জিজ্ঞাসুর মনে পরমাত্মার অস্তিত্বকে বসিয়ে দেওয়া আর তাকে প্রাপ্ত করার অভিলাষা উৎপন্ন করে দেওয়া। এসব ছাড়া যুক্তির কোনো প্রয়োজনই নেই। যদি পরমসাধ্য মোক্ষের মতো মহান্ বিষয় যুক্তি দিয়েই সিদ্ধ হয়ে যায় আর মোক্ষের স্থিতির অনুভবও হয়ে যায় তাহলে তো মোক্ষের সেই সাধন যার উপর মোক্ষের প্রাপ্তি নির্ভর রয়েছে কে করবে আর কে সদাচার, তপ আর যোগসমাধির জন্য কষ্ট উঠাবে, কারণ

মোক্ষের স্থিতির অনুভব তো কেবল তর্ক দিয়েই হতে থাকবে আর ফল এই হবে যে আর্যদের তো তপ, ব্রহ্মচর্য, সদাচার, সরলতা আর যোগ তথা সমাধি আদির ব্যবস্থাই ভঙ্গ হয়ে যাবে, কিন্তু পরমেশ্বর মোক্ষের বাস্তবিক পরিস্থিতির সমাধান করা যুক্তির মর্যাদার উপর রাখেনি, আর তাই বৈদিকদের মতে মোক্ষদশার পরিস্থিতির উপর বিবাদ করা মানে একভাবে সময়ই নষ্ট করা। উপনিষদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসয়োগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে।।
(মুণ্ডকঃ ৩|২|৬)

সমাধিনির্ধৌতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি য়ত্ সুখম্ ভবেত্।
ন শক্যেত বর্ণয়িতুম্ গিরা তদা স্বয়ম্ তদন্তঃ করণেন গৃহ্যতে।।
(মৈত্রায়ণ্যুঃ ৬|৩৪)

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসম্শয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে।।
(মুণ্ডকঃ ২|২|৮)

অর্থাৎ - বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার নিশ্চয় করে সন্ন্যাস আর যোগ দ্বারা ত্যাগী বিদ্বান্ ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করেন। অন্তঃকরণের মলকে ধুয়ে বিদ্বান্ যখন সমাধিতে প্রবেশ করেন আর সেই আত্মাতে যখন সুখ অনুভব করেন সেটি বাণী দ্বারা বলার যোগ্য নয়, বরং সেটি স্বয়ং নিজের অন্তঃকরণ থেকেই গ্রহণ করার যোগ্য। পরমাত্মার দর্শনের ফলে হৃদয়ের গিঁট খুলে যায়, সমস্ত শঙ্কা নিবৃত্ত হয়ে যায় আর কর্মফল ক্ষীণ হয়ে যায়। এই শ্রুতিগুলোর মধ্যে বেদান্তের তর্ক দ্বারা কেবল পরমাত্মাকে সিদ্ধ করে দেওয়ারই সংকেত রয়েছে, মোক্ষের অবস্থার নয়। মোক্ষানন্দের উদাহরণ তো স্বয়ং সমাধিদশাকে প্রাপ্ত করে তখনই দেখা যেতে পারে যখন হৃদয়ের গিঁট খুলে সমস্ত শঙ্কার নিবৃত্তি হয়, এইজন্য মোক্ষের স্থিতির বিতর্কে ব্যর্থ মাথামারি করা বৈদিকদের উচিত নয় আর না কখনও দ্বৈদ-অদ্বৈদের মধ্যে পড়ার আবশ্যকতা রয়েছে। আবশ্যকতা তো কেবল এটাই যে মোক্ষ-প্রাপ্তির উপায় করা হোক, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, কেউ বলছে যে কর্ম দ্বারাই মোক্ষ হয়ে যায় আবার কেউ বলছে যে কেবল উপাসনা (ভক্তি) দ্বারাই মোক্ষ হয়। এরকম পরিস্থিতিতে জিজ্ঞাসু ভ্রমে পরে যায় আর সোজা মার্গ ছেড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, তাই আমি এখানে জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার বিষয়ের মধ্যেও প্রকাশ দেওয়ার চেষ্টা করবো।

আমি মোক্ষের স্বরূপ আর তার স্থানের বর্ণনা করে বলে এসেছি যে দুঃখের অত্যন্তাভাব আর ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তির নামই হল মোক্ষ আর সেটি প্রকৃতিবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার প্রাপ্তি দ্বারাই পাওয়া সম্ভব, এইজন্য দেখা উচিত যে সেটি জ্ঞান দ্বারা বা কর্ম দ্বারা বা উপাসনার পৃথক-পৃথক প্রয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত হতে পারে নাকি সব প্রয়োগকে একই সঙ্গে উপযুক্ত করলে প্রাপ্ত হতে পারে। আমরা মার্গত্রয় বিবেচনা করবো তার পূর্বে এমনটা উচিত বলে মনে হচ্ছে যে সবার আগে এটা জানা যাক যে জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার প্রক্রিয়া আসলো কোথা থেকে? এই বিষয়ের উপর আমাদের বেশি মাথায় চাপ দিতে হবে না ,

কারণ এটা সবাই জানে যে জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনারই নাম হল ত্রয়ীবিদ্যা আর সমষ্টিরূপে ত্রয়ীবিদ্যার নামই হল বেদ, তাই এখন দেখতে হবে যে এই বৈদিক জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার রহস্যটা কি?

আমরা দেখি যে সংসারের মধ্যে যা কিছু সত্ শিক্ষা, অধ্যয়ন-অধ্যাপন আর উপদেশ রয়েছে সেসব তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় আর সেই তিন বিভাগের সারাংশ এতটুকুই হতে পারে যে "জানো আর মন লাগিয়ে করো"। এই বাক্যটির মধ্যে "জানো" হল জ্ঞানকাণ্ড, "মন লাগানো" হল উপাসনাকাণ্ড আর "করো" হল কর্মকাণ্ড। এই তিনটিকে ছাড়া লোক অথবা পরলোকের কোনো কাজই সিদ্ধ হবে না। এটাই হল বেদের জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার রহস্য, কিন্তু যারা কেবল হবনকেই কর্ম বলে, নিজে- নিজেকে পরমাত্মা বলারই নাম জ্ঞান বলে যারা মনে করে আর দিন-রাত রাম-রাম, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলাকেই যারা উপাসনা বলে মনে করে, তারা বেদের বাস্তবিক জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার মর্মকে বোঝে না, কারণ বেদে জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার তাৎপর্যই আলাদা। আমি এখানে অনেক প্রকারের জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনা সম্বন্ধিত কিছু বেদমন্ত্রকে উদ্ধৃত করে দেখাবো যে সেগুলোর মধ্যে ওই ধরনের জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার বর্ণনা নেই যে প্রকারের জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার কথা বলা হয়ে থাকে। বেদ কর্ম করার প্রেরণা করে আজ্ঞা দিয়েছে যে -

ব্রজম্ কৃণুধবম্ স হি বো নৃপানো বর্ম সীব্যধবম্ বহুলা পৃথূনি।

(ঋঃ ১০|১০১|৮)

সম্ গচ্ছধবম্ সম্ বদধবম্ সম্ বো মনাম্সি জানতাম্।

(ঋঃ ১০|১৯১|২)

মা ভ্রাতা ভ্রাতরম্ দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।

(অথর্বঃ ৩|৩০|৩)

অধঃ পশ্যস্ব মোপরি সন্তরাম্ পাদকৌ হর।।

মা তে কশপ্লকৌ দৃশন্ত্স্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ।।

(ঋঃ ৮|৩৩|১৯)

অর্থাৎ - হে মনুষ্য! ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন করো। চতুর্দিকে অনেক বড়ো-বড়ো রক্ষা কবচ বস্তুর নির্মাণ করো। একসঙ্গে চলো, একসঙ্গে কথা বলো আর একসঙ্গে বিচার করো। ভাই ভাইয়ের সঙ্গে আর বোন বোনের সঙ্গে দ্বেষ করো না। হে স্ত্রী! তুমি এখন বুদ্ধিমান হয়েছ, তাই দৃষ্টি নিচে রাখো, সোজাভাবে চলো আর নিজের অঙ্গকে সর্বদা ঢেকে রাখো।

এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে কর্ম করার --- কিছু-না-কিছু করার জন্য উপদেশ রয়েছে, কিন্তু এই কর্ম যজ্ঞ অর্থাৎ হবনের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখে না। এইজন্য স্বীকার করতে হবে যে বেদের মধ্যে কর্মের নামে কেবল যজ্ঞেরই বর্ণনা রয়েছে তা নয়, বরং করা হয় এরকম সমস্ত কর্মকে কর্ম বলা হয়েছে। এইভাবে জ্ঞানেরও কিছু উদাহরণ রয়েছে। বেদ বলেছে -

বেদা য়ো বীনাম্ পদমন্তরিক্ষেণ পততাম্।

বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ।।

(ঋঃ ১|২৫|৭)

ব্রহ্মচর্য়েণ কন্যা য়ুবানম্ বিন্দতে পতিম্।

(অথর্বঃ ১১|৫|১৮)

সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ত্।

(ঋঃ ১০|১৯০|৩)

একয়া চ দশভিশ্চ স্বভূতে ...

(য়জুঃ ২৭|৩৩)

অর্থাৎ - যিনি পক্ষী ও নৌকোর রচন, চালন, জ্ঞান আর মার্গকে জানেন তিনি বিমান ও নৌকোর জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারবেন। ব্রহ্মচর্য দ্বারাই কন্যা যুবক পতিকে প্রাপ্ত করে। পরমেশ্বর সূর্য-চন্দ্রাদি সেভাবেই বানিয়েছেন যেভাবে এর পূর্ব কল্পতে বানিয়েছেন। একের অঙ্কই দশের অঙ্ক হয়ে যায়।

এই মন্ত্রগুলোতে অনেক ধরনের জ্ঞানের উপদেশ রয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের একটাও কথা বলেনি। এইজন্য বলা যেতে পারে যে যেভাবে বেদের কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য মানে কেবল হোম, যজ্ঞ নয় ঠিক সেইভাবে জ্ঞানের তাৎপর্যও কেবল ব্রহ্মজ্ঞান নয়। যেরকম অবস্থা কর্ম আর জ্ঞানের সেই রকম অবস্থা উপাসনারও। বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম্।

(য়জুঃ ২২|২২)

তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনম্ কুরু।

(য়জুঃ ৩২|১৪)

পশ্যেম শরদঃ শতঃ জীবেম শরদঃ শতম্।

(য়জুঃ ৩৬|২৪)

প্রিয়ম্ মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ম্ রাজসু মা কৃণু।

(অথর্বঃ ১৯|৬২|১)

অর্থাৎ - সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবর্চস্বী উৎপন্ন হোক। আমাকে সেই মেধা দ্বারা শীঘ্রই মেধাবী করুন। আমি শত বর্ষ পর্যন্ত দেখবো আর শত বর্ষ পর্যন্ত বাঁচবো। আমাকে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রিয় করুন।

এই প্রার্থনাগুলোর মধ্যে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য কোনো কিছু বলা হয়নি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বেদের উপাসনাকাণ্ডের মধ্যেও ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, শুধু মোক্ষের জন্যই নয়, বরং "জানো আর মন লাগিয়ে করো" এর সিদ্ধান্তানুসারে প্রত্যেক সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা রয়েছে।

যেভাবে জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার পরিকল্পনা প্রত্যেক সিদ্ধির জন্য রয়েছে সেইভাবে এই তিনটির পরিকল্পনা মোক্ষের জন্যও রয়েছে। মোক্ষের জন্য জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার আবশ্যকতা রয়েছে। যারা বলছে যে কেবল জ্ঞান বা কেবল কর্ম বা কেবল উপাসনা দ্বারাই মোক্ষ হয়ে যাবে, তারা ভুল করছে। তারা

নিজের সাম্প্রদায়িক ধুনের কারণে ভুলে যায় যে দুঃখের অত্যন্তাভাব আর আনন্দ প্রাপ্তিরই নাম হল মোক্ষ আর এটা প্রাকৃতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তথা ঈশ্বরের প্রাপ্তি দ্বারাই পাওয়া যেতে পারে। যদি লোকজন এতটুকু মনে রাখে তাহলে তাদের সম্মুখ আপনা-আপনি এসে যাবে যে এই সমস্ত সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করার জন্য সংসার থেকে বিরক্ত হতে হবে, প্রকৃতিবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আর আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার সম্মেলন প্রাপ্ত করতে হবে, কারণ বিনা সংসার হতে বিরাগ উৎপন্ন করে শরীরের মোহ যায় না আর না বিনা শরীর-মোহের ত্যাগ করে দুঃখ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। একইভাবে বিনা দুঃখকে সরিয়ে আর বিনা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে আনন্দও পাওয়া যাবে না। ন্যায়শাস্ত্রের (১|১|২) মধ্যে গৌতমমুনি লিখেছেন যে -

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ

অর্থাৎ - মিথ্যা জ্ঞান থেকে দোষ, দোষ থেকে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি থেকে জন্ম আর জন্ম থেকে দুঃখ হল। জন্মের নিরোধ করলে দুঃখের নাশ হয়ে যায় আর মোক্ষ হয়ে যায়। বলার তাৎপর্য হল যে দুঃখের অত্যন্তাভাব করার জন্য জন্ম অর্থাৎ শরীরের অত্যন্তাভাব করা উচিত, শরীরের অত্যন্তাভাবের জন্য প্রবৃত্তির অভাব হতে হবে, প্রবৃত্তির অভাবের জন্য দোষের অভাব হতে হবে আর দোষের অভাবের জন্য মিথ্যাজ্ঞানের অভাব হতে হবে, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানের অভাব দ্বারাই পূর্ব-পূর্বের বিঘ্নতা দূর হতে পারে, এইজন্য সবার আগে মিথ্যা জ্ঞান দূর করার অবশ্যতা রয়েছে, কারণ মিথ্যা জ্ঞানই হল মোক্ষের সবার থেকে বড়ো বাধক। মিথ্যা জ্ঞানের নাশ সত্য জ্ঞান দ্বারাই হতে পারে। সত্য জ্ঞানের দ্বিতীয় পারিভাষিক নাম হল বস্তুর যথার্থ পরিচয়। যদি সংসারের যথার্থ পরিচয় হয়ে যায় মানুষের, যদি সংসারের কারণ-কার্যের বোধ তার হয়ে যায়, আর যদি মানুষ এটা বুঝতে সক্ষম হয়ে যায় যে সমস্ত দুঃখের আর পাপের মূল কেবল মানুষের এই শরীর তাহলে তার মন থেকে সংসারের মমতার দোষের গভীর ছাপ মুছে যাবে আর তার সাংসারিক প্রবৃত্তির মধ্যে বিবেক উৎপন্ন হবে। মোক্ষপ্রকরণে এই বিবেকের নাম হল জ্ঞান, তবে স্মরণে রাখতে হবে যে কেবল এতটুকু জ্ঞান আর বিবেক উৎপন্ন হলেই মানুষ মুক্ত হয়ে যায় না। যারা কেবল জ্ঞান দ্বারা মোক্ষকে মানে, তারা এটা বোঝে না যে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে কেবল বুঝে যাওয়া মাত্রই পূর্বকৃত কর্মের নাশ কিভাবে হতে পারে! কখনও কোনো বিজ্ঞানবেত্তা অপরাধের দণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছে কি? কক্ষনো না। মনু ভগবানের দণ্ডবিধানের মধ্যে তো ব্রাহ্মণ আর রাজাকে সর্ব সাধারণের দণ্ড থেকেও অনেক অধিক দণ্ড দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। এইজন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে গেলেও আর বিবেক উৎপন্ন হয়ে গেলে পরেও যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর উৎপন্নকারী পূর্বকর্মের নাশ না হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের অত্যন্তাভাব হবে না, কিন্তু কর্মের নাশ বিনা কর্ম ভোগ করে হতে পারে না। কর্মের নাশ বিনা কর্মফল ভোগ করে হতে পারে না এটা ঠিক, তবে আমরা এটা অবশ্যই দেখি যে কর্মফলের ভোগ ক্ষীণ হতে পারে, কারণ কর্মফলের ভোগের সিদ্ধান্ত কর্মের লঘুতা-গুরুতার উপরে অবলম্বিত।

যে কর্মটি গুরু হয় তার ফল আগে আসে আর যেটি লঘু হয় তার ফল পরে আসে। যেভাবে জলের মধ্যে ফেলা একটি ছোটো পাথর ছোট্ট তরঙ্গ উৎপন্ন করে কিন্তু তারপরের ফেলা বড়ো পাথরটি ছোট্ট তরঙ্গকে মিলিয়ে বড়ো ঢেউ উৎপন্ন করে দেয়, সেইভাবে ছোটো কর্মফল বড়ো কর্মফলের সামনে চাপা

পরে যায় আর বড়ো কর্মফল আগে হয়ে যায়। একই দিনে আগে-পরে করা লঘু-গুরু কর্মের পরিণাম আগে-পরে হওয়া দেখা যায়। প্রাতঃকালের দেওয়া দানের কীর্তি আটটার সময় হওয়া চুরির সামনে চাপা পরে যায় আর আটটার সময় হওয়া চুরির অপরাধ দশটার সময় হওয়া রাজার প্রাণরক্ষার সামনে ফ্যাকাসে হয়ে যায়, এইজন্য খারাপ কর্মফলকে চাপানোর সবথেকে উত্তম উপায় হল এটাই যে নিঃস্বার্থভাবে লোকসেবা আদি বড়ো কর্ম করা। যজ্ঞ, দান আর ইষ্টাপূর্তকে করে স্কুল, হাসপাতাল, গোশালা আর ধর্মশালা নির্মাণ করে অথবা ধর্ম, দেশ আর জাতির সেবার জন্য সবদিক থেকে কষ্টকে সহ্য করে যেসব লোকজন লোককল্যাণের নিমিত্ত অনেক প্রকারের বড়ো কর্ম করে তাদের এই সুকৃত কর্ম পাপ ভোগের আগে হয়ে যায় আর পরবর্তী জন্মগ্রহণে বাঁধা উৎপন্ন করে আর তাই সব প্রকারের দুঃখ থেকে বেঁচে যায়।

বলার তাৎপর্য হল এটাই যে এই দুঃখদায়ী শরীর তখনই পাওয়া যায় যখন মানুষ অন্য কাউকে দুঃখ দেয়, কিন্তু যে কখনও কাউকে দুঃখ দেয়নি কেবল সবাইকে সুখই দিয়েছে, সে এই দুঃখদায়ী শরীর আর সংসারে কেন আসবে? এইজন্য দুঃখের অত্যন্তাভাবের জন্য উত্তম কর্মের আবশ্যকতা রয়েছে, কিন্তু যারা বলে যে কেবল কর্ম দ্বারাই মোক্ষ হয়, তারাও ভুল করছে। যদি গীতার কর্ময়োগের অনুসারে কর্ম করলেই মোক্ষ হয়ে যেত তাহলে কর্ময়োগের উপদেশকর্তা স্বয়ং কৃষ্ণই কেন বলেছেন যে **"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি"** অর্থাৎ আমার অনেক জন্ম হয়েছে।এতে তো এটাই জ্ঞাত হচ্ছে যে তিনিও মুক্ত হননি। যদি এটাও মানা হয় যে ভগবান্ কৃষ্ণের উপর এই নিয়ম প্রযোজ্য হয় না তাহলে সেই অর্জুনেরই দশা দেখা উচিত যাকে কর্ময়োগের উপদেশ করা হয় আর যিনি সেই কর্ময়োগের অনুসারে যুদ্ধ করেন। মহাভারতের মধ্যেও লেখা রয়েছে যে মৃত্যুর পরে নরক যন্ত্রণায় তিনিও চিৎকার করছিলেন আর সেই যন্ত্রণা থেকে যুধিষ্ঠির বাঁচিয়ে ছিলেন যাঁকে কখনও কর্ময়োগের উপদেশই দেওয়া হয়নি। বলার তাৎপর্য হল যে কেবলমাত্র কর্ম দ্বারাই মোক্ষ হতে পারে না।

এখন বাকি রইলো উপাসনা। যারা বলে যে এটাই মোক্ষের সাধন, তারাও ভুল করছে।যেভাবে কেবল জ্ঞান আর কেবল কর্ম মোক্ষ সাধনের জন্য অসমর্থ, কিন্তু মোক্ষ সাধনের এক-একটি অঙ্গকে পূরণ করে সেইভাবে উপাসনাও করে। উপাসনাও একাই মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারবে না, কারণ উপাসনার দ্বারা শরীরের অত্যন্তাভাব হবে না, তবে সেটি মোক্ষের এক অঙ্গের পূর্তি করবে। যেভাবে জ্ঞানের দ্বারা বিবেক উৎপন্ন হয় আর কর্ম দ্বারা শরীরের অত্যন্তাভাব হয়ে যায় ঠিক সেইভাবে উপাসনা দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়ে যায়, কারণ জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার মধ্যে এক উপাসনাই হল এরকম যা পরমাত্মাকে অন্তঃকরণের মধ্যে আবির্ভূত করাতে পারে। যেসময় মানুষ জ্ঞান দ্বারা বিবেক আর বৈরাগ্য উৎপন্ন করে মানুষ ছোটো-বড়ো সৎকর্মকে করে সমাধিতে পৌঁছে যায় আর স্থিরচিত্ত হয়ে যায় সেই সময় উপাসনার দ্বারাই সে পরমাত্মাকে আত্মার মধ্যে প্রকট হওয়ার প্রার্থনা করে। যদি উপাসনা দ্বারা দ্রবীভূত হয়ে পরমেশ্বর দর্শন না দেন তাহলে মানুষ জ্ঞান আর কর্ম দ্বারা কিছুই করতে পারবে না। যেভাবে চোখের মধ্যে পরে থাকা ধুলি কণাকে চোখ দেখতে পারে না সেইভাবে আত্মার মধ্যে ঢুকে থাকা পরমাত্মাকে বোঝা যায় না, কিন্তু যেভাবে চোখের কণা তার ঝিকমিকি দ্বারা চোখকে তার অনুভব স্বয়ং করিয়ে দেয়, সেইভাবে সমাধিস্থ শান্ত আত্মার মধ্যে নিত্য ব্যাপ্ত পরমেশ্বরও

নিজের প্রেরণা দ্বারা নিজের অনুভব করিয়ে দেন। পরমাত্মার এই অনুভবই হল জীবনমুক্তি আর মোক্ষের প্রবল প্রমাণ। যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমেশ্বরের অনুভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মোক্ষের মধ্যে সন্দেহই ভাবা উচিত, কিন্তু এই অনুভব উপরিউক্ত জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার মিশ্রিত প্রচেষ্টা দ্বারাই প্রাপ্ত হতে পারে, এইজন্য মোক্ষের না কেবল জ্ঞান, না কেবল কর্ম আর না কেবল উপাসনা, কিন্তু তিনটির মিশ্রণ যা আর্যদের বর্ণাশ্রমধর্মের মধ্যে ভরপুর রয়েছে। উপনিষদ্ বলছে -

আচার্য়কুলাদ্বেদমধীত্য য়থাবিধানম্ গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্মিকান্বিদধদাত্মনি সর্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিম্সন্সর্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবম্ বর্তয়ন্যাবদায়ুষম্ ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে।ন চ পুনরাবর্ত্ততে। ন চ পুনরাবর্ত্ততে।।

(ছান্দোগ্য উপ০ ৮|১৫|১)

অর্থাৎ - আচার্যকূল থেকে বেদাধ্যায়ন করে, গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে, সমাবর্তন হওয়ার পর গৃহে এসে, স্বাধ্যায়রত থেকে আর ধার্মিক বিদ্বানদের সৎসঙ্গ দ্বারা, সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে, অহিংসা ও বুদ্ধির দ্বারা সকল প্রাণীদের উপর দৃষ্টি রেখে আর পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত এই ধরনের ব্যবহার করা বিদ্বানই ব্রহ্মলোক (মোক্ষ) - কে প্রাপ্ত করে, যেখান থেকে সে ফিরে আসে না, আসে না।

এটাই হল আর্য সভ্যতানুসারে মোক্ষ প্রাপ্ত করার মার্গ। এই মার্গের মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান, কর্ম আর উপাসনার মিশ্রণ পাওয়া যায়। এইজন্য এটা হল মোক্ষ প্রাপ্ত করার উপায় আর এটাই হল মোক্ষের স্বরূপ, স্থান আর উপায়ের কিছুটা দিগ্দর্শন। এই দিগ্দর্শন দ্বারা মোক্ষের মহত্বতে ভালো প্রকাশ পরে, কিন্তু সংসারে পদে-পদে সৃষ্টির পদার্থের আবশ্যকতা হয় আর প্রাণীদের হানি-লাভের প্রশ্ন সামনে এসে যায়, এইজন্য প্রাণী সম্বন্ধিত আর মোক্ষের সঙ্গে হওয়া উপরিউক্ত অর্থ, কাম আর ধর্মের বর্ণনা হওয়াটা আবশ্যক, অতএব আমি এরপর মোক্ষের সাধন আর শরীরকে স্থির রাখে এরকম অর্থের বর্ণনা করবো।

<u>অর্থের প্রাধান্য</u>

আর্য সভ্যতার প্রধান চারটি আধারশিলার মধ্যে মোক্ষের মতো অর্থেরও প্রাধান্য রয়েছে। অর্থের দ্বিতীয় নাম হল সম্পত্তি। এই অর্থই হল মোক্ষের সহায়ক। অর্থশুদ্ধি ছাড়া মোক্ষ হবে না |আমি চারটি পদার্থের বর্ণনা করে লিখে এসেছি যে, যেভাবে আত্মার জন্য মোক্ষের, বুদ্ধির জন্য ধর্মের আর মনের জন্য কামের আবশ্যকতা রয়েছে সেইভাবে শরীরের জন্য অর্থেরও আবশ্যকতা রয়েছে। মোক্ষ আর ধর্মের আবশ্যকতা কেবল মানুষেরই হয়, কিন্তু অর্থ আর কামকে ছাড়া তো মানুষ, পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ আর তৃণ-পল্লবেরও নির্বাহ হবে না। কামকে ছাড়াও চলতে পারবে যদি মনোরঞ্জনকে সরিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু যে অর্থের উপর

প্রাণীমাত্রের শরীর স্থির রয়েছে আর প্রাণীমাত্রের জীবন স্থির রয়েছে, সেই অর্থের প্রাধান্যতার অনুমান সহজেই করে নেওয়া উচিত আর তার মীমাংসা খুবই সাবধানের সঙ্গে করা উচিত, কারণ তার অনুচিত সংগ্রহ দ্বারা মোক্ষমার্গ নষ্ট হয়ে যাবে। আর্যরা অর্থের এই মহত্বকে বুঝেছিল। এটাই হল কারণ যে তারা অর্থের বিষয়ে খুবই সূক্ষ্ম আর উদারভাবের সঙ্গে বিচার করেছে। মনুস্মৃতিতে (৫|১০৬) লেখা রয়েছে যে **"সর্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচম্ পরম্ স্মৃতম্"**, সমস্ত পবিত্রতাগুলোর মধ্যে অর্থের পবিত্রতাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ, এইজন্য সংসার থেকে অর্থ সংগ্রহ করার সময় খুবই সাবধানের সঙ্গে কাজ করা উচিত। অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে মনু ভগবান্ বলেছেন -

অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
য়া বৃত্তিস্তাম্ সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি।।২।।
য়াত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থম্ স্বৈঃ কর্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্বীত ধনসম্চয়ম্।।৩।।
সর্বান্পরিত্যজেদর্থাস্স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
য়থাতথাऽধ্যাপয়ম্স্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা।।১৭।।
(মনুস্মৃতিঃ ৪|২, ৩, ১৭)

অর্থাৎ - যে বৃত্তিতে জীবদের কোনো পীড়া হয় না, অথবা অল্প পীড়া হয়, সেই বৃত্তি দ্বারা আপত্তিরহিত কালে বৈদিক আর্য নির্বাহ করবে। বিনা নিজের শরীরকে ক্লেশ দিয়ে নিজেরই অগর্হিত কর্ম দ্বারা কেবল নির্বাহমাত্রের জন্য অর্থের সংগ্রহ করবে আর সেই সমস্ত অর্থকে ত্যাগ করে দিবে যা স্বাধ্যায়ে বিঘ্ন উৎপন্ন করে।

এই শ্লোকগুলোতে আপত্তিরহিত সময়ে অর্থ সংগ্রহের পাঁচটি নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে। প্রথম নিয়মটি হল অর্থ সংগ্রহ করার সময় কোনো প্রাণীরই যেন কষ্ট না হয়। দ্বিতীয় নিয়মটি হল অর্থ সংগ্রহ করার সময় নিজের শরীরেরও যেন কষ্ট না হয়। তৃতীয় নিয়মটি হল স্বয়ং নিজের পুরুষার্থ দ্বারা উৎপন্ন করা অর্থ দিয়ে নির্বাহ করা, অন্যের কামাই করা থেকে নয়। চতুর্থ নিয়মটি হল নিজের উৎপন্ন করা অর্থও যেন কোনো নিন্দিত কর্মের দ্বারা উৎপন্ন না হয়|পঞ্চম নিয়মটি হল অর্থ উপার্জনের কারণে স্বাধ্যায়ের (লেখাপড়ার) মধ্যে যেন বিঘ্ন উৎপন্ন না হয়, অর্থাৎ যে অর্থ এই পাঁচটি নিয়মকে ধ্যানে রেখে উপার্জিত করা হবে, সেই অর্থই আর্য সভ্যতার অনুসারে পবিত্র হবে, কিন্তু যে অর্থ এই নিয়মের দুর্লক্ষ্য করে সংগ্রহ করা হবে, তা অনর্থ হয়ে যাবে, এইজন্য প্রত্যেক আর্যকে অনর্থ থেকে এড়িয়ে গিয়ে অর্থোপার্জন করা উচিত, কারণ বেদ উপদেশ করেছে যে -

ইশা বাস্যমিদ সর্বম্ য়ত্কিঞ্চ জগত্যাম্ জগত্।
ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।
কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছত সমাঃ।

এবম্ ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

(য়জুঃ ৪০|১-২)

অর্থাৎ - এই সংসারে পরমাত্মাকে সর্বত্র ব্যাপক বুঝে কারও ধনের প্রতি ইচ্ছা করবে না, কিন্তু ততটুকু ধন দিয়েই নির্বাহ করবে যতটা তিনি তোমার জন্য স্থির করেছেন। আজীবন এইভাবে কর্ম করলে পরেই মোক্ষ হতে পারে আর এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

এই দুটি মন্ত্রের তাৎপর্য হল এটাই যে, মোক্ষার্থীকে সংসার থেকে ততটুকুই পদার্থ নেওয়া উচিত যতটা নিলে পরে অন্য কোনো প্রাণীর কষ্ট হবে না। এই নিয়মটির পালন কেবল এই সিদ্ধান্তের অবলম্বন দ্বারাই হওয়া সম্ভব যে, যতটা সম্ভব এই সংসার থেকে খুবই সরল উপায়ের সঙ্গে খুবই কম পদার্থ নেওয়া, কারণ সংসারের মধ্যে যত প্রাণী রয়েছে সকলের অর্থের আবশ্যকতা রয়েছে, এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত খুবই কম নেওয়ার নিয়ম হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সকলের জন্য অর্থের সুবিধা হতে পারবে না।

যদিও সংসারে সকল প্রাণীরই অর্থের আবশ্যকতা রয়েছে, কিন্তু মানুষের অর্থ সম্বন্ধিত আবশ্যকতা অন্য প্রাণীদের অপেক্ষা খুবই বিলক্ষণ। সংসারে দেখা যায় যে, মানুষের অতিরিক্ত যত প্রাণী রয়েছে তাদের সকলের অর্থ কেবল আহার আর ঘর পর্যন্তই সীমিত। তাদের আহার আর ঘরের অতিরিক্ত শরীর রক্ষা করার সম্বন্ধিত অন্য কোনো অর্থের আবশ্যকতা হয় না। অনেক প্রাণীদের তো আহারের অতিরিক্ত ঘরেরও আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু মানুষের অর্থ চারটি ভাগে বিভাজিত, আর এই চারটি বিভাগের নাম হল - (১) ভোজন, (২) বস্ত্র, (৩) গৃহ আর (৪) গৃহস্থী। এই বিশ্বের মধ্যে যত মানুষ রয়েছে, তা সে জঙ্গলে বসবাসকারী কোল, ভীল হোক, অথবা ফ্রান্সে বসবাসকারী বড়ো-বড়ো অনুরাগী হোক, তা সে রাজা বাদশাই হোক অথবা ত্যাগী-সন্ন্যাসী হোক, সকলের উপরিউক্ত চার প্রকারের অর্থের আবশ্যকতা রয়েছে। যেভাবে একজন সম্রাটকে নানা প্রকারের ব্যঞ্জনের, অনেক প্রকারের বহুমূল্য বস্ত্রের, বড়ো-বড়ো রাজপ্রাসাদের আর রঙ্গমহলের তথা সহস্র প্রকারের বাসন, আসবাবপত্র, অস্ত্র, যান আর অন্য অনেক এরকমই পদার্থের আবশ্যকতা হয়, সেইভাবে একজন ত্যাগী - পরিব্রাটেরও ভিক্ষান্ন, কৌপিন, কন্দরা আর দণ্ড-কমণ্ডলুর আবশ্যকতা হয়, সেইভাবে একজন আমেরিকার নাবিক থেকে আফ্রিকার জুলু পর্যন্ত উক্ত চারটি পদার্থের আবশ্যকতা হয়। এর তাৎপর্য হল এটাই যে, সংসারের সকল মানুষের আর্থিক আবশ্যকতাগুলো একই সমান, কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এই সমতার মধ্যেই এত অসমতা বিদ্যমান রয়েছে যে তার সামঞ্জস্য করা খুবই কঠিন। কেউ মাংস খেয়ে, কেউ ফল খেয়ে, কেউ অন্ন খেয়ে আবার কেউ সবকিছু খেয়ে নির্বাহ করছে। এইভাবে কেউ কৌপিন লাগিয়ে, কেউ কোট - পতলুন পড়ে, কেউ ধুতি জড়িয়ে কাপড়ের উপয়োগ করে। এইভাবে কারও গৃহ অনেক তলা উঁচু আকাশের সঙ্গে কথা বলে আবার কারও গৃহ ভূগর্ভস্থের মতো ভূমির নিচে নির্মিত পাতালের সঙ্গে কথা বলছে। ভোজন, বস্ত্র আর গৃহের যেরকম অবস্থা সেরকমই অবস্থা গৃহস্থীরও। কোথাও ষোলো-ষোলো বাক্স ভর্তি জামা, বাহান্ন-বাহান্ন জোড়া জুতো, নানা প্রকারের চেয়ার আর আলমারি তো কোথাও বা পরিষ্কার ঘরের মধ্যে কেবল বিছানা পাতা রয়েছে আর খানিকটা খাওয়া-রান্নার বাসন রয়েছে। বলার তাৎপর্য হল মানুষের আবশ্যকতাগুলো যদিও একই সমান

তবুও তার সংখ্যা আর প্রকারের মধ্যে এত পার্থক্য আর বিষমতা রয়েছে যে তাকে দেখে এই প্রশ্নটি স্বাভাবিকই উপস্থিত হয়ে যায় যে এই সবগুলোর মধ্যে কোন প্রকারটি হল উত্তম? যতদূর মনে পড়ে এই প্রশ্নটিকে আজ পর্যন্ত কেউ এরকম ভাবে সমাধান করেনি যা সংসারের আর্থিক সমস্যাকে সমাধান করে মানুষকে মোক্ষসুখী বানাতে পারে, কিন্তু বড়ো গর্বের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে আর্যরা অনেক অনুসন্ধানের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধিত এই চারটি বিভাগকে এরকমভাবে সমাধান করেছে যে তার দ্বারা না তো কোনো প্রাণীর দুঃখ হতে পারে আর না স্বয়ং নিজের কোনো কষ্ট হতে পারে, বরং সংসারের আর্থিক অসমতাকে নষ্ট করে একটি এমন মার্গ তৈরি হয়ে যায় যা মানুষকে লোক আর পরলোকের সুখকে সহজভাবে প্রাপ্ত করাতে পারে। এটাই হল কারণ যে আর্যরা এই প্রকারের অর্থকে নিজেদের সভ্যতার মধ্যে প্রধান স্থান দিয়েছে। এখানে আমি অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধিত উক্ত চারটি বিভাগকে ক্রমে-ক্রমে লিখবো আর দেখাবো যে আর্যরা কত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অর্থের সমাধান করেছে।

আর্য ভোজন

আর্যরা অর্থের প্রধান অঙ্গ ভোজন অর্থাৎ আহারের খুবই নিরীক্ষণ করেছে। তারা আর্য আহারকে ধার্মিক আর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অনুসারে দাঁড় করেছে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে **"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"** অর্থাৎ আহারের শুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বের শুদ্ধি হয় আর সত্ত্বের শুদ্ধি দ্বারা স্মরণশক্তি নিশ্চল হয়, কিন্তু অশুদ্ধ আহার দ্বারা সত্ত্ব আর স্মৃতিও অশুদ্ধ হয়ে যায়। এমনকি অন্নদোষের কারণে আয়ুও কমে যায়। মনু ভগবান্ স্পষ্ট বলেছেন যে **"আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রাঞ্জিঘাংসতি"**, অর্থাৎ আলস্য আর অন্নদোষ হতে মানুষ শীঘ্র মারা যায়। এইজন্য যে আহার আয়ু, বল, রূপ, কান্তি আর মেধার বৃদ্ধিকারী হবে সেটাই আর্যদের ভোজন হতে পারে। কেবল এটাই নয় বরং যে ভোজনের সংগ্রহ করতে অর্থের পাঁচটি নিয়মের অনুকূলতা হবে, কোনো প্রাণীর আয়ু আর ভোগে বিঘ্ন হবে না এরকম আর আয়ু, বল, রূপ আর মেধার সঙ্গে-সঙ্গে মোক্ষ প্রাপ্ত করতেও সহায়ক হবে সেই আহারই আর্যদের ভোজন হতে পারে, আর্য ভোজন হল চারটি পরীক্ষা দিয়ে বাঁধা। প্রথম পরীক্ষাটি হল - যে আহার দ্বারা আয়ু, বল, কান্তি, আর বুদ্ধির বৃদ্ধি হবে। দ্বিতীয় পরীক্ষাটি হল - যাকে প্রাপ্ত করতে কারও কষ্ট হয় না, অর্থাৎ কোনো প্রাণীর আয়ু আর ভোগের মধ্যে বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। তৃতীয় পরীক্ষাটি হল - যে আহার বিনা কোনো কষ্টে কেবল নিজেরই অগর্হিত কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে আর চতুর্থ পরীক্ষাটি হল - যে আহার মোক্ষ প্রাপ্ত করতে সহায়ক হবে, সেটাই আর্যদের ভোজন হতে পারে, অন্য নয়। এরকম আহারকে আর্যদের পরিভাষাতে সাত্ত্বিক আহার বলে। সাত্ত্বিক আহারের স্বরূপ আর প্রভাব বর্ণনা করার সঙ্গে ভগবদ্গীতার মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন -

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতি বিবর্ধনঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।

(গীতাঃ ১৭|৮)

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী য়তবাক্কায়মানসঃ।

(গীতাঃ ১৮|৫২)

অর্থাৎ - আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ আর সৌন্দর্যের বৃদ্ধিকারী রসালো, হালকা, পুষ্ট আর রুচিকর আহারই সাত্ত্বিক পুরুষদের প্রিয়, এইজন্য মোক্ষার্থীদের সর্বদা একান্ত সেবী, হালকা ভোজনকারী আর শরীর, বাণী আর মনকে নিয়ন্ত্রণকারী হওয়া উচিত। এই সাত্ত্বিক আর হালকা ভোজনের স্পষ্টীকরণ করার সঙ্গে বেদ বলেছে যে-

ঊর্জম্ বহন্তীরমৃতম্ ঘৃতম্ পয়ঃ কীলালম্ পরিস্রুতম্।
স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্।।

(য়জুঃ ২|৩৪)

অর্থাৎ - ঘী, দুধ, অন্নরস (মিশ্রী), পাকা, পরিশ্রুত (ঝরে পরা) ফল আর জল আদি বলকারক পদার্থকে খেয়ে তথা পান করে হে পিতর! তুমি তৃপ্ত হও।

এই মন্ত্রটির মধ্যে সেই আহারের স্বরূপ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাকে গীতা সাত্ত্বিক আহার বলেছে আর যাকে পিতৃপূজনের পরে আর্যদের নিত্য খাওয়া উচিত। গীতা সাত্ত্বিক আহারের লক্ষণ রসালো, হালকা, পুষ্ট আর রুচিকর করেছে আর বেদমন্ত্রের মধ্যে তাকেই ঘী, দুধ, মিশ্রী, জল আর ফল বলা হয়েছে। উভয়ের তাৎপর্য হল একই। ঘী, দুধ, মিশ্রী, জল আর ফলই রসালো, হালকা, পুষ্ট আর রুচিকর হয়, এইজন্য ঘী, দুধ, মিশ্রী, জল আর ফলই হল আর্যদের আহার। এই আহারই উপরিউক্ত চারটি পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষিতও হয়েছে। এই পদার্থগুলোকে খাওয়া-পান করার জন্যই আয়ু, বল, মেধা আর সত্ত্বের বৃদ্ধি হয়, এই পদার্থগুলোকে খেলে না তো কোনো প্রাণীর কষ্ট হয় আর না কোনো প্রাণীর আয়ু আর ভোগের মধ্যে বাধা পড়ে, এই পদার্থ বিনা কোনো প্রকারের কষ্ট করে কেবল ফলের বাগান লাগিয়ে আর গৌ সেবা করলেই প্রাপ্ত হয়ে যায় আর হালকা ভোজন হওয়াতে এই পদার্থই ব্রহ্মচর্য আর য়োগাভ্যাসের মধ্যেও সহায়ক হয় আর মোক্ষ সাধনের যোগ্য বানিয়ে তোলে, এইজন্য আর্যশাস্ত্রের মধ্যে ইষ্টাপূর্তের দ্বারা বন-বাগান থেকে ফলের আর গোরক্ষার দ্বারা ঘী-দুধের প্রাপ্তি করা উত্তম বলেছে। যারা বলে যে ফল খেলে আর দুধ পান করলেও হিংসা হয়, তারা না তো ফলোৎপন্ন করার বিদ্যাকে জানে, আর না ফল খেতে জানে আর না গোদুগ্ধের সম্বন্ধে কিছু জানে, এইজন্য আমি এখানে একটু এই দুটি বিষয়ের মধ্যেও প্রকাশ ফেলার চেষ্টা করবো।

মানুষের আহার হল চার প্রকারের, যার প্রাপ্তি বৃক্ষ আর পশুদের থেকে হয়ে যায়। এরমধ্যে দুই প্রকারের আহার বৃক্ষ থেকে আর দুই প্রকারের আহার পশুদের থেকে প্রাপ্ত হয়। দুধ আর মাংস পশু থেকে তথা ফল আর ফসল বৃক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এরমধ্যে ফল, দুধ, ঘৃতাদি হল সাত্ত্বিক, ফসল আর শাকাদি হল রাজস্ আর মাংস-মদ্যাদি হল তামস্ অন্ন। সাত্ত্বিক অন্নের মধ্যে ফল আর দুধ-ঘৃতাদিকে ধরা হয়। ফল আর ঘৃত-দুগ্ধাদিকে বিধিবত্ গ্রহণ করলে পরে হিংসার কিছুই হয় না। পৃথিবীকে উর্বরা বানিয়ে আর বীজকে কলম

আদি দ্বারা সুসংস্কৃত করে সেচ আর আগাছা নিড়ানির দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হয়, তা প্রাকৃতিক বন্য ফলের তুলনায় বড়ো হয় আর সেগুলোতে বীজ অনেক কম হয়ে থাকে, তাই স্বভাবে পাকা আর আপনা- আপনি পরে যাওয়া ফলের বীজ বের করে নিয়ে খেলে তাতে কোনো হিংসাই হয় না, কারণ বীজ বের করে খেলে অন্য বৃক্ষকে উৎপন্নকারী বীজের নাশ হয় না। একইভাবে পারস্কর শিক্ষার অনুসারে বৃষোত্সর্গের দ্বারা উত্তম ক্ষেত্রের বৃষকে স্বতন্ত্রতাপূর্বক চড়িয়ে আর তার থেকে অমুক ক্ষেত্রের গৌ দ্বারা সন্ততি উৎপন্ন করিয়ে আর সেই সন্ততির সন্তানকেও সেই ক্রম দ্বারা গোবর্ধন (Cow-breeding) এর সিদ্ধান্তানুসারে তৈরি করলে পঞ্চম প্রজন্মতে দুধের মাত্রা চারগুণ বেড়ে যায় আর এক-একটি গৌ দেড়-দেড় মন দুধ দিতে পারে। কিন্তু গাভীকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে আর ইচ্ছেমত স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি উৎপন্ন করলে পরে কখনও এত দুধ উৎপন্ন হয় না, তাই অনেক গাভীকে এইভাবে অমিত দুগ্ধদাতা বানিয়ে, তাদের থেকে কিছু পরিমাণ দুধ নিলে পরে হিংসা হয় না, কারণ যতটা দুধ বাচ্চার জন্য আবশ্যক সেটা তো সে পেয়েই যায়। মানুষ তো ফলের মতো নিজের কারিগরী দ্বারা গাভীর সেবা করে দুধকে স্বাভাবিক পরিমাণ থেকে অধিক বাড়িয়ে দেয়, এইজন্য যতটা অধিক বাড়িয়ে দেয় ততটা নিলে পরে কারও হানি হয় না, অতএব হিংসাও হয় না। বাকি রইল রাজস্ আর তামস্ অন্ন, তামসান্নের জন্য মনুস্মৃতিতে (১১|৯৫) স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে **"য়ক্ষরক্ষঃ পিশাচান্নম্ মদ্যম্ মাম্সম্ সুরাऽऽসবম্"**, অর্থাৎ মাংস আর মদ্য হল রাক্ষস আর পিশাচদের অন্ন, আর্যদের নয়, তাই মাংস-মদ্য আদি হিংসারূপ তামস্ আহারকে আর্য সভ্যতার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়নি, কিন্তু রাজসান্ন অর্থাৎ খাদ্যশস্য আর শাকান্ন অর্থাৎ যাকে খেলে কিছু হিংসার সম্ভাবনা হয়, সেগুলোকে আপত্কালের সময়েই সেবন করার আজ্ঞা রয়েছে, তাই যজ্ঞশেষান্ন খাওয়ার বিধান করা হয়েছে। কিছু লোক বলে যে আর্যদের সভ্যতার মধ্যে অন্ন আর কৃষির জন্যও স্থান রয়েছে, কারণ অনেক স্থানে অন্ন আর কৃষির প্রশংসা করা হয়েছে। আমি বলবো যে ঠিক আছে আর্যদের সভ্যতার মধ্যে অন্ন আর কৃষির বর্ণনা এসেছে, কিন্তু বর্ণনার অভিপ্রায় অন্ন রয়েছে। অর্থাৎ যেখানে-যেখানে অন্নের বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে - সেখানে সর্বত্র অন্নের তাৎপর্য আহারই রয়েছে, খাদ্যশস্য নয়, এইজন্য আহারের পরিভাষা করে উপনিষদের মধ্যে লেখা হয়েছে যে **"অদ্যতেऽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নম্ তদুচ্যত ইতি।"** (তৈত্তিরীয়০ ২|২|১ {পৃষ্ঠ৪০০}) অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের যা কিছু আহার রয়েছে সেই সব হল অন্ন, কারণ অন্ন শব্দ **"অদ্ ভক্ষণে"** ধাতু হতে তৈরি, যার তাৎপর্য হল যা কিছু খাওয়া যায়, সে সবই হল অন্ন, এইজন্য মনু ভগবান্ পিশাচ আর রাক্ষসদের অন্ন মদ্য আর মাংস বলেছেন। বলার তাৎপর্য হল অন্ন শব্দ দ্বারা কেবল খাদ্যশস্যই গ্রহণ হয় না, বরং অন্নের মধ্যে সেই সমস্ত পদার্থের সমাবেশ রয়েছে যা হল প্রাণীমাত্রের আহার। এখন বাকি রইলো কৃষি, কৃষির জন্য ভগবান্ মনু বলেছেন -

বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবম্স্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োऽপি বা।
হিম্সাপ্রায়াম্ পরাধীনম্ কৃষিম্ য়ত্নেন বর্জয়েত্।।
কৃষিম্ সাধিবতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।

ভূমিম্ ভূমিশয়াম্শ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়ো মুখম্॥

(মনুঃ ১০|৮৩-৮৪)

অর্থাৎ - বৈশ্যবৃত্তি থেকে জেতা ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় অনেক হিংসাত্মক আর পরাধীন কৃষিকাজকে যত্নের সঙ্গে ছেড়ে দিবে। "কৃষিকাজ করা ভালো", এমনটা লোকে বলে, কিন্তু এই বৃত্তি সত্পুরুষদের দ্বারা এইজন্য নিন্দিত যে কৃষকের লোহা লাগানো হাল ভূমি আর ভূমিবাসীদের নাশ করে দেয়, কারণ ধান্যের কৃষিকাজ দ্বারা বন আর বাটিকার নাশ হয়ে যায়, পশুদের চারণভূমি নষ্ট হয়ে যায় আর বনবৃক্ষ থেকে যে প্রাকৃতিক শীতলতা প্রাপ্ত হয় তা আর থাকে না। জঙ্গলের শীতলতার অভাবে বর্ষা কমে যায় আর প্রাণনাশক বায়ুর ব্যয় কম হয়ে যাওয়ার জন্য বায়ু বিষাক্ত হয়ে যায় আর অনাবৃষ্টি তথা রোগ হতে মানুষ-পশু-পক্ষী আদি মরে যায়, এইজন্য কৃষিকে গর্হিত বলা হয়েছে আর বলা হয়েছে যে কৃষি হতে ভূমি আর ভূমিতে বসবাসকারী প্রাণী মরে যায়। এরপর মনু ভগবান্ বলেছেন যে -

অকৃতম্ চ কৃতাত্ক্ষেত্রাদ্ গৌরজাবিকমেব চ।
হিরণ্যম্ ধান্যমন্নম্ চ পূর্বম্ পূর্বমদোষবত্॥

(মনুঃ ১০|১১৪)

অর্থাৎ - নির্মাণ করা ক্ষেতের তুলনায় স্বাভাবিক ক্ষেতের মধ্যে, ছাগ-মেষের তুলনায় গৌয়ের মধ্যে আর ধান্য তথা অন্নের তুলনায় সোনার মধ্যে কম দোষ হয়, অর্থাৎ উত্তর-উত্তর থেকে পূর্ব-পূর্ব ভালো। অন্নের থেকে সোনা ভালো, মেষ-ছাগের থেকে গৌ ভালো আর অন্নের ক্ষেতের থেকে তপোবনের অকৃত ক্ষেত উত্তম।

এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে অন্নকারী ক্ষেতের স্থান আর্য সভ্যতাতে খুবই নিকৃষ্ট। মনু ভগবান্ যেখানে কৃষিকাজকে এত হীন দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেখানে বৃক্ষের সুরক্ষার জন্য খুবই বল দিয়েছেন। উনি বলেছেন যে -

ইন্ধনার্থমশুষ্কাণাম্ দ্রুমাণামবপাতনম্।
আত্মার্থম্ চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনম্ তথা॥

(মনুঃ ১১|৬৪)

ফল দানাম্ তু বৃক্ষাণাম্ ছেদনে জপ্যমৃক্ শতম্।
গুল্মবল্লীলতানাম্ চ পুষ্পিতানাম্ চ বীরুধাম্॥

(মনুঃ ১১|১৪২)

বনস্পতীনাম্ সর্বেষামুপভোগম্ য়থায়থা।
তথাতথা দমঃ কার্য়ো হিম্সায়ামিতি ধারণা॥

(মনুঃ ৮|২৮৫)

অর্থাৎ - জ্বালানির জন্য সবুজ(জীবিত) বৃক্ষকে কাটা আর নিন্দিত অন্ন খাওয়া হল উপপাতক। ফল দেওয়া বৃক্ষ, গুল্ম, লতা আর পুষ্পিত বৃক্ষকে যে কাটবে একশ ঋচার জপ করবে। যে ব্যক্তি সমস্ত বনস্পতির যেমন-

যেমনটা হানি করবে, তাকে রাজা সেইরকম দণ্ড দিবে৷

এই আজ্ঞাগুলো থেকে সিদ্ধ হচ্ছে যে বন আর বাটিকার স্থান ক্ষেতির থেকে অনেক বড়ো৷ ঋগবেদ ১০|১৪৬|৬ এর মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"বহ্বন্নমকৃষীবলাম্"**, অর্থাৎ বনবৃক্ষ থেকে বিনা কৃষিকাজ করেই অনেক অন্ন, অর্থাৎ মানুষের আহারের উৎপত্তি হয়৷ বলার তাৎপর্য হল আর্য সভ্যতার মধ্যে কৃষির অধিক বন-তপোবনের মহানতা অনেক বেশি৷ যদিও বন-তপোবনের মহানতা অনেক বেশি তবুও জীবিকার প্রবন্ধক বৈশ্যদের কৃষি করারও কিছুটা আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে৷ এই নির্বল আজ্ঞার কারণ হল তিনটি৷ প্রথমত কৃষি থেকে উৎপন্ন খাদ্যশস্য যজ্ঞের কাজে লাগে, অর্থাৎ অনেক প্রকারের যজ্ঞ অনেক প্রকারের অন্ন দ্বারাই হয়৷ দ্বিতীয়ত, কিছু পরিমাণ যজ্ঞশেষান্ন প্রসাদের রূপে প্রতিদিন খাওয়ারও অভ্যাস রাখা হয়, যাতে সংকটের সময় অন্ন দিয়েও নির্বাহ করা যেতে পারে, (আহারের অভ্যাস একদম পরিবর্তন করা যায় না, তাই আপত্কালকে ধ্যানে রেখে প্রসাদের রূপে কিছু পরিমাণ যজ্ঞশেষান্ন অবশ্য খাওয়া উচিত৷ নিত্য যজ্ঞান্ন খেলে তাদের ভালো করে রন্ধনেরও ভাবনা থাকবে আর ভালো রন্ধন করা সুস্বাদু অন্নই যজ্ঞের মধ্যে গুণকারী হবে৷) এইজন্য বলা হয়েছে যে যজ্ঞশেষ অন্নই খাওয়া উচিত, কেবল নিজের জন্য রন্ধন করা নয়৷ মনু ভগবানও তাই বলেছেন **"য়জ্ঞশিষ্টাশনম্ হ্যেতত্সতামন্নম্ বিধীয়তে"** (মনুঃ ৩|১১৮)৷ তাৎপর্য হল খাদ্যশস্য আর শাকান্ন আদি রাজস্ আহার আর্যদের স্বাভাবিক ভোজন নয়৷ আর্যদের তো সাত্ত্বিক আহারই হল ফল আর দুধ যা অর্থ আর আহার সংগ্রহের সমস্ত নিয়মের অনুসারে আর মোক্ষের সহায়ক, তাই শতপথ ব্রাহ্মণ ২|৫|১|৬ এর মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"এতদ্বৈ পয় এব অন্নম্ মনুষ্যাণাম্"**, অর্থাৎ এই দুধই হল মানুষের অন্ন (আহার)৷ এইভাবে ঋগবেদ ১০|১৪৬|৫ এর মধ্যে লেখা রয়েছে **"স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায়"**, অর্থাৎ মোক্ষমার্গীকে সুস্বাদু ফলেরই আহার করা উচিত৷ একথা আর্যদের আদিম সভ্যতার ইতিহাস থেকেও ভালোভাবে প্রমাণিত হয়, কারণ আদিম কালে তপস্বীদের আহার প্রায়শঃ ফল-ফুলই ছিল, অন্ন ছিল না৷ বনস্থদের আহারের বর্ণনা করে মনু মহারাজ লিখেছেন -

পুষ্পমূলফলৈর্বাऽপি কেবলৈর্বর্তয়েত্সদা৷
কালপক্কৈঃ স্বয়ম্ শীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ৷৷
(মনুঃ ৬|২১)

অর্থাৎ - বানপ্রস্থী পুষ্প, মূল অথবা পাকা আর আপনা- আপনি পরে যাওয়া ফল দ্বারা নির্বাহ করবে৷ মহুয়ার একটি বৃক্ষতেই এত অধিক ফুল হয় যে তার থেকে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ বছর নির্বাহ করতে পারবে৷ ফুল ছাড়াও ফল, তেল, পত্র আর কাঠ আদি পদার্থ প্রাপ্ত হয়, যে কারণে মানুষকে আর অন্য কোনো আহারের আবশ্যকতা থাকে না৷

বাল্মীকি রামায়ণে লেখা রয়েছে যে রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ আর সীতা ফলাহার করেই তপস্বী জীবন নির্বাহ করেন৷ গুহরাজের আতিথ্য করাতে শ্রী রামচন্দ্র বলেন -

কুশচীরাজিনধরম্ ফলমূলা শনম্ চ মাম্৷

বিধিপ্রণিহিতম্ ধর্মে তাপসম্ বনগোচরম্।।

(বাল্মীকি রা০ অয়োধ্যা কা০ ৫০|৪৪)

অর্থাৎ - আমি কুশচীর পরে, তাপসবেশ আর মুনিদের ধর্মে স্থির হয়ে কেবল ফল-মূলই আহার করি।

ভরতও বলেন যে -

চতুর্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরোম্যহম্।
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ম্ রঘুনন্দন।।

(বাল্মীকি রা০ অয়োধ্যা কা০ ১১২|২৩-২৪)

অর্থাৎ - আমিও চোদ্দো বর্ষ পর্যন্ত জটা ধারণ করে আর ফল-মূলই আহার করবো।

লক্ষ্মণও বলেন যে -

আহরিষ্যামি তে নিত্যম্ ফূলানি চ ফলানি চ।
বন্যানি চ তথান্যানি স্বাহার্হাণি তপস্বিনাম্।।

(বাল্মীকি রা০ অয়োধ্যা কা০ ৩১|২৬)

অর্থাৎ - আপনার জন্য তপস্বীদের মতো বন্য পদার্থ নিয়ে এসে দিবো আর আমিও ফল-ফুলই আহার করবো। এইভাবে অয়োধ্যা কাণ্ড ২৭|১৬ র অনুসারে সীতা জীও বলেন যে - **"ফলমূলাশনা নিত্যা ভবিষ্যামি ন সম্শয়ঃ"**, অর্থাৎ আমি সর্বদা ফল-মূল আহার করে থাকবো, এতে সন্দেহ নেই।

এই প্রমাণগুলো থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে চোদ্দো বর্ষ পর্যন্ত ফল-ফুল খেয়ে শুধু বৃদ্ধই নয় বরং যুবক মানুষও থাকতে পারতো আর বড়ো-বড়ো যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয় প্রাপ্ত করতো। এখনও যুক্তপ্রান্তের বৈসবাড়ে আমের ফসলের সময় তিন মাস পর্যন্ত কেবল আম খেয়েই লোকজন কুস্তি লড়াই করে। বলার তাৎপর্য হল আর্য সভ্যতার উচ্চাদর্শের অনুসারে মানুষের ভোজন হল ফল-ফুল, দুধ, ঘী। অন্ন তো যজ্ঞশেষ - প্রসাদের নামেই খাওয়া হল, কিন্তু যখন কৃষিকাজ বাড়ে আর জঙ্গল বনের নাশ হয় তখন মানুষ অন্নের ভূমির আশ্রয় করতে থাকে। কলিযুগের বর্ণনা করে মহাভারত বনপর্ব অধ্যায় ১৯০ এরমধ্যে লেখা রয়েছে যে -

যে য়বান্না জনপদা গোধূমান্নাস্তথৈব চ।
তান্ দেশান্ সম্শ্রয়িষ্যন্তি য়ুগান্তে পর্য়ুপস্থিতে।।

অর্থাৎ - যে দেশের মধ্যে যব আর গম আদি বিশেষভাবে উৎপন্ন হয়, কলিযুগের লোকজন সেইসব দেশের আশ্রয় নিবে।

এরদ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে যে অন্য যুগের মানুষ সেই দেশের আশ্রয় নিতো যেখানে ফল-ফুলই অধিক হত, অন্ন নয়। এটাই হল কারণ যে হিন্দুজগতে ফলাহারের এযাবৎ যত প্রতিষ্ঠা রয়েছে ততটা অন্য খাদ্যের নেই। ফলাহারকে এক প্রকারের মহান উচ্চ আচরণ আর তপ বলে মনে করা হয়। শুধু এটাই নয় বরং যত ব্রত ,

শুভ অনুষ্ঠান অর্থাৎ সতোগুণী কার্য রয়েছে, সবার মধ্যে ফলাহারেরই বিধান রয়েছে। এর ভাব স্পষ্ট যে ফলাহার হল সাত্ত্বিক আহার, তাই সতোগুণী অনুষ্ঠানে তার ব্যবহার হয়। এর থেকেই বলপূর্বক বলা যেতে পারে যে ফলাহারই হল আর্য ভোজন। এটি আর্য ভোজনের অধিক প্রতিষ্ঠার কারণ হল - ফলাহার কামচেষ্টার প্রতিষেধক। কোনো ব্যক্তি যদি ব্রহ্মচারী থাকতে চায় তবে তাকে ফলাহার করা উচিত, কারণ ফলাহার হতে কামচেষ্টা কমে যায়, তাই বিধবা স্ত্রীদেরও ফলাহারের দ্বারা কামকে শরীরের মধ্যেই শোষণ করার জন্যই মনু ভগবান্ বিধান করেছেন। এর অতিরিক্ত ফল আর ফুলের দ্বারা মানুষের সারা জীবন নির্বিঘ্নতায় কেটে যাবে। আজও বছরের তিনমাস আমাদের অবধের বৈসবারা প্রান্তে আম, মহুয়া আর জামুন দিয়েই কেটে যায়। জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্রমাস পর্যন্ত আম, মহুয়া আর জামুনের কারণে অনেক ঘরে উনুনই জ্বলে না, আর না কাউকে ক্ষুধার্থ ব্যাকুল বা দুর্বল দেখা যায়।

এটা তো হল আর্যশাস্ত্র আর আর্যবর্তের কথা। এখন আমি অন্য দেশের প্রমাণ দ্বারাও দেখাতে চাইবো যে ফলাহারী ব্যক্তি কত শক্তিশালী, পরিশ্রমী , দীর্ঘায়ু আর দীর্ঘকায় হয়ে থাকে। একই প্রকারের ফল খেয়ে মানুষের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা করে সিরিয়া প্রান্তের আসদ ইয়াকুবয়াত নামক এক বিদ্বান নিজের ভাষণে বলেছেন যে আমি লেবেনন পর্বতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি মানুষদের দানবের মতো শক্তিশালী আর চঞ্চল দেখেছি। এই লোকেরা কেবল খেজুরের উপরেই নির্বাহ করে। এদের মধ্যে অনেকেরই আয়ু একশ দশ বছরের ছিল[®] **।**এই বর্ণনা থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে যখন এক প্রকারের ফল থেকে এত লাভ হয় তাহলে নানা প্রকারের ফলাহার থেকে অনেক বড়ো লাভ হওয়া সম্ভব, অতএব স্পষ্ট হল যে মানুষ ফলের দ্বারা ভালোভাবে নির্বাহ করতে পারে আর ফলাহার দ্বারা দীর্ঘায়ু, দীর্ঘকায় আর শক্তিশালীও হতে পারে।

যেসব লোকেরা মনে করে যে ফলাহার দ্বারা শ্রম করার শক্তি থাকে না, তারা ভুল করছে। ১৮ মে ১৯০২ সালে জার্মানির বিটসনটাইড নামক স্থানে আন্তর্জাতিক পায়ে হাঁটা দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এই দৌড় ড্রস্ডন থেকে বার্লিন পর্যন্ত ১২৪ মাইল লম্বা ছিল। সব মিলে ৩২ জন দৌড়বিদ ছিল। আবহাওয়া গরম ছিল। দৌড়বিদরা ড্রস্ডন থেকে ৭ টা ৩০মিনিটে বের হয়, এদের মধ্যে কিছু ফলাহারী, কিছু শাকান্নহারী আর কিছু মাংসাহারী ছিল। শাকান্নহারীদের মধ্যে বার্লিনের প্রসিদ্ধ কার্লমানও ছিল। বার্লিনে যে ছয় জন সবার আগে পৌঁছে ছিল তারা তো শাকান্ন আর ফলাহারী ছিল, এদের মধ্যে কার্লমান প্রথম হয়। কার্লমান ২৬ ঘন্টা ৪৮ মিনিটের মধ্যে যাত্রা সমাপ্ত করেছিল। দৌড় সমাপ্ত হওয়ার পরেও সে একদম সতেজ ছিল, কিন্তু বড়ো-বড়ো প্রসিদ্ধ মাংসাহারী পালোয়ান ক্লান্তিতে দিশেহারা হয়ে গেছিল। এই ঘটনা বলছে যে মানুষ মাংসাহারী নয় বরং ফলাহারী, কারণ মানুষের শরীরের গঠন, তার দাঁত আর অন্ত্র দেখে চিকিৎসকরা নির্ণয় করেছে যে ফলই হল মানুষের স্বাভাবিক ভোজন। ডক্টর লুই কুন্হকে উদ্ধৃত করে পূজ্য পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেছেন যে মানুষের স্বাভাবিক ভোজন হল ফল, ফুল আর কন্দ আদি। স্বাভাবিক ভোজনকে ছেড়ে

[®]Assad Yakoob Kayat, a native Syrian, in a speech at Exeter Hall (16th May 1838) remarked that he had lately visited Mount Lebanon, where he found the people as large as giants and very strong and active. They lived almost entirely on dates and there were many among them one hundred and ten years of ago. - Fruits and Farinacea

দেওয়ার কারণেই আমরা বিভিন্ন রোগে পীড়িত হচ্ছি। অভ্যাসে আজ মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক শক্তিকে এত নষ্ট করেছে যে যেই বস্তুকে দেখে আমাদের ঘৃণা হওয়া উচিত, তাকেই আমরা প্রসন্নতাপূর্বক খাচ্ছি। এই বিষয়ে পশুই আমাদের থেকে ভালো। যে পশু ঘাস খায় সে মাংসের দিকে দেখেই না আর যে মাংস খায় সে ঘাসের দিকে দৃষ্টিপাতও করে না। এইভাবে ফল আর কন্দ আদির ভক্ষক জীবও সেই পদার্থ ছেড়ে ঘাস পাত খায় না আর তৃষ্ণা লাগলেও সোডাওয়াটার আর মদ্য পান করে না, কিন্তু মানুষ হল এক বিলক্ষণ পশু, যে ঘাস- পাত, ফল-ফুল, মাংস-মদ্য সবকিছুই উদরস্থ করে ফেলে|তাহলে তার শরীর কেন রোগের ঘর হবে না।

ভোজনের অনুসারে স্থলচর পশুদের তিনটি ভেদ রয়েছে যথা - মাংসভক্ষী, বনস্পতিভক্ষী আর ফলভক্ষী। বিড়াল, কুকুর আর সিংহ আদি যত হিংস্র পশু রয়েছে, তারা সবাই হল মাংসভক্ষী। মাংসই হল তাদের স্বাভাবিক ভোজন, এইজন্য তাদের দাঁত লম্বা, ধারালো আর প্রসারিত। এইধরনের দাঁত দিয়ে এরা জীবের মাংসকে টেনে ছিড়ে গিলে নেয়। এদের দাঁতের রচনা দ্বারা এটা সূচিত হচ্ছে যে পরমেশ্বর এদের মাংস খাওয়ার জন্যই এরকম দাঁত দিয়েছে। গাভী, বৃষ, মহিষ, ছাগ আদি জীব হল বনস্পতিভক্ষী, তাই পরমেশ্বর তাদের দাঁত এরকম বানিয়েছে যা দিয়ে তারা ঘাসকে সহজেই কাটতে পারে। তাদের দাঁতের রচনাই হল তাদের বনস্পতিভক্ষী হওয়ার প্রমাণ, কিন্তু মানুষের দাঁত না তো মাংসভক্ষী পশুদের সঙ্গে মেলে আর না ঘাসভক্ষী পশুদের সঙ্গে। তাদের গঠন সেইরকম যেমনটা বাঁদর আদি ফলভোগী জীবদের হয়।এইজন্য একথা নির্বিবাদ, নির্ভ্রান্ত আর নিঃসংশয় যে পরমেশ্বর মানুষের দাঁত ফল খাওয়ার জন্যই বানিয়েছে, কিন্তু আমরা যদি সেটা দিয়ে মাংস আর মাছ কাটা আরম্ভ করি, এর মাথা ওর পা চিবিয়ে ভাঙ্গি, তারপরও কি কেউ নিরোগ থাকার কথা ভাবতে পারে? মাংসভক্ষী জীবদের আমাশয় ছোটো আর গোল হয়। তাদের শরীর থেকে তাদের অন্ত্র ৩ থেকে ৫ গুণ পর্যন্ত অধিক লম্বা হয়। বনস্পতিভক্ষী জীবদের আমাশয় অনেক বড়ো হয়, সে খাবারও খায় অনেক বেশি। তাদের অন্ত্র তাদের শরীরের থেকে ২০ থেকে ২৮ গুণ পর্যন্ত অধিক লম্বা হয়।

এখন বাকি রইলো ফলভক্ষী, তাদের আমাশয় মাংসভক্ষী জীবদের আমাশয়ের থেকে অধিক চওড়া হয় আর তাদের অন্ত্র তাদের শরীরের থেকে ১০ থেকে ১২ গুণ পর্যন্ত অধিক লম্বা হয়। এখন এই তিন প্রকারের জীবদের সঙ্গে মানুষের মিলিয়ে দেখুন। মাথা থেকে মেরুদণ্ডের হাড্ডির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত মানুষের দৈর্ঘ্য ১ থেকে ২ ফুট পর্যন্ত হয় আর মানুষের অন্ত্রের দৈর্ঘ্য ১৬ থেকে ২৮ ফুট পর্যন্ত হয়, অর্থাৎ তার দৈর্ঘ্য শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ১০ থেকে ১২ গুণ অধিক হয়। এখানেও ফলভক্ষী জীবদের সঙ্গে মানুষের সমতা মিলে যায়। শরীরের অনুসারে মানুষের অন্ত্র ফলভক্ষী জীবদেরই মতো বের হল, অতএব মানুষ যে ফলভক্ষী তার এটা দ্বিতীয় প্রমাণ হল। এইভাবে "Odontogeaphy" নামক গ্রন্থের ৪৭১ পৃষ্ঠাতে প্রফেসর ওয়েন (Owen) বলেছেন যে *‘‘মানুষের দাঁত বনমানুষ আর বাঁদরের সঙ্গে অনেকটা অনুরূপ আর এদের ভোজনও ফল, অন্ন এবং বাদাম একই ধরনের। এই চার পাওয়ালা আর মানুষের দাঁত সম্বন্ধিত সাদৃশ্য থেকে বিদিত হচ্ছে যে সৃষ্টির আরম্ভে মানুষের জন্য স্বাভাবিক ভোজন ফলই নির্মাণ করা হয়েছিল।’’*

এর সম্বন্ধে লিনাকুস (Linnacus) বলেছেন যে *''ফল-মূল হল মানুষের জন্য অত্যন্ত হিতকর ভোজন যা চার পাওয়ালাদের থেকে প্রকাশিত হয় তথা বনমানুষ আর লাঙ্গুরের সাদৃশ্য এবং তাদের মুখ, পেট আর হাতের গঠন দ্বারাও প্রকট হয়''*[©] ।একইভাবে ডক্টর ইব্রামৌস্কি যিনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আর যিনি সমস্ত রোগের একটাই সহজ ঔষুধ বের করেছেন, লিখেছেন যে আমরা যেসব রন্ধন আদি করে, গুঁড়ো করে কৃত্রিম ভোজন করি তা আমাদের জন্য অস্বাভাবিক। আমাদের শরীরকে বৃদ্ধি তথা পুষ্টি পাওয়ার জন্য প্রায়শঃ এন্দ্রিক পদার্থেরই (Organic Matter) আবশ্যকতা হয়ে থাকে, ফল তথা খাদ্যশস্যের মধ্যে সেটা প্রচুরমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু যদি ফল আর খাদ্যশস্যকে আগুনে রন্ধন করা হয় তাহলে তার অনেকটা এন্দ্রিক অংশ পৃথক হয়ে যায়। শেষ পদার্থ না কেবল কঠিনতার সঙ্গে পচে, বরং পচে গিয়ে আমাদের শরীরের জন্য কিছুই লাভ দেয় না। যখন এরকম ভোজন করলে অনেক ধরনের অকেজো পদার্থ আমাদের শরীরের মধ্যে ঘর করে নেয় তখন অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। প্রায়শঃ সব আন্তরিক রোগের উৎপত্তি এরকম অকেজো পদার্থের একত্র হয়ে যাওয়ার জন্য হয়, সুতরাং এই রোগগুলোর একটাই ঔষধ রয়েছে যে যেভাবেই হোক সেই অকেজো পদার্থ আমাদের শরীর থেকে যেন বেরিয়ে যায় আর নতুন করে যেন প্রবেশ না করে।এরকমটা হলেই সেই রোগ স্বয়ংই নষ্ট হয়ে যাবে, এইজন্য প্রায়শঃ নব সম্মতির চিকিৎসকেরাও রোগীদের উপবাস করান। তাদের বেশ কয়েকদিন ধরে কেবল উষ্ণ জল ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় না। এই ঔষধি প্রায়শঃ লাভদায়ক সিদ্ধ হয়েছে। যথাশক্তি উপবাস দ্বারা প্রায়শঃ রোগ দূর হয়ে যায়, কিন্তু এই ঔষধি করার একটা ভয় থাকে যে কখনও-কখনও অনেকদিন পর্যন্ত শরীরের আধারভূত পদার্থ না পাওয়ার কারণে রোগী এতটাই দুর্বল হয়ে যায় যে বৃদ্ধি হওয়ার স্থানে ধীরে-ধীরে ক্ষয়ের রাজ্য হয়ে যায় আর রোগী কিছু দিনের মধ্যেই মৃত্যুর গ্রাসে চলে যায়, এইজন্য কেবল উপবাসের স্থানে ফলোপবাস অধিক উপযোগী, কারণ ফল খাওয়াতে কোনো অকেজো পদার্থ শরীরে প্রবেশ করে না আর বল প্রাপ্ত হয়ে যায়, রোগও নষ্ট হয়ে যায় আর শক্তির হ্রাস হয় না।

এই বিদেশি প্রমাণগুলো থেকেও সিদ্ধ হচ্ছে যে ফলই হল মানুষের আদিম আর মৌলিক ভোজন আর ফলের সেবন হতে মানুষ অসুস্থ তো হয়ই না বরং যদি অসুস্থ থাকে তাহলেও ঠিক হয়ে যায় আর সুদৃঢ় তথা দীর্ঘজীবি হয়, এইজন্য আর্যরা নিজেদের মূল সভ্যতাতে ফল আর দুধেরই স্থান দিয়েছে আর কৃষিকে তথা কৃষি থেকে উৎপন্ন হওয়া অন্নকে আপত্‌কালে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ব্রত আর উপবাসের মধ্যে ফলাহারের মহিমা হতে তথা আর্য পরম্পরা আর আর্য সভ্যতাতে নিষোজ্ঞার বিশেষত্বগুলো হতে এটাই সূচিত হচ্ছে যে আর্যদের আহার সাত্ত্বিকই যারমধ্যে ফল আর দুধ-ঘীয়েরই প্রাধান্য রয়েছে, কারণ ফল-ফুল আর দুধ-ঘৃতাদি সাত্ত্বিক আহারই অর্থের পাঁচ শর্তের সঙ্গে সংগ্রহ হতে পারে তথা তার থেকেই আয়ু, বল, কান্তি, মেধা আর সত্ত্ব আদিও প্রাপ্ত হতে পারে তথা সেসবের আহার থেকেই সংসারের মধ্যে কারও আয়ু আর ভোগের মধ্যে হস্তক্ষেপও হবে না আর য়োগাভ্যাস, মোক্ষসাধনেও সহায়তা পাওয়া যায়, এইজন্য

© Linnasi Amoonitales Academical, Vol. X, Page 8

আর্যরা নিজেদের সভ্যতাতে সাত্ত্বিক আহারকেই স্থান দিয়েছে।

আর্যবস্ত্র আর বেশভূষা

অর্থের মধ্যে ভোজনের পরে দ্বিতীয় নম্বর হল বস্ত্রের। ভোজনের মতো আর্য সভ্যতাতে বস্ত্রের উপরেও বিশেষ ধ্যান দেওয়া হয়েছে আর সেলাইয়ের কাজ জানা© সত্ত্বেও আর্যরা নিজেদের সভ্যতাতে কখনও সেলাই করা বস্ত্রকে স্থান দেয় নি। ভগবান্ বুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই দেশের আর্য সেলাই করা বস্ত্র পরতো না, কারণ বৌদ্ধকালের পূর্ব লিখিত সাহিত্যের মধ্যে কোথাও সেলাই করা বস্ত্রের বর্ণনা নেই। বৌদ্ধ মূর্তিগুলোতে সেলাই করা বস্ত্র কোথাও দেখা যায় না। বঙ্গ আর ওড়িশা আদি প্রান্তের মধ্যে এখনও গ্রামীণ আর্য সেলাই করা বস্ত্র পরে না। কুলীন আর্যদের মধ্যে এখনও নিয়মিত ভোজনের সময়, দেবারাধন অথবা যজ্ঞাদির সময় আর যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কারের সময় সেলাই করা বস্ত্রের ব্যবহার হয় না। দেবপূজনের সময় যদি কেউ সেলাই করা বস্ত্র পরে থাকে তাহলে তার বোতাম খুলে দেওয়া হয়। এছাড়া বিবাহের সময় বর আর বধূকে বস্ত্র আর উপবস্ত্রই দেওয়ার বিধান রয়েছে®, সেলাই করা বস্ত্রের নেই। বস্ত্র আর উপবস্ত্রের আধুনিক নাম হল ধুতি-উপর্না (অঙ্গবস্ত্র)। বঙ্গ আর ওড়িশার মধ্যে এই ধুতি-উপর্না একটার মধ্যেই বোনা বিক্রি হয়। নদীয়া শান্তিপুরের ধুতি-উপর্না প্রসিদ্ধ ছিল, এরমধ্যে একটা ধুতি আর একটা ওড়নাই হতো। এই পোশাক স্ত্রীদেরও ছিল, তারাও একটি ধুতি আর একটা চাদরই ধারণ করতো। এখনও পাঞ্জাব, যুক্তপ্রান্ত, বঙ্গ আর মহারাষ্ট্রের মধ্যে এই রীতি রয়েছে। মহারাষ্ট্রের মধ্যে তো গরমের দিনেও স্ত্রীরা শাল জড়িয়ে রাখে। এই সমস্ত রীতি থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে আর্য সভ্যতার মধ্যে সেলাই করা বস্ত্রের জন্য স্থান নেই। তাদের বাস্তবিক আর্য পোশাকই হল ধুতি আর ওড়না। মহাভারত মীমাংসা পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৪ এর মধ্যে শ্রীযুতরায়বাহাদুর চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য এম০ এ০ লিখেছেন যে *"মহাভারতের সময়ে ভারতীয় আর্যপুরুষদের পোশাক একদম সাধারণ ছিল, কেবল ধুতিই তাদের পোশাক ছিল। একটা ধুতি কোমরের নিচে পরা হতো আর অন্যটা শরীরের উপরে যার যেমনটা ইচ্ছে হতো।...উল্লেখিত দুই বস্ত্র ছাড়া ভারতীয় আর্যদের পোশাকের মধ্যে আর অন্য কোনো কাপড় ছিল না।... আজকাল স্ত্রীরা যেসব লেহেঙ্গা আদি বস্ত্র পরে সেরকম সেই সময়ে ছিল না। স্ত্রীদের বস্ত্র পুরুষদের মতোই হতো কিন্তু তাদের থেকে লম্বা হতো।"*

বস্ত্রের আবশ্যকতা কেবল দুটি কারণেই, প্রথম তো হল বর্ষা আর শীত-উষ্ণ থেকে রক্ষা আর দ্বিতীয় লজ্জানিবারণ। শীত-উষ্ণ আর বর্ষার কারণেই তুলো, উল আর চর্ম অথবা বল্কল আদি বস্ত্রের বিধান রয়েছে, কিন্তু আর্যদের উচ্চতম আদর্শ সভ্যতার মধ্যে উল আর রেশমের বস্ত্রের বিধান নেই। সন্ন্যাসীদের জন্য উল

© বর্ম সীব্যধ্বম্, সূচ্যাচ্ছিদ্যমানঃ - ঋগ্বেদ। মূর্ধানমস্য সম্সীব্যাথর্বা...। - অথর্বঃ ১০|২|২৬)

® সংস্কারবিধি - স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত

আর রেশমের বস্ত্র পরা উচিৎ মানা হয়নি[@] |হ্যাঁ, প্রবাসের সময়ে পাহাড়ী প্রদেশে যেখানে বরফ পরে, সেখানের জন্য উলের বস্ত্র উপযোগী বলা হয়েছে। বাকি রইলো লজ্জানিবারণের কথা, সেটা শীত-উষ্ণের থেকেও বেশি আবশ্যক, কারণ পরমাত্মার আজ্ঞা হল গুপ্তাঙ্গকে খোলা রাখা যাবে না। তিনি পশু আর পক্ষীদেরও গুপ্তাঙ্গকে লেজ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন, তাই মানুষেরও উচিত যে তারাও যেন গুপ্তাঙ্গকে ঢেকে রাখে। বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে **"মা তে কশপ্লকৌ দৃশন্"**, অর্থাৎ তোমার গুপ্তাঙ্গকে যেন না দেখতে পায়, এইজন্য গুপ্তাঙ্গকে ঢাকা আবশ্যক, কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে যে গুপ্তাঙ্গের পর্দা আর শীত-উষ্ণের থেকে রক্ষা খুবই সাধারণ বস্ত্র দিয়েই হয়ে যায়। তাই যেখানে আর্য সভ্যতা শরীর-রক্ষা আর পর্দার জন্য বস্ত্রের অনিবার্য আজ্ঞা দেয়, সেখানে কাজকর্মে অসুবিধা আর বিলাস, অসমানতা তথা ঈর্ষা-দ্বেষাদি উৎপন্নকারী বস্ত্রের ব্যবহারকে নিষেধও করেছে। আর্য সভ্যতা ততটুকু আর সেই ধরনের বস্ত্রেরই আজ্ঞা দিয়েছে, যার দ্বারা কাজকর্মে সুবিধা হবে। ধুতি হল ঠিক সেরকমই পোশাক। ধুতি ব্যবহারের বিষয়ে মিনিজ মেনিঙ্গ (Manning) বলেছেন যে *"সব পোশাকের মধ্যে ধুতি হল পূর্ণ আর চলতে, ফিরতে, উঠতে-বসতে সুবিধাদায়ক। এর থেকে ভালো অন্য কোনো পোশাক অসম্ভব"*[®] |এরকমই লর্ড ডাফরিন বলেছেন যে *"পোশাকের বিষয়ে পশ্চিমীদের পূর্বদের থেকে কিছু শেখা উচিত''*[∞] |এই ধুতি আর চাদরের পোশাক দ্বারা একদিকে অঙ্গরক্ষা, পর্দা আর কাজকর্মের মধ্যে সুবিধা হয়, অন্যদিকে সমাজের মধ্যে বিলাস আর ঈর্ষা-দ্বেষ বাড়ে না। পোশাকই সমাজকে বিলাসী আর অসমান বানিয়ে তোলে। নিজের ঘরে মানুষ যেটাই খেয়ে থাকুক না কেন, তার প্রত্যক্ষ অনুভব সমাজের হয় না, কিন্তু পোশাক হল বাহ্য আডম্বর -- এটা দেখা যায়, এইজন্য এরদ্বারা সমাজের মধ্যে বিলাস আর অসমনতাজন্য ঈর্ষা-দ্বেষ উৎপন্ন হওয়ার ভয় থাকে। শৈলী, ফ্যাশন আর শৃঙ্গার থেকেই সমাজের মধ্যে অসমানতা উৎপন্ন, এই জন্য আর্য সভ্যতার মধ্যে সেলাই করা বস্ত্রের জন্য স্থান নেই। আর্য সভ্যতার মধ্যে সহজ সাধারণ ধুতি আর চাদরই পরার ও জড়ানোর আজ্ঞা রয়েছে।

বর্তমান সময়ে বস্ত্রের অনেক শৈলী আর ফ্যাশন দ্বারা নিজেকে ভদ্রপুরুষ বলে এরকম গৃহস্থীদের কতটা কষ্ট হচ্ছে, এটা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে লুকিয়ে নেই। সারা বছরের সব উপার্জন কাপড়েই চলে যায় তবুও পোশাকের মধ্যে অভাব থেকেই যায়। এক-একটি গৃহস্থের ঘরে এক-একজন ব্যক্তির জন্য চার-চার, ছয়-ছয় সিন্দুক কাপড় রাখা রয়েছে আর তাদের সারাটা দিন সেগুলোকেই বদলাতে ব্যতীত হয়ে যায়, অতএব মানুষের জন্য ততটুকু আর সেই ধরনের বস্ত্র হওয়া উচিত যাকে রক্ষা আর পর্দার জন্য সে স্বয়ংই তৈরি করে নিবে। এই দৃষ্টিতেও ধুতি আর চাদরের মহত্ত্ব বোঝা যাচ্ছে। এই সময় লেহেঙ্গা, পায়জামা,

---

[@] ঊর্ণাকেশোদ্ভবা জ্ঞেয়া মলকীটোদ্ভবঃ পটঃ।
কস্তূরীরোচনম্ রক্তম্ বর্জয়েদাত্মবান্ যতিঃ||
বস্ত্রম্ কার্পাসজম্ গ্রাহ্যম্। - কাত্যায়নস্মৃতি

® Any dress more perfectly convenient to walk, to sit, to lie in, it would be impossible to invent.
- Ancient and Mediaeval India, Vol.11, p.358

∞ The West has still much to learn from the East in matters of dress.

পতলুন আর কুর্তা, কোট, শার্ট তথা গেঞ্জী আদি যত সেলাই করা বস্ত্র পাওয়া যায়, সেই সব হল ধুতি চাদরেরই রূপান্তর। ধুতি থেকে তহমত (লুঙ্গি) আর লেহেঙ্গা হয়েছে আর সেই উভয়ের মিলন থেকে ঢিলা পায়জামা, পাতলুন (প্যান্ট) আর জোধপুরী আদি হয়েছে। এই ভাবে চাদর থেকে কফনী (যার মধ্যে চির করে গলায় পরা হয়), কফনী থেকে কুর্তা আর কুর্তা থেকে শার্ট আর গেঞ্জী আদি হয়েছে। এই ভাবে মাথার কেশ থেকে পাগড়ী আর পাগড়ী থেকে টুপির সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন মৌলিক আর্য সভ্যতার পোশাকের মধ্যে নিচে ধুতি, শরীরে চাদরের ওড়না, মাথায় কেশের মুকুট আর গলায় ফুলের মালা হতো। এই ফ্যাশন সুবিধাজনকও বটে, কিন্তু আজকালের পোশাকের কারণে একটু নোংরা লেগে গেলে, নদীতে নামার সময়, লেগে যাওয়া আগুনকে নিভানোর সময় অথবা কিছু দৌড়-ঝাঁপ, রোদে-গরমের সময় বড়োই দুর্দশা হয়, কিন্তু ধুতি-চাদরের মধ্যে এই অসুবিধাটা নেই।

আর্য সভ্যতার মধ্যে কেশেরও বড়ো মাহাত্ম্য রয়েছে। বালক আর বৃদ্ধাদি অসমর্থদের অতিরিক্ত কোনো আর্যকে কেশ কাটার আজ্ঞা নেই। বাল্যকালে যখন বালক অসমর্থ হয়ে যায় তখন তার মুণ্ডন করা হয় আর যখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে অথবা শরীর রোগী হয়ে অসমর্থ হয়ে যায়, তখনই মুণ্ডিত করার আজ্ঞা রয়েছে। সন্ন্যাসীদের মুণ্ডন এই দশারই সূচক। এই দশার অতিরিক্ত আর্যদের সর্বদা দাড়ি, গোঁফ আর মস্তকের কেশের রক্ষা করা উচিত। এই কঠিন নিয়মের কারণ হল কেশের মধ্যে বিদ্যুৎ গ্রহণের অদ্ভুত শক্তি রয়েছে। এই শক্তির সাহায্যে কেশের দ্বারা দ্যু-তত্ত্ব মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে জ্ঞান তন্তুগুলোকে বল পৌঁছে দেয়। বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

বৃহস্পতিঃ প্রথমঃ সূর্য়ায়াঃ শীর্ষে কেশাঁ অকল্পয়ত্।

(অথর্বঃ ১৪|১|৫৫)

অর্থাৎ - জ্ঞানাধিষ্ঠান বৃহস্পতি -- আকাশ আগেই সূর্যের দ্বারা মস্তকে কেশের উৎপন্ন করে। এর থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে কেশের সঙ্গে জ্ঞান আর সূর্যের অপূর্ব সম্বন্ধ রয়েছে, কারণ রঙ সূর্য থেকে উৎপন্ন হয় আর মানব শরীরের কেশ তার রঙ চার বার পরিবর্তন করে। বাল্যকালে যখন জ্ঞান-গ্রহণের শক্তি থাকে না তখন বালকের কেশের রঙ পীত লাল হয় আর যখন বৃদ্ধাবস্থায় জ্ঞান-গ্রহণ করার শক্তি থাকে না তখন কেশের রঙ সাদা হয়ে যায়। কিন্তু যুবাবস্থায় যখন জ্ঞান-গ্রহণ করার শক্তি পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে তখন কেশের রঙ কালো থাকে। কালো রঙে সূর্যের কিরণের প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে, এইজন্য কালো কেশ রঙের যুবক মানুষই জ্ঞানগ্রহণ করার ক্ষমতাও রাখে। এই কেশের রঙের পরিবর্তন কেবল মানুষের মধ্যেই দেখা যায়, পশু-পক্ষীদের মধ্যে দেখা যায় না। এর দ্বারা আরও অধিক স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে অসমর্থ দশাকে বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত দশার মধ্যে কেশের ধারণই করে রাখা উচিত। এইজন্য বলা হয় যে "**জটিলো বা মুণ্ডিতো বা**"®, অর্থাৎ হয় সমস্ত কেশ রাখো অথবা মুণ্ডন করো। তাৎপর্য হল যার সমর্থ রয়েছে সে রাখুক আর যে অসমর্থ সে কেটে নিক। কেটে ফেলা হল বালক, বৃদ্ধ আর রোগীদের জন্য, কারণ বেদের মধ্যে ব্রহ্মচারী,

---

® মনুঃ ২|২১৯| মনুর পাঠ হল - মুণ্ডো বা জটিলো বা স্যাদথবা স্যাচ্ছিখাজটঃ।

গৃহস্থ আর বানপ্রস্থী আদি সব স্ত্রী-পুরুষদের জন্য কেশ রাখার উপদেশ করা হয়েছে। ব্রহ্মচারীর জন্য অথর্ববেদ ১১|৫|৬ এরমধ্যে লেখা রয়েছে - **"ব্রহ্মচার্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণম্ বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ"** |এরমধ্যে ব্রহ্মচারীকে দীর্ঘশ্মশ্রুকারী অর্থাৎ বড়ো-বড়ো দাড়ি- গোঁফওয়ালা বলা হয়েছে। ব্রহ্মচারীর জন্য অন্য স্থানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে **"ক্ষুরকৃত্যম্ বর্জয়"**, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীকে কেশ নকশা (design) করা নিষেধ। যেভাবে ব্রহ্মচারীর জন্য কেশ নকশা করা নিষেধ রয়েছে সেইভাবে গৃহস্থদেরও নিষেধ রয়েছে। রাজার জন্য লেখা রয়েছে যে -

শিরো মে শ্রীর্যশো মুখম্ ত্বিষিঃ কেশাশ্চ শ্মশ্রূণি।
রাজা মে প্রাণোঽঅমৃতঁসম্রাট্ চক্ষুর্বিরাট্ শ্রোত্রম্॥
(য়জুঃ ২০|৫)

এরমধ্যে রাজার মস্তকের কেশ আর দাড়ি-গোঁফের প্রশংসা করা হয়েছে। তাৎপর্য হল অসমর্থ দশার অতিরিক্ত আর্য সভ্যতার অনুসারে মানুষকে কখনও কেশ আর দাড়ি কেটে ফেলা উচিত নয়। বেদের মধ্যে যেখানে কেশ রাখার আদেশ করা হয়েছে সেখানে তার স্বচ্ছ রাখারও উপদেশ রয়েছে। অথর্ববেদের (১৪|২|৬৮) মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

কৃত্রিমঃ কন্টকঃ শতদন্য এষঃ।
অপাস্যাঃ কেশ্যম্ মলমপ শীর্ষণ্যম্ লিখাত্।

অর্থাৎ - অনেক কৃত্রিম কাটাযুক্ত চিরুনি দিয়ে মস্তকের কেশের বিন্যাস করো।

এই সমস্ত আজ্ঞা থেকে জানা যাচ্ছে যে আর্য সভ্যতার মধ্যে কেশ রক্ষার বিধান রয়েছে। শুধু এটাই নয়, বরং ইতিহাস আর প্রাচীন চিত্রকলা থেকেও জানা যায় যে ঋষি-মুনি আর রাজা-মহারাজ সকলে কেশ রাখতেন। রামচন্দ্রের মস্তকে আগে থেকেই বড়ো-বড়ো কেশ ছিল, তাই তো তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বটক্ষীর দিয়ে সেটি জটিল বানাতে পেরেছেন। কৃষ্ণ, অর্জুন আর অন্য যোদ্ধাদের বর্ণনার মধ্যেও কেশ রক্ষার চর্চা এসেছে। ঋষি তো জটাধারী ছিলেনই, এছাড়া প্রাচীনকালে কেশ দ্বারাই আর্য আর দস্যুদের সনাক্তকরণও হতো | প্রাচীন কালে যেভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যকে চেনার জন্য সূত, সন আর উলের য়জ্ঞোপবীত পরা হতো, সেইভাবে আর্য আর দস্যুদের চেনার জন্য মস্তকের কেশে এক গ্রন্থি লাগানো হতো। যার মস্তকে গ্রন্থি হতো সে আর্য আর যার মস্তকের কেশে গ্রন্থি হতো না সে দস্যু অর্থাৎ অনার্য বলে জানা যেত। এই কারণে আর্যদের ভিতরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র চেনা যেত, কিন্তু শুদ্র আর্য হলেও য়জ্ঞোপবীত পরতো না, অতএব তাদের কেশের গ্রন্থি দ্বারাই চেনা যেত। এইভাবে কেশগ্রন্থি আর্যত্বের চিহ্ন ছিল। এটা আমাদের কেবল কল্পনা নয় প্রত্যুত সপ্রমাণ সিদ্ধ যে পূর্ব সময়ে যখন-যখন আর্যরা যাকেই জাতিচ্যুত করে অনার্য করেছে অথবা তাকে আর্য থেকে পৃথক করে দস্যু বানিয়েছে তখন-তখন তার কেশ কেটে ফেলেছে অথবা শিখাগ্রন্থিকে খুলে দিয়েছে। একথা মহাভারত, হরিবংশ আর বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে ভালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আমি এখানে এই বিষয়ের দুটি শ্লোক লিখবো -

অর্ধম্ শকানাম্ শিরসো মুন্ডয়িত্বা ব্যসর্জয়ত্।

য়বনানাম্ শিরঃ সর্বম্ কাম্বোজানাম্ তথৈব চ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষটকারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥
(হরিবংশঃ ১|১৪|১৬-১৭)

অর্থাৎ - শকদের অর্ধেক মস্তক নেড়া করে দেওয়া হয়েছে, য়বনদের সম্পূর্ণ মস্তক নেড়া করে দেওয়া হয়েছে, কম্বোজদের সম্পূর্ণ মস্তক নেড়া করে দেওয়া হয়েছে, পরদদের শিখাগ্রন্থি খুলে ফেলা হয় আর পহ্লবদের কেবল গোঁফ ছেড়ে বাকি মস্তক তথা দাড়ির কেশ কেটে ফেলা হয়েছে।

এই বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে মস্তকের কেশ অর্থাৎ শিখা আর্যত্বের চিহ্ন ধরা হতো। আগের কথা বাদ দিন এই ১০০ বছর পূর্বেও এই রীতি ছিল যে যখন কখনও কোনো পতিতকে ত্যাগ করা হতো তখন তার মস্তক নেড়া করে আর এক গাধার উপর চড়িয়ে বের করে দেওয়া হতো। এই ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায় যে আমাদের কেশ কিরকম বিজ্ঞানে ভরা, ধার্মিক, ঐতিহাসিক আর আর্যত্বের প্রতিপাদনকারী। আমরা দেখি যে আজকাল লোকজন হিন্দুর (আর্যের) লক্ষণ অনেক প্রকারের করে থাকে, কিন্তু বিনা আর্য ইতিহাসকে জেনে তারা হিন্দুদের ঠিক-ঠিক লক্ষণ করতেই পারবে না। বৈদিকরা জানে যে শিখাসূত্রধারীকে আর্য (হিন্দু) বলে। শিখার মধ্যে শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, শূদ্র আর কোলভীল সব সমাবেশ হয়ে যায় আর সূত্রের মধ্যে দ্বিজাতি তথা পারসি চলে আসে আর এইভাবে কেশের যোগ্যতা জানলে পরে আর্য শৈলী, আর্য বেশভূষা আর আর্য পোশাকের মহত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়।

আর্য সভ্যতাতে ধাতুর আভূষণের জন্য স্থান নেই, কারণ বৈদিক আর্য সুগন্ধিত ফুলেরই আভূষণ পরতো, সোনা-রুপার আভূষণ পরতো না। তারা সোনা-রুপার আভূষণ তো গাভী আদিদের পরাতো। এরকমটা হলে পরেও তারা স্বর্ণের গুণকে ভালোভাবে জানতো। তারা স্বর্ণের আভূষণ পরতো না, কিন্তু স্বর্ণকে শরীরের কোনো-না-কোনো ভাগে লাগিয়ে অবশ্য রাখতো। এর কারণ এই হল যে আর্যদের সভ্যতার অনুসারে স্বর্ণের ধারণ করা আর স্বর্ণ অথবা রুপার আভূষণ পরা এই দুটি আলাদা-আলাদা বিষয়। যেভাবে বিনা চেনের ঘড়ি কেবল সময় দেখার জন্য গুপ্ত রীতিতে পকেটের মধ্যে রেখে দেওয়া হল এক বিষয় আর সোনার সুন্দর চেন দিয়ে ঘড়িকে বেঁধে হাতের কব্জিতে পরা হল আরেক বিষয়। সেইভাবে স্বর্ণের ধারণ করা আর স্বর্ণের আভূষণ পরা -- এই দুটিকে আলাদা-আলাদা ধরা হয়েছে। হাতে স্বর্ণ চেনের সঙ্গে ঘড়ি বাঁধা হল আভূষণের শ্রেণীতে আর সময় দেখার জন্য স্বর্ণ ঘড়িকে পকেটে রাখা হল স্বর্ণ ধারণ করার শ্রেণীতে। যেভাবে ঘড়ির মুখ্য উদ্দেশ্য হল সময় দেখা, আভূষণ বানানো নয়, সেইভাবে স্বর্ণ শরীরে লাগিয়ে রাখা হল স্বাস্থ্যের জন্য, আভূষণের জন্য নয়।

আর্য সভ্যতাতে স্বর্ণ আয়ুবর্দ্ধক মানা হয়েছে। এটাই হল কারণ যে আর্যরা সন্তান জন্ম হলেই স্বর্ণের শলাকা দিয়ে তার জিহ্বাতে "**ওঽম্**" লিখে দেয় আর মৃত্যু হওয়ার সময়েও অসুস্থের মুখে স্বর্ণ রেখে দেয়। শুধু রেখেই দেয় না বরং মৃত্যুর কয়েক দিন আগে থেকে স্বর্ণের তৈরি চন্দ্রোদয়াদি রসের প্রয়োগ করা আরম্ভ করে দেয় যেন তার মৃত্যু না হয়। জন্ম- মৃত্যুর সময়ের অতিরিক্ত কুণ্ডল অথবা অংটিকে আভূষণ বলে মানা

হতো না। কুণ্ডলের অর্থ হল ছল্লা আর আংটিও হল একটি ছল্লা। ছল্লা আভূষণ নয়, কারণ এটাতে কোনো কারিগরী হয় না, এতে ফুল-পত্র আদির কাজ হয় না। কানের ছিদ্রের জন্যও ঔষধিরূপ কুণ্ডল পরা হতো, আভুষণের জন্য নয়। স্বর্ণ ধারণ আর স্বর্ণ দিয়ে তৈরি চন্দ্রোদয়াদি রসের পান করা থেকে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হচ্ছে যে স্বর্ণের মধ্যে দীর্ঘায়ুর গুণ রয়েছে। এই গুণের বর্ণনা করার সঙ্গে বেদ বলেছে যে দীর্ঘায়ুর জন্য স্বর্ণ অবশ্যই ধারণ করা উচিত। অথর্ব আর য়জুর্বেদের লেখা রয়েছে যে -

জরামৃত্যুর্ভবতি য়ো বিভর্তি॥

(অথর্বঃ ১৯|২৬|১)

য়ো বিভর্তি দাক্ষায়ণঁ হিরণ্যঁ স দেবেষু কৃণুতে
দীর্ঘমায়ুঃ স মনুষ্যেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ॥

(য়জুঃ ৩৪|৫১)

অর্থাৎ - স্বর্ণ তাকে পবিত্র করে দেয়, যে তাকে ধারণ করে। যে স্বর্ণ ধারণ করে তার বৃদ্ধাবস্থাতে মৃত্যু হয়। যে উত্তম স্বর্ণ ধারণ করে সে দীর্ঘজীবি হয়।

স্বর্ণের এই মহান গুণের কারণেই শতপথ ব্রাহ্মণ ৪|৩|৪|২৪ আর ১০|৪|১|৬ এর মধ্যে **"আয়ুর্হিরণ্যম্, অমৃতম্ হিরণ্যম্"**, অর্থাৎ স্বর্ণ হল আয়ু আর স্বর্ণ হল অমৃত, বলা হয়েছে। এই গুণের কারণেই আর্যরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বর্ণকে কানের মধ্যে অথবা আঙ্গুলের মধ্যে পরতো©, কিন্তু এই ছল্লাকে কখনও আভূষণ বলা হতো না। আভূষণ তো তারা সর্বদা সুগন্ধিত ফুলেরই পরতো, কারণ ফুলের আভূষণ দ্বারা মন প্রফুল্লিত হয় আর শীতলতা প্রাপ্ত হয়। ফুল সকলের জন্য সরলতার সঙ্গে এক সমানই প্রাপ্ত হতে পারে আর পরস্পরের ঈর্ষা-দ্বেষ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এটাই হল কারণ যে ঋষিগণ ফুলের আভূষণ বানিয়ে ঋষি-পত্নিদের পরাতেন। এর থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে আর্যরা আভূষণ ফুলেরই পরতো আর কুণ্ডল আদি সাধারণ ছল্লা তো কেবল আরোগ্যতা প্রাপ্ত করার অভিপ্রায়েই পরতো, আভূষণের অভিপ্রায়ে নয়। আর্য সভ্যতা সম্বন্ধিত যত প্রাচীন আভূষণ রয়েছে তাদের নাম হতে জ্ঞাত হয় যে সেগুলো ফুলেরই হতো। কর্ণফুল, কণ্ঠশ্রী আর বেণীপর্ণ আদি নাম ফুল-পত্রেরই সূচক। এর অতিরিক্ত যত আভূষণ রয়েছে সবার মধ্যে লতা, ফুল, কুঁড়ি আর পত্রই বানানো হতো অর্থাৎ ফুল-পত্রেরই নকশা করা হতো। অতএব একথা নির্বিবাদ যে আদিমকালে আর্যদের আভূষণ ফুলেরই হতো, তবে অনুমান হয় যে কিছু দিন পরে গৌভক্ত আর্যরা কারিগরদের থেকে সোনার ফুল-পত্র বানিয়ে আর তারমধ্যে ফুলেরই রঙের মূল্যবান্ পাথর জুড়ে দিয়ে গৌয়ের জন্য আভূষণ তৈরি করিয়ে নেয় আর মণি মুক্তাখচিত আভূষণ দ্বারা নিজেদের গৌকে সাজিয়েছে। এরফল এই হয় যে কিছু দিন পর ফুলের আভূষণের স্থানে স্বর্ণের আভূষণ তৈরি হতে থাকে আর সব লোকজন ধাতু নির্মিত অনেক প্রকারের আভূষণ পরা আরম্ভ করে দেয়, কিন্তু আর্যদের আদিম সভ্যতার

© অণ্ডবৃদ্ধি থামানোর জন্য কর্ণবেধ সংস্কার হয় আর কানের মধ্যে ছিদ্র করা হয়। সেই ছিদ্রের রক্ষা আর স্বর্ণের ধারণ কুণ্ডল দিয়েই হয়ে যায়, এইজন্য কানে স্বর্ণ পরার রীতি হয়ে গেছে।

মধ্যে ধাতু নির্মিত আভূষণের জন্য কোনো স্থান নেই। যেরকম তাদের বস্ত্র সাধারণ হতো যেরকম তাদের বেশ সাধারণ হতো, সেইরকম তাদের ভূষাও সাধারণ হতো।

আর্যগৃহ, গ্রাম আর নগর

অর্থের তৃতীয় শাখা হল গৃহ। শীত-উষ্ণ আর বর্ষা থেকে রক্ষা তথা অন্য সামাজিক কার্য সম্পন্ন করার জন্য যদিও গৃহের আবশ্যকতা মানুষমাত্রের জন্য হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও আর্য সভ্যতার মধ্যে গৃহ অর্থাৎ ঘরের বিশেষ মহত্ব রয়েছে। এর কারণ হল আর্যদের আশ্রম ব্যবস্থার অনুসারে তাদের সমাজের অর্ধেকেরও অধিক জনগণের কাছে নিজের গৃহ হয় না। ব্রহ্মচারী, বনস্থ, সন্ন্যাসী আর অন্য এরকমই উপযোগী মানুষ কেবল গৃহস্থেরই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে, এইজন্য আর্যগৃহের বিষয়ে খুবই ভাবনা চিন্তা করে নিয়ম বানানো হয়েছে। আমি যে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী আর সন্ন্যাসীদের বিনা ঘর-দ্বারের লিখেছি তাদের মধ্যে বানপ্রস্থী আর সন্ন্যাসী এরা উভয়ই আর্য জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য মোক্ষমার্গের পূর্ণ অবলম্বন করার সঙ্গে বিচরণ করে। তৃতীয় ব্রহ্মচারীরা গৃহস্থ হয়ে আর তারপর সেই দুইয়ের অনুকরণকারী শিক্ষা আর দীক্ষাকে প্রাপ্ত করার সঙ্গে চলতে থাকে। এই তিনটি দলকে সহায়তা দিতে আর স্বয়ং দুই অন্তিম দলে প্রবেশ করার জন্যই গৃহাস্থাশ্রমের ব্যবস্থা। এইজন্য তিনভাগ জনগণের গৃহ থাকে না আর একভাগ জনগণের গৃহ থাকে, সেটা কেবল উপরিউক্ত তিন আশ্রমের সেবা করার জন্যই হয়, আর অন্য কোনো কাজের জন্য হয় না। অতএব আর্যদের গৃহ এরকমই হতে হবে যা ব্রহ্মচারীদের, বানপ্রস্থীদের আর সন্ন্যাসীদের আচার-আচরণের বিপরীত না হয়, সেগুলোতে মোহ আর বাসনার কোনো বিষ হবে না আর গৃহস্থের প্রতি ঘৃণা, উপেক্ষা তথা তিরস্কার উৎপন্নকারী হবে না, প্রত্যুত আর্যদের গৃহ এরকম হবে যা মোক্ষমার্গীদের কাছে আসতে আহ্বান করবে আর গৃহস্থকেও বনস্থ হতে সহায়তা দিবে।

একজন আর্য যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে এসে গৃহস্থ হয় তখন ব্রহ্মচারীদের, বানপ্রস্থীদের আর সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক ধরনের শক্তি হয়ে ওঠে। তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে আমাদের সেবা করার জন্য আর আমাদের সহায়তা করার জন্য এখন আরও এক দৃঢ় বাহুবলী দম্পতি নিজের গৃহের মধ্যে অগ্নির স্থাপনা করেছে। এই অভিপ্রায় হতে বোঝা যায় যে আর্যরা বিবাহের পরে নিজের কুটুম্বের থেকে পৃথক হয়ে পৃথকভাবে থাকাকেই ধর্ম বলে মান্য করেছে। মনু ভগবান্ বলেছেন যে **"পৃথক বিবর্ধতে ধর্মস্তস্মাদ্ধর্ম্যা পৃথক ক্রিয়া"**, অর্থাৎ পৃথক পৃথকভাবে বসবাস করলে ধর্ম বাড়ে, তাই আলাদাই থাকা উচিত। এই কথাই গৌতমসূত্র অধ্যায় ২৮ এর মধ্যে এরকমভাবে লেখা রয়েছে যে পিতার মৃত্যুর পশ্চাৎ অথবা "পিতা জীবিত থাকাকালীন যখন মাতার পুত্র জননের সময় ব্যতীত হয়ে যাবে তখন সব পুত্র পিতার সম্পত্তিকে ভাগ করে নিবে"। একইভাবে শুক্রনীতির মধ্যেও লেখা রয়েছে যে -

সদারপ্রৌঢ়পুত্রাম্ দ্রাক্ শ্রেয়োऽর্থী বিভজেত্পিতা।
সদারা ভ্রাতরঃ প্রৌঢ়াঃ বিভজেয়ুঃ পরস্পরম্।।

অর্থাৎ - যুবা আর বিবাহিত পুত্র অথবা ভাই কল্যাণের জন্য পরস্পর গৃহস্থীকে ভাগ করে নিবে আর পৃথক হয়ে যাবে। এই পৃথক্তার কেবল এতটুকুই কারণ যে প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ-স্ত্রী কুটুম্বের কলহ, প্রমাদ আর আলস্য হতে সরে গিয়ে পৃথক গৃহ নির্মাণ করবে আর নিজের বাহুবলে মোক্ষার্থীদের সেবা-সৎসঙ্গ দ্বারা স্বয়ং নিজেও মোক্ষমার্গী হয়ে উঠবে। তাৎপর্য হল যে গৃহস্থের ঘর মোক্ষমার্গের কেন্দ্র হতে হবে, যারমধ্যে দেব, পিতর, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, পাপ-রোগী, শ্বপচ আর পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ, তৃণ-পল্লব সবার পূজা হবে আর সবাইকে সমর্থন দেওয়া যাবে। এরকম গৃহ যারমধ্যে নিরন্তর মোক্ষার্থীদের সেবা হবে আর যেখানে নিরন্তর মোক্ষ প্রাপ্ত করারই উদ্যোগ হবে সেটা এরকমই হতে হবে যা স্বচ্ছ, সাত্ত্বিক, অভয়দানকারী আর রম্য হবে। সেই গৃহ থেকে অভিমান, বিলাস আর অপবিত্রতার গন্ধ আসবে না, প্রত্যুত শান্তি পাওয়া যাবে। এটাই হল কারণ যে আর্যরা নিজেদের সভ্যতাতে গৃহের স্থান খুবই সাধারণ দিয়েছে আর এটাই হল কারণ যে পুরোনো সময়ে আর্যদের গৃহ খুবই সাধারণ হতো। "মহাভারত মীমাংসা" পৃষ্ঠা ৩৭৫ এরমধ্যে রায়বাহাদুর চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য এম০ এ০ লিখেছেন - '' *ভারতের মধ্যে প্রাচীনকালে প্রায়শঃ কাঠ আর মাটিরই ঘর ছিল। দুর্যোধন পাণ্ডবদের থাকার জন্য যে লাক্ষাগৃহ নির্মাণের আজ্ঞা দিয়েছিল, সেখানেও কাঠ আর মাটিরই প্রাচীর নির্মাণের জন্য বলেছিল। এই প্রাচীরের ভিতরে রাল, লাখ আদি জ্বালাগ্রাহী পদার্থ দেওয়া হয়েছিল আর তার উপরে মাটির লেপ দেওয়া হয়েছিল। যখন পাণ্ডবদের মতো রাজপুরুষদের জন্য এরকম ঘর নির্মাণের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তো একথাই দৃঢ় হচ্ছে যে মহাভারত কালে বড়ো লোকেদের ঘরও মাটিরই হতো।"* একথা একদম ঠিক। আর্যদের ঘর এরকমই হতো, কিন্তু এর তাৎপর্য এই নয় যে আর্যরা ইট বানানো বা পাথর কেটে জোড়া লাগানো আদি জানতো না। তারা ইটকে পাকা করা জানতো আর ইট দিয়ে হবনকুণ্ড, হবনমণ্ডপও বানাতো, এমনকি বড়ো-বড়ো লোহার কিলা পর্যন্ত বানাতো। একথা অগ্নইষ্টকার বর্ণনা করে য়জুর্বেদের মধ্যে আর আয়সীপুরের বর্ণনা করে ঋগ্বেদের মধ্যেও লেখা রয়েছে, কিন্তু আমি যেমনটা বলে এসেছি আর্যদের থাকার গৃহ মোক্ষার্থীদের থাকার আর মোক্ষার্থের চর্চা করার জন্যই ছিল, তাই সেগুলো প্রমাদ উৎপন্নকারী শৈলীর নির্মিত করা হতো না। ভব্য ভবন আর সাধারণ আর্য গৃহের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে আর উভয়ের মধ্যে কি-কি হানি-লাভ রয়েছে, এখানে আমি তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সরল-সাধারণ, মাটি-কাঠ আর ঘাসের ছোটো-ছোটো গৃহ ঝাড়ু দিলে আর লেপে নিলেই নিত্য পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু বড়ো, উঁচু আর ইট-পাথরের বাড়ি প্রতিদিন এত দ্রুত পরিষ্কার করা যায় না। ইট-পাথরের বাড়ি গরমে অধিক গরম আর শীতে অধিক শীত তথা বর্ষাতে অধিক উষ্ণতা উৎপন্ন করে, কিন্তু মাটি-কাঠের আর খড়ের ছাউনীর গৃহে গরমে ঠান্ডা, শীতে গরম আর বর্ষাঋতুতে খুবই বায়বীয় হয়। সাধারণ গৃহ খুবই কম শ্রম আর কম খরচে হয়ে যায়, কিন্তু ইট-পাথরের ভব্য ভবনে লক্ষ-লক্ষ টাকা লেগে যায়। আজ ভবনের ব্যর্থ খরচের কারণে নবীন স্কুল আর কলেজ খোলা কঠিন হয়ে গেছে। নবীন স্কুলের নাম নিতেই বিল্ডিংয়ের প্রশ্ন সামনে এসে যায় আর সহস্রের কথা লক্ষে বদলে যায় আর সমস্ত স্কিম মাথাতেই রয়ে যায়, কিন্তু যদি

সাধারণ গৃহের অনুকরণ করা যায় তাহলে প্রত্যেকটিতে অল্প একটু খরচেই এক-একটা কলেজ খোলা যেতে পারে, তাই ভব্য ভবনের তুলনায় সাধারণ গৃহ হল অধিক উপযোগী। সাধারণ গৃহের উপযোগিতা সেই সময় খুবই ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় যখন ভূকম্প, অগ্নিকাণ্ড অথবা নদীর প্রবাহ দ্বারা গ্রামের নাশ হয়ে যায়। এরকম বিপর্যয়ের মধ্যে ভূকম্পের কারণে তো ছাউনীওয়ালা গৃহ পড়েই না। বাকি রইলো অগ্নিকাণ্ড আর জলপ্রবাহ, যদিও এতে সাধারণ গৃহও নষ্ট হয়, তবে সাধারণ গৃহ নষ্ট হওয়া ভব্য ভবনের অপেক্ষা অনেক কমই হানি হয়। কম হানির কারণে ছোটো গৃহকর্তা দশ থেকে বিশ দিনের মধ্যেই নিজের নতুন গৃহ আবার বানিয়ে নেয়, কিন্তু ভব্য ভবনের গৃহকর্তার তো আর দ্বিতীয় ভব্য ভবন আজীবন ধরে চেষ্টা করেও হয়ে ওঠে না। এর তাৎপর্য এই হল যে সাধারণ গৃহ সর্বদা স্থির থাকে, কিন্তু ভব্য ভবনের স্থিরতার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। বড়ো গৃহকর্তাদের মধ্যে স্বাভাবিকই অভিমান আর প্রমাদ হয়, কিন্তু সাধারণ গৃহকর্তা খুবই সরল হয়। বড়ো ভবনে থাকলেই চাকর, ফার্নিচার, বাহন আর অনেক প্রকারের পোশাকের আর ঠাট-বাটের আবশ্যকতা অকারণেই উৎপন্ন হয়ে যায়, কিন্তু সাধারণ গৃহতে এসব বিষয় উৎপন্ন হয় না। ভব্য ভবন আর সাধারণ গৃহের মধ্যে সবথেকে বড়ো যে পার্থক্য রয়েছে সেটা হল মোহ আর পৈতৃক সম্পত্তির। সাধারণ গৃহকর্তা যখন চায় তো তখন নিজের গৃহকে ছেড়ে দিয়ে সুবিধার সঙ্গে অন্য কোনো স্থানে নতুন গৃহ বানিয়ে নেয় আর কথায়-কথায় গ্রাম, জেলা আর প্রান্তকেও ছেড়ে দেয়, যার উদাহরণ আমরা নিত্য যাযাবর (nomads) - নট, কাঞ্জর আর হবুড়দের মধ্যে দেখতে পাই, কিন্তু উঁচু-উঁচু গৃহের কর্তা সহস্র-সহস্র সংকট আসলেও নিজের ভবনের মোহে কোথাও যেতে পারে না আর না ধনাঢ্যতার ব্যর্থ গন্ধকে মাথা থেকে বের করতে পারে, প্রত্যুত সেই পুরোনো গৃহকে সম্পত্তি মনে করে তারই পাথরে নিজের পা ঘষতে থাকে, এইজন্য ভব্য ভবন আর বড়ো-বড়ো ভবন হল মানুষের স্বাভাবিক বসবাসের সর্বথা বিপরীত। এটাই মানুষের মধ্যে সবার আগে স্বামিত্ব ভাবকে উৎপন্ন করেছে আর পৈতৃক সম্পত্তির ভাবগুলোকে জমিয়েছে, তাই মোহ, অভিমান আর আলস্য উৎপন্নকারী এরকম ভবনকে আর্যরা নিজেদের সভ্যতাতে স্থান দেয়নি। আর্যদের গৃহের আদর্শ বর্ণনা করে এরকম অথর্ববেদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

তৃণৈরাবৃতা পলোদান্বসানা রাত্রীব শালা জগতো নিবেশনী।
মিতা পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠসি হস্তিনীব পদ্বতী।।
(অথর্বঃ ৯|৩|১৭)

য়া দ্বিপক্ষা চতুষ্পক্ষা ষটপক্ষা য়া নিমীয়তে।
অষ্টাপক্ষাম্ দশপক্ষাম্ শালাম্ মানস্য পত্নীমগ্নির্গর্ভ ইবা শয়ে।।
(অথর্বঃ ৯|৩|২১)

অর্থাৎ - তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত আর কলা-কৌশল আদি যন্ত্রে সুসজ্জিত হে শালে! সকলের জন্য তুমি রাত্রিকালের শান্তিদাতা আর কাষ্ঠ স্তম্ভে হস্তিনীর ন্যায় ভূমিতে স্থির হয়ে আছো। যে শালা দুই ছাউনী, চার ছাউনী, ছয় ছাউনী আর আট তথা দশ ছাউনীওয়ালা নির্মিত, সেই সম্মান রক্ষাকারী শালাতে (গৃহে) আমি জঠরগ্নি আর গর্ভের সমান নিবাস করি।

বৈদিক আর্যদের গৃহের আদর্শ হল এটাই। এরকম গৃহেই বাস করে তারা ঈশ্বরপরায়ণ মোক্ষার্থী ভক্তদের আশ্রয় দিতো আর স্বয়ং তাদের সৎসঙ্গ দ্বারা মোক্ষসাধনের মধ্যে সর্বদা রত রইতো। এটাই হল কারণ যে বৈশ্যবর্ণের দ্বারা সংশোধিত পৃথিবীখণ্ডের মধ্যে যেখানকার জলবায়ু উত্তম হতো, পশুদের জন্য চরনের যোগ্য বড়ো-বড়ো গোচর ভূমি হতো আর জঙ্গলে তথা উঁচু পাহাড়ের দৃশ্য হতো, সেখানেই তারা তাদের বসতি বসিয়ে দিতো। আর্যদের গৃহ মাটি, কাঠ আর ঘাস দিয়ে আর ফুল-ফলের বাগানে ঘেরা, উঁচু ভূমিতে, নদীর নিকট কূপ, সরোবর যুক্ত আর উর্বর ভূমিতে নির্মাণ করা হতো। গৃহ নির্মাণের সময় একথা ধ্যানে রাখা হতো যে প্রত্যেকটি গৃহ যেন দূরে-দূরে ততটুকু ভূমিকে ছেড়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয় যারমধ্যে একটি কুটুম্বের যোগ্য ভোজন, বস্ত্র আর পশুর চারা উৎপন্ন হতে পারে। ঘরের এই শৈলী বঙ্গ আর মধ্যপ্রদেশের মধ্যে কোথাও-কোথাও এখনও পর্যন্ত জীবিত রয়েছে।

ভালো আর্যগৃহের মধ্যে দশ ছাউনী, অর্থাৎ দশটি ভিন্ন-ভিন্ন ঘর হতো। এদের মধ্যে পাঁচটি ভিতরের দিকে আর পাঁচটি প্রাচীরের বাইরের দিকে হতো। ভিতরগুলোর মধ্যে একটি গৃহকর্তার, দ্বিতীয়টি গৃহপত্নী আর ছোট শিশুদের, তৃতীয়টি অতিথির, চতুর্থটি পাকশালার যেখানে গার্হপত্যাগ্নি থাকে আর পঞ্চমটি বাইরে থেকে আসা অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচারীর জন্য হতো। গৃহের বাইরের ঘরগুলোর মধ্যে একটিতে নর-পশুর, দ্বিতীয়টি মাদা-পশুর, তৃতীয়টি রোগীদের, চতুর্থটি স্নানের, পঞ্চমটি কৃষি পদার্থের হতো। ব্যস্, এর অতিরিক্ত গৃহের মধ্যে অনেকগুলো খণ্ড বানিয়ে অনেক ঘর বানানো নিরর্থক বলে মনে করা হতো। সত্যি তো, অধিক ঘরের আবশ্যকতাও হয়তো হতো না। আর্য সভ্যতার স্থিরতা তো সাধারণ, স্বচ্ছ আর ছোট গৃহের মধ্যে থাকতে পারে, এইজন্য সাধারণ গৃহই হওয়া উচিত আর এরকমই শ'দুয়েক গৃহের গ্রাম হওয়া উচিত তথা প্রত্যেক গ্রামের পরে বিশাল বড়ো জঙ্গলকে ছেড়ে আবার দ্বিতীয় গ্রাম স্থাপন করা উচিত, কারণ গ্রাম্য জঙ্গলের মধ্যেই বনস্থদের নিবাস হওয়া সম্ভব। মনুস্মৃতির মধ্যে লেখা রয়েছে যে প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দিকে শত ধনুষ ভূমি ছেড়ে দেওয়া উচিত আর বড়ো নগরের চতুর্দিকে এর তিনগুণ চরভূমি ছেড়ে দেওয়া উচিত[©] **।**আর্য গ্রামের মধ্যে যতদূর সম্ভব সকল বর্গের আর সকল পেশাযুক্ত লোকেদের বাস করানো উচিত। বৈদ্য, রাজকর্মচারী, বেদবেত্তা আর যজ্ঞ করিয়ে দেয় এরকম তো অবশ্যই যেন বাস করে। যেরকম এই গ্রাম হবে সেইরকম সাধারণ গৃহ দ্বারা নির্মিত নগর অথবা পুরও হওয়া উচিত। আর্যগ্রাম আর আর্যপুর বা নগরের মধ্যে সেরকম বড়ো পার্থক্য নেই। যেখানে বড়ো জঙ্গলে ঘিরে দুই-চার কোস পর্যন্ত দশ-বিশটি ছোটো - ছোটো গ্রাম এসে যায় সেখানেই পুর হয়ে যায় আর এই ছোটো-ছোটো গ্রামই তার নগর হয়ে যায়। এরকম পুর বা নগর বেশিরভাগ হাট বা রাজার কারণে হয়ে যায়, কিন্তু সেসব আজকালের নগরের মতো হতো না। আজকালের নগরে তো গৃহের নিচে, উপরে, এপাশে - ওপাশে সর্বত্র পায়খানা ভরা থাকে, কিন্তু আর্য সাহিত্যের মধ্যে ভঙ্গী (মেথর) আর পায়খানার জন্য কোনো শব্দ নেই। এর থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে আর্যনগর

© ধনুঃশতম্ পরীহারো গ্রামস্য স্যাত্ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতাস্ত্রয়ো বাऽপি ত্রিগুণো নগরস্য তু।। - মনুঃ ৮|২৩৭

জঙ্গল দ্বারা আর তার নগর বন-বাগান তথা চরাভূমি দ্বারা ঘেরা ছিল আর লোকেরা জঙ্গলেই শৌচ করার জন্য যেত। এটাই হল আর্যগৃহ আর আর্যগ্রামের তথা আর্যনগরের দিগদর্শন।

আর্য-গৃহস্থী

অর্থের চতুর্থ শাখা হল গৃহস্থী। ভোজন, বস্ত্র আর গৃহ নির্মাণ করতে যেসব পদার্থের আবশ্যকতা হয় আর যে পদার্থ স্বাস্থ্য আর জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়ক হয় সেই সবকে গৃহস্থীর মধ্যে ধরা হয়। স্থূলরূপে আর্যগৃহস্থীর সাতটি বিভাগ রয়েছে। এই সাতটির নাম হল বাসনপত্র, পশু, প্রদীপ, ঔষধি, পুস্তক, যন্ত্র আর শস্ত্রাস্ত্র। এখানে আমি ক্রমে-ক্রমে সবগুলোর বর্ণনা করবো।

আর্য গৃহস্থীর মধ্যে সর্বপ্রথম বস্তুটি হল বাসনপত্র। বাসনপত্রের ব্যবহার আহার ও পান করা, রন্ধনে আর যজ্ঞের কাজে লাগে|আহার ও পান করা বাসনপত্রের জন্য অথর্ববেদের (৮|১০(৫)|১৪) মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"অলাবুপাত্রম্ পাত্রম্"** অর্থাৎ অলাবুপাত্রের বাসনই হল বাসন, অন্য নয়। একথাই বাসনপত্রের বর্ণনা করার সঙ্গে মনু ভগবান্ও লিখেছেন - **"অলাবুম্ দারুপাত্রম্ চ মৃণ্ময়ম্ বৈদলম্ তথা"**[®], অর্থাৎ অলাবুপাত্র, কাষ্ঠময় পাত্র, মাটির পাত্র আর বাঁশেরই বাসন হওয়া উচিত। এই বাসনগুলোতে আহার ও পান করার পদার্থ রেখে দিলে নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না আর এই বস্তু সহজেই সবাই প্রাপ্ত করতে পারবে। এইভাবে কাষ্ঠ, মাটি আর পাথরের পাত্র যজ্ঞের মধ্যেও কাজে লাগে, তাই এরকমই পাত্র হওয়া উচিত যা সকলে সহজে পেতে পারে। এর উপর কিছু ব্যক্তি বলে যে - এসব পাত্র তো সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহস্থদের জন্য নয়, কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আজ আমাদের দেশে লক্ষ-লক্ষ গ্রহস্থ এরকম রয়েছে যাদের গৃহে কাঠের, পাথরের, মাটির বা বাঁশের অথবা পাতার পাত্র ছাড়া একটিও পিতল - কাঁসার বাসন নেই।

এইভাবে লক্ষ-লক্ষ গৃহস্থ এরকম রয়েছে যাদের ঘরে কেবল একটি পিতলের থালা, একটি বাটি আর একটিই ঘটি রয়েছে, শেষ যত বাসন রয়েছে সে সবগুলোই কাঠ, মাটি, পাথর, পাতা আর বাঁশ আদির। এইজন্য এটা বলা উচিত নয় যে এই বাসন কেবল সন্ন্যাসীদেরই জন্য। একে সন্ন্যাসীদের বাসন বলার কারণ হল এটাই যে সন্ন্যাসী এগুলোর মধ্যে একটিই পদার্থের বাসন নিতে পারবে, সব পদার্থের একসঙ্গে অনেক বাসন নয়, তবে গৃহস্থ প্রত্যেক বস্তুর অনেক বাসন রাখতে পারবে, তাই সন্ন্যাসী আর গৃহস্থের বাসনের তুলনা হয় না। আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত একটি রীতি রয়েছে যে গৃহস্থের ঘরে কুমার মাটির বাসন, নট বাঁশের বাসন আর বারী পাতার বাসন যতটা আবশ্যক হয় ততটা সর্বদা দিয়ে যায় আর বছর শেষে গৃহস্থের উপজের অমুক ভাগ নিয়ে যায়, কিন্তু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এধরনের কোনো নিয়ম নেই, তাই উপরিউক্ত বাসনকে কেবল

® মনুসংহিতা ৬|৫৪

সন্ন্যাসীদের বাসন বলা যায় না, প্রত্যুত এটা বলা যেতে পারে যে - যেই বাসন সবার জন্য একসমান সরলতার সঙ্গে প্রাপ্ত হতে পারে আর যা ভোজনকে সুরক্ষিত রাখতে পারে, সেগুলোরই সমাবেশ আর্য সভ্যতার মধ্যে রয়েছে। পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, জার্মান সিলভার আর রূপা আদির বাসনের নেই, কারণ এসব সকলের জন্য সরলতার সঙ্গে একসমান প্রাপ্ত হবে না।

পশুও আর্যগৃহস্থীর প্রধান সামগ্রী, এইজন্য বেদের মধ্যে পশু প্রাপ্তির জন্য শত-শত প্রার্থনার বর্ণনা রয়েছে, কারণ আর্য সভ্যতার মধ্যে পশুদের থেকে ছয় প্রকারের কাজ নেওয়া হয়, অর্থাৎ আর্যদের পশু ভোজন, বস্ত্র, ক্ষেতী, আরোহণ, প্রহরী আর স্বাচ্ছতার কাজে লাগে। গাভী, মোষ, ছাগ আর মেষ থেকে দুগ্ধ-ঘৃতাদি খাদ্য পদার্থ প্রাপ্ত হয়। মেষ আর ছাগ থেকে বস্ত্রের জন্য উল প্রাপ্ত হয়ে যায়। বৃষ, মোষ, উট, ঘোড়া, গাধা আর হাতি থেকে আরোহণ, বোঝা নিয়ে যেতে আর ক্ষেতী চাষাদির কাজে ব্যবহার করা হয়। কুকুর পাহারা দেয় আর শুয়োর স্বচ্ছতার কাজ করে, এইজন্য আর্যগৃহস্থীর মধ্যে পশুর বড়ো মহত্ব রয়েছে। আর্যগৃহস্থীর মধ্যে প্রদীপও হল প্রধান বস্তু, কারণ আর্য সভ্যতার মধ্যে দীপ-দানের বড়ো মহত্ব রয়েছে। যেখানে অতিথির ষোলোশোপচার গণা হয় সেখানে অতিথিপূজার মধ্যে দীপ-দানকেও রাখা হয়েছে। এছাড়া আর্যদের কোনো ধার্মিক কৃত্যই আরম্ভ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রদীপ জ্বালানো হচ্ছে। এইজন্য দিনের সময়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। আর্যদের প্রদীপ সর্বদা ঘী দিয়েই জ্বালানো হয়। ঘৃত প্রদীপের সমান নেত্রকে সুখ দেয় এরকম কোনো দ্বিতীয় আলো নেই, তাই আর্য গৃহস্থের মধ্যে অন্ধকারকে দূর করার জন্য প্রদীপকে আবশ্যক ধরা হয়েছে।

আর্য গৃহস্থের মধ্যে ঔষধির সংগ্রহও আবশ্যক রয়েছে, কিন্তু এর তাৎপর্য এই নয় যে আর্যদের সর্বদা ঔষধির সেবন করা উচিত। ঔষধি সংগ্রহের কারণ কেবল এটাই যে না জানি কখন কিরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় আর ওষুধের আবশ্যকতা পড়ে, কারণ গৃহস্থের মধ্যে এইধরনের প্রসঙ্গ এসেই থাকে, যেখানে শীঘ্র ওষুধের আবশ্যকতা পড়ে, এইজন্য যেসব ওষুধ দ্রুত তৈরি করা যায় না আর যার আবশ্যকতা দ্রুত হয় সেইসবের সংগ্রহ আর্য গৃহস্থের মধ্যে অবশ্যই রাখা উচিত। যদিও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের তাৎপর্য হল এটাই যে কখনও যেন অসুস্থ্য না হতে হয়, কারণ আয়ুর্বেদ বলাই হয় সেই বিদ্যাকে যা অসুস্থ্য থেকে বাঁচার জ্ঞান দেয়, তথাপি দুর্দৈবের কারণে শরীরে আঘাত লাগলে, ক্লান্তি হলে আর মলের সঞ্চয় হয়ে গেলে যে অসুস্থতা উৎপন্ন হয়, তার উপায় বের করে রাখতে হয়। আঘাত লাগলে - কোনো অঙ্গ ভেঙে গেলে যে অসুস্থতার উৎপন্ন হয়, তাতে রোগী যত্ন, সেবা-শুশ্রূষা আর মলম-পট্টি বাঁধা দ্বারা আরাম পায়, ওষুধপত্র দিয়ে নয়। একইভাবে ক্লান্তি হতে যে অসুস্থতা হয় তাতেও আরাম নিলে পরে লাভ হয়, ওষুধ দিয়ে হয় না, কিন্তু যেসব অসুস্থতা রোগের কারণে হয় সেগুলোর মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিকারের আবশ্যকতা হয়ে থাকে, কারণ মাধব নিজের নিদানের মধ্যে লিখেছেন যে **"সর্বেষামেব রোগানাম্ নিদানম্ কুপিতা মলাঃ"**, অর্থাৎ সমস্ত রোগ মলের সঞ্চয় হতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে আর এই সঞ্চিত মলই কখনও কফ হয়ে, কখনও ডায়রিয়া হয়ে, তো কখনও ফোড়া-ব্রণ হয়ে আর কখনও জ্বর তথা বমনের রূপে পরিণত হয়ে নানা প্রকারের রোগের নামে প্রকট হয়। তাই এই মলজন্য রোগকে চারটি উপায়ে দূর করা হয়। চরকাচার্য বলেছেন যে-

পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্।
চতুষ্প্রকারা সম্শুদ্ধির্বমনঞ্চ বিরেচনম্।

অর্থাৎ - পাচক পদার্থকে ভোজন, উপবাস, ব্যায়াম আর লঙ্ঘন করলে তথা বমন আর বিরেচনের প্রয়োগ করলে মলের শুদ্ধি হয়। এই প্রতিকারের মধ্যে ফলোপবাস, লঙ্ঘন আর বমন - বিরেচনকে সকলেই জানে, কিন্তু আর্য সভ্যতার মধ্যে মল শুদ্ধির এক অন্য উপায়ও বলা হয়েছে, যাকে প্রায়শঃ লোকজন ভুলে গেছে, সেই উপায়টি হল প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের গুণ বর্ণনা করে ভগবান্ মনু বলেছেন -

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাম্ ধাতূনাম্ হি য়থা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাম্ দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাত্।।

(মনুঃ ৬|৭১)

অর্থাৎ - যেভাবে অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করলে ধাতুর মল নষ্ট হয়ে যায়, সেইভাবে প্রাণায়াম করলে পরে ইন্দ্রিয়ের দোষ নষ্ট হয়ে যায়।

যদিও নিত্য প্রাণায়ামকারী ফলাহারী আর্যদের শরীরের মধ্যে মলের সঞ্চয় হয় না তথাপি কখনও-কখনও অকস্মাৎ সান্নিপাতিক রোগের আক্রমণ হলে, যার থেকে মৃত্যুর আশঙ্কা উৎপন্ন হয়, অতএব বিদ্বান বৈদ্যের কাছ থেকে ভালো ঔষধি নিয়ে নিজের ঘরে রেখে দেওয়া উচিত।

আর্যগৃহস্থীর মধ্যে পুস্তকেরও ভারী মহত্ব রয়েছে, এইজন্য প্রত্যেক আর্যদের গৃহে বেদ, বেদের অঙ্গ, উপাঙ্গ, স্মৃতি, দর্শন, ইতিহাস আর অন্য এরকমই জ্ঞান-বিজ্ঞান বৃদ্ধিকারী পুস্তক হওয়া উচিত। ব্যর্থ ফালতু বক্তব্যের আর জ্ঞানের স্থানে অজ্ঞানতা ছড়ানো তথা মানুষের রুচিকে তামস্ বানানোর মতো পুস্তক হওয়া উচিত নয়। উচ্চ কোটির কিছু গ্রন্থ দিয়েই জ্ঞানবৃদ্ধিতে যে সহায়তা হয় ততটা সহায়তা অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের প্রচারকারী সহস্র গ্রন্থও করতে পারবে না। ঋষিদের লেখা শ'পাঁচেক গ্রন্থকে অবলোকন করলে পরেই জ্ঞানের মধ্যে যে স্থিরতা হয় তা বড়ো-বড়ো পুস্তকালয়ের সহস্র-সহস্র পুস্তককে পড়লে পরেও হয় না। এইজন্য শাস্ত্রের মধ্যে অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের সংগ্রহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শন ১|২৬ এর মধ্যে কপিলাচার্য বলেছেন যে - **"অনিয়তত্ত্বেপি নায়ৌক্তিকস্য সম্গ্রহোऽন্যথা বালোন্মত্তাদিসমত্বম্"**, অর্থাৎ বালক আর উন্মত্তের সমান অনিশ্চিত আর যুক্তিহীন কথার সংগ্রহ করা ব্যর্থ। এইজন্য সেইসব গ্রন্থই সংগ্রহ করার যোগ্য যা সনাতন সিদ্ধান্ত অখণ্ডরূপে প্রচার করে আর প্রাণীদের এই লোক আর পরলোকে সুখ পৌঁছানোর বিধি আর যুক্তির শিক্ষা দেয়।

আর্যগৃহস্থীর মধ্যে যন্ত্রেরও সমাবেশ রয়েছে, তবে বৈদিক যন্ত্র হল সেটাই যা কোনো পশু বা মানুষের কর্মক্ষেত্র সংকীর্ণ করে না। আর্য সভ্যতার মধ্যে এরকম যন্ত্রের সমাবেশ নেই যা কোনো পশুর সহায়তা ছাড়া কেবল স্প্রিং, স্টিম অথবা বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা অল্প মানুষের সহায়তায় চালানো যায় আর যে কারণে সহস্র পশু আর মানুষের কর্মক্ষেত্র থেমে যায়। বৈদিক যন্ত্রের উদাহরণ সূত কটার পুরোনো চরকা, কাপড় বুনার পুরোনো ছাঁচ আর বাসন তৈরির কুমারের পুরোনো চক্র আদি রয়েছে, কিন্তু অবৈদিক যন্ত্র আজকালকার মোটর, ট্রাম, রেল আর স্টিমইঞ্জিন রয়েছে যার কারণে লক্ষ-লক্ষ পশু আর মানুষ অকেজো, অনুপযোগী

আর বোঝার মতো হয়ে গেছে। এই যন্ত্র হল হিংসক, এইজন্য আর্য সভ্যতার মধ্যে এর সমাবেশ নেই। আর্য যন্ত্র তো হল সেটাই যা সনাতন হতে পশু আর মানুষের দ্বারা চলে আসছে, এইজন্য আর্য গৃহস্থীর মধ্যে তার সংগ্রহ অবশ্যই হওয়া উচিত।

আর্য গৃহস্থের মধ্যে শস্ত্রাস্ত্রেরও আবশ্যকতা রয়েছে। প্রাচীন কোদাল, করাত, বাইস, নিহায়, হাতুড়ি, সন্সি (pincer), সুই, কেঁচি, ক্ষুর, ধনুষ-বান, তলোয়ার আর ঢাল আদি হল আর্য সভ্যতার শস্ত্রাস্ত্র। এগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার শৈলীর প্রয়োগ হয় না, এইজন্য এগুলো আর্য সভ্যতার মধ্যে গণা হয়েছে। কিন্তু যেগুলোর মধ্যে শৈলীর প্রয়োগ হয় সেগুলো অন্য প্রাণীদের কর্মক্ষেত্রের বাঁধক হয়, এইজন্য তা আর্য সভ্যতার মধ্যে গণা হয় না, কিন্তু আর্যদের গৃহে সাধারণ শস্ত্রাস্ত্র থাকাটা খুবই আবশ্যক, অতএব সাধারণ শস্ত্রাস্ত্রই আর্যগৃহস্থীর মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। গৃহস্থীর সঙ্গে সম্বন্ধিত এই সাত প্রকারের পদার্থের অতিরিক্ত যদি আরও কোনো বস্তু গৃহস্থীর মধ্যে উপযোগী আর আবশ্যক বলে মনে করা হয় তাহলে তারও সংগ্রহ করা উচিত, তবে একথা সর্বদা ধ্যানে রাখা উচিত যে আর্যগৃহস্থীর বস্তু সেটাই হতে পারে যাকে প্রাপ্ত করতে না তো কোনো প্রাণীর হানি হবে আর না মানবসমাজের মধ্যে অসমানতা, না ঈর্ষা উৎপন্ন করবে আর না তাকে প্রাপ্ত করতে নিজেকেও কষ্ট করতে হবে, প্রত্যুত যে পদার্থ সরলতার সঙ্গে সবার জন্য এক সমান প্রাপ্ত হতে পারে, সেটাই আর্য গৃহস্থীর মধ্যে সম্মিলিত হতে পারে, কারণ মোহক পদার্থের সংগ্রহ করে মানুষের মধ্যে প্রকরণান্তর হতে চুরির প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, যা হল আর্যসভ্যতার বিপরীত। আর্য সভ্যতার মধ্যে চুরির জন্য অবকাশ নেই। এটাই হল কারণ যে, আর্যদের ভাষা সংস্কৃতের মধ্যে তালা আর চাবির জন্য কোনো শব্দ নেই, এইজন্য আর্যদের এরকমই গৃহস্থী হতে পারে যার জন্য তালা-চাবির প্রবন্ধের দরকার হয় না।
এই পর্যন্ত আমরা আর্যদের অর্থের চার শাখাগুলোর আলোচনা করে দেখলাম আর তার থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে যেই পদ্ধতিতে তারা এই সৃষ্টি থেকে অর্থের সংগ্রহ করে, তার দ্বারা না তো কোনো প্রাণীর কোনোরূপ কষ্ট হয় আর না আর্যদের লোক-পরলোক সম্বন্ধীত উদ্দেশ্য পূর্ণতার মধ্যে কোনো বাধা আসে, বরং সৃষ্টির সোজা (মানব), বেঁকা (পশ্বাদি) আর উল্টো (বৃক্ষাদি) সমস্ত য়োনিগুলোর লেন-দেনে সামঞ্জস্য উৎপন্ন হয় আর সকলের জন্য মোক্ষমার্গ সরল হয়ে যায়, কারণ আর্যগণ নিজেদের অর্থের চারটি বিভাগ প্রায় পশু আর বৃক্ষ থেকেই নিয়ে থাকে আর তাদের আয়ু তথা ভোগের সর্বদা ধ্যান রাখে। তারা জানে যে যেভাবে মানুষের আবশ্যকতা পশু আর বৃক্ষ সেইভাবে পশুর আবশ্যকতা হল বৃক্ষ আর বৃক্ষের জলের আবশ্যকতা হয়, এইজন্য তারা সর্বদা কৃষি আর জঙ্গলের দ্বারা পশুদের জন্য অন্ন আর ঘাসের তথা যজ্ঞের দ্বারা বনস্পতির জন্য জলের প্রবন্ধ করে। তারা একথা ভালোভাবেই জানে যে মানুষের জীবন কেবলমাত্র একটি গাভীর দুধ দিয়েই চলে যেতে পারে আর গাভী কেবল জঙ্গলের ঘাসের উপরেই নির্বাহ করতে পারে, এইজন্য আর্যরা নিজেদের সভ্যতার পরিভাষাতে মানুষকে প্রজা, পশুকে প্রজাপতি আর বৃক্ষকে পশুপতি বলেছে। এর তাৎপর্য হল এটাই যে, প্রজাকে পশু পালন করে আর পশুকে বনস্পতি পালন করে। বেদের মধ্যে কয়েকশ স্থানে মানুষকে "প্রজয়া সুবীরাঃ" বলা হয়েছে। একইভাবে শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে পশুদের প্রজাপতি বলা হয়েছে। সেখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে **"কতমঃ প্রজাপতিরিতি"**, অর্থাৎ প্রজাপতি কে? তো উত্তর

দেওয়া হয়েছে যে **"পশুরিতি"**, অর্থাৎ পশুই হল প্রজাপতি |যেভাবে পশুদের প্রজাপতি বলা হয়েছে সেইভাবে বৃক্ষকে পশুপতি বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণের ৬|১|৩|১২ তে লেখা রয়েছে যে **"ওষধয়ো বৈ পশুপতিস্তস্মাদ্যদা পশব ওষধীর্লভন্তেऽথ পতীয়ন্তি"**, অর্থাৎ ঔষধিই হল পশুপতি, অতঃ যখন পশু ঔষধি আহার করে তখনই স্বামীর কার্যক্ষম হয়। একইভাবে য়জুর্বেদ ১৬|১৭ তে **"বৃক্ষেভ্যঃ হরিকেশেভ্যো পশূনাম্ পতয়ে নমঃ"** লিখে বৃক্ষকে হরিতকেশকারক পশুপতি বলা হয়েছে। তাৎপর্য এই হল যে যেভাবে প্রজার (মানুষের) পালন পশু করে আর পশুর পালন বৃক্ষ করে, সেইভাবে ঘুরে মানুষও পশু থেকে ঘী আর বৃক্ষ থেকে কাষ্ঠাদি নিয়ে যজ্ঞ করে আর যজ্ঞ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে বৃক্ষেরও পালন করে, যার ফলে বৃক্ষ, পশু আর মানুষ আদি সকল প্রাণী পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত জীবনযাপন করে আর নিজেদের কর্মফলকে ভোগ করে মোক্ষমার্গের পথিক হয়ে যায়। এটাই হল আর্য অর্থশাস্ত্রের মূল আর এটাই আর্যদের অর্থের প্রাধান্যের সারাংশ।

কামের প্রাধান্য

আর্য সভ্যতার প্রধান চার স্তম্ভের মধ্যে কামের অত্যন্ত মহত্ব রয়েছে। যেভাবে মোক্ষের সহায়ক অর্থ, সেইভাবে অর্থের সহায়ক হল কাম। যদি কাম অর্থের সহায়তা না করে তাহলে এখনি আমি যেই অর্থের প্রাধান্যের বর্ণনা করে এসেছি আর আর্য ভোজন, আর্য বস্ত্র, আর্য গৃহ আর আর্য গৃহস্থীর যে আদর্শ দেখিয়ে এলাম, তার স্থিরতা একদিনও থাকবে না, অর্থাৎ যদি মানুষ কামকে সংযত না করে তাহলে তারা অর্থকেও সংযত করতে পারবে না আর অর্থসংযত বিনা কখনও মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারবে না, এইজন্য আর্যরা কামের বিষয়ে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেছে। সংসারে আজ পর্যন্ত আর্যদের অতিরিক্ত কোনো সভ্যজাতি অর্থশুদ্ধির মূলাধার এই কামের উপর এতটা বিচার করেনি। সবাই অর্থ আর কামকে একটির মধ্যেই মিলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আর্যরা যেভাবে শরীর আর মনের পৃথক্তাকে জেনে যায় সেইভাবে শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধিত অর্থকে আর মনের সঙ্গে সম্বন্ধিত কামকেও একে-অপরের থেকে পৃথক করে দিয়েছে আর যেভাবে শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধিত ভোজন, বস্ত্র, গৃহ আর গৃহস্থীকে অর্থের অন্তর্গত করে দিয়েছে, সেইভাবে মনের সঙ্গে সম্বন্ধিত ঠাট-বাট, শোভা-শৃঙ্গার আর স্ত্রী-পুত্রাদিকে কামের অন্তর্গত করে দিয়েছে, কারণ এইসব পদার্থ কেবলই হল মনস্তুষ্টির জন্য। যদি নিজের মন নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে এগুলোর মধ্যে একটি পদার্থেরও আবশ্যকতা হবে না, কিন্তু এসব থেকে মনকে একদম সরিয়ে দেওয়াটা খুবই কঠিন। ঠাট-বাট আর শোভা - শৃঙ্গার থেকে যদি বা মানুষ নিজের মনকে সরিয়েও নেয়, কিন্তু স্ত্রী হতে পুরুষকে আর পুরুষ হতে স্ত্রীকে মন সরিয়ে নেওয়া বড়োই কঠিন। সত্যি কথা হল স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক বন্ধনকেই কাম বলা হয়েছে, সাজ-সজ্জা আর শোভা-শৃঙ্গার তো হল তার বন্ধনের সাধনমাত্র। এটাই হল কারণ যে মানসশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ জ্ঞাতা সার্ঙ্গধর

কামের লক্ষণ করে লিখেছেন যে -

স্ত্রীষু জাতো মনুষ্যাণাম্ স্ত্রীণাম্ চ পুরুষেষু বা।
পরস্পরকৃতঃ স্নেহঃ কাম ইত্যভিধীয়তে।।
(সার্ঙ্গধরঃ ১|৬)

অর্থাৎ - স্ত্রীদের মধ্যে পুরুষের আর পুরুষদের মধ্যে স্ত্রীর যে পরস্পর স্বাভাবিক স্নেহ রয়েছে, তাকেই "কাম" বলে।

স্ত্রী আর পুরুষের এই পারস্পরিক স্নেহ আর স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণ হল দুটি। প্রথম কারণ হল মানুষ অনন্ত জন্ম-জন্মান্তর হতে অনেক য়োনির মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ শক্তির সম্মেলনের দ্বারাই জন্ম নিয়ে আর সেই সম্মেলন দ্বারা অন্য জীবদের জন্ম দিয়ে চলে আসছে। দ্বিতীয় কারণ হল বীর্যতে পড়ে থাকা জীবদের ভোগ জীবদের বাইরে বেরিয়ে আসতে আর নবীন শরীর ধারণ করার প্রেরণা করে। এই দুই কারণের জন্যই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এক বিলক্ষণ আকর্ষণ উৎপন্ন হয় আর মানুষ রতি করার জন্য বিবশ হয়ে যায়। এটা হল প্রাণীমাত্রের অনাদি অভ্যাস, তবে মানুষের জন্য এই অভ্যাস যেমন ভালো আবার তেমন খারাপও। এই অভ্যাসের মধ্যে যতদূর পর্যন্ত আর্য সভ্যতার সম্বন্ধ রয়েছে ততটুকু পর্যন্ত ভালো, তবে যেখান থেকে এরমধ্যে অনার্যের সঞ্চার হয় সেখান থেকে এর রূপ ভয়ংকর হয়ে যায়। মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে আর আবশ্যক সন্তানের জন্ম দিয়ে সেই সন্তানকে মোক্ষমার্গী করে তোলা হল আর্য সভ্যতা, আর অন্যদিকে শোভা-শৃঙ্গার আর ঠাট-বাটের দ্বারা কামুকতাকে বাড়িয়ে আর অপরিমিত সন্তান উৎপন্ন করে সংসারে অর্থ সংকট করে দেওয়া হল অনার্য সভ্যতা। আর্য সভ্যতা হল মোক্ষাভিমুখী, এইজন্য তার অর্থ হল (ভোজন, বস্ত্র, গৃহ আর গৃহস্থী) সহজ সরল ও সাধারণ। তারমধ্যে শোভা-শৃঙ্গার আর ঠাট-বাটের জন্য অবকাশ নেই, কিন্তু অনার্য সভ্যতা শোভা-শৃঙ্গার আর ঠাট-বাটের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, অতঃ সেটা একদিকে যেমন সংসারের মধ্যে অর্থ সংকট উৎপন্ন করে দেয়, তেমনি অন্যদিকে শোভা-শৃঙ্গার দ্বারা কামুকতাকে বাড়িয়ে দেয় আর অপরিমিত সন্তান উৎপন্ন করে অর্থ সংকটকে আরও অধিক ভয়ংকর রূপ দিয়ে দেয়, যারফলে দুষ্কাল, মহামারী আর যুদ্ধের প্রচণ্ড ঝড় উপচে পড়ে আর সম্পূর্ণ সংসার অশান্ত হয়ে যায়, এইজন্য আর্যরা নিজেদের অর্থের মধ্যে শোভা-শৃঙ্গার আর ঠাট-বাটের একদম স্থানই দেয়নি, প্রত্যুত সেগুলোর গণনা কামের মধ্যে করেছে, কারণ শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব হল রতি। "রসগঙ্গাধর" নামক গ্রন্থে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ লিখেছেন যে -

শৃঙ্গারঃ করুণঃ শান্তো রৌদ্রো বীরোऽদ্ভুতস্তথা।
হাস্যো ভয়ানকশ্চৈব বীভত্সশ্চেতি তে নব।।
রতিঃ শোকশ্চ নির্বেদঃ ক্রোধোত্সাহশ্চ বিস্ময়ঃ।
হাসো ভয়ম্ জুগুপ্সা চ স্থায়িভাবাঃ ক্রমাদমী।।©

© রসগঙ্গা০ প্রথমাননম্

অর্থাৎ - শৃঙ্গার, করুণা, শান্ত, রৌদ্র, বীর, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক আর বীভৎস এই হল নয়টি রস। এরমধ্যে শৃঙ্গারের রতি, করুণার শোক, শান্তের নির্বেদ, রৌদ্রের ক্রোধ, বীরের উৎসাহ, অদ্ভুতের বিস্ময়, হাস্যের হাসি, ভয়ানকের ভয় আর বীভৎসের ঘৃণা হল স্থায়ীভাব।

এখানে শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব রতি মানা হয়েছে। সাজসজ্জা আর শোভা-শৃঙ্গারের পরিণামই হল রতি। সাহিত্যদর্পণের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

রাজ্যে সারম্ বসুধা বসুধায়ামপি পুরম্ পুরে সৌধম্।
সৌধে তল্পম্ তল্পে বরাঙ্গনাঙ্গসর্বস্বম্।।

অর্থাৎ - রাজ্যের সার হল পৃথিবী, পৃথিবীর সার হল নগর, নগরের সার হল মহল, মহলের সার হল পালঙ্গ আর পালঙ্কের সর্বস্ব হল স্ত্রীর অঙ্গ।

এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে একজন শৃঙ্গার প্রিয়ের মনোকামনা কিভাবে রতিতে সমাপ্ত হয়ে যায়। একইভাবে কামচেষ্টা উৎপন্নকারী শৃঙ্গারের বর্ণনা করার সঙ্গে চরকাচার্য বলেছেন -

অভ্যঙ্গোত্সাদনস্নানগন্ধমাল্যবিভূষণৈঃ।
গৃহশয়্যাসনসুখৈর্বাসোভিরহতৈঃ প্রিয়ৈঃ ||
বিহঙ্গানাম্ রুতৈরিষ্টৈঃ স্ত্রীণাঞ্চাভরণস্বনৈঃ।
সম্বাহনৈর্বরস্ত্রীণামিষ্টানাঞ্চ বৃষায়তে।।

অর্থাৎ - তেল, প্রলেপ, স্নান, ইত্র (perfume), মালা, আভূষণ, অট্টালিকা, রঙ্গমহল, শয্যা, পোশাক, বাগান, পক্ষীর কলরব, স্ত্রীদের আভূষণের ঝঙ্কার আর স্ত্রীদের দিয়ে হাত-পা টিপে দেওয়া আদি সমস্ত হল কাম চেষ্টা উৎপন্নকারী বস্তু, অতঃ এই প্রকারের শৃঙ্গারময় পদার্থ দ্বারা নির্বীর্যও কামাতুর হয়ে যায়। এই বর্ণনা হতে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে শৃঙ্গার মানুষকে কামী বানিয়ে রতিপ্রিয় বানিয়ে দেয়। পঞ্চতন্ত্রতে বিষ্ণুশর্মা ঠিকই বলেছেন - নিঃস্পৃহো নাধিকারী স্যান্নাকামী মণ্ডনপ্রিয়ঃ।

নাবিদগ্ধঃ প্রিয়ম্ ব্রূয়াত্স্ফুটবক্তা ন বঞ্চকঃ।।

(মিত্রভেদঃ ১৭৫)

অর্থাৎ - নিঃস্পৃহ মানুষ অধিকারী হয় না, সাজসজ্জা আর শোভা-শৃঙ্গার প্রিয় মানুষ অকামী হয় না, মূর্খ কখনও প্রিয়ভাষী হয় না আর স্পষ্ট বক্তা কখনও ঢঙ্গি হয় না।

সত্যি তো, শৃঙ্গারপ্রিয় কেতাদুরস্ত, গুণ্ডা কখনও অকামী হতেই পারবে না। তাকে নিশ্চয়ই কামী হতে হবে। সে সাজসজ্জা করেই এরজন্য যে তার যেন রতি প্রাপ্ত হয়। একথা আমরা সংসারের অনুভব থেকেও বলতে পারি যে শৃঙ্গার রতির জন্যই করা হয়, কারণ আমরা দেখি যে রতির পশ্চাৎ তো শৃঙ্গার ভঙ্গ হয়ে যায়। এই ভঙ্গ শৃঙ্গারের উপর খণ্ডিতারা না জানি কত ব্যঙ্গ বলেছে যা শৃঙ্গাররসের জ্ঞাতাদের থেকে লুকানো নেই। বলার তাৎপর্য এই হল যে সাজসজ্জা, শোভা-শৃঙ্গার আর বিলাস তথা আমোদ-প্রমোদ হতে কামুকতা বৃদ্ধি পায় আর সেই কামুকতা হতে শৃঙ্গারের আরও উন্নতি হয় আর দ্বিগুণ পরিমাণ হতে কামুকতার বিস্তার হয়। এর ফল এই হয় যে অপরিমিত সন্ততি দ্বারা সংসার ভরে যায় আর ক্ষুধার্থ, দুষ্কাল আদি দ্বারা সংসারের প্রাণী

অকালেই মরতে শুরু করে।

সন্ততি-বিস্তারের ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরে প্রফেসর মাল্থস আদি প্রজনন-শাস্ত্রী বলেছেন যে সংসারের মধ্যে জনসংখ্যা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর সেই বৃদ্ধিকে প্রকৃতি সর্বদা দুষ্কাল, মহামারী আর যুদ্ধের দ্বারা ন্যুন করে থাকে, এইজন্য যদি দুষ্কাল, মহামারী আর যুদ্ধের সন্তাপ থেকে বাঁচতে আর যদি সন্তানজন্য দরিদ্রতা থেকে বাঁচতে হলে সন্তান-নিরোধের উপায় করা উচিত, অন্যথা একদিন এরকম আসবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীতে তিল রাখারও জায়গা হবে না। এই আশঙ্কাকে ধ্যানে রেখে পাশ্চাত্য বিদ্বানগণ সন্তান-নিরোধের তিনটি বিধি নিশ্চিত করেছে। প্রথম বিধিতে তারা বলেছে যে কিছু এরকম যন্ত্রের ব্যবহার উপয়োগ করা হোক যাতে গর্ভবতী না হয়, দ্বিতীয় বিধি এটা বলা হয়েছে যে এরকম ওষুধ খাওয়ানো হোক যেন সন্তানের উৎপন্নই বন্ধ হয়ে যায় আর তৃতীয় বিধি এটা বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ধারণ করা হোক, যাতে সন্তানের বৃদ্ধি থেমে যায়। এই তিনটি বিধির এখন পর্যন্ত যা অনুভব হয়েছে তা খুবই দুঃখজনক। যন্ত্র আর ওষুধের উপয়োগ দ্বারা অনেক প্রকারের রোগ উৎপন্ন হয়েছে যার কারণে লক্ষ-লক্ষ স্ত্রী আর পুরুষ দুঃখ পাচ্ছে।

মিo থর্স্টন এই যন্ত্র আর ওষুধগুলোর দুষ্পরিণামের খুবই লোমহর্ষক বর্ণনা করেছেন। এখন বাকি রইলো ইন্দ্রিয় - নিগ্রহ, তা হল এই তিনটির থেকেও অধিক ভয়ংকর। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা কোনো যেমন-তেমন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। তাকে তো খুবই যোগ্য পুরুষ করতে পারে। যে যোগ্য, তার দ্বারাই যোগ্য সন্তান উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু যদি যোগ্য মানুষ সংযম করে যোগ্য সন্তানের উৎপন্ন করা বন্ধ করে দেয় আর অযোগ্য মানুষ সন্তানের উৎপন্ন করতে থাকে তাহলে পরিণাম এই দাঁড়াবে যে ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবী অযোগ্য প্রজায় ভরে যাবে আর তারপর সেই দুষ্কাল, মহামারী, যুদ্ধ আর দুঃখ দারিদ্র্য দ্বারা মানুষের সংহার হতে থাকবে, এইজন্য যোগ্যদের তো কখনও সন্ততি-নিরোধের চক্করে পড়াই উচিত না। এখন বাকি রইলো অযোগ্য, তারা তো সংযম করতেই পারবে না, এইজন্য পশ্চিমীয় বিদ্বানদের খোঁজা তিন বিধি উপযোগী সিদ্ধ হয়নি, তবে আর্য সভ্যতা, শোভা-শৃঙ্গার, ঠাট-বাট আর আমোদ-প্রমোদকে সরিয়ে দিয়ে সরল আর সামান্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে বিনা কোনো প্রকারের অর্থ সংকট উৎপন্ন করে, নিজের ব্রহ্মচর্য ব্রত দ্বারা সমস্ত মানুষকে মোক্ষাভিমুখী বানিয়ে সন্ততি-বিস্তারজন্য অর্থ সংকটের বিভ্রান্তিকে খুবই সুন্দরভাবে সমাধান করে দিয়েছে। আমি আর্যদের অর্থের বিস্তৃত বর্ণনা করে দেখিয়েছি যে আর্য সভ্যতার মধ্যে সাজসজ্জা, শোভা-শৃঙ্গার আর ঠাট- বাটের জন্য কোনো স্থান নেই। আর্যের অর্থ হল খুবই সরল, এইজন্য তারমধ্যে কামুকতাজন্য অর্থ সংকট উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনোরূপ আশঙ্কা নেই। বাকি রইলো সন্ততি বিস্তারের কথা, সেটা নিয়ে আর্যরা নিজেদের এক বিশেষ শক্তির দ্বারা খুবই সুন্দরভাবে সমাধান করেছিল। তারা শৃঙ্গারশূন্য কিন্তু সরল অর্থ দিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রতকে ধারণ করে উর্ধ্বরেতত্ব আর অমোঘবীর্যত্বের শক্তি দিয়ে সেই সামর্থ্য প্রাপ্ত করে ফেলেছিল, যা দিয়ে তারা যখন চাইতো তখন আবশ্যক সন্তান উৎপন্ন করে ফেলতো আর যখন চাইতো তখন সন্তানের উৎপত্তি করা একদম বন্ধ করে দিতো। এরকম মনোনিগ্রহ শক্তির সম্পাদন আজ পর্যন্ত সংসারে কোনো সভ্য জাতি করতেই পারেনি। এটাই হল কারণ যে সন্ততিনিরোধের জটিল প্রশ্নকেও আজ

পর্যন্ত কোনো জাতি সমাধান করতে পারেনি, এইজন্য আমি এখানে আর্যদের সন্ততি নিরোধের শক্তি আর নীতির সারাংশ তুলে ধরে দেখাবো যে কিভাবে তারা এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছিল।

আর্যদের কাম-সম্বন্ধিত নীতি

সংসারের অনুভব বলছে যে ব্যক্তি, সমাজ আর রাষ্ট্রে সময়-সময়ে সন্ততি অর্থাৎ জনসংখ্যার অনাবশ্যকতা, আবশ্যকতা আর অত্যাবশ্যকতা হয়েই থাকে। যেসময় রাষ্ট্র আর সমাজের মধ্যে শান্তি থাকে সেই সময় মোক্ষমার্গীদের অতিরিক্ত শেষ সমস্ত সমাজকে মৃত্যুর পরিণাম হতে সন্তানের আবশ্যকতা হয়, তবে যেসময় যুদ্ধ আরম্ভ অথবা সমাপ্ত হয়, সেই সময় সন্তানের আবশ্যকতা অত্যধিক বেড়ে যায়। একইভাবে যেসময় সুখ-শান্তির কারণে সন্তান অত্যধিক বেড়ে যায়, সেই সময় সন্তান কম করারও আবশ্যকতা হয়। এরকম দশাতে ইচ্ছানুসারে অধিক সন্ততি উৎপন্ন করতে অথবা কম সন্ততি উৎপন্ন করতে অথবা সর্বদা সন্ততি উৎপন্ন বন্ধ করে দেওয়ার শক্তি তার মধ্যেই হতে পারে যার সামাজিক শিক্ষার প্রাচীর অখণ্ড ব্রহ্মচর্যব্রতের শিখরে তোলা হয়েছে।

আর্যরা নিজেদের সভ্যতার ভবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের উপরেই দাঁড় করেছে, এইজন্য আর্য সভ্যতার অনুসারে আর্যদের ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস আশ্রমে পঁচাত্তর বছর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য দশাতেই যাপন করার জন্য বল দেওয়া হয়েছে আর গৃহস্থকেও অধিক রতি থেকে বাঁচার জন্য যজ্ঞোপবীত-সংস্কার থেকেই সন্ধ্যোপাসন, প্রাণায়াম, শৃঙ্গারবর্জন, কপটহীনতা, তপস্বী জীবন আর মোক্ষমার্গের ধ্যেয় বলে অমোঘবীর্যত্ব সম্পাদন করার উপদেশ করা হয়েছে, কারণ সন্ততি নিরোধের শক্তি অমোঘবীর্যত্ব পুরুষের মধ্যেই হতে পারে আর তিনিই আবশ্যকতানুসারে এক, দুই অথবা দশ সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন আর তিনি যদি চান তবে সন্তানকে উৎপন্ন করা একদম বন্ধও করতে পারেন। আর্য সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রকারের প্রজোৎপত্তি - সম্বন্ধিত তিনটি সিদ্ধান্ত আর তিনটি সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, অতঃ আমি এখানে তিনটির সারাংশরূপ বর্ণনা করবো।

প্রথম প্রমাণ সেই ব্যক্তিদের পাওয়া যায় যারা ক্ষীণদোষ উৎপন্ন হয় আর জন্ম থেকেই মোক্ষমার্গে লেগে যায়। তারা কখনও প্রজার ইচ্ছা করে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৪|৪|২২) মধ্যে লেখা রয়েছে যে - **"পূর্বে বিদ্বা□সঃ প্রজাম্ ন কাময়ন্তে কিম্ প্রজয়া করিষ্যামঃ"**, অর্থাৎ পূর্ব সময়, বিদ্বানরা সন্তানের কামনা করতেন না। তারা বলতেন যে প্রজা দিয়ে কি করবেন? এরকম আজীবন ব্রহ্মচারী এইদেশে সহস্র-সহস্র লক্ষ-লক্ষ হয়েছে। মনুস্মৃতিতে লেখা রয়েছে -

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবম্ গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্।।
(মনুসংহিতা ৫|১৫৯)

অর্থাৎ - সহস্র-সহস্র ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বিনা সন্ততি করে কুমার অবস্থা থেকেই মোক্ষগামী হয়েছেন। এমনটা নয় যে পূর্বকালে কেবল পুরুষই এরকম হতেন, প্রত্যুৎ সেই সময়ের কন্যারাও কুমারী থেকে আর আজন্ম ব্রহ্মচারিণী থেকে মোক্ষভাগিনী হতেন। মহাভারতের মধ্যে লেখা রয়েছে যে লোমশঋষি যুধিষ্ঠিরের নিকট বলেন যে -

অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমার ব্রহ্মচারিণী।
য়োগয়ুক্তা দিবম্ য়াতা তপঃ সিদ্ধা তপস্বিনী।।
বভূব শ্রীমতী রাজন্ শাম্ডীলস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতবতী সাধবী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।।
সা তু তপ্ত্বা তপো ঘোরম্ দুশ্চরম্ স্ত্রীজনেন চ।
গতা স্বর্গম্ মহাভাগ দেবব্রাহ্মণপূজিতা।।

(মহাভারত শল্য০ অ০ ৫৪)

অর্থাৎ - এই স্থানেই শাণ্ডীল্য ঋষির কন্যা ধৃতবতী আজন্ম ব্রহ্মচারিণী থেকে বিদ্বান দ্বারা সত্কৃত হয়ে মোক্ষলাভ করেছিলেন। সেখানে অধ্যায় ৪৯ এর মধ্যেও লেখা রয়েছে যে -

ভারদ্বাজস্য দুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
শ্রুতাবতী নাম বিভো কুমারী ব্রহ্মচারিণী।।
শাহম্ তস্মিন্ কুলে জাতা ভর্তর্য় সতী মদ্বিধে।
বিনীতা মোক্ষধর্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতম্।।

অর্থাৎ - ভারদ্বাজের কন্যা শ্রুতাবতীও আজন্ম ব্রহ্মচর্যব্রতের পালন করেছিলেন। শুধু এটাই নয় প্রত্যুত য়াজ্ঞবল্ক্য আর মৈত্রেয়ী বিবাহ করেও কখনও সন্তান উৎপন্ন করেননি।

এই ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে পূর্বকালে আর্যগণ বিনা সন্ততি করে আজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে মোক্ষ প্রাপ্ত করতেন। যারা বলে যে প্রাচীন আর্য সন্তান প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হয় ঘুরতো তারা ভুল করছে। মোক্ষার্থী আর্য কখনও সন্তানের ইচ্ছা করতেন না, কারণ অথর্ববেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"ব্রহ্মচর্য়েণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত্"** অর্থাৎ তপস্বী বিদ্বান আজীবন ব্রহ্মচর্য বল দ্বারাই মৃত্যুকে সরিয়ে দিয়ে মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। সত্যি তো, যে মানুষ অন্যকে উৎপন্ন করে না সে নিশ্চয়ই অন্যের দ্বারা উৎপন্নও হয় না। উৎপন্ন না হওয়ার সবথেকে সুগম বিধি হল এটাই যে মানুষ আজীবন ব্রহ্মচারী থাকুক, তবে এই মহাব্রতটি সবার মানের নয়। সব মানুষ তো সন্তানের ইচ্ছাই করে, এইজন্য অন্য ধরনের প্রমাণও পাওয়া যায়। এই প্রমাণের অনুসারে সন্তানের ইচ্ছা করা হিতকরও বোঝানো হয়েছে, কারণ এতে দুটি লাভ রয়েছে। প্রথমত সন্তান দ্বারা গৃহস্থাশ্রম স্থির থাকে, যার আশ্রয়ে সমস্ত মানব সমাজ জীবিকা প্রাপ্ত করে আর দ্বিতীয়ত বীর্যতে পড়ে থাকা জীব বাইরে এসে মোক্ষপ্রাপ্তির সাধনা করে। যদি সন্তানের জন্মই না হয় তাহলে সেই প্রাণী যে কিনা অন্য য়োনি হয়ে ঘুরে এখন মানুষের শরীরের দ্বারা মোক্ষের মধ্যে যাবে, সব মাঝপথেই ফেঁসে যাবে। এইজন্য অত্যন্ত আবশ্যক হল যে যোগ্য পুরুষ এক-দুটি সন্তান অবশ্য উৎপন্ন করে আর শিক্ষা-দীক্ষা

দ্বারা যোগ্য বানিয়ে সমাজকে শক্তিশালী করুক আর তাদের মোক্ষমার্গী বানিয়ে তুলুক। তাই আপত্তিরহিত সমাজের সময়ে আর্যদের একটি সন্তান উৎপন্ন করার জন্য বল দেওয়া হয়েছে। মনুস্মৃতিতে লেখা রয়েছে -

জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।।

(মনুসংহিতা ৯|১০৬)

স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্বিদুঃ।।

(মনুসংহিতা ৯|১০৭)

অর্থাৎ - প্রথম পুত্র উৎপন্ন হতেই মানুষ পুত্রবান্ হয়ে যায়, অতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রই হল ধর্মজ আর অন্য সব হল কামজ।

এই প্রমাণ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে বৈদিক আর্য সভ্যতার অনুসারে একটি সন্তানই উৎপন্ন করা উচিত, অধিক নয়। অনেক সন্তান উৎপন্ন করলে পরে কামুকতার সংস্কার হয় আর এই দোষ সমাজ আর মোক্ষ উভয়ের বাধক হয়ে যায়। বেদ স্বয়ং আজ্ঞা দেয় যে অনেক সন্তান উৎপন্ন করা উচিত নয়। ঋগ্বেদ ১|১৬৪|৩২ এর মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"বহুপ্রজা নির্ঋতিমা বিবেশ"**, অর্থাৎ অনেক সন্তানকারীকে অনেক দুঃখ উঠাতে হয়। এইজন্য ঋগ্বেদ ৩|১|৬ এর মধ্যে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে **"সনা অত্র যুবতয়ঃ সয়োনীরেকম্ গর্ভম্ দধিরে সপ্ত বাণীঃ"**, অর্থাৎ সপ্তপদী (বিবাহ) হওয়া যুবতী স্ত্রী কেবল একটিই গর্ভ ধারণ করবে। এই প্রমাণ দ্বারা সূচিত হচ্ছে যে সামাজিক আবশ্যকতা পূর্তির জন্য আর্যদের একটি সন্তানই উৎপন্ন করার আজ্ঞা রয়েছে, অধিক নয়। কদাচিৎ একটিও পুত্র উৎপন্ন না হলেও এতে কোনো চিন্তার বিষয় নেই। পুত্রের অভাবের চিন্তায় কিছু লোক অন্যের সন্তানকে দত্তক নেয়, কিন্তু সেটা বেদানুকূল নয়, কারণ বেদে দত্তক পুত্রকে নেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

নহি গ্রভায়ারণঃ সুশেবোऽন্যোদর্যো মনসা মন্তবা উ।
অধা চিদোকঃ পুনরিত্স এত্যা নো বাজ্যভীষাळেতু নব্যঃ।।

(ঋঃ ৭|৪|৮)

অর্থাৎ - যে অন্যের গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাকে কখনও নিজের সন্তান ভাবা উচিত নয়। অন্যোদর্য পুত্রের মন সর্বদা সেখানেই যাবে যেখান থেকে সে এসেছে, এইজন্য নিজেরই পুত্রকে পুত্র ভাবা উচিত। নিজের কেবল একটি পুত্রই হল পুত্র, শেষ হল কামজ। অতঃ এই এক পুত্রের সিদ্ধান্ত হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐতিহাসিক প্রমাণ। এই প্রমাণের অনুসারে নিজে ও একটি পুত্রই হল উত্তম, অনেক নয়, কিন্তু কখনও - কখনও রাষ্ট্রে অনেক সন্তানেরও আবশ্যকতা হয়ে থাকে, অতঃ তৃতীয় শ্রেণীরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যারা রাষ্ট্রের ইতিহাস পড়েছে, তারা জানে যে কখনও-কখনও রাষ্ট্রের অনেক সন্তানেরও আবশ্যকতা পড়ে যায়। যুদ্ধের সময়ে অথবা যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে অনেক যুব পুরুষের মৃত্যুর কারণে কখনও-কখনও রাষ্ট্র পুরুষশূন্য হয়ে যায়। মহাভারতের সময়ে অথবা গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অনেক রাষ্ট্রকে এইধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে আর এক-একজন পুরুষকে অনেক ক'টি স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বা নিয়োগ করেও অনেক সন্তানের উৎপত্তি করতে হয়েছে। এরকমই আপত্তির সময়ের জন্য বেদের মধ্যে **"দশাস্যাম্**

পুত্রানা ধেহি" (ঋঃ ১০|৮৫|৪৫) অর্থাৎ দশ পুত্র উৎপন্ন করার প্রার্থনা করা হয়েছে। এইভাবে আর্য সভ্যতার মধ্যে প্রজোত্পত্তির তিনটি সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়েছে। এই তিনটির মধ্যে প্রথম সিদ্ধান্তটি হল বিশেষ - বিশেষ ব্যক্তি আজন্ম ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করে মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারবে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হল সামাজিক সুবিধা উৎপন্ন করতে আর জীবদের মানবশরীরে নিয়ে এসে মোক্ষাভিমুখী বানানোর জন্য এক-একটি সন্তান উৎপন্ন করা উচিত আর তৃতীয় সিদ্ধান্তটি হল রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতার সময়ে একের অধিক, অর্থাৎ অনেক সন্তান উৎপন্ন করা উচিত।

এই তিনটি সিদ্ধান্তের মধ্যে আর্যদের অমোঘবীর্যত্বের শক্তিই কাজ করছে। সেই শক্তিই এইভাবে ইচ্ছেমতো সময়ে সন্তান উৎপন্ন করতে পারে আর সেই শক্তিই মৈথুন কৃত্য হতে সর্বদা পৃথক রাখতে পারে। এই অমোঘবীর্যত্বের শক্তি হল আর্যদের বিশেষ ফসল। এই শক্তির চমৎকারের ইতিহাস আর্যদের সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে বিস্তারভাবে বর্ণিত রয়েছে। এই শক্তি উৎপন্ন হওয়াতে কামবাসনা নিজের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, অতঃ অমোঘবীর্য পুরুষ যখন চায় তখন সন্তান উৎপন্ন করতে পারে আর যখন চায় না তখন সন্তান উৎপন্ন করে না। মহর্ষি বেদব্যাস যখন চেয়েছেন তখন ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর বিদুরকে উৎপন্ন করেছেন আর যখন চান তখন এই কৃত হতে সর্বদার জন্য পৃথক হয়ে যান। এই ভাব অমোঘবীর্যত্বেরই শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত অমোঘবীর্যত্ব উৎপন্ন করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মাল্থস থিওরীর সামঞ্জস্য হওয়া সম্ভব নয়।

অমোঘবীর্যত্ব প্রাপ্ত করার জন্য শৃঙ্গাররহিত, সরল, তপস্বী আর মোক্ষাভিমুখী জীবন বানাতে হয়, কিন্তু ইউরোপের বিদ্বান শৃঙ্গারমণ্ডিত অবস্থার মধ্যেই কেবল যন্ত্রের সাহায্যে সর্বসাধারণের থেকে সন্ততিনিরোধ করতে চাইছে, এইজন্য এটা দৃঢ়তাপূর্বক বলা যেতে পারে যে তারা ত্রিকালেও কখনও সুখপূর্বক সন্ততিনিরোধ করতে পারবে না। যদি যন্ত্র আর ঔষধীর দ্বারা সন্ততিনিরোধ মেনেও নেওয়া যায় তাহলেও এটা ততটাই পাপ হবে যতটা গর্ভপাত থেকে হয়, কারণ বীর্যও হল এক ছোট্ট গর্ভ যারমধ্যে সন্ততি আগে বীজের (বীর্যের) মধ্যেই বড়ো হয় আর তারপর বীর্য থেকে গর্ভের মধ্যে বড়ো হতে থাকে তথা গর্ভ থেকে পৃথিবীতে এসে আরও অধিক বড়ো হয়। এই তিনটি স্থান - বীর্য, গর্ভ আর পৃথিবী -- প্রাণীর ক্রমে - ক্রমে বড়ো হওয়ার জন্যই হয়। এরকম অবস্থাতে যদি পৃথিবীতে উৎপন্ন হওয়া মানুষকে মারা পাপ হয় আর যদি গর্ভে থাকা জীবকে মারা পাপ হয় তাহলে বীর্যের মধ্যে থাকা জীবকে মারলে পরেও পাপ হওয়া উচিত। প্রাণীর বৃদ্ধিতে সহায়তা করাই হল আমাদের কর্তব্য, বৃদ্ধি থামানোর মধ্যে নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি বীর্যকে গর্ভের মধ্যে বৃদ্ধি রোধ করে -- তাকে গর্ভ পর্যন্ত যেতে দেয় না, সে সেইরকমের অপরাধ করে, যে রকমের অপরাধ গর্ভপাত করে গর্ভস্থকে পৃথিবীতে আসতে রোধ করে, এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত কামবাসনার নিরোধ করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ততিনিরোধ প্রশ্নের সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

কামবাসনার নিরোধ শৃঙ্গাররহিত সরল মোক্ষাভিমুখী অমোঘবীর্যত্ব দ্বারাই হতে পারে, অন্যদের দ্বারা হবে না। তিনিই একবারের রতি দিয়ে একটি সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন, এইজন্য অমোঘবীর্য আর্যরা নিজেদের আর্য সভ্যতার মধ্যে একটিই সন্তান উৎপন্ন করাকে, অর্থাৎ একবারই রতি করাকে ধর্ম মানা

হয়েছে আর একের অধিক সন্তান উৎপন্ন করাকে, অর্থাৎ একের অধিক রতি করাকে অনার্যতা ধরা হয়েছে© | এই অনার্যতা কাম্য পদার্থ থেকে -- শোভা-শৃঙ্গার, সাজসজ্জা আর ঠাট-বাট থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু কাম্য পদার্থের না তো শরীরের আবশ্যকতা হয়, না বুদ্ধি আর আত্মার। কাম্য পদার্থ তো কেবল মনকে খুশি করার জন্য একত্রিত করা হয়ে থাকে। উদাহরণার্থ শীতের দিনে শরীরে চাদরের আবশ্যকতা হয়, কিন্তু চাদরে অমুক ধরনের লতা-পুষ্প-পত্র ছাপা, নীল বা সাদা বা লাল রঙ, অমুকভাবে নকশা করা আদির আবশ্যকতা কেবল মনকে খুশি করার জন্যই হয়ে থাকে। এইজন্য চাদর হল অর্থ আর লতা-পুষ্প-পত্র ছাপা, রঙ তথা নকশা আদি হল কাম। প্রথমটির উদ্দেশ্য হল - শরীর রক্ষা, অর্থাৎ বাঁচার আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হল রতি, অর্থাৎ মরার, তবে মুমুক্ষুর উদ্দ্যেশ্য মরে যাওয়া নয়, এইজন্য সে হত্যাকারী কামকে নিজের শত্রু বলে মনে করে। ভগবদ্গীতা (৩|৩৯) এর মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

আবৃতম্ জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।।

অর্থাৎ - জ্ঞানের নাশকারী এই কামই হল জ্ঞানীদের (মুমুক্ষুদের) শত্রু, এইজন্য মুমুক্ষুতা অর্থাৎ সন্ন্যাসীর লক্ষণ করে গীতা (১৮|২) এর মধ্যে বলা হয়েছে যে -

কাম্যানাম্ কর্মণাম্ ন্যাসম্ সন্ন্যাসম্ কবয়ো বিদুঃ

অর্থাৎ - বিদ্বানরা কাম্য কর্ম ত্যাগের নামই সন্ন্যাস বলেছে। ঠিকই তো, কাম্য পদার্থ, কাম্য কর্ম আর কাম্য অভিলাষাই জনসমাজের মধ্যে নানা প্রকারের দুঃখ, অসমানতা আর বিপ্লবের জন্ম দেয়, আর সেটাই মোক্ষতে বাধা উৎপন্ন করে, কারণ সেটি মন থেকে উৎপন্ন হয় আর মন হল বড়োই উচ্ছৃঙ্খল। তারমধ্যে অনেক জন্মের সংস্কার রয়েছে, এটাই হল কারণ যে নিরঙ্কুশ মন জন্ম-মরণকারী কর্মের দিকেই ছুটে আর রতিপ্রধান কাম্য পদার্থের মধ্যেই জড়িয়ে পড়ে। সেটি বিলাস, আমোদ-প্রমোদ আর ঈর্ষা-দ্বেষকে বাড়িয়ে দেয় আর মানুষকে সবদিক থেকে পতিত করে ফেলে। এটাই হল কারণ যে সমস্ত রাজনীতি আর সমস্ত ধর্মশাস্ত্র মানসিক আবশ্যকতাকে সংযত করারই নিয়ম তৈরি করে, কারণ পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, সভ্যতা - অসভ্যতা আর লোক-পরলোক সবই হল মনের অধীন। যখন মানুষ দ্বারা কোনো অসাবধানী ঘটে তখন সেটা মনের কারণেই হয়। এইজন্য সমস্ত শাস্ত্র এটাই বলে যে - মন থেকে সাবধান থাকো। উপনিষদের মধ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে -

মন এব মনুষ্যাণাম্ কারণম্ বন্ধমোক্ষয়োঃ

(মৈত্রায়ণ্যুপ০ ৬|৩৪)

অর্থাৎ - মানুষের বন্ধ-মোক্ষের কারণই হল মন।

কিছু লোকের বিচার হল স্ত্রীকে পুরুষ আর পুরুষকে স্ত্রী সেইভাবে আবশ্যক যেভাবে ক্ষুধার্থের জন্য আহার অথবা শীতের জন্য চাদরের আবশ্যকতা হয়, কিন্তু একথা একদমই ভুল। আহারের মতো মৈথুন

© তত্ত্ববেত্তা সুকরাতও বলেন যে মানুষকে জীবনে একবারই মৈথুন করা উচিত।

আবশ্যক নয়, কারণ বিনা আহারে মানুষ বাঁচতে পারবে না, কিন্তু কেউ কি সিদ্ধ করতে পারবে যে বিনা স্ত্রীসঙ্গেও মানুষ ক্ষুধার্থ - পীড়িতের মতো মৃতপ্রায় হতে পারে অথবা সেটি ছাড়া মানুষের কায়িক বা আত্মিক বা বৈজ্ঞানিক কোনো হানি হতে পারে? কখনও না, কোনোদিনও না। যদি হানি হতো তাহলে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস আশ্রমগুলোর উৎপত্তিই হতো না, কুস্তিবিদ্-দের সুরক্ষিত থাকা কঠিন হয়ে যেত আর বিধবাধর্ম তথা পতিব্রতধর্মের নামও শোনা যেত না, কিন্তু আমরা এইসব বিষয় সংসারের মধ্যে দেখতে পাই, এর দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে যে কাম তো কামনা অর্থাৎ মনেরই বিকার আর কেবল কামিদের মন পরিবর্তনেরই বস্তু, আহারের মতো শরীরের জন্য আবশ্যক বস্তু নয়, এইজন্য বীর্যকে মনসিজ, মনোজ আর কামদেব আদি নামে সূচিত করা হয়েছে। বলার তাৎপর্য হল যখন রতি কোনো আবশ্যক বস্তু সিদ্ধই হচ্ছে না আর যখন সেটি কেবল মনেরই প্রতারক প্রতিত হচ্ছে তখন মন দ্বারা উৎপন্ন হওয়া আর শোভা-শৃঙ্গার তথা ঠাট-বাট দ্বারা সম্বন্ধিত যেকোনো রতিপ্রধান বস্তু আবশ্যক সিদ্ধ হতে পারে না। এই বস্তুর আবশ্যকতা তো নিশ্চয়ই মনের মিথ্যা কল্পনা আর কুসংস্কার থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, অতঃ এর বাস্তবিক আবশ্যকতা নেই।

আজ সংসারে যে অশান্তি ছড়াচ্ছে তার কারণ হল কেবল লোকেদের মন। মানুষের নিরঙ্কুশ মনগুলো নিজেদের কামনাকে এত অধিক অসংযত করে ফেলেছে যে প্রায়শঃ সমস্ত মানবসমাজ কাম্য পদার্থের দাস হয়ে কামী হয়ে গেছে। যেখানে আর্য সভ্যতা কামকে চেপে রাখার জন্য ২৪, ৩৬ আর ৪৪ বর্ষের ব্রহ্মচর্য পালন করে, সরল অর্থের আশ্রয় নিয়ে আর মণ্ডন অর্থাৎ শৃঙ্গার থেকে বেঁচে গিয়ে অমোঘবীর্যত্ব প্রাপ্ত করার আয়োজন করে, সেখানে আজ অনার্যসভ্যতা বীর্যরক্ষার অবগণনা করে কামকে উত্তেজনা দেওয়ার জন্য অসাবধানী সম্পত্তির আশ্রয় নিয়ে বিলাস অর্থাৎ শৃঙ্গারের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে ব্যর্থ বীর্যপাতের প্রবন্ধ করে। এটাই হল কারণ যে, অনার্যসভ্যতার এই অসংযত বিলাস সংসারকে কামী বানিয়ে পতিত করে দিয়েছে, অর্থাৎ যেখানে আর্যসভ্যতা সর্বদা অর্থশুদ্ধিকে প্রধান মেনে তপস্বী জীবনের সঙ্গে মোক্ষ-প্রাপ্তির দিশায় নিয়ে যেত, সেখানে অনার্য সভ্যতা অর্থ-অশুদ্ধির দ্বারা কামুকতাকে বাড়িয়ে সংসারের মধ্যে কলহ উৎপন্ন করে। আর্যসভ্যতা অর্থ আর কামের দুটি বিভাগ করে শরীর আর মনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য করেছিল আর উভয়কে বৈজ্ঞানিক রীতি দ্বারা সমাধান করে পৃথক-পৃথক উপস্থিত করেছিল, কিন্তু আজ বর্তমান অনার্য সম্পত্তিশাস্ত্র অর্থ আর কামকে একটির মধ্যেই মিলিয়ে "পলিটিকাল ইকোনমি"র নামে সংসারব্যাপী হয়ে চলেছে, এইজন্য যেভাবে আমি কামের বিষয়ে আর্যদের নীতির আলোচনা করে এসেছি, সেইভাবে আমি এখানে বর্তমান অনার্য পলিটিকাল ইকোনমির সমস্ত অঙ্গ-উপাঙ্গের সারাংশ লিখে দেখাতে চাইবো যে সেটা কতটা অশুদ্ধ আর কিভাবে বিশুদ্ধ অর্থের মধ্যে - সাধারণ ভোজন, বস্ত্র, গৃহ, গৃহস্থীর মধ্যে কাম্য, অর্থাৎ শৃঙ্গার আর বিলাসপ্রধান পদার্থের সমাবেশ করছে আর কিভাবে সংসারের মধ্যে কামুকতাজন্য সন্ততি-বিস্তার দ্বারা অশান্তি ছড়িয়ে আছে।

অনার্য সভ্যতা, অর্থাৎ পলিটিকাল ইকোনমি

যদিও বর্তমান সম্পত্তিশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত বিদ্বানেরা মেনে নিয়েছেন যে এখন পলিটিকাল ইকোনমি অর্থাৎ রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অপূর্ণ রয়েছে তথাপি তার যা উদ্দেশ্য আর সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়েছে তা দেখলে বোঝা যায় যে পলিটিকাল ইকোনমির নিয়মের অনুসারে মানুষকে খুব সম্পত্তিবান্ হওয়া উচিত। খুব সম্পত্তিবান্ হওয়ার এই অর্থ হল যে, মানুষের ঘরে নাগরিক জীবন নির্মাণকারী অর্থাৎ শৃঙ্গার আর বিলাস বৃদ্ধিকারী বস্তু অধিক হওয়া। অধিক সামগ্রীই হল সভ্যতার চিহ্ন, এইজন্য সভ্যতা বৃদ্ধিকারী অমিত পদার্থের সংগ্রহের জন্যই খুব ধন একত্রিত করা উচিত। ধনের স্রোত হল বাণিজ্য, এইজন্য বাণিজ্য-সম্বন্ধিত এরকম পদার্থ তৈরি করা উচিত যা অন্য দেশের তৈরি বস্তুর তুলনায় সস্তা আর ভালো হবে। এর নির্মাণের জন্য কোম্পানির দ্বারা ধনরাশি একত্রিত করে আর ধন দিয়ে কাচা মাল কিনে যন্ত্রের দ্বারা সেটা পাকা মাল তৈরি করা উচিত আর এই তৈরি করা মালকে নিজের রাজার রাজত্বের সহায়তায় অন্য দেশের মধ্যে গিয়ে বিক্রি করা উচিত আর সেখান থেকে কাচা মাল নিয়ে এসে নিজের এখানে পুনঃ সস্তা মাল তৈরি করানো উচিত। এটাই বর্তমান বাণিজ্যের সত্য পরিভাষা বলা হয় আর এটাকেই পলিটিকাল ইকোনমির মূল ধরা হয়েছে। রাজার সহায়তা নেওয়ার কারণে বেশিরভাগ অন্য রাজার সঙ্গে লড়াই লেগে যায়, এইজন্য নিজের দেশে বড়ো-বড়ো ঘাতক শস্ত্র নির্মাণ আর সমস্ত প্রজাকে একত্রিত হয়ে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকা এই সম্পত্তির প্রতি কর্তব্য বলে মনে করা হয়। যুদ্ধের জন্য জাতীয়তাকে দৃঢ় করা আর জাতিরক্ষার নাম দেশরক্ষা রেখে দেশসেবার অনুরাগ তৈরি করা, জীবনে সফলতার চাবি এরমধ্যে বলে মনে করা হয়, আর কোনো বিশেষ সভ্যতার প্রচার করার বেয়াড়া করে বিপদকে বাড়ানো আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক বলে মনে করা হয়। কারণ দেখতে-শুনতে লড়াই করার প্রস্তুতি খানিকটা অসভ্য প্রতিত হয়, এইজন্য বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে এটা অজুহাত করা হয় যে - ভাই সংসারে ভোগীদের তুলনায় ভোগ্য পদার্থ কম রয়েছে, তার ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি অসংখ্যভাবে বেড়ে চলেছে আর এক সময় এরকম আসবে যখন ভূমিতে পা রাখা কঠিন হয়ে যাবে, এইজন্য অনেক ভূমিকে কব্জা করে নিয়ে তাতে অমিত ধন - সোনা-রূপা আর হীরা-মতি দিয়ে ভরে দেওয়া উচিত আর শস্ত্র তথা জাতিপ্রেমের অমিত বল দ্বারা নিজের রক্ষা করে অপরকে চেপে রাখা উচিত। এটা হল বর্তমান পলিটিকাল ইকোনমির বিজ্ঞান প্রকরণ। ব্যস, এটাই বর্তমান সম্পত্তিশাস্ত্র অর্থাৎ পলিটিকাল ইকোনমির সাধারণতঃ প্রকট ও গুপ্ত নিয়ম আর উদ্দেশ্য। সারাংশ রূপে বর্তমান সম্পত্তির পরিভাষা হল আবশ্যক পদার্থ আর আবশ্যক পদার্থের পরিভাষা হল অমিত পদার্থ। অমিত পদার্থের মধ্যে অসংখ্য বস্তু চলে আসে আর অসংখ্য বস্তুর জন্য বলা হয় যে - "না জানি কখন কোন বস্তুর আবশ্যকতা পরে যায়," এইজন্য যদিও বর্তমান সম্পত্তির পদার্থের গণনা হতে পারে না তথাপি আবশ্যক পদার্থ বলার কারণে তার সমস্ত পদার্থের গণনা হয়ে যায়।

এই সম্পত্তির সঙ্গে সম্বন্ধিত তিনটি বিষয় রয়েছে -

১. সম্পত্তির আবশ্যকতা

২. সম্পত্তির স্বরূপ আর

৩. সম্পত্তি প্রাপ্ত করার উপায়।

এরমধ্যে সর্বপ্রথম বিষয়টি হল সম্পত্তির আবশ্যকতা। সম্পত্তিশাস্ত্রী বলে যে - সম্পত্তির আবশ্যকতার কারণ হল দুটি, প্রথমটি তো হল নাগরিক জীবন যার মধ্যে অমিত আবশ্যক পদার্থের আবশ্যকতা হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়টি হল জনসংখ্যার বৃদ্ধি আর ভোগ্য পদার্থের ন্যূনতা, যে কারণে অমিত সম্পত্তিকে কব্জা করে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় হল সম্পত্তির স্বরূপ। সম্পত্তিশাস্ত্রী বলে যে - পৃথিবী হল শ্রম আর পুঁজি সম্পত্তির স্বরূপ, পৃথিবীর মধ্যে খাদান আর ক্ষেত রয়েছে আর শ্রম তথা পুঁজি দিয়ে যন্ত্র আর সার তৈরি হয়, এইজন্য পৃথিবী, ক্ষেত, যন্ত্র আর সার-ই হল আসল সম্পত্তির স্বরূপ। তৃতীয় বিষয় হল সম্পত্তি প্রাপ্ত করার উপায়, এরজন্য সম্পত্তিশাস্ত্রী বলে যে - কোম্পানি, শাসন আর জাতীয়তার দ্বারাই অমিত সম্পত্তির প্রাপ্তি, রক্ষা আর ভোগ হতে পারে।

এইভাবে বর্তমান পলিটিকাল ইকোনমির সঙ্গে সম্বন্ধিত নয়টি বিভাগ রয়েছে যথা - ১. নাগরিক জীবন, ২. জনবৃদ্ধি, ৩. খাদান, ৪. ক্ষেত, ৫. সার, ৬. যন্ত্র, ৭. কোম্পানি, ৮. শাসন আর ৯. জাতীয়তা আদি। আমি এখানে ক্রমে-ক্রমে এই সমস্ত বিভাগের সাধারণ আলোচনা করে দেখাবো যে, এই সমস্ত বিভাগ কি সৃষ্টি নিয়মের অনুকূল? আর অর্থশাস্ত্রের মধ্যে এর গণনা কি হতে পারে?

নাগরিক জীবন আর জনবৃদ্ধি

নাগরিক জীবন আর জনবৃদ্ধির আশঙ্কায় প্রেরিত হয়েই আজকাল অমিত সম্পত্তির আবশ্যকতার কথা বলা হচ্ছে, অথচ আমি দেখছি যে এই দুটি কথাই অশুদ্ধ। এই কথা দুটির মধ্যে প্রথমে নাগরিক জীবনকেই ধরা যাক, নাগরিক জীবন বড়ো-বড়ো নগরের মধ্যে বসবাস দ্বারা উৎপন্ন হয়, যেখানে কেনা আর বেচার বাজার থাকে, যেখানে কোনো বড়ো রাজকর্মচারী বা রাজা বাস করে, যেখানে কোনো বড়ো ঘাট বা বন্দর থাকে আর যেখানে কোনো তীর্থ অথবা অন্য কোনো এরকমই লোক সমাগমের স্থান থাকে সেটাই ধীরে-ধীরে নগর হয়ে যায় আর নগরে বসবাসকারীদের মধ্যে চারটি দোষ উৎপন্ন হয়। তারা অভিমানী, বিলাসী, রোগী আর মিথ্যুক হয়ে যায়, কারণ ক্রেতা-বিক্রেতা, রাজকর্মচারী আর তীর্থবাসী মানুষ অন্য জনতার তুলনায় অধিক খবরাখবর রাখে, এইজন্য তারা নিজেকে স্বভাবতঃ বড়ো ব্যক্তি মানা শুরু করে। তারা নিজেদের জীবন - যাপন আর বেষ-ভূষার মধ্যে কিছু বিলক্ষণ পরিবর্তন করে নেয় আর ফ্যাশনের দাস হয়ে বিলাসী হয়ে যায়। নাচ-তামাশা, গান-বাজনা আর বিষয়াসক্তি এতটাই বেড়ে যায় যে সবাই কোনো-না-কোনো রোগের শিকার হয়ে যায়। জুয়া খেলা, প্রতারণা করা, মিথ্যা কথা বলা একটু-আধটু সবার মধ্যেই চলে আসে। এইভাবে এরা নিজেদের চারটি দোষের কারণে সবদিক থেকে পতিত হয়, তবে অজ্ঞানী গ্রামবাসী এদের সভ্য বলে মনে

করে, তাই এদের নকল করা আরম্ভ করে দেয় আর তারাও তাদের সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে।

নাগরিক জীবনে অমিত পদার্থের সঞ্চয় করাই হয়ে যায় প্রধান কাজ আর যন্ত্রের আবিষ্কার শুরু হয়ে যায়। নাগরিকদের স্বভাবের মধ্যে এত অধিক অত্যাচার বেড়ে যায় যে তারা নিজেদেরই সদৃশ মানুষদের দিয়ে পালকী তোলা, রিক্সা চালানো আর পায়খানা পরিষ্কার করার কাজ করিয়ে নেয়। এর কারণে নগরের মধ্যে বেশ্যাদের দোকান, মদের দোকান, জুয়ার দোকান আর কুটিল নীতি (মামলাবাজীর) দোকান খুলে যায়। বড়শি লাগিয়ে মাছের হত্যাকারী যেভাবে মাছের অপেক্ষায় বসে থাকে সেইভাবে প্রত্যেক নাগরিক সরল-সাধারণ মানুষকে ফাঁসাতে - লুট করে নেওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

বিলাসের লোভে মোহিত হয়ে গ্রামের মানুষ শহরে জমা হতে থাকে আর কিছু দিনের মধ্যেই শহরের জনসংখ্যা এত ঘন হয়ে যায় যে পায়খানা, প্রসাব, ধুলো আর ধুয়োর নোংরায় মানুষের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। ওষুধ, স্বচ্ছতা আর কাপড় ধোয়ার খরচা এতই বেড়ে যায় যে তার চিন্তা শরীরকে রোগের ঘর বানিয়ে নেয়। রেল, মোটর, ট্রাম আর বাস গাড়ি আদি তথা মোটর সাইকেল আর ইঞ্জিনের অত্যন্ত অধিকতার কারণে কয়েকশ মানুষ খোঁড়া আর অন্ধ হয়ে যায় আর কয়েকশ মরেই যায়। নগরের মধ্যে শুদ্ধ হাওয়া, শুদ্ধ জল, শুদ্ধ ঘী-দুধ, শুদ্ধ ফল-ফুল-সব্জি আর শুদ্ধ অন্ন কখনও দেখতে পাওয়া যায় না। সবুজ ক্ষেতের দর্শন, বন-অরণ্যের ভ্রমণ, পশুদের ডাক আর পাখিদের কলরব কখনও শোনা যায় না, অর্থাৎ মানুষের জীবন এতটাই অস্বাভাবিক হয়ে যায় যে তারা রোগ, খরচা আর অভিমানের কারণে জীবিত অবস্থাতেই প্রেত হয়ে যায়, এইজন্য নাগরিক জীবন হল সর্বদা সৃষ্টিনিয়মের প্রতিকূল আর নাগরিক জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত অমিত সম্পত্তিও হচ্ছে অস্বাভাবিক। এরকম অস্বাভাবিক নাগরিক জীবন হল নিতান্ত আসুরী জীবন, এইজন্য আর্য সভ্যতার মধ্যে নগরের জন্য কোনো স্থান নেই।

আর্য সভ্যতার নগরের আদর্শ আমি আর্যগ্রামের বর্ণনার মধ্যে লিখে এসেছি। আর্যনগর তো কেবল রাজার নিবাসের কারণেই তৈরি হতো যা ছোটো-ছোটো গ্রাম আর বন-বাগান তথা অরণ্যের অংশ দিয়ে সর্বদা ঘিরে থাকতো। আমার একথা তো প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ, প্রথম প্রমাণ হল - প্রত্যেক আর্যকে সন্ধ্যা করার জন্য দুই সময় নিত্য জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার কথা লেখা রয়েছে© ।দ্বিতীয় প্রমাণ হল - আর্যভাষা সংস্কৃতের মধ্যে ভঙ্গী (মেথর) আর পায়খানার জন্য কোনো শব্দ নেই। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, লোকেরা শৌচের জন্য জঙ্গলের মধ্যেই যেতো। এই দুই প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হচ্ছে যে, আর্যনগর জঙ্গল দিয়ে ঘেরা থাকতো আর জঙ্গল গ্রাম তথা নগরগুলো দিয়ে ঘিরে থাকতো। তা নয়তো নিত্য দুই সময় সন্ধ্যা আর শৌচের জন্য এত দূর কেউ কিভাবে যেতে পারে, এইজন্য আর্যনগর বর্তমান নগরের মতো ছিল না। বর্তমান নগর তো হল আসুর নগর, অতঃ এরকম নগরকে তো বেদের মধ্যে ইন্দ্রবৃত্রের অলঙ্কার দিয়ে ভেঙে ফেলার আজ্ঞা রয়েছে। ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

ত্বম্ মায়াভিরপ মায়িনোऽধমঃ স্বধাভির্যে অধি শুপ্তাবজুহ্বত।

© অপাম্ সমীপে নিয়তো নৈত্যকম্ বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যম্ সমাহিতঃ।। - মনুঃ ২/১০৪

ত্বম্ পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্র ঋজিশ্বানম্ দস্যুহত্যেষ্বাবিথ।।

(ঋঃ ১|৫১|৫)

অর্থাৎ - হে রাজন! নিন্দনীয় বুদ্ধির ছল-প্রতারক, অব্রতী দস্যুদের আপনি কম্পায়মান করুন আর যারা যজ্ঞ না করে কেবল নিজেরই পেট ভরে সেই দুষ্টদের দূর করে দিন আর এই (পিপ্র) উপদ্রব, অশান্তি, অজ্ঞানতা আর নাস্তিকতার প্রচারকদের নগরকে ভগ্ন করে দিন তথা দুষ্টের হনন করে সরলপ্রকৃতি মানুষের রক্ষা করুন।

শতমশ্মন্ময়ীনাম্ পুরামিন্দ্রো ব্যাস্যত্।
দিবোদাসায় দাশুষে।।

ঋঃ ৪|৩০|২০

অর্থাৎ - রাজার উচিত যে তিনি যেন সেই দ্যূত ক্রীড়াকারী জুয়াখোরদের পাষাণনির্মিত সমস্ত নগরকে ভেঙে ফেলেন।

এই প্রমাণগুলো থেকে সূচিত হচ্ছে যে আর্য সভ্যতার মধ্যে নাগরিক জীবন আসুর প্রবৃত্তিকারী মনে করা হয়, তাই নগরকে ভেঙে ফেলার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আর্য সভ্যতার মধ্যে যখন নগরের আবশ্যকতাই বলা হয়নি তাহলে নাগরিক জীবন আর নাগরিক সম্পত্তির কথা কোথায় বলা যেতে পারে। এখন আসছি জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে, বলা হয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভোগ্য পদার্থ আর ভূমি হ্রাস হচ্ছে, কিন্তু একথার মধ্যেও অধিক দম নেই। আমরা এই সৃষ্টির প্রবল নিয়মে দেখতে পাই যে আগে ভোগ্য উৎপন্ন হয় তারপর ভোক্তা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বাচ্চা উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেই দুধ তৈরি হয় আর পশু-পক্ষী তথা মানুষের উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেই বনস্পতি উৎপন্ন হয়। প্রজোত্পত্তির বিষয়ে বিদ্বানদের সম্মতি হল এইরকম যে, চল্লিশ দিন পর আহার করা পদার্থ বীর্য তৈরি হয়, যারদ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয় আর দশ মাস ভোজন প্রাপ্ত করার পরেই মাতা বাচ্চাকে পেটের বাইরে নিয়ে আসে, এইজন্য সংসারের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত সন্ততি উৎপন্ন হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কে বলতে পারে যে ভোগ্যের হ্রাস হচ্ছে। ভোগ্য হ্রাস হলে পরে না তো পিতার বীর্য হবে আর না দশ মাস পর্যন্ত ভোজনাদি করে মাতা বাচ্চাকে তৈরি করতে পারবে। আমি তো মনে করি যখন ভোগ্য এত কমে যাবে যে যারফলে ভবিষ্যতে প্রজার পোষণ হতে পারবে না তখন মাতার পেটের মধ্যে বাচ্চা আসাই বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রায়শঃ লোকেরা বলে থাকে যে যেহেতু প্রজা উৎপন্ন হয় তথাপি পৃথিবীর মধ্যে ভোজনের ন্যূনতা তো হবেই, কারণ যদি লক্ষ-লক্ষ মণ মাছ আর পশুর মাংস না হতো তাহলে লোকজন খিদায় মরে যেতো। আমি বলছি এরমধ্যে পৃথিবীর দোষ নেই, এরমধ্যে তাদের দোষ রয়েছে যারা পৃথিবীর অপব্যবহার করছে। লক্ষ - লক্ষ একর ভূমি মসলা, গাঁজা, ভাঙ্গ, চা, তামাক আর আফিমের উৎপন্ন করার জন্য আটকে রাখা হয়েছে, লক্ষ-লক্ষ একর ভূমি তুলো, শন আর পাটের ক্ষেতের জন্য আটকে রাখা হয়েছে, লক্ষ-লক্ষ একর ভূমি মেশিনের তেল উৎপন্ন করার জন্য আটকে রাখা হয়েছে আর লক্ষ-লক্ষ একর ভূমি রেলপথ, পাকা রাস্তা আর খালের জন্য আটকে রাখা হয়েছে আর লক্ষ-লক্ষ একর ভূমির মধ্যে উৎপন্ন হওয়া দেশী মদ তৈরির মধ্যে ব্যয় করে দেওয়া হয়। এই সমস্ত ভূমিতে যদি মানুষের খাদ্য উৎপন্ন করা হতো আর পশুদের

ভরণপোষণের জন্য ঘাস উৎপন্ন করা হতো তাহলে যতটা খাদ্য আজ সংসারের মধ্যে উৎপন্ন হয় তার থেকে দিগুণ উৎপন্ন হয়ে যেতো আর সকলের জন্য ভরপেট অন্ন ভোজনের জন্য পাওয়া যেতো আর মাংসের জন্য পশুদের হত্যা করতে হতো না আর তাদের থেকে উৎপন্ন হওয়া দুধ-ঘী দিয়েও মানুষের আহারে সহায়তা পাওয়া যেতো।

আমিও মানি যে ধীরে-ধীরে মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু আমি এটাও মানি যে ধীরে-ধীরে পৃথিবীও বেড়ে চলেছে। যদি পৃথিবী ধীরে-ধীরে না বাড়তো তাহলে আদিসৃষ্টি থেকে আজপর্যন্ত এতো প্রাণীদের স্থান কে দিতো? আদিতে পৃথিবীর কি এরকমই স্থিতি ছিল? কক্ষনো না। আদিতে তো সমস্ত পৃথিবী জলে ভরা ছিল। যেমন-যেমন ভাবে সৃষ্টি বাড়তে থাকে সেরকম ভাবে সমুদ্র শুকিয়ে যেতে থাকে আর পৃথিবী বসবাসের যোগ্য হয়ে যায়। এখন পৃথিবীর তিন ভাগের একভাগ সমুদ্র থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আর তিন ভাগের দুইভাগে জল ভরা রয়েছে। যতটাতে সমুদ্র ভরে রয়েছে সেই জলময় সমুদ্রের পেট থেকে এখনও পৃথিবীর অংশের উৎপত্তি হচ্ছে। যখন-যখন জ্বালামুখী, অগ্নিপ্রপাত আর ভূমিকম্প হয় তখন-তখন কোথাও-কোথাও সমুদ্র থেকে পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে আসার সুত্রপাত হয় আর কখনও -কখনও পৃথিবী বাইরে বেরিয়েও যায়। তাছাড়া পাহাড় ধীরে-ধীরে খণ্ড-খণ্ড হয়ে ভূমির রূপ ধারণ করছে। ঝাঁসির নিকটতম স্থানে এই দৃশ্য খুবই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। একইভাবে বালুর বড়ো-বড়ো ময়দান ধীরে-ধীরে মাটিতে পরিণত হচ্ছে। এই দৃশ্যও মারবাড়, কাঠিয়াবাড় আর কচ্ছতে ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যায়, এইজন্য এটা বলা একদমই ভুল যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীতে অভাবগ্রস্ত অবস্থা হয়েছে। এটা তো হল বৈজ্ঞানিক অজুহাত যা অন্য দেশের উপরে কব্জা করার জন্য করা হয়ে থাকে। আমি তো মনে করি অভাবগ্রস্ত অবস্থাটা পৃথিবীর কারণে নয় প্রত্যুত সেটা নাগরিক বিলাসীদের স্বয়ং উৎপন্ন করার কারণে হয়েছে। নাগরিকরা নিজেদের বিলাসের জন্য সংসারের অপরিমিত পদার্থকে নিজের ঘরের মধ্যে একত্রিত করে রেখেছে। এক-একজন জেন্টলম্যানের কাছে আট-আট বাক্স পোশাক, ষোলো-ষোলো জোড়া জুতো বুট, দুই-দুই শত আসবাবপত্রের ভিড় জমে রয়েছে। এক-একজন লেডির ঘর শপিংমলের দোকান হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামের মধ্যে সেই রকম ধরনের দেখতে এক কুলবধূর শরীরে লজ্জা-নিবারণের জন্য একটি সুদৃঢ় সাধারণ বস্ত্রও নেই। চা, সিগারেট আর গাঁজা, তামাকে ভরা রেলগাড়ি আর জাহাজ সারা সংসারে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর এক-একজন ধনবানের ঘোড়া ষোলো জনের খাদ্য দানা পাচ্ছে, কিন্তু গরীবদের অর্ধেক পেট অন্নেরও কোনো নাম ঠিকানা নেই। এরকম অবস্থার মধ্যে কে বলতে পারে যে এই অভাবগ্রস্ত অবস্থা পৃথিবীর কারণে উৎপন্ন হয়েছে? আমি তো এটাই বলবো যে এই অভাব নাগরিক জীবন থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এইজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কায় অমিত সম্পত্তিকে কব্জা করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল সর্বদা ভুল, কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি অমিত সম্পত্তির দ্বারা বন্ধ হবে না। অমিত সম্পত্তি দ্বারা সেটা তো আরও বৃদ্ধি হবে, তাই এই নাগরিক জীবন আর কাম্য সম্পত্তির মোহ ছেড়ে দিয়ে যখন সরল, তপস্বী আর মোক্ষাভিমুখী জীবন বানানো হবে তখনই সন্ততিনিরোধ হওয়া সম্ভব আর তখনই মানবজাতির সুখ-শান্তির আশা করা যেতে পারে, অতএব আজকালকার আসুরী সম্পত্তির আবশ্যকতা একদমই নেই।

ক্ষেত, সার, খনি আর যন্ত্র

গত পৃষ্ঠাতে বর্তমান সম্পত্তির আবশ্যকতার উপর বিচার করে জ্ঞাত হল যে, মানবজাতির এই ধরনের সম্পত্তির আবশ্যকতা নেই। এখন আমরা দেখবো যে সেই সম্পত্তির স্বরূপ কি সঠিক? বর্তমান সম্পত্তির স্বরূপ বর্ণনা করার সঙ্গে অর্থশাস্ত্রীরা পৃথিবী, শ্রম আর পুঁজিকে সম্পত্তির স্বরূপ মেনেছে। পৃথিবীর মধ্যে খনি আর ক্ষেত হল প্রধান। বৈজ্ঞানিক সার ফেলে দিয়ে আর যন্ত্র জুড়ে দিয়ে ক্ষেত থেকে অন্ন, তুলো, তেল আর ফল আদি উৎপন্ন করা হয় আর তারপর যন্ত্রের সাহায্যে তা থেকে বিভিন্ন প্রকারের অন্য পদার্থ তৈরি হয়। একইভাবে খনি থেকে খনিজ পদার্থকে বাইরে বের করে যন্ত্র দিয়েই বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ তৈরি করা হয় আর যন্ত্র দিয়েই এদিক-সেদিক পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এইজন্য সম্পত্তির উপরিউক্ত চারটি বিভাগ ক্ষেত, সার, খনি আর যন্ত্রই সুদৃঢ় সম্পত্তির স্বরূপ বলে মনে করা হয়। আমি এখানে ক্রমে-ক্রমে এই চারটি স্বরূপের আলোচনা করবো।

আমি মানুষের আহারপ্রকরণের মধ্যে লিখে এসেছি যে - মানুষের বাস্তবিক ভোজন হল ফল, ফুল আর দুধ-ঘী। এই সব পদার্থ পশু, ফলের বৃক্ষ তথা ফলের লতা থেকে উৎপন্ন হয়, তাই মানুষের উচিত এগুলোর ক্ষেতী করা, অন্নের নয়। অন্ন ক্ষেতীর কারণে জঙ্গল, বাটিকা আর অরণ্যের নাশ হয় আর পশুদের জন্য চারণভূমি কমে যায়, যার ফলে দুধ আর ঘীয়ের পরিমাণ কমে যায়। তাছাড়া জঙ্গল, বাটিকা আর চারণভূমি নষ্ট হওয়ার কারণে অনাবৃষ্টিও হয় আর বিভিন্ন প্রকারের রোগও উৎপন্ন হয়, তাই ক্ষেতী করা অর্থাৎ অন্নের জন্য ভূমির অধিকাংশ ভাগ আটকে রাখা সৃষ্টি নিয়মের বিরুদ্ধ, তবে বাগান লাগানো, গোচর ভূমি বানানো আর জঙ্গল বাড়ানো সৃষ্টি নিয়মের অনুকূল হবে। জঙ্গলের মধ্যে যেখানে মানুষের ভোজনের জন্য ফল পাওয়া যায় সেখানে অন্নও উৎপন্ন হয়। শুরুতে সমস্ত অন্ন জঙ্গলের মধ্যেই উৎপন্ন হতো আর এখনও অনেক দেশের মধ্যে কয়েক ধরনের অন্ন জঙ্গলের মধ্যেই ঘাসের মতো করে উৎপন্ন হয়, এইজন্য কেবল জঙ্গলের বৃদ্ধির দ্বারাই ফল-ফুল, দুধ-ঘী আর অনেক প্রকারের অন্নের প্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু ক্ষেতী কেবল অন্নই দেয়, বাকি ফল-ফুল, দুধ-ঘী, বর্ষা আর আরোগ্যের নাশ করে দেয়, এইজন্য ক্ষেতী করা উচিত নয়। মনু ভগবান্ স্পষ্ট শব্দে নিষেধ করেছেন যে -

হিম্সাপ্রায়াম্ পরাধীনাম্ কৃষিম্ য়ত্নেন বর্জ্জয়েত্

(মনুসংহিতা ১০|৮৩)

অর্থাৎ - এই হিংসাময় দৈবাধীন ক্ষেতীকে কখনও করা উচিত নয়।

ক্ষেতী করাই যখন সৃষ্টি নিয়মের বিরুদ্ধ তখন ক্ষেতের মধ্যে অপবিত্র আর রাসায়নিক সার দেওয়া অনুকূল কি করে হতে পারে? হ্যাঁ, জঙ্গলের মধ্যে আর বাটিকাদির মধ্যে যেসব স্বাভাবিক সার পাতা আর পশুর গোবর-মূত্র থেকে তৈরি হয়ে আসে সেটাই বৃক্ষের জন্য হিতকর হয়, কিন্তু যেসব সার মানুষের মল-মূত্র আর মৎস্য আদি দিয়ে তৈরি করা হয় সেটা খুবই হানিকারক।নোংরা সার দ্বারা খাদ্য পদার্থের আসল গুণ নষ্ট হয়ে যায়। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত "মিফ্লাবর" নামক পত্রের মধ্যে একটি লম্বা নিবন্ধ ছাপা হয়েছে যার

মধ্যে বৈজ্ঞানিক রীতি দ্বারা সিদ্ধ করা হয়েছে যে - কৃত্রিম আর নোংরা সার অন্নকে দূষিত করে দেয় আর সেই দূষিত অন্নকে যে আহার করে তার হানি হয়। নোংরা সার দিয়ে উৎপন্ন করা অন্নকে ইউরোপনিবাসীও পছন্দ করে না। ভগবান্ মনু (৫|৫) বলেছেন যে **"অমেধ্যপ্রভবাণি চ"**, অর্থাৎ অপবিত্র স্থানে উৎপন্ন হওয়া অন্ন খাওয়া উচিত নয়। তাৎপর্য হল এই সম্পত্তিশাস্ত্রের মধ্যে যে ধরণের সারের মহত্ব বলা হয়েছে সেটাও খুব অস্বাভাবিক।

ক্ষেত আর সারের পরে খনি আর যন্ত্রের নম্বর রয়েছে। খনি আর যন্ত্রের প্রশ্ন বড়োই ভয়ংকর। খনির মধ্যে পরমাত্মা না জানি কি প্রয়োজনের জন্য খনিজ পদার্থকে সুরক্ষিত রেখেছেন, কিন্তু আজকালকার সম্পত্তিশাস্ত্রী সেই গচ্ছিত দ্রব্যকে বাইরে বের করে-করে হেরফের করছে। কে জানে যে এই খনিজ পদার্থ পৃথিবীর ভিতরে-ভিতরে কি প্রভাব করছে আর বের করে নিলে কি প্রভাব হবে। ভাবনা চিন্তা না করে, বিনা কোনো প্রমাণ আর তথ্যে মানুষের কি অধিকার যে সে এই পদার্থের মধ্যে হাত লাগাবে। আমরা দেখতে পাই যে কোটি-কোটি মণ কয়লা খনি থেকে বের করে নেওয়া হচ্ছে। লোকে বলে যে কয়লার মধ্যে প্রাণনাশক বায়ু অধিক পরিমাণ থাকে যা কিনা বৃক্ষের ভোজন , কিন্তু কয়লা থেকে যে মিশ্রিত রস বা বায়ু বৃক্ষ পায় সেটা কয়লা বের করে নেওয়ার ফলে এখন আর পায় না। এরকম অবস্থার জন্য এমনটা হওয়া সম্ভব যে বৃক্ষের ফল আর অন্নের গুণ পূর্বের তুলনায় কমে গেছে।

আজ যে কয়েকশ রকমের রোগ ছড়াচ্ছে হতে পারে সেটা এইরকম উপদ্রবেরই ফল। বলার তাৎপর্য হল, যে বিষয়কে আমরা জানিই না আর না ত্রিকালেও জানতে পারবো, সেই বিষয়ের উপর হাত দেওয়া আর প্রকৃতির রক্ষিত পদার্থকে বের করে নিয়ে নষ্ট করে ফেলা কোথাকার বুদ্ধিমত্তা হল? সোনা, রূপো, হীরা, পান্না, মেন্সিল, হর্টাল আর পারদকে সবাই জানে যে এগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত বিশেষ-বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এরকম অবস্থাতে আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি যে তার টানাহেঁচড়া থেকে সৃষ্টির মধ্যে মহান কোনো পরিবর্তন হয়নি? আমার তো বিশ্বাস যে সৃষ্টির মধ্যে এই প্রতিবছর অনাবৃষ্টি, রোগ আর বড়ো ক্রুর স্বভাবের সমস্ত কাজ এইসব পদার্থের হেরফের-টানাহেঁচড়ার জন্যই হচ্ছে। তাছাড়া খনি থেকে বের করা অপরিমিত পদার্থ - সোনা, রূপো, হীরা, মতি আদিগুলো সংসারের মধ্যে সীমাতীত অসমানতা তৈরি করে দিয়েছে, যারজন্য কাউকে অত্যন্ত ধনী আর কাউকে অত্যন্ত দরিদ্র বলা হচ্ছে, এইজন্য এরকম নিরর্থক পদার্থকে বহুমূল্য বানিয়ে জনগণের রুচি সেদিকে লাগিয়ে দেওয়াটা কি কম পাপের বিষয় হবে?

একজন ব্যক্তি যার সোনা, রূপো আদির আভূষণ পরার কোনো ধ্যানই ছিল না তাকে সোনা, রূপো আর হীরা-মতি দেখিয়ে সেদিকে লালায়িত করিয়ে দেওয়াটা কি কম অত্যাচার হবে? আজ সংসারের মধ্যে আভূষণ সম্বন্ধিত কাল্পনিক দুঃখ থেকে যে মানুষ দুঃখী হচ্ছে, আজ যে সংসারের মধ্যে হায়-হায় হচ্ছে যে আমার কাছে কানের দুল নেই, আমার কাছে গলার চেন নেই আর আমার কাছে আংটি নেই, এটা কি কম শোকের কথা? যেসব মানুষ এই ব্যর্থ পদার্থকে মূল্যবান বানিয়ে সরল-সাধারণ মানুষকে এই কল্পনার দুঃখে ফাঁসিয়েছে তাদের পাপ কি কম হবে? আমি তো বড়ো গলায় বলছি যে যারা প্রথমে আর এই সময় এরকম

পদার্থের পরম্পরা তৈরি করে মানুষদের এইদিকে প্রবৃত্ত করেছে, তারা শুধু মানবজাতিরই নয় প্রত্যুত তারা হল প্রাণীমাত্রের শত্রু, এইজন্য ক্ষেতী, আর খনি দুটোই ব্যর্থ আর মানবসমাজের মধ্যে পাপ বৃদ্ধিকারক। এই সবগুলোর মধ্যে যন্ত্রের আবিষ্কার তো ক্ষেত আর খনির থেকেও অধিক ভয়ংকর। যন্ত্র সংসারের মধ্যে কত অত্যাচার করে চলেছে, তা সবার চোখের সামনে রয়েছে। যন্ত্র মানুষ, ঘোড়া, বৃষ, হাতী, খচ্ছরাদি পশুদের কর্মক্ষেত্র একদম বন্ধ করে দিয়েছে। যে কাজকে সহস্র মানুষ আর সহস্র পশু মিলে করতে পারতো আজ যন্ত্রের সাহায্যে সেই কাজকে কিছু লোহা, কয়লা (জ্বালানি) আর দুই-চার জনব্যক্তি করে নেয়। বাকি মানুষ আর বাকি পশু অকেজো হয়ে গেছে আর এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের জন্য সংসারের মধ্যে কোনো কাজ নেই। এটাই হল কারণ যে, বিনা উদ্যোগে মানুষ হয় ধনীর গুলাম হয়ে গেছে অথবা খিদায় মরছে আর পশু ছুরির নিচে নিজের ঘাড় কাটাচ্ছে। এই যন্ত্রের কারণেই সংসারের মধ্যে স্থানে - স্থানে স্ট্রাইক আর অনারকিজেমর আসুরী আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় আর প্রত্যেক স্থানে লড়াই চলছে। যন্ত্রের কারণেই জঙ্গল কাটা হয়েছে, প্রতিবছর অনাবৃষ্টি হয়, জলবায়ু পাল্টে গেছে, সৃষ্টি-সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে আর মানুষ মানুষের প্রাণের শত্রু হয়ে গেছে, এইজন্য আমি বলবো যে, যদি যন্ত্র না হতো তাহলে সংসারের নকশা অন্য রকমই হতো।

আপনি কল্পনা করে দেখুন যে আজ যদি সংসারের মধ্যে সব ধরণের ইঞ্জিন, রেল, মোটর, ট্রাম, মোটর সাইকেল, বিদ্যুৎতে জ্বালানো লাইট আর বিদ্যুতে চলা ফ্যান না থাকে, অর্থাৎ কোনো ধরনের কোনো আসুরী যন্ত্র নেই। এখন আপনি ভাবুন যে আপনার বাহন কিভাবে যাবে আর আপনার পদার্থ এদিক-সেদিক কিভাবে বহন করা যাবে। এর উত্তর এটাই হতে পারে যে পশুদের দ্বারা বাহন আর বোঝা বহনের কাজ চলবে। আবার প্রশ্ন হল যে এত পশু কোথায় চরবে, তো উত্তর স্পষ্ট যে চারণভূমিতে - অরণ্যে। এখন আবার প্রশ্ন হল যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী অরণ্যে ভরে যায় তাহলে মানুষ খাবে কি, এর উত্তর স্পষ্ট যে ফলওয়ালা গাছের ফল আর পশুর দুধ-ঘী মানুষ খাবে আর ছোটো বৃক্ষ (তৃণ) আর দানা পশু খাবে আর সমস্ত প্রাণী সমূহের যোগক্ষেম আনন্দে চলে যাবে আর সংসার আনন্দকানন হয়ে যাবে। সেখানে আজও খুব আনন্দ যেখানে অরণ্য রয়েছে। আজ ৩০ বছর ধরে ভারতে প্লেগ মানুষের সর্বনাশ করছে, কিন্তু অরণ্যের মধ্যে এর প্রভাব কিছুই পড়েনি। সেখানে আজ পর্যন্ত লোকেরা প্লেগকে জানেই না। এর কারণ হল এটাই যে অরণ্যের মধ্যে এরকম রোগ হয় না আর রোগীকে অরণ্যের মধ্যে নিয়ে যেতেই রোগ সেরে যেতে থাকে। অরণ্যে ঠিক সময়ে বৃষ্টি হয় আর ভূমি সর্বদা শস্যশ্যামলা বিদ্যমান থাকে। এইভাবে কেবল যন্ত্র, মেশিন আর ক্ষেতকে সরিয়ে দেওয়ার কল্পনামাত্র করতেই স্বর্গীয় সুখ চোখের সামনে ঘুরতে থাকে। ফল ঝরে পড়া আর ঘী-দুধের প্রবাহ বৈতে থাকে, বর্ষা হতে থাকে আর প্লেগ-কলেরা আদি রোগ পালিয়ে যায়, অর্থাৎ পুরো সংসারই অন্য ধরনের হয়ে যায়, এইজন্য সমস্ত খনিজকে বাইরে বের করা আর সেইসব যন্ত্রকে চালানো যা স্প্রিং, স্টিম আর বিদ্যুৎ অথবা কোনো কৃত্রিম উপায় দ্বারা চালানো হয় একদম সৃষ্টি নিয়মের বিরুদ্ধ, তাই ভগবান্ মনু বলেছেন যে -

সর্বাকরেষ্বধিকারো মহায়ন্ত্রপ্রবর্তনম্।

হিংস্রৌষধীনাম্ স্ত্র্যাজীবোऽভিচারো মূলকর্ম্ম চ।।

(মনুসংহিতা ১১|৬৪)

উপপাতকম্।।

(মনুসংহিতাঃ ১১|৬৭)

অর্থাৎ - সমস্ত খনিজের উপর অধিকার করা, বড়ো-বড়ো যন্ত্রকে চালানো, বৃক্ষকে কাটা, বেশ্যাবৃত্তি আর অভিচার আদি করা হল উপপাতক।

এখানে খনিজের উপরে অধিকার করা আর মহাযন্ত্রকে চালানো পাপ বলা হয়েছে, অতঃ এইধরনের মহাযন্ত্র যার দ্বারা মানুষের অথবা পশুদের কর্মক্ষেত্র থেমে যায়, আর্য সভ্যতার মধ্যে কিভাবে স্থান পেতে পারে। আর্য সভ্যতার মধ্যে তো অগর্হিত শিল্পেরই জন্য স্থান রয়েছে। মনুজী বলেছেন যে -

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিম্ জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ।।

(মনুঃ ৯|৭৫)

অর্থাৎ - যদি পতি নিজের স্ত্রীর প্রবন্ধ না করে অন্যদেশে চলে যায় তাহলে সেই স্ত্রী অনিন্দিত শিল্পের দ্বারা নিজের নির্বাহ করবে। অনিন্দিত শিল্পের অর্থ হল বৈদিক শিল্প। বৈদিক শিল্প হল সেটা যা নিজের ঘরে নিজের হাত দিয়ে করা হয়, যেরকম চরখা কাটা আদি, কিন্তু যে শিল্প আর যন্ত্র অনিন্দিত না হয়ে গর্হিত তার জন্য মনুজী বলেছেন যে -

শিল্পেন ব্যবহারেণ শূদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।
গোভিরশ্বৈশ্চ য়ানৈশ্চ কৃষ্যা রাজোপসেবয়া।
কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি য়ানি হীনানি মন্ত্রতঃ।

(মনুসংহিতাঃ ৩|৬৪-৬৫)

অর্থাৎ - শিল্পকার্য্য, টাকার লেনদেন, কেবল শূদ্রের গর্ভে সন্তানোৎপাদন, গৌ-অশ্ব যান, কৃষিকার্য্য, রাজসেবা করার কারণে আর বেদাধ্যয়ান না করার কারণে সমস্ত কূল শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়, এইজন্য শিল্প, কৃষি, চাকুরী আর নীচ সঙ্গতিকে ছেড়ে দিবে।

এখানে নিন্দিত শিল্প আর কৃষির নিন্দা করা হয়েছে। তাছাড়া এই নিন্দিত যন্ত্র বেশি দিন চলতে পারে না, সেটা শীঘ্র বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ স্টিম নির্মাণের জন্য যে কয়লার আবশ্যকতা হয় সেটা অতি শীঘ্র সমাপ্ত হয়ে যাবে© ।একইভাবে বিদ্যুৎ যেসব সামগ্রী দিয়ে নির্মিত হয় সেটাও সমাপ্ত হয়ে যাবে আর যদি সূর্য থেকে

© Already some of the smaller coalfields of Europe have been worked out, while in others it has become necessary to sink much deeper shafts at an increasing cost. There is not much tin left in Cornwall, not much gold in the gravel deposits of northern California. The richest known goldfield of the world, that of Transval Witwatersrand, can hardly last more than thirty or forty years. Thus in a few centuries the productive capacity of many regions may have become quite different from what it is now with grave consequences to their inhabitants.
- Harmsworth History of the world, Introduction, p.33

শক্তি নেওয়া হয় তাহলে সেই শক্তি যেখানের জন্য নির্মিত করা হয়েছে সেখানে পৌঁছবে না আর ঘোর উপদ্রপ উৎপন্ন হয়ে যাবে। বাকি রইলো একথা যে বিনা রেল আদি ব্যবহার করে লোকজন দূর দেশে কিভাবে যাবে? এর উত্তর হল প্রথম তো সকলকে যাত্রার মধ্যে যাওয়ার আবশ্যকতাই হয় না, কারণ প্রায়শঃ বৈশ্য লোকেরাই দূর দেশে যায়। তারা স্থলে পশুর দ্বারা আর জলে বিনা ইঞ্জিনের জাহাজের দ্বারা যেতে পারে। যদি এই যানের ভালো প্রবন্ধ করা হয় তাহলে এক বছরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর চক্কর লাগাতে পারবে। যদি মানুষ প্রতিদিন ২০ মিল চলে তাহলে হেঁটেই তিন-চার বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথিবীর চক্কর লাগিয়ে দিতে পারে। সংসারকে অবলোকন করার জন্য হেঁটে চলার থেকে ভালো আর কোনো মার্গ নেই, এইজন্য এরকম যন্ত্রকে যারজন্য যেকোনো প্রাণীর কর্মক্ষেত্র থেমে যায়, কখনও কাজে লাগানো উচিত নয়। তার সঙ্গে এরকম যন্ত্রের দ্বারা নির্মিত পদার্থও সেটা স্বদেশী হোক বা বিদেশি, কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। এইসব পদার্থ মানুষের আর পশুদের হানি করেই তৈরি হয়, তাই প্রাণীর রক্ত দিয়ে নির্মিত পদার্থের দ্বারা সাজসজ্জাকারী মানুষের কখনও ভালো হবে না।

মেশিনের কারণেই লক্ষ-লক্ষ কুলী খিদে-খিদে করে চিৎকার করে বেড়ায় আর লক্ষ-লক্ষ পশুকে প্রতিদিন হত্যা করা হয়। যদি মেশিন না থাকতো তাহলে এইসব প্রাণীদের যত্ন করা হতো, কিন্তু মেশিন সবগুলোকে অকেজো করে দিয়েছে, অতঃ মেশিনকে সাহায্য দেওয়ার মধ্যে ততটাই পাপ হবে, যতটা অনেক মানুষ বা পশুকে বধ করলে পরে হয়। এইভাবে এই ক্ষেত, সার, খনিজ আর যন্ত্র দ্বারা নির্মিত কুচক্র, সম্পত্তির স্বরূপ নয়, এটা তো কামুকতার ভয়ংকর চিত্র যা মানুষ, পশু আর বৃক্ষদেরই কষ্ট দেয়, তাই এটা অতি শীঘ্রই নষ্ট হওয়া উচিত। এই সম্পত্তির স্বরূপের আলোচনার পরে এখন আসুরী সম্পত্তিকে উৎপন্নকারী সাধনেরও বিবরণ দেখে নেওয়া দরকার।

কোম্পানি, রাজ্যবল আর জাতীয়তা

সম্পত্তিশাস্ত্রীদের বক্তব্য হল সম্পত্তি উৎপত্তির জন্য অনেক লোকজনের কাছ থেকে কিছু-কিছু করে ধন একত্রিত করে আর সকলকে হানি-লাভের অংশীদার বানিয়ে ব্যবসা করলেই অমিত লাভ হতে পারে, কারণ এই রকম করলে একদিকে যেমন অনেক বড়ো ধনরাশি একত্রিত হয়ে যাবে, যার বল দ্বারা অনেক বড়ো বাণিজ্য করা যেতে পারে, তেমনই অন্যদিকে অন্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পিছনে ফেলে দেওয়ার জন্য যদি প্রথম-প্রথম কম-বেশি ক্ষতিও বৈতে হয় তাহলে কিছু-কিছু পরিমাণ হানি অনেক অংশীদারের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে, যারফলে কোম্পানির মধ্যে কোনো ধাক্কা লাগবে না, প্রত্যুত অন্য ব্যবসায়ীদের ধান্দা বন্ধ হয়ে যাবে আর শীঘ্র সেই সমস্ত লাভ কোম্পানি পাওয়া শুরু করবে, যার দ্বারা অনেক ব্যবসায়ী আর সেই ব্যবসার

অন্তর্গত যারা রয়েছে তারা টিকে থাকবে। এই ধরনের কুটিলনীতি দ্বারা প্রেরিত হয়ে কোম্পানির সংগঠন হয় আর নিজেদের রাজার বল তথা জাতীয়তার উত্তেজনায় প্রবল হয়ে আর মেশিনের দ্বারা শৃঙ্গারিক পদার্থকে বানিয়ে অন্য দেশের হাট-বাজারের সর্বস্ব অপহরণ করা হয়। কোম্পানির এই নীতির মধ্যে প্রধান বস্তুটি হল ধনরাশি; সম্পত্তিশাস্ত্রী এটাকেই পুঁজি (মূলধণ) বলে। তারা বলে যে বিনা পুঁজিতে সম্পত্তি উপার্জিত হবে না, কিন্তু এই পুঁজিবাদ যারমধ্যে ধনরাশির দ্বারা শৃঙ্গারিক পদার্থকে বানিয়ে অন্য দেশের ব্যবসা নষ্ট করে দেওয়ার বিষয়টা গর্ভিত হবে, যা নিতান্ত পতিত আর পাপমূলক। এখানে আমি ধনরাশি আর অন্যের ব্যবসাকে পিছনে ফেলে দেওয়ার নীতির আলোচনা করে দেখাবো যে সেটা কতটা অস্বাভাবিক।

আজকাল ধনের অর্থ সোনা আর রূপাকে মানা হয়। ব্যবসাতে লেনদেনের মাধ্যম হল এটাই। এর দ্বারাই পদার্থের মূল্য নিশ্চিত করা হয়, কিন্তু এই সোনা আর রূপা স্বয়ং কোন কাজে লাগে? -- মানবজীবনে ওষুধের অতিরিক্ত সেটা আর কোন কাজে লাভদায়ক সিদ্ধ হয়, এটা আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি। প্রথম তো সংসারের মধ্যে যত মূল্যের পদার্থ রয়েছে, অর্থাৎ এই সংসার যতটা মূল্যবান্, ততখানি মূল্যের সোনা-রূপা এই সংসারের মধ্যেই নেই, এইজন্য সোনা-রূপা সম্পত্তির মাধ্যম হতেই পারে না। সংসারের সম্পত্তির কথা ছেড়ে দিন, এখনই যত বড়ো-বড়ো লেনদেন হচ্ছে তারমধ্যেও যদি নোট, চেক আর বিলের ব্যবহার না হয়, কেবল সোনা-রূপা দিয়েই লেনদেন ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে একটা দিনও ব্যবসা চলবে না, এইজন্য সোনা-রূপাকে ধন মানা অথবা সেটা দিয়ে ধনের মূল্য নির্ধারিত করা সর্বদা বুদ্ধির বিরুদ্ধ হবে। তাছাড়া যে ব্যক্তি সোনা-রূপাকে মূল্যবানই মনে করে না, তার সঙ্গে তো পদার্থের লেনদেনই হবে না। গভীর জঙ্গলে বসবাসকারী নগ্ন ভীলদের কাছে যদি কেউ স্বর্ণের টুকরো দিয়ে ভোজনের জন্য বন্যপদার্থ চেয়ে বসে তাহলে তো তারা কখনও দিবেই না। জঙ্গলবাসীদের কথা ছেড়ে দিন, এই গত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় খাদ্যপদার্থ কমে যাওয়ার কারণে যখন সার্বিয়ার সৈনিকদের ভোজনের সময় স্বর্ণের মুদ্রা দেওয়া হয় তো তারা মুদ্রাকে ফেলে দিয়েছিল। এইভাবে স্বর্ণ না তো জংলী অসভ্যদের কোনো কাজের বস্তু আর না সেটা অন্নহীন নাগরিক সভ্যদের কোনো কাজের বস্তু। সেটা তো শৃঙ্গারপ্রিয় কামিদের বস্তু, তারাই তার মান করে, কিন্তু যারা কামি নয় তাদের কাছে হীরা, মোতি, সোনা, রূপা কিছুরই মূল্য থাকে না। একবার লব-কুশকে স্বর্ণ দেওয়া হয় তো তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে -

বন্যেন ফলমূলেন নিরতৌ বনচারিণৌ।
সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিম্ করিষ্যাবহে বনে॥

(বা০ রা০ উত্তর০ ৯৪|২১)

অর্থাৎ - আমরা তো বন্য ফল-ফুল দিয়েই নির্বাহ করি, আমরা এই স্বর্ণ নিয়ে কি করবো?

এর দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে যে সোনা-রূপা সম্পত্তির মাধ্যম হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এই কিছু সময় পূর্বে যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণের মধ্যে লব-কুশকের মতো পরিমার্জিত বুদ্ধির বিকাশ হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত সরল সাধারণ স্বভাবের জনগন তার মোহে ফেঁসে ছিল, কিন্তু যখন সংসারের মধ্যে সোনা অতিরিক্ত হয়ে যাবে (খনিজ থেকে আর রাসায়নিক প্রয়োগের দ্বারা যখন সোনার বৃদ্ধি হয়ে যাবে) তখন তাকে কেউ মাটির

সমানও মান করবে না।

আমি কানপুর থেকে প্রকাশিত ৮ ডিসেম্বর ১৯২১ এর "আদর্শ" পত্রিকাতে পড়ে ছিলাম যে "চোদ্দো বছরের অনুভবের পর একজন ফ্রান্সিসী রসায়নশাস্ত্রী পারদ থেকে সোনা বানিয়েছে। মি০ বাঁড নামক একজন ইংরেজও তার সঙ্গে রয়েছে। দুইজনে এই কৃত্রিম স্বর্ণকে অক্সফোর্ডের প্রসিদ্ধ রসায়নশাস্ত্রীর নিকট পরীক্ষার্থ পাঠিয়ে ছিল। সেখানকার রাসায়নিক অনুসন্ধান থেকে জ্ঞাত হয় যে এরমধ্যে একশ ভাগের নব্বই ভাগ সোনা রয়েছে আর শেষ দশ ভাগ রেডিয়াম তথা অন্য পদার্থ রয়েছে। এর উপর এক অর্থশাস্ত্রী বলেন যে - *এই আবিষ্কারের জন্য ভারত আর চিনকে বাদ দিয়ে বাকি সারা বিশ্বে আপত্তি (বিপদ) এসে যাবে, কারণ বাকি সারা বিশ্বে সোনা দিয়েই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়"*।

এই ঘটনা আর অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধিত এই বিচার থেকে স্পষ্টভাবে প্রকট হচ্ছে যে সোনা-রূপা বা টাকা-পয়সা অথবা হীরা-মোতি সম্পত্তির মাধ্যম হতে পারে না। সম্পত্তির মাধ্যম তো সম্পত্তিই হতে পারে, কারণ আমরা দেখতে পাই যে মানুষকে দুটি পরিস্থিতিতে সম্পত্তির মাধ্যমের আবশ্যকতা হয়। প্রথম তো গ্রামের ভিতর নিত্য প্রতি লেনদেনের সময়ে আর দ্বিতীয় হল আপত্তির সময়ে যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশের মধ্যে আবশ্যক পদার্থের ক্রয়-বিক্রয়ের আবশ্যকতা হয়। গ্রামে নিত্য পদার্থ বিনিময়ের মাধ্যম গ্রামের পদার্থই হয়ে থাকে, টাকা-পয়সা হয় না। গ্রাম্য জীবনের প্রকাণ্ড অর্থশাস্ত্রী প্রো০ রাধাকমল মুকরজী গ্রাম্য জীবনের প্রাচীন আবশ্যকতার সম্বন্ধে বলেছেন যে *"গ্রামের কাজ আজও প্রায় গ্রামের ভিতরেই হয়ে যায়। গ্রাম হল নিজেই নিজের আর্থিক সঙ্ঘ। গ্রামের কৃষক গ্রামবাসীদের সমস্ত আবশ্যক খাদ্য উৎপন্ন করে দেয় আর লোহার কৃষকের ফাল তথা গার্হস্থ্য কাজ করার জন্য লোহার অন্য সব পদার্থ তৈরি করে দেয়। সে এইসব বস্তু লোকেদের দেয় আর এর পরিবর্তে তাদের থেকে টাকা-পয়সা নেয় না কিন্তু সে এর পরিবর্তে নিজের গ্রামবাসীদের থেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ নেয়। কুমার তাকে ঘরা দেয়, তাঁতি দেয় কাপড়, তেলি তেল দিয়ে যায়। একইভাবে অন্য সব কারিগরও অন্য-অন্য আবশ্যক পদার্থ দিয়ে যায়। এইসব কারিগর কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্যের সেই ভাগটি পায় যা প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। এইভাবে গৃহকার্য নির্বাহ সম্বন্ধিত সমস্ত আবশ্যকতার পূর্তি টাকা-পয়সা ছাড়াই হয়ে যায় আর গ্রামবাসীকে লেনদেনের জন্য টাকা-পয়সার আবশ্যকতা হয় না"*।একথা একদম সত্য। এই ঘটনা থেকে আমরা এই পরিণাম বের করতে পারি যে, যখন এই ধরনের দেওয়া-নেওয়া গ্রামের মধ্যে হতে পারে তাহলে সেই ধরনেরই দেওয়া-নেওয়া দূরবর্তী দেশের সঙ্গেও হতে পারে, কিন্তু এটা তখনই হওয়া সম্ভব যখন দেওয়া-নেওয়ার উদ্দেশ্য জনগণের ধন হরণ করা নয়, প্রত্যুত প্রাণীদের কষ্ট দূর করা হবে। আর্য সভ্যতার মূল প্রচারক ভগবান্ মনু বৈশ্যকে (ব্যবসায়ীদের) ব্যবসার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে লিখেছেন যে -

ধর্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ য়ত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্বভূতানামন্নমেব প্রয়ত্নতঃ॥
(মনুসংহিতাঃ ৯|৩৩৩)

অর্থাৎ - বৈশ্য ধর্মানুসারে ধন (ভোজনাদি সামগ্রী) বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ থাকিবে এবং যত্ন সহকারে

সকল প্রাণীকে অন্নদান করবে।

বৈশ্যের উচিত যেসব মানুষ তুষারগ্রস্থ এলাকাতে পরে রয়েছে তাদের গোমেধ যজ্ঞের দ্বারা নতুন-নতুন দ্বীপ অনুর্বর ভূমিকে উর্বরা বানিয়ে বাস করাবে আর যদি কোথাও কোনো পদার্থের আবশ্যকতা হয় তাহলে সেখানে পদার্থ পৌঁছে দিবে। এই কাজের জন্য অর্থাৎ যান আর বোঝা উঠানোর জন্য পশু আর নৌকো তথা জাহাজের আবশ্যকতা হয়। নৌকোর আবশ্যকতা কখনও সখনও হতে পারে তবে পশু তো নিত্যই কাজে আসবে। এইজন্য আর্যব্যবসার মধ্যে পশুরক্ষাকে বিশেষ মহত্ব বলা হয়েছে। বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

এতা ধিয়ম্ কৃণবামা সখায়োऽপ য়া মাতাঁ ঋণুত ব্রজম্ গোঃ।
য়য়া মনুর্বিশিশিপ্রম্ জিগায় য়য়া বণিগ্বঙ্কুরাপা পুরীষম্॥

(ঋঃ ৫|৪৫|৬)

অর্থাৎ - হে মিত্র! আসুন গ্রামের মধ্যে বড়ো-বড়ো গোষ্ঠ নির্মাণের উদ্দম করি। এই উদ্দম হল মাতা সমান। এর দ্বারাই মানুষ পশুদের জিততে পারবে আর এর দ্বারাই উত্কণ্ঠাবান্ বণিক প্রত্যেক প্রকারের রসকে প্রাপ্ত করে।

এই মন্ত্রের মধ্যে গ্রামের বড়ো-বড়ো গোষ্ঠ তৈরি করাকেই উদ্দম বলা হয়েছে। গৌ-গোষ্ঠের মধ্যে বড়ো-বড়ো বৃষ উৎপন্ন হয় যারা লক্ষ-লক্ষ মণ অন্ন-বস্ত্র এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছে দিতে পারে। এই ধরনের পবিত্র উদ্দেশ্য দ্বারা প্রেরিত হয়ে কেবল প্রাণীদের অন্ন পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেসব ব্যবসা করা হয়, তারমধ্যেও সোনা-রূপার তৈরি মুদ্রার আবশ্যকতা হয় না। বাণিজ্যের মধ্যে সোনা-রূপার পচড়া লাগিয়ে দিলে তো সেইসব দেশ অন্নই পাবে না যাদের কাছে সোনা-রূপা নেই। এই সিদ্ধান্তানুসারে তো যদি আরবদের কাছে সোনা না থাকে তাহলে ইরানীরা তাদের অন্নই দিবে না, সমস্ত আরবস্থান খিদাতে মরে গেলেও দিবে না, তবে যে ব্যবসায়ী আরবদের প্রাণরক্ষার জন্য সেখানে অন্ন পাঠিয়ে দিবে সে যেন এমন শর্ত না করে বসে যে আমাদের সোনা দিন তবেই অন্ন দিবো, প্রত্যুত সে তো যদি সেখানে সুতো, উল অথবা গৃহ নির্মাণের কাঠই যদি পায় তাহলে ফেরার পথে সেটাই নিয়ে আসবে আর তারমধ্যেই বিনিময় বুঝে নিবে। যদি এটাও না পাওয়া যায় তাহলে নিজের মাল পরের বছরের জন্য খেজুরের উৎপাদনের মধ্যে তাদের কৃষককে দিয়ে আসবে, এইজন্য দূরবর্তী দেশের বাণিজ্যের মধ্যেও সোনা-রূপা মুদ্রার আবশ্যকতা প্রতিত হচ্ছে না।
এখন বাকি রইলো বর্তমান সম্পত্তিশাস্ত্রীদের নির্মিত করা পদার্থের। এইসব লোকেরা এমন কোনো পদার্থ তৈরি করে না যা মানুষের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। এরা খাদ্য পদার্থ তৈরি করে পাঠায় না। তবে হ্যাঁ, কাপড় পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু সেই কাপড় ভদ্র ব্যক্তিদের পরার যোগ্য হয় না। তারমধ্যে শৃঙ্গার, বিলাস আর ব্যভিচারের দুর্গন্ধ বের হয়, এইজন্য সেটা ততোটাই ত্যাগের যোগ্য যতোটা এক কুলবধূর জন্য বেশ্যার সঙ্গে মৈত্রীর ত্যাগ আবশ্যক। এই দুই পদার্থ ছাড়া মানুষকে বাঁচার জন্য সংসারের মধ্যে আর কোন বস্তুর অবশ্যকতা রয়েছে? এইজন্য এদের তৈরি করা পদার্থকে অর্থ বলা যেতে পারে না।সেটা তো অনর্থ আর কাম বৃদ্ধিকারক, অন্য দেশের ধন শোষণকারী আর প্রাণীমাত্রকে জীবিতই দাহকারী, তাই মহারাজ মনু এরকম

শিল্পীদের উপর রাজাকে কড়া নজর রাখার আজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন -

অসম্যক্কারিণশ্চৈব মহামাত্রাশ্চিকিত্সকাঃ।
শিল্পোপচারযুক্তাশ্চ নিপুণাঃ পণ্যয়োষিতঃ।।
এবমাদীন্বিজানীয়াত্প্রকাশাম্লোককন্টকান্।
নিগূঢচারিণশ্চান্যাননার্য়ানার্য়ালিঙ্গিনঃ।।

(মনুঃ ৯|২৫৯, ২৬০)

অর্থাৎ - মন্দ কর্মকারী, উচ্চ কর্মচারী, বৈদ্য, মারন-মোহনকারী ঠগ, শিল্পী, বেশ্যাদির মধ্যে থাকা আর আর্যরূপ ধারণ করা অনার্যদের উপর রাজা দৃষ্টি রাখবে।

এখানে শিল্পীদের কিরকম ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে ধরা হয়েছে আর চোরের মতো তাদের উপর নজরদারি করার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হল এটাই যে, শৃঙ্গার বৃদ্ধকারক বিলাসী পদার্থ যেন নির্মিত না হয়। বলার তাৎপর্য হল, পুঁজির সঙ্গে সম্বন্ধিত কোম্পানির মুদ্রা আর শিল্পী সম্বন্ধিত নীতি হচ্ছে নিতান্ত অশুদ্ধ।

সম্পত্তির উৎপন্নকারী এই প্রধান সাধন - কোম্পানির জন্য রাজ্যবলেরও আবশ্যকতা থাকে। রাজ্যবল দ্বারা দুটি লাভ হয়, প্রথমত কোম্পানিকে অন্য দেশের মধ্যে বস্তু ক্রয় আর বিক্রয়ে নিজের রাজার সৈনিক থাকার কারণে কোনো ধরনের বাধা আসে না আর দ্বিতীয়ত নিজের রাজার সহায়তায় যান্ত্রিক কলা আর বিজ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হয়, যার দ্বারা শৃঙ্গার আর বিলাস বৃদ্ধকারক পদার্থ সস্তা আর শীঘ্র তৈরি হয় তথা যুদ্ধকে সফল বানানোর জন্য নানা প্রকারের যন্ত্র, গ্যাস আর যানও তৈরি হয় যার দ্বারা অন্য দেশকে ভয় দেখানো হয়। এটাই হল আজকালকার শাসনের প্রধান ধ্যেয়। একেই আজকালকার অর্থশাস্ত্র, রাজনৈতিক সম্পত্তিশাস্ত্র অর্থাৎ পলিটিকাল ইকোনমি বলে। এই রাজনৈতিক সম্পত্তিশাস্ত্রের দ্বারা মানুষের জীবনকে শৃঙ্গার আর বিলাসময় করে তোলা হয় আর কামুকতার প্রচার খুব পরিমাণে করা হয়। যেদিকে তাকাবেন, সেখানেই নানা প্রকারের মদের দোকান, চা, গাঁজা, আফিম আর চণ্ডুর দোকান, সিগারেট আর তামাকের দোকান, বেশ্যাদের দোকান, জুয়া (লটারি) দোকান আর কামোদ্দীপক তথা ব্যভিচারকে বাড়িয়ে দেয় এরকম বস্ত্র, যন্ত্র আর ঔষধির দোকান সবার চোখের সামনে লাগানো রয়েছে। সবার সামনে জীবিত প্রাণীর ডিম আর মাংস প্রচণ্ড বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু নিষেধ করার কেউই নেই। এটা তো প্রতিদিন দেখতে পাওয়া যায় যে সরল আর সমতার প্রচারকদের জেলে বন্দী করা হচ্ছে, কিন্তু এটা দেখতে পাওয়া যায় না যে যেই বেশ্যারা নিজের বিষ দিয়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে পচিয়ে ফেলে দিয়েছে অথবা যেসব দুরাচারী পুরুষ লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ গৃহদেবীদের সেই বিষের মধ্যেই পচিয়েছে, তাদের উপরে একটা টাকাও কি জরিমানা হয়েছে? এরকম অবস্থা কেবল কোনো একটি দেশ বা জাতির নয় প্রত্যুত সম্পূর্ণ পৃথিবীর শাসনপ্রণালী আজকাল প্রায়শঃ এরকমই ঢঙের হয়েছে। এর কারণ হল এটাই যে আজকাল শাসন আর বাণিজ্যের উদ্দেশ্য উত্তম মানুষের নির্মাণ আর তাদের ক্ষুধার্ত থেকে বাঁচিয়ে তোলা নয়, বরং সবাইকে বিলাসী বানিয়ে সংসারের সব স্বর্ণ নিজের কাছে জমা করা আর অন্যদের দাস বানিয়ে রাখাই হল এর উদ্দেশ্য, এইজন্য এই সম্পত্তি না তো শুভ

কামনাকারী হবে আর না এই ধরনের রাজ্যপ্রণালী উত্তম হবে। এরকম রাজ্যপ্রণালীর থেকে তো সেই প্রজা লক্ষগুণ ভালো যারা বিনা রাজাতেই বাস করছে। সমুদ্রের অনেক দ্বীপের মধ্যে যেখানে বিনা রাজাতে মানুষ বাস করছে, তারা জংলী অবস্থার মধ্যেও সুখের ঘুম ঘুমোয়। তাদের এই ভয় নেই যে, সকাল হতেই আমাদের কামানের সম্মুখে লড়াই করতে হবে অথবা কাল আমাদের শহরকে উড়িয়ে দেওয়া হবে - বম্বার্ডমেন্ট করা হবে। তাদের এটাও চিন্তা নেই যে যতক্ষণ পর্যন্ত না মিল (কারখানা) খোলা হবে আর ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবন ব্যর্থ। তাদের কোনো দেশের উত্তম অবস্থার উপর ঈর্ষা আর দ্বেষ নেই। তারা মানুষের মতো প্রাণীদের নাশ করার উপায়ও চিন্তা করে না। এইজন্য যেসব রাজ্যে শান্তি নেই, সুখ নেই, মানুষের প্রতি দয়া নেই, পরস্পর প্রেম নেই আর সহানুভূতি নেই সেই রাজ্যের থেকে তো কোনো মরুভূমির ময়দানে বালু খেয়ে থাকা অনেক ভালো। পৃথিবীর মধ্যে এখনও কয়েকশ এরকম স্থান রয়েছে যেখানকার লোকজন রাজার নাম পর্যন্ত জানে না, তাহলে কি সেখানকার লোকজন পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত বাঁচে না? অবশ্যই বাঁচে। রাজ্যহীন যত জংলী মানুষ রয়েছে তারা যেখানকার রাজ্যশাসন প্রচলিত রয়েছে সেখানকার প্রজাদের থেকে অধিক দীর্ঘায়ু, বলবান্ আর প্রসন্নচিত্ত হয়।

এরকম প্রচলিত রাজ্যশাসন প্রণালীর মধ্যে অর্ধেক আয়ু বাঁচবে এমন নাগরিক হাসপাতালের ওষুধই খেয়ে-খেয়ে অর্ধেক আয়ু বাঁচা ছাড়া আর কি করবে? আর বড়ো- বড়ো মহলের মধ্যে গদির পালঙ্কে করাহ-করাহ করে অর্ধেক ঘুম ঘুমানো ছাড়া আর কি করতে পারে? এইজন্য আমি বলবো, রাজ্যশাসন প্রণালী সেটাই ঠিক হবে যার উদ্দেশ্য মানবজীবনকে শান্তি দেওয়ার হবে, তবে উপরিউক্ত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের কারণে রাজ্যের মধ্যে একজন ব্যক্তিও শান্তিতে একটি দিনও বসে থাকতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য রাজ্য থেকে বাঁচার জন্য অথবা তাদের সঙ্গে বাজী মারার জন্য ব্যগ্র থাকে। একজন বিজ্ঞানবেত্তা থেকে সাধারণ কুলী পর্যন্ত এই ব্যথার জন্য পীড়িত থাকে আর এই কারণেই সংসারের কোথাও না কোথাও যুদ্ধের আগুন জ্বলতে থাকে, অতঃ এই ধরনের শাসনপ্রণালী দ্বারা সংসারের মধ্যে সুখ শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যেখানে বৈর-বিরোধ রয়েছে সেখানে শান্তি কি করে হতে পারে? সেখানের মানুষ সুখের ঘুম কিভাবে ঘুমাতে পারে, যারা অনেক শত্রু বানিয়ে রেখেছে? এইজন্য এই শাসনপ্রণালীকে ছেড়ে দিয়ে দেখা উচিত যে বৈদিক শাসনপ্রণালীর অনুসারে রাজার আবশ্যকতা কি রয়েছে?

সংসারের মধ্যে দুই ধরনের মানুষ হয়ে থাকে, বিদ্বান আর মূর্খ। বিদ্বানদের জন্য রাজ্যশাসনের আবশ্যকতা হয় না, কারণ বিদ্বান কখনও শারীরিক শাসন দ্বারা (দণ্ড দ্বারা) আয়ত্তে আসে না। তারা নিজেদের জ্ঞানচাতুর্য দ্বারা রাজার শক্ত ব্যবস্থাকে ঢিলে করে দেয়, এইজন্য রাজ্যশাসন হল সেই মূর্খ আর উদ্দণ্ড মানুষদের জন্য যারা অত্যাচারী হয় আর যাদের পাপ কর্মকে সবাই দেখতে পারে। তাদের দমন করার আবশ্যকতাও রয়েছে আর তাদের দমনও হতে পারে, কিন্তু যারা বিদ্বান আর নিজের বুদ্ধিকৌশল দ্বারা পাপ কর্ম করে চলেছে, তাদের দমন রাজা করতে পারে না, এইজন্য রাজার আবশ্যকতা কেবল উদ্দণ্ড, মূর্খ আর অত্যাচারী, রাক্ষসদের উপরেই শাসন করার জন্য, এইজন্য মনুস্মৃতির মধ্যে বলা হয়েছে যে -

য়স্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।

ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্।।

(মনুঃ ৮|৩৮৬)

অর্থাৎ - যে রাজার রাজ্যে চোর নেই, পরস্ত্রী-গামী নেই, দুষ্ট বাণী বলার বক্তা নেই, অত্যাচারী আর দণ্ড প্রহার করা আঘাতকারী নেই, সেই রাজা স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের সমান সুখী আর সর্বশ্রেষ্ঠ।

আর্যরাজ্যের এটা কাল্পনিক আদর্শ নয়, প্রত্যুত রাজা অশ্বপতি বলেছেন -

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য়ো ন মদ্যপো
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ।।

(ছান্দোগ্য উপনিষদঃ ১১|৫)

অর্থাৎ - আমার রাজ্যে চোর নেই, কৃপণ নেই, মদ্যপান কেউ করে না, অগ্নিহোত্র করে না এমন কেউ নেই, মূর্খ নেই, ব্যভিচারী আর ব্যভিচারিণী নেই।

যথার্থ শাসনের আদর্শই হল এই রকম। এই ধরনের শাসন দ্বারাই দুষ্ট মানুষের দমন হয়। শৃঙ্গারপ্রিয় আর বিলাসী মানুষই বেশি মদ্যপান আর ব্যভিচারী হয়। এটাই হল কারণ যে, আর্যশাসন বিলাস আর কামুকতার মূল নেশা আর ব্যভিচারকেই বলেছে। কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাই যে, রাজনৈতিক সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য রাজ্যশাসনের ক্ষমতা দিয়ে মদ আর বেশ্যা বৃদ্ধিকারক শৃঙ্গারিক পদার্থের প্রচার করা হচ্ছে, এইজন্য সম্পত্তি উৎপন্নকারী এই রাজ্যবলরূপী সাধনও মানব স্বভাবেরই বিরুদ্ধ। এটা মানব জাতির সুখদাতা নয়, প্রত্যুত তাদের কামী বানিয়ে অকালমৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়া।

এখন বাকি রইলো সম্পত্তি বাড়াতে সহায়তা দেওয়ার তৃতীয় বস্তু জাতীয়তা। জাতীয়তাকে ইংরেজিতে ন্যাশনালিটি বলে। এটা লোকেদের যুদ্ধে মরতে আর অন্যকে মারার জন্য তৈরি করে। যদি এটা না হয় তাহলে কোনো মানুষকে যুদ্ধে মরার জন্য তৈরি করাই যাবে না। জাতীয়তার ভাব দ্বারা প্রেরিত হয়েই এক প্রজা অন্য প্রজার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়ে যায় আর যেসব যুদ্ধ এই ধরনের ভাবনাযুক্ত প্রজার দ্বারা হয় সেইসব যুদ্ধের মধ্যে প্রায়শঃ বিজয় হয়, এইজন্য রাজনৈতিক বাণিজ্যের মধ্যে যুদ্ধের জন্য সহায়ক এই জাতীয়তার আবশ্যকতা হয়, তবে এই জাতীয়তাও মানব স্বভাব আর সৃষ্টিনিয়মের বিরুদ্ধেই হয়, কারণ সমস্ত সংসারের মানুষ হল একই বংশের আর একই জাতির, এইজন্য এই একটি জাতিকে কল্পনাভেদ করে অনেক জাতিতে বিভক্ত করে কলহ উৎপন্ন করাটা মোটেও উচিত নয়।

জাতীয়তাবাদীরা বলে যে, যার এক ধর্ম, এক ভাষা, এক রঙ-রূপ আর একটাই রাজা হবে, সেটাই হল জাতি, কিন্তু এটা ঠিক নয়। এই লক্ষণের মধ্যে দোষ রয়েছে। আমরা দেখি যে রুসের মধ্যে অনেক ধর্ম, অনেক ভাষা আর অনেক রঙ-রূপের ব্যক্তি রয়েছে, কিন্তু তারা সব একটাই জাতির মধ্যে সংগঠিত। একই ভাবে অন্য জাতির মধ্যেও অনেক প্রকারের বিষম ভেদ বিদ্যমান রয়েছে, এইজন্য জাতির এই লক্ষণটি মোটেও ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, জাতির একটি লক্ষণ ঠিক প্রতিত হয় যদি সমান স্বত্ব প্রাপ্ত এক শাসনের মধ্যে আবদ্ধ জনতা হয় তাহলে একটি জাতি, কিন্তু এই লক্ষণটিও দোষপূর্ণ। ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ আর ঈসাই সবাই সমান স্বত্ব প্রাপ্ত এক শাসনের মধ্যে আবদ্ধ, তবে এতকিছু হওয়ার পরেও

ইংল্যান্ডের শাসকই বলে যে ভারতবর্ষের মধ্যে এক জাতি অথবা একটাই জাতীয়তা - ন্যাশনালিটি নেই। বলার তাৎপর্য হল জাতির সঙ্গে সম্বন্ধিত যতগুলো লক্ষণ করা হয়েছে সেসব হল কৃত্রিম আর গোলমেলে। জাতির সবথেকে উত্তম লক্ষণ তো **"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ"**, যার তাৎপর্যই হল সমান প্রসব অর্থাৎ যেই নর আর নারী দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয় সেটাই হল জাতি। সংসারের সমস্ত নর-নারী পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করতে পারে, অতএব সংসারের সমস্ত মানুষের জাতি হল একটাই, অতঃ এটা সৃষ্টিনিয়ম আর প্রত্যক্ষ লক্ষণ হওয়ার পরেও এক জাতির মধ্যে অনেক জাতির কল্পনা করে পরস্পরের রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন করে সংসারকে অশান্ত করাটা উচিত নয়।

বড়ো-বড়ো বিচারশীল বিদ্বানদের বিশ্বাস হল - জাতীয়তাই হল সংসারের অশান্তির কারণ। এই জাতীয়তার কারণেই অন্য জাতির মানুষকে মাটি আর বালুর সমান ভাবা হচ্ছে আর এই জাতীয়তারই জন্য খণ্ড রাজ্যের মূল জমে রয়েছে। যদি সংসারের মধ্যে জাতীয়তার ঝগড়া থেমে যায় তাহলে খণ্ড রাজ্যের ক্রম এক নিমেষে মুছে যাবে আর আর্যসভ্যতার আদর্শরাজ্য - চক্রবর্তী সার্বভৌম রাজ্য স্থাপিত হবে আর স্বজাতি - অভিমান আর পরজাতি - অপমানের বীজ সংসার থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, কারণ যারমধ্যে স্বজাতি অভিমান থাকে তারমধ্যে বিজাতি অপমানের অঙ্কুর স্বভাবতঃ থাকেই আর বিজাতি - অপমানের মধ্যে স্বজাতিপক্ষপাত হওয়াটা স্বাভাবিকই। এটাই হল রাগ আর দ্বেষের মূল, এটাই হল স্পর্ধা - কম্পিটিশনের জননী, এটাই যন্ত্রের উত্তেজক আর এটাই ভয়ংকর যুদ্ধের আগুন লাগিয়ে দেওয়ার বস্তু, এইজন্য যত দূর সম্ভব জাতীয়তা শীঘ্র নাশ হওয়া উচিত।

আর্য সভ্যতার মধ্যে না জানি কবে থেকে **"উদার চরিতানাম্ তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"** এর পাঠ পড়ানো হয় আর বলা হয় যে, উদার মানুষের নিকট তো সমস্ত সংসার হল একটি কুটুম্বের সমান। এটাই হল কারণ যে, প্রাচীন সময়ের আর্যদের মধ্যে এই ধরনের জাতীয়তা ছিল না। তারা ভালো আর খারাপ এই দুটোকেই জাতি মানতো, যাকে আর্য আর দস্যু বলা হতো। ভালোদের নাম আর্য আর খারাপদের নাম দস্যু ছিল, কিন্তু খারাপ যে সর্বদা খারাপই থাকবে এমনটা নয়, সময় পেলে শিক্ষার দ্বারা তারাও আর্য হয়ে যেত আর অশিক্ষিত তথা অসংস্কারী থাকার ফলে আর্যও দস্যু হয়ে যেত।

আজকালকের জাতির মতো কখনও এই ধরনের পৃথক - পৃথক সংগঠন হতো না, কারণ আর্যরা এই জাতীয়তার মন্দটাকে জানতো। তারা মনে করতো জাতীয়তা মানুষের মধ্যে সবার আগে অন্যায় উৎপন্ন করায়। সেটা নিজেদের জাতির অনুচিত পক্ষপাত করায় আর বিজাতির উপর অনুচিত অত্যাচার করার জন্য তৈরি করে দেয়। এর থেকে অভিমানের সৃষ্টি হয় আর অপরকে অপমান করার জন্য প্রেরণা দেয়, এইজন্য এটা সর্বদা ত্যাগেরই যোগ্য। এটা ত্যাগের সবথেকে উত্তম উপায় হল সমস্ত মানুষ একটাই রাজ্যশাসনের প্রজা হয়ে যাক। যদিও সরল আর সমান জীবন দ্বারাও পরস্পরের দ্বেষভাব ছুটে যায়, বিবাহ - সম্বন্ধও পরস্পরের দ্বেষকে নষ্ট করে দেয়, এক ভাষা আর এক ধর্মও এটাকে সরিয়ে দিতে সহায়ক হয় আর এই ধরনের প্রায় সমস্ত ঐক্যতার প্রচার করেও সমস্ত অনৈক্য দূর হতে পারে তথাপি সমস্ত মানবজাতিকে এক রাজার প্রজা হয়ে যাওয়াটা সমস্ত একতার মূল হবে। এটা স্বীকার করলেই উপরিউক্ত সমস্ত ঐক্যতা আপনা-

আপনি উৎপন্ন হয়ে যাবে, এইজন্য বেদের মধ্যে চক্রবর্তী রাজ্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। কেবল জগতের মধ্যে শান্তি স্থাপিত করার জন্যই সেই প্রার্থনা করা হয়েছে, কারণ মানবসমাজ কখনও শান্তিতে থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা একটাই রাজার প্রজা না হচ্ছে।

যেখানে দেশভেদ, কূলভেদ, ধর্ম, ভাষা আর রঙের ভেদ রয়েছে সেখানে কখনও শান্তি হবে না, কিন্তু সার্বভৌম এক রাজ্যের স্থাপনা দ্বারাই সমস্ত বিরোধ দূর হয়ে যায়। প্রাচীনকালে যতদিন পর্যন্ত আর্যরাজা পৃথিবীর মধ্যে সার্বভৌম রাজ্য করেছিল ততদিন পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ছিল আর সমস্ত মানুষ একে-অপরকে মিত্র মনে করতো, কিন্তু আর্যরাজ্যের নাশ হতেই সমস্ত মানবজাতি কলহ-পীড়িত হয়ে যায়, এইজন্য বেদের মধ্যে সার্বভৌম রাজ্য দ্বারাই সুখ বলা হয়েছে। যজুর্বেদ ৫|২৪ এরমধ্যে লেখা রয়েছে -

স্বরাডসি সপত্নহা সত্ররাডস্যভিমাতিহা।
জনরাডসি রক্ষোহা সর্বরাডস্যমিত্রহা।।

অর্থাৎ - শত্রুর নাশক হল স্বরাজ্য, দুঃখের নাশক হল স্বরাজ্য, জনরাজ্য হল রাজার নাশক আর সর্বরাজ্য হল শত্রুর নাশক। এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে সর্বরাজ্য দ্বারা অমিত্র (শত্রু) উৎপন্ন হয় না। কোনো অমিত্রই যখন কোথাও নেই - সবাই মিত্র আর মিত্র হবে তখন দুঃখের কোনো স্থানই থাকবে না। এইজন্য খণ্ডরাজ্যের ঘৃণিত জাতীয়তা থেকে উৎপন্ন হওয়া রাজনৈতিক সম্পত্তিশাস্ত্র হল নিতান্ত অশুদ্ধ।

এই পর্যন্ত আমরা বর্তমান রাজনৈতিক সম্পত্তিশাস্ত্রের সমস্ত বিভাগ আর উপবিভাগের আলোচনা করে দেখলাম। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট সূচিত হচ্ছে যে এটা সম্পত্তিশাস্ত্র নয় বরং এটা হল কামশাস্ত্র আর অর্থশাস্ত্র নয় তবে এটা অনর্থশাস্ত্র। অর্থ আর সম্পত্তির প্রধান বিষয় তো ভোজন, বস্ত্র, গৃহ আর গৃহস্থীই হওয়া উচিত, যার সম্বন্ধ হল কেবল শরীর-রক্ষা, কিন্তু এই রাজনৈতিক সম্পত্তিশাস্ত্রের উদ্দ্যেশ্য হল কাম্য পদার্থের প্রচার করা, যা দিয়ে মানুষের শক্তি দূষিত হয় আর মানুষ সবদিক দিয়ে পতিত হয়ে যায়, এইজন্য অর্থশাস্ত্র বলার পাত্র নয় এই কামশাস্ত্র।

আজ সংসারের মধ্যে কাম্য পদার্থের বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের মন সম্পূর্ণ নির্বল হয়ে গেছে আর গরীব না হয়েও তারা নিজেকে গরীব মনে করছে। তাদের ঘরে অন্ন রয়েছে, পান করার দুধ রয়েছে, পরার জন্য সাধারণ ধুতি রয়েছে আর বাস করার জন্য ঘর পর্যন্ত রয়েছে, কিন্তু সোডাওয়াটার, সিগারেট, চা আর মদের অভাবের কারণে তারা নিজেকে গরীব মনে করছে। শার্ট-প্যান্ট-বুট আর কাশ্মীরি শাল নেই বলে তারা নিজেকে গরীব মনে করছে। আলমারি নেই, কাঁচের গিলাস নেই আর ল্যাম্প নেই তথা অন্য এরকমই ব্যর্থ বস্তু নেই বলে তারা নিজেকে গরীব মনে করছে।এরকম অবস্থাতে এটা আর না বলে থাকা যাচ্ছে না যে অর্থের নামে অনর্থ, অর্থাৎ কাম্য পদার্থকে সামনে নিয়ে এসে সরল-সাধারণ ভদ্র মানুষকে গরীব আর কাঙ্গালির কাল্পনিক আর মিথ্যা সন্তাপের শিকার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেদিকে তাকাবেন সেই লোকই শোভা, শৃঙ্গার আর বিলাস বৃদ্ধিকারক পদার্থ কিনতে নিজের কষ্টের কামাই নষ্ট করে চলেছে আর তারপরও নিজেকে গরীবই মনে করছে, অতঃ এই পাপ - পারম্পরিকতার সবথেকে বড়ো দোষী হল তারা যারা এইসব কিনে ব্যবহারে লাগায় আর অন্য লোকেদের লালচায় তথা তাদেরও এই বিষ কেনার জন্য প্রেরিত করে।

এইভাবে এইসবের মধ্যে সবথেকে বড়ো অপরাধী প্রতিবেশীই দাঁড়াচ্ছে যারা অন্য প্রতিবেশীর উপর এই বিষের প্রভাব ঢেলে দেয়।

এইজন্য বলতে হবে যে মানুষের চিন্তার অধিকাংশ ভাগই হল কাল্পনিক। তারা নিজেদের মিথ্যা কল্পনা আর মূর্খতার দ্বারাই দুঃখী হয়। আমাদের কাছে প্রতিবেশীর মতো ঘর নেই, তার মতো আভূষণ আর বস্ত্র নেই, তার মতো গাড়ি নেই, চাকর নেই আর তার মতো আমার সাজ-সজ্জার বস্তু নেই আদি, এই ধরনের কল্পনাপূর্ণ অসমানতার জন্য, বৃদ্ধি হওয়া রুচির মিথ্যা স্বপ্নের জন্য মানুষ রাতদিন চিন্তিত আর দুঃখী হচ্ছে। একজন মানুষ তা সে যতই ধন প্রাপ্ত করুক, কিন্তু সে নিজের থেকে বড়ো প্রতিবেশীর আদর্শ সামনে নিয়ে এসে আর তার সঙ্গে বাজী মারার তালে নিজের সব আয় শোভা - শৃঙ্গারেই খরচা করে দেয় আর তারপরেও সে নিজেকে গরীবই মনে করতে থাকে।এটাই হল কাল্পনিক দুঃখ।

এই কাল্পনিক দুঃখের অতিরিক্ত আরও একটি দুঃখ রয়েছে সেটা হল সংস্কারের দুঃখ, সেটা এর থেকেও অধিক ভয়ংকর। কাল ছেলের মুণ্ডন হবে, যজ্ঞোপবীত হবে, বিবাহ হবে অথবা শ্রাদ্ধ করতে হবে বা গয়াতে যেতে হবে আর জগন্নাথ আদির ব্রহ্মভোজ করতে হবে আর এতেও প্রতিবেশীর আগে দৌড় লাগাতে হবে। এটা হল সংস্কারের দুঃখ যা কাল্পনিক দুঃখের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মানুষকে জীবিত অবস্থাতেই জ্বালিয়ে দেয়। কাল্পনিক আর সংস্কারের দুঃখের অতিরিক্ত আরও একটি দুঃখ রয়েছে সেটা হল স্বভাবগত দুঃখ যা এই দুইয়ের থেকেও অধিক দুঃখদায়ী। প্রতিদিন হালুয়া আর মালাই খাওয়ার স্বভাব, আফিং খাওয়ার স্বভাব, যদি রাতে একটু মদ পান না করা হয় তাহলে সকালে পেটই পরিষ্কার হয় না, গান না শুনলে, মেলা-ঠেলা না দেখলে আর থিয়েটার সিনেমায় না গেলে মনই মানে না বা ভালোই লাগে না, এটা হল স্বভাবগত দুঃখ। এইভাবে এইসব দুঃখ খারাপ সঙ্গ আর দেখে-দেখানোর থেকে উৎপন্ন হয়। এই দেখা আর দেখানোর জন্যই ব্যর্থ খরচেই অসংখ্য পরিমাণ ধন নষ্ট হয়, মনের পতন হয় আর ধনের চিন্তা, মনের নিম্নতা আর শরীর নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ তথা মানবসমাজের নাশ হয় - তার লোক-পরলোক ভঙ্গ হয়ে যায়। এইজন্য যতদূর সম্ভব এই অনর্থকারী আর শৃঙ্গারময়ী কাম্য সামগ্রীকে কখনও চোখ দিয়ে দেখাও উচিত নয়, কারণ এই কামুকতা আর শৃঙ্গারপ্রিয়তা সাজ-সজ্জা, শোভা-শৃঙ্গার আর ঠাট-বাটের কাল্পনিক আডম্বরের দ্বারা মানুষের মধ্যে অসমানতা আর ঈর্ষা-দ্বেষ উৎপন্ন করে দিয়েছে, কামজাত যন্ত্র পশুদের বেকার বানিয়ে তাদের কসাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে আর শৃঙ্গারোৎপাদক - তুলো, পাট, চা আর তামাক আদির ক্ষেতী জঙ্গলের নাশ করে দিয়েছে আর সোজা, বেঁকা তথা উল্টো সৃষ্টির তিনটি বিভাগের মধ্যেই ভয়ংকর ক্ষোভ উৎপন্ন করে দিয়েছে।

সোজা শরীরধারী মানুষদের নিম্নশ্রেণী অনারকিজম উৎপন্ন করে দিয়েছে আর চতুর্দিকে সাম্যবাদজাত যুদ্ধের ভীষণ হুংকার শোনা যাচ্ছে। একইভাবে বেঁকা শরীরধারী পশুদের নিম্নশ্রেণী - কৃমিরাও অনারকিজম উৎপন্ন করে দিয়েছে আর কলেরা, প্লেগ, ইনফ্লুএঞ্জা তথা লক্ষাধিক রোগের জের্মস্ হয়ে বিলাসী আর নাগরিক মানুষদের সংহার আরম্ভ করে দিয়েছে, আর ঠিক সেইভাবেই বৃক্ষও ভয়ংকর অনারকিজম আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি প্রতিদিন সমাচার পত্রের মধ্যে দেখতে পাই যে জঙ্গলের মধ্যে মানুষ আর পশুদের ধরে-

ধরে খেয়ে ফেলার মতো বৃক্ষের বৃদ্ধি হচ্ছে। অতএব স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে যদি মানুষ শীঘ্রই বিলাসময় জীবনের পরিত্যাগ করে সরল, তপস্বী আর ব্রহ্মচারী জীবন বানানো আরম্ভ না করে দেয় তাহলে সেদিন দূর নেই যখন সমস্ত কামি জনসমাজ সাধারণ লোক আর সাধারণ কৃমির দ্বারা নষ্ট হয়ে যাবে, সর্বভক্ষী বৃক্ষের দ্বারা জঙ্গলের মধ্যে কেউই জীবিত থাকবে না আরও একবার এই বর্তমান উপদ্রবী সৃষ্টির সংহার হয়ে যাবে। এইজন্য সকল মানুষের উচিত যে তারা যেন কাম্য পদার্থের মোহ ছেড়ে দিয়ে সরল-সাধারণ আর্যজীবনের দ্বারা অর্থ, কাম আর মোক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য উৎপন্নকারী বৈদিক ধর্মকে স্বীকার করে নেয় আর আর্য সভ্যতার অনুসারে ব্যবহার করে, যার দ্বারা সংসারের প্রাণীমাত্রের কল্যাণ হবে আর সমস্ত দুঃখের নাশ হয়ে যাবে।

ধর্মের প্রাধান্য

ধর্ম হল বুদ্ধি অর্থাৎ বিদ্যা আর জ্ঞানের বিষয়, এইজন্য আর্য সভ্যতার চার মহান স্তম্ভের মধ্যে তার স্থান অনেক উচুঁতে। যেভাবে মোক্ষ সংযত অর্থের অধীন হয় আর সংযত অর্থ কামের অধীন হয় সেই ভাবে কামকে সংযত করে তাকে অর্থ আর মোক্ষের অনুকূল বানানো ধর্মেরই অধীন হয়। ধর্মই হল এরকম যে নিরঙ্কুশ কামকে সংযত করে মোক্ষ আর অর্থ-কামের মাঝে সামঞ্জস্য উৎপন্ন করাতে পারে আর ধর্মই হল এরকম যে ভালো করে বলে দেয় যে ধর্মপূর্বক অর্থ আর কামের উপয়োগ দ্বারাই মোক্ষ সুলভ হতে পারে আর ধর্মপূর্বক মোক্ষের অনুষ্ঠান দ্বারাই অর্থ-কামের গ্রহণ করতে সুবিধা হতে পারে, অর্থাৎ ধর্মানুসার জীবন বানানোর দ্বারাই লোক আর পরলোক উভয়ের মধ্যে সুখ প্রাপ্ত হতে পারে, এইজন্য বৈশেষিক দর্শনে কণাদমুনি ধর্মের লক্ষণ করে বলেছেন যে - **"য়তোঽভ্যুদয়নিঃ শ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ"**, অর্থাৎ যার দ্বারা অর্থ কাম সম্বন্ধিত লোক সুখ আর মোক্ষ সম্বন্ধিত পরলোক সুখের সিদ্ধি হয় সেটাই হল ধর্ম। ধর্মের এই লক্ষণ খুবই ব্যাপক, তবে এই সূত্রের মধ্যে আসা অভ্যুদয় শব্দের দ্বারা এটা মনে করা উচিত নয় যে এই শব্দের তাৎপর্য লোকের বর্তমান নাগরিক ঐশ্বর্য হবে। এখানে অভ্যুদয়ের তাৎপর্য কেবল ততটুকুই অর্থ আর কামের সঙ্গে হবে যতটুকু গ্রহণ করলে শরীর-যাত্রা আর মনস্তুষ্টির নির্বাহ হয়ে যাবে আর অর্থ-কামের মধ্যে যেন আসক্তি উৎপত্তি না হয়। ভগবান্ মনু স্পষ্ট শব্দে বলেছেন যে -

অর্থকামেষ্বসক্তানাম্ ধর্মজ্ঞানম্ বিধীয়তে।
ধর্মজিজ্ঞাসমানানাম্ প্রমাণম্ পরমম্ শ্রুতিঃ।।
(মনুঃ ১|১৩২)

অর্থাৎ - যারা অর্থ আর কামের মধ্যে অনাসক্ত (ফেঁসে যায় নি), এই ধর্ম জ্ঞান তাদের জন্যই বলা হয়েছে আর এই ধর্ম জ্ঞানের ইচ্ছাকারীর জন্য বেদই হল পরম প্রমাণ।

এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল যে অভ্যুদয়ের তাৎপর্য লোকনির্বাহমাত্রই হবে আর লোকনির্বাহমাত্রই হল বেদানুকূল ধর্ম, এইজন্য জৈমিনিমুনি মীমাংসা দর্শনের মধ্যে ধর্মের মীমাংসা করে বলেছেন যে - **"চোদনা লক্ষণো অর্থো ধর্মঃ"**, অর্থাৎ বেদের আজ্ঞাই হল ধর্ম। আর্যরা নিজেদের ধর্ম আর সভ্যতাকে বেদের শিক্ষার অনুসারেই স্থির করেছে, এইজন্য ধর্মপূর্বক অভ্যুদয়ের অভিপ্রায় হল এটাই যে সংসার থেকে ততটুকুই অর্থ-কাম নেওয়া উচিত যার দ্বারা মোক্ষে সহায়তা হবে। এটাই হল ধর্ম আর এই ধর্মের জন্যই বেদব্যাসজী বলেছেন -

ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ নহি কশ্চিচ্ছৃণোতি মাম্।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্মঃ কিম্ ন সেব্যতে।।
(মহাভারত স্বর্গা০ ৫|৬২)

অর্থাৎ - আমি হাত তুলে চিৎকার করে বলছি যে অর্থ আর কামকে ধর্মপূর্বক গ্রহণ করার মধ্যেই কল্যাণ হবে, কিন্তু কেউই তা শুনছে না।

বলার তাৎপর্য হল, ধর্ম হল সেই নিয়ম যার অনুসারে ব্যবহার করলে লোক আর পরলোক উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য উৎপন্ন হয়ে যায় আর অর্থ, কাম আর মোক্ষ সরলতার সঙ্গে পাওয়া যায়, কিন্তু ধর্মের নাম শুনে প্রায়শঃ আধুনিক বিদ্বান মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তারা বলে যে এই পুরোনো বস্তুটিকে (ধর্ম) এই নতুন আলোর যুগে কোথায় নিয়ে ঘুরছেন। দেখুন, সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ ধর্মের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে নবীন বিচারের শীতল ছায়ায় এসেছে। দেখুন, রুশরাজ্য থেকে সর্বদার জন্য ধর্মকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে আর দেখুন, ধার্মিক মানুষের কিরকম দুর্দশা হচ্ছে। এরকম অবস্থাতে আবার সেই ধর্মের নাম নিয়ে নিষ্পত্তি হওয়া বিচারের মধ্যে সমস্যা উৎপন্ন করাটা ভালো নয়।

আমি বলবো যে ঠিক আছে। ধর্ম হল এরকমই বর্জ্য বস্তু, অতএব তার নাম নেওয়াটা উচিত নয়, কিন্তু স্মরণে রাখা উচিত যে আমি কোন ধর্মের চর্চা করতে চাচ্ছি, এটা সেই ধর্ম নয় যাকে নবীন মস্তিষ্ক অকেজো মনে করে বাইরে বের করে দিয়েছে, প্রত্যুত এটা হল সেই ধর্ম যাকে ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর রাজনীতি একটা পা-ও আগে চলতে পারবে না। এটা ভারী দুখদায়ক যে আজকাল সম্প্রদায় আর মত-মতান্তরেরা ধর্ম শব্দের ভারী বদনাম করে রেখেছে, কিন্তু বাস্তবে ধর্ম শব্দের অর্থ সম্প্রদায় অথবা মত-মতান্তর নয়। ধর্ম শব্দের অর্থ তো হল সেই নিয়ম যার অনুসারে ব্যবহার করলে লোক আর পরলোক উভয় শুধরে যায়। লোক শুধরে নেওয়ার অভিপ্রায় হল এটাই যে আবশ্যকতার অনুসারে সংসার থেকে ততটুকুই অর্থ আর কাম গ্রহণ করা হোক যা দিয়ে নিজের আয়ুর জন্য ভোগ মিলে যাবে আর কোনো প্রাণীর আয়ু আর ভোগের মধ্যে ন্যূনতা উৎপন্ন হবে না আর পরলোক শুধরানোর অভিপ্রায় এটাই হল যে সৃষ্টির কারণের জ্ঞান উৎপন্ন করে নেওয়া, যার দ্বারা অর্থ আর কামের নির্ণয় হতে পারে আর সৃষ্টির কারণেরও কারণ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হতে জন্ম-মৃত্যুর চক্কর থেকে বেরিয়ে যাওয়া আর মোক্ষ হয়ে যাওয়া|আর্য ধর্মের তাৎপর্যই হল এটা। কখনও কি কোনো বিজ্ঞানবেত্তা সৃষ্টির কারণগুলোকে জানার জিজ্ঞাসাকে এক পলকের জন্যও বন্ধ করতে পারবে আর সৃষ্টির কার্যকারণ ভাবের অনুসন্ধানের নাম কি সাইন্স নয়? আর তাছাড়া কখনও কি কোনো

রাজনীতিজ্ঞ এক পলকের জন্যও এই বিচারটিকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে যে কিভাবে অর্থ আর কামের বিভাজন করা যায় আর কিভাবে মানুষ নিজের জীবনশৈলী বানাবে? যদি সাইন্স আর রাজনীতির মধ্যে এই দুটি বিষয় নিজের বিশেষ স্থান রাখে তাহলে আর্যধর্মের মোক্ষপ্রকরণ, যার মধ্যে সৃষ্টির কারণগুলোকে জানা আবশ্যক আর আর্যধর্মের অর্থকাম প্রকরণ, যার মধ্যে প্রাণীদের ভোগের বিভাজন করা আবশ্যক কিভাবে বিজ্ঞান আর রাজনীতির বিপরীত হতে পারে আর কিভাবে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বা সমাজ এটার প্রতি উদাসীন থাকতে পারে? বৈদিক ধর্ম হল সেই ধর্ম যার দ্বারা বুদ্ধিমান আর বিদ্বান মানুষ উদাসীন থাকতে পারে না। এটাই হল কারণ যে আর্যরা বেদের আজ্ঞানুসারে ধর্মকে অনেক বড়ো মহত্ব দিয়েছে আর অর্থ, কাম ও মোক্ষকে তারই অধীন রেখেছে। বেদের মধ্যে মোক্ষ আর অর্থ-কামের সামঞ্জস্য করে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে -

বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তমাদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাত্।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেऽয়নায়।।

(য়জুঃ ৩১|১৮)

ঈশা বাস্যমিদ সর্বম্ য়ত্কিঞ্চ জগত্যাম্ জগত্।
ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ।।
কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছত সমাঃ।
এবম্ ত্বয়ি নান্যথেতোऽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।

(য়জুঃ ৪০|১-২)

অর্থাৎ - যিনি অন্ধকারের (অজ্ঞান) নাশকারী, প্রকাশস্বরূপ, সৃষ্টির কর্তা পরমেশ্বর, তাকে জানলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় আর এছাড়া অন্য কোনো দ্বিতীয় মার্গ নেই। এই সমস্ত জগতের মধ্যে তিনি প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত আছেন, এইজন্য তিনি সকলকে দিয়ে যা তোমার জন্য নিশ্চিত করেছেন তার উপরই নির্বাহ করো - অন্যের স্বত্বকে নিও না। যদি সারাজীবন এইভাবে কর্ম করে জীবনযাপনের ইচ্ছা করো তাহলে নিশ্চয়ই মোক্ষ হয়ে যাবে, এর অতিরিক্ত আর অন্য কোনো মার্গ নেই।

উপরিউক্ত মন্ত্রের মধ্যে দুটি বিষয়ই বলে দিয়েছে। প্রথম মন্ত্রটিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে সংসারের কারণরূপ পরমাত্মাকে জানার দ্বারাই মোক্ষ হতে পারে, অন্য ভাবে নয় আর দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে নিজের যাত্রামাত্রেরই হিসাবে অর্থ-কামের গ্রহণ করো, এর দ্বারাই মোক্ষ হতে পারে, অন্য ভাবে নয়, অর্থাৎ অর্থ, কাম আর মোক্ষকে ধর্মানুসারে গ্রহণ করলে পরেই মানবজীবন, মানবসমাজ আর প্রাণীসমূহের কল্যাণ হতে পারে, ধর্মের বিপরীত আচরণ করে নয়।

এই বৈদিক আর্যধর্মের দুটি বিভাগ রয়েছে শুদ্ধধর্ম আর আপদ্ধর্ম। শুদ্ধধর্মের ভবন আশ্রম-ব্যবস্থার ভিত্তির উপর আর আপদ্ধর্মের ভবন বর্ণ-ব্যবস্থার ভিত্তির উপর স্থির রয়েছে। যেসময় আশ্রমের সুব্যবস্থা হয় - সমস্ত সমাজ আশ্রমধর্মের পালন করে, সেই সময় সর্বত্র শুদ্ধধর্মেরই ব্যবহার হয়, কিন্তু যেসময় লোকজন আশ্রম ব্যবস্থা থেকে স্বয়ং বিচলিত হয়ে যায় অথবা অন্য কেউ সেই আশ্রমিদের অত্যাচার করে বিচলিত

করতে চায় তখন আপদ্ধর্মের ব্যবহার হয় আর তখন বর্ণব্যবস্থাই প্রাধান্য হয়ে যায়। আশ্রম ব্যবস্থার সবথেকে বড়ো ব্যবস্থাপকের নাম হল পরিব্রাট্ আর বর্ণ ব্যবস্থার সবথেকে বড়ো ব্যবস্থাপকের নাম হল সম্রাট। পরিব্রাটের কাজ হল শুদ্ধধর্মের ব্যবস্থা করা আর সম্রাটের কাজ হল আপদ্ধর্মের ব্যবস্থা করা। যখন শুদ্ধধর্মে স্থিরতা আসে তখন আশ্রমের প্রাবল্য হয় আর সমস্ত বর্ণ বর্ণোচিত কাজের না হওয়ার জন্য জন্মনা স্থির হয়ে প্রভাহীন হয়ে যায়, কিন্তু যখন আপদ্ধর্মের ব্যবস্থা হয় তখন সমস্ত আশ্রম প্রভাহীন হয়ে যায় আর বর্ণের প্রাবল্য হয়ে যায় তথা সমস্ত বর্ণ নিজের-নিজের গুণ-কর্ম-স্বভাবানুসার নিজের-নিজের কাজে লেগে যায়। শুদ্ধধর্মের সময়ে সমাজকে না তো সৈনিকের আবশ্যকতা হয়, না ব্যবসায়ীদের আবশ্যকতা হয় আর না শূদ্রের আবশ্যকতা হয়। সেই সময় এই তিনটি বর্ণের এক প্রকার তিরোভাব হয়ে যায় আর তিনটি বর্ণ ব্রাহ্মণ্য হয়ে চার আশ্রমে বিভক্ত হয়ে যায় আর একই প্রকারের ধার্মিক মানুষের সমাজ তৈরি হয়ে যায় যারা বেদের আদেশানুসারে ধর্মপূর্বক অর্থ আর কামকে গ্রহণ করে ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে লেগে থাকে। এই ব্রহ্মনিষ্ঠ সমাজকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রকারের একটি যুগ হয়েছিল যখন শুদ্ধধর্মেরই ব্যবহার হতো আর সব লোকজনকে ব্রাহ্মণই বলা হতো। মহাভারতের (শান্তিপর্ব ১৮৮|১০) মধ্যে লেখা রয়েছে যে - **"সর্বম্ ব্রাহ্মমিদম্ জগত্"**, অর্থাৎ একটা সময় ছিল যখন সমস্ত সংসারে কেবল ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণই ছিল। সেই সময় রাজন্য আদি বর্ণের তিরোভাব ছিল। মহাভারতের মধ্যে লেখা রয়েছে যে -

ন বৈ রাজ্যম্ ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্।।
(শান্তিপর্বঃ ৪৯|১৪)

অর্থাৎ - সেই সময় না কোনো রাজ্য ছিল, না রাজা ছিল আর না কোনো দণ্ড ছিল, না দণ্ড পাওয়ার মতো কোনো পাপী ছিল। সেই সময় তো সমস্ত প্রজা পরস্পর ধর্ম দ্বারাই নিজেদের রক্ষা করতো।

এরকম ধার্মিক সময়ে মানুষ অর্থ-কামের মধ্যে আসক্ত হয় না আর ভগবান্ মনুর (১০|৬৫) আদেশানুসারে **"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি"**, অর্থাৎ শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়ে যায়। এটাই হল কারণ যে সেই সময় কোনো ধরনের কলহও হয় না আর না রাজা আদির আবশ্যকতা হয়, এইজন্য ধর্মকে রাজারও রাজা বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১|৪|১৪ তে লেখা রয়েছে যে - **"তদেতত্ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্ য়ুদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্মাত্পরম্ নাস্ত্যথো"**, অর্থাৎ এই ধর্ম হল রাজারও রাজা, এর থেকে বড়ো আর কিছু নেই। ধর্মের এত মহত্বের কারণ হল এটাই যে এটা বুদ্ধির পোষক আর বিদ্যা তথা জ্ঞানের বৃদ্ধিকারক। বুদ্ধির পোষাক হওয়ার জন্যই এটা পাপের উৎপন্ন হতে দেয় না, কারণ পাপের সূক্ষ্ম বীজ তো আগে মনের মধ্যেই উৎপন্ন হয়, এইজন্য মনু মহারাজ (৫|১০৯) বলেছেন যে - **"মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি"**, অর্থাৎ সত্য দ্বারাই মন শুদ্ধ হয়। সত্যাসত্যের নির্ণয় করা বুদ্ধি, বিদ্যা আর জ্ঞানপোষক ধর্মেরই কাজ, এইজন্য বলা হয়েছে যে যেখানে ধর্ম রয়েছে সেখানে পাপ হবেই না, কিন্তু যেখানে ধর্ম নেই কেবল রাজ্যশাসন দ্বারাই মানুষের সুধার করা হয়ে থাকে সেখানে কোনো প্রভাবই হয় না। আজ রাজ্যশাসন অপরাধ থামানোর জন্য যতটা উপায় বের করেছে সেই সব থেকে বদমাশেরা লাভই তুলে নিয়েছে। বিপদের সময়ে রেলগাড়ি থামানোর জন্য যে

চেনটি ছিল, সেটিকে টেনেই ডাকাতরা অনেকবার গাড়িকে জঙ্গলে থামিয়ে লুট করেছে। যে পুলিশ চোরকে ধরার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে সে চোরের সঙ্গে মেলামেশার কারণে অনেকবার বদনাম হয়েছে আর অনেক পুলিশম্যানকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।কতদূর বলবো আজকালের কারাগারে কারাবাসীর ভীড়, মুকদ্দমাবাজদের ভীড়, বেশ্যাগীরি, মাতাল, জুয়া, চুরি আর প্রতারণার অধিকতা বলে দিচ্ছে যে ধর্মহীন রাজ্যপ্রবন্ধ কোনো কাজের হয় না। এর কারণ হল এটাই যে রাজ্যশাসন জনগণের মানসিক বিচারকে পবিত্র করতে পারে না। সেটা তো শরীর দিয়ে করে থাকা স্থূল পাপকেই দেখে আর শরীরকেই দণ্ড দেয়, কিন্তু পাপ সর্বপ্রথম মনের মধ্যে উৎপন্ন হয়, এইজন্য বলা হয়েছে যে ধার্মিক সময়ে যখন লোকজনের মন পবিত্র হয়, তখন রাজ্যশাসনের অথবা রাজন্য আদি বর্ণের আবশ্যকতা হয় না। সেই সময় তো মোক্ষ প্রধান আর অর্থ-কাম গৌণ থাকে, অতএব আশ্রমধর্মেরই প্রাবল্য থাকে আর শুদ্ধ ধর্মেরই সব ব্যবহার হয়।

শুদ্ধধর্ম

শুদ্ধধর্ম হল আশ্রমব্যবস্থার উপর স্থির। বলা তো হয় আশ্রম চারটি, কিন্তু তারমধ্যে দুটি প্রধান আর দুটি সহায়ক হয়। গৃহস্থাশ্রম আর সন্ন্যাসাশ্রম দুটিই হল লোক আর পরলোকের সাধনকারী। গৃহস্থাশ্রম হল লোকের আর সন্ন্যাসাশ্রম হল পরলোকের সাধক। এই দুটিকে দৃঢ় করার জন্য অন্য দুই সহায়ক আশ্রম তৈরি করা হয়েছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সহায়তা ছাড়া গৃহস্থাশ্রম সঠিক ভাবে চলতে পারবে না আর বানপ্রস্থাশ্রমকে ছাড়া কোনো মানুষই গৃহস্থ থেকে একেবারে সন্ন্যাসের মধ্যে যেতে পারবে না, অতএব গৃহস্থ আর সন্ন্যাসকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্রহ্মচর্য আর বানপ্রস্থ আশ্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে আর নিয়মপূর্বক আশ্রমের ব্যবহারের নামই হল শুদ্ধধর্ম। এই শুদ্ধধর্মের সিদ্ধান্ত হল কোনো প্রাণীর আয়ুভোগে বাঁধা উৎপন্ন না করে নিজের আয়ুভোগকে প্রাপ্ত করে স্বয়ং মোক্ষ প্রাপ্ত করা আর অন্য প্রাণীদের জন্য এরকম মার্গ বানিয়ে দেওয়া যার দ্বারা সকল প্রাণী নিজেদের কর্মফলকে ভোগ করে মানুষ-শরীর দ্বারা মোক্ষে চলে যাবে। এই সিদ্ধান্তটিকে রক্ষা করার জন্য মানুষকে নিজের জীবনের দুটি লক্ষ্য বানিয়ে নিতে হয়। একটি তো হল যতদূর সম্ভব এই সৃষ্টি থেকে খুবই কম ভোগ্য পদার্থ নেওয়া আর দ্বিতীয়টি হল যতদূর সম্ভব তপস্বী-জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে সৃষ্টির কারণের যথা আত্মা - পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা। এই দুটি কর্তব্যকে লক্ষ্য বানালে পরে ধর্মের সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হয়ে যাবে আর ধর্মের স্থিরতা দ্বারাই মোক্ষের মার্গ সকলের জন্য সুলভ হয়ে যাবে।

ধর্মের স্থিরতার সাধারণ সাধন হল অর্থ আর কামের সীমা নির্ধারণ। আমি অর্থ আর কামের বর্ণনা করে লিখে এসেছি যে আর্যরা অর্থের সীমাকে পাঁচটি শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তারা বলে যে, কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দিয়ে, স্বয়ং বিনা কষ্ট করে আর স্বাধ্যায়ে বিঘ্ন না করে কেবল নিজের উপার্জন দ্বারা যাত্রামাত্রর জন্য যা কিছু প্রাপ্ত হয় তা দিয়েই নির্বাহ করতে আর বাকি ধনকে অন্যের মনে করতে।

এরকমই কামের সীমা নির্ধারিত করে তারা এই নিয়ম বানিয়েছে যে বিনা ঠাট-বাট, শোভা-শৃঙ্গারে নিজেরই বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে কেবল একটাই সন্তান উৎপন্ন করা, এর অধিক নয়। এই নিয়মকে স্থির করার জন্য তারা সরল আর তপস্বী-জীবন বানানোর পরিকল্পনা করেছে। এর সঙ্গেই ধর্মের স্থিরতার দ্বিতীয় বিশেষ সাধন তারা ঈশ্বরপরায়ণতা স্থির করেছে। তারা জানতো যে যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রধান লক্ষ্য সামনে থাকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সরল আর তপস্বী-জীবনের কোনো মানেই হবে না, কারণ ঈশ্বরপরায়ণতা ছাড়া সরল আর তপস্বী-জীবনে স্থিরতা হবেই না আর সরল আর তপস্বী-জীবন শুদ্ধধর্ম ছাড়া দর্শনও হবে না। একইভাবে শুদ্ধধর্ম ছাড়া সংসারের স্বাভাবিক স্থিতির স্থিরতাও হবে না।

শুদ্ধধর্মের ব্যবহার দ্বারাই বিলাস, শৃঙ্গার আর কামুকতার বৃদ্ধি থেমে যায়, পশু আর বৃক্ষকে অল্পায়ুতে মারা বন্ধ হয়ে যায় আর মানুষের মধ্যে সভ্যভাব উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা পরস্পরের দ্বেষ, স্পর্ধা আর কলহ শান্ত হয়। একইভাবে শুদ্ধধর্ম দ্বারা অনাবৃষ্টি, অকাল, মহামারী আর যুদ্ধেরও সমাপ্ত হয় আর প্রাণীমাত্রের জন্য মোক্ষমার্গ সুলভ হয়। বলার তাৎপর্য হল অর্থশুদ্ধি দ্বারা পশু আর বৃক্ষের আয়ু আর ভোগের মধ্যে বাঁধা পরে না আর কামশুদ্ধি দ্বারা মানুষের মধ্যে সভ্যভাব উৎপন্ন হয় আর উভয়ের পরিণাম এই হয় যে মানুষ মোক্ষসাধনের যোগ্য হয়ে যায়। এটাই হল শুদ্ধধর্মের রহস্য, কিন্তু এই রহস্যের মধ্যে অর্থ আর কামের পার্থক্যটা বুঝে নেওয়াটা হল বড়ো মহত্বের বিষয়, কারণ অর্থশুদ্ধি হল পূর্ণরূপে কামশুদ্ধির উপর অবলম্বিত আর কামশুদ্ধি ছাড়া মোক্ষসাধন হবে না, এইজন্য কামশুদ্ধিই হল মোক্ষসাধনের চাবি। মোক্ষসাধনের মধ্যে কামের উপেক্ষা আর ঈশ্বরপ্রাপ্তির অপেক্ষা থাকে। মোক্ষমার্গী সবার আগে জন্ম - মরণকারী মৈথুনকে বন্ধ করে দেয় আর ব্রহ্মচর্যব্রত দ্বারা আগে অমোঘবীর্যত্ব প্রাপ্ত করে আর তারপর উর্ধ্বরেতা হয়ে প্রাণায়াম আর প্রণব জপের দ্বারা সমাধিস্থ হওয়ার চেষ্টা। এই ক্রিয়া দ্বারা তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হয়, তার মন আর বুদ্ধির নিবাস ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যে হতে থাকে তথা মন স্থির হয়ে যায়। মন স্থির হতেই মনোজ - কাম - বীর্য প্রাণায়ামের প্রেরণা দ্বারা উর্ধ্বগামী হয়ে যায় যা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা দ্বারা ভস্ম হতে থাকে। পরিণাম এই দাঁড়ায় যে রতির ইচ্ছা একদম মন্দ হয়ে যায় আর তার অধিক সন্তান হয় না। এই বিষয়টির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে হর্বর্ট স্পেন্সর তার "প্রাণিশাস্ত্রের তত্ত্ব" নামক গ্রন্থের মধ্যে লিখেছেন যে, মানসিক শক্তি যতই বাড়বে, ততই প্রজোৎপাদক শক্তি ন্যুন হতে থাকবে"। একথাই একজন নীতিকারও বলেছিলেন যে -

অত্যন্তমতিমেধাবী ত্রয়াণামেকমশ্নুতে।
অল্পায়ুষো দরিদ্রো বা হ্যনপত্যো ন সম্শয়ঃ।।

অর্থাৎ - অত্যন্ত মেধাবী পুরুষ নির্ধন বা অল্পায়ু অথবা নিঃসন্তান হয়েই থাকে, এরমধ্যে সন্দেহ নেই। নির্ধন আর নিঃসন্তান তো তাকে হওয়াই উচিৎ, কিন্তু অল্পায়ু হওয়াটা অপবাদ হবে। এটা তাদের জন্য যারা বিনা ব্রহ্মচর্য করে মেধা দ্বারা অধিক কাজ করে। ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে মেধার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, কারণ মস্তিষ্ক আর শিশ্নের তন্তুর সংযুক্তি একটির মধ্যে রয়েছে। দেখা গেছে যে যেভাবে হস্তমৈথুনাদি নিয়ম বিরুদ্ধ শিশ্ন স্পর্শ দ্বারা মস্তিষ্ক নির্বল হয়ে যায়, ব্যক্তি পাগল হয়ে যায়, সেইভাবে অত্যন্ত মানসিক আর মেধাশক্তির ব্যয় হতে শিশ্নেন্দ্রিয়ের মধ্যেও নির্বলতা এসে যায় আর সন্ততির উৎপন্ন হওয়া একদম বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু মেধা

আর শিশ্নার উচিত রক্ষা দ্বারা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে, এইজন্য সন্ততিনিরোধের সবথেকে উত্তম প্রকার অমোঘবীর্যত্বই হবে। এই বিধির দ্বারাই জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হয়, মানুষ পরমাত্মাকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়, প্রজার প্লাবন বন্ধ হয়ে অল্প হয়ে যায়। প্রজার বড়ো প্লাবন থেমে যাওয়া আর সকলের এক-দুটি সন্ততি হওয়ার কারণে কারও কোনো অন্নকষ্ট হয় না। সমস্ত প্রাণী তার পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত বেঁচে থাকে তথা সকলের জন্য মোক্ষের মার্গ সুলভ হয়ে যায়, এইজন্য আর্যরা গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা মেধা বাড়ানোর আয়োজন ছোটো থেকেই (উপনয়ন সংস্কার) থেকেই করে দিয়েছে।

এইভাবে এই মোক্ষাভিমুখী কাম অবরোধের পশ্চাৎ অর্থশুদ্ধির কাজ খুবই সহজভাবে হয়ে যায়। সবাই শৃঙ্গাররহিত আর বিলাসরহিত হয়ে যায়। সাধারণ ভোজন, বস্ত্র, গৃহ আর গৃহস্থীর অতিরিক্ত কারও ব্যর্থ আভুষণের আবশ্যকতা থাকে না, তখনই চার আশ্রম নিজের-নিজের কর্তব্যকে পূর্ণ করতে পারে। আর্যরা এই ধরনের শিক্ষা আর সভ্যতার প্রচারের উদ্দেশ্য দ্বারা ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস আশ্রমের পঁচাত্তর বর্ষ পূর্ণ তপস্বী, অখণ্ড ব্রহ্মচারী আর মোক্ষাভিমুখী নির্মাণের জন্য নিযুক্ত করেছে আর তার জীবিকাকে অন্যের অধীন রেখে গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকে বাড়াতে আর মোক্ষ প্রাপ্ত করার দ্বার খুলে দিয়েছে আর এই তপস্বী আশ্রমের মাঝেই গৃহস্থাশ্রমকেও নিয়ে জুড়ে দিয়েছে, যাতে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে আসা আর বানপ্রস্থ তথা সন্ন্যাসের মধ্যে যাবে এরকম গৃহস্থ কখনও বিলাসী না হতে পারে। চার আশ্রমের এই জীবন-যাত্রা দ্বারা না তো কোনো প্রাণীর কষ্ট হয়, না সন্ততি বৃদ্ধি পায় আর না সৃষ্টির মধ্যে কোনো ধরনের অসমানতা উৎপন্ন হয়, কিন্তু এরমধ্যেই কামুকতার সঞ্চার যথা - বিলাস আর শৃঙ্গারের বৃদ্ধি হতেই এই সমস্ত কার্যক্রম বদলে যায় আর মানুষ পতিত হয়ে সমস্ত প্রাণীর দুঃখের কারণ হয়ে যায়, এইজন্য অর্থের মধ্যে কামের প্রবেশকে খুবই সাবধানতার সঙ্গে থামানো উচিত।

অর্থ আর কামের ভিন্নতা বোঝার জন্য এই সংকেতই যথেষ্ট যে, যত পদার্থ শরীর-রক্ষার জন্য আবশ্যক সেসব হল অর্থ আর যা কেবল মন প্রসন্ন করার জন্য রয়েছে সেই সব হল কাম। উদাহরণের জন্য বোঝা উচিত যে শীতের মধ্যে বিনা চাদরে শরীরের-রক্ষা হবে না, কিন্তু চাদরটা লাল, সবুজ নকশা আদি হল সর্বথা ব্যর্থ কারণ সেটা কেবল মনোরঞ্জনের জন্যই হয়। একইভাবে কলার, নেকটাই আর কোর্ট-পাতলুন অথবা শার্ট আর প্যান্ট আদির বিষয়ও হবে। এই ফ্যাশনের সঙ্গে সম্বন্ধিত সমস্ত পদার্থ কেবল শোভা-শৃঙ্গারের জন্যই হয় অর্থাৎ মনোরঞ্জনের জন্যই হয়, বাস্তবিক আবশ্যকতার জন্য হয় না। এইসব পদার্থ ছাড়াও মানুষ সারাটা জীবন সুখী থাকতে পারবে, কিন্তু চাদর অথবা কম্বল ছাড়া শীতে শরীর-রক্ষা হবে না, এইজন্য সাধারণ চাদর বা কম্বল অর্থ হবে আর লখনৌয়ের নকশা করা চাদর বা বুলন মিলের লাল-সবুজ কম্বল কাম হবে। এই মানদণ্ড দ্বারা অর্থ আর কামের ভিন্নতা সর্বত্র বুঝে নেওয়া উচিত। আর্যরা এই সিদ্ধান্তটিকে খুবই ভালোভাবে বুঝেছিল আর কামনাগুলোকে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকেই সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করেছিল। ভগবান্ মনু লিখেছেন -

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

য়শ্চৈতানপ্রাপ্নুয়াত্‌সর্বান্যশ্চৈতানেকবলাস্ত্যজেত্‌।
প্রাপণাত্‌সর্বকামানাম্‌ পরিত্যাগো বিশিষ্যতে।।

(মনুঃ ২|৯৪-৯৫)

অর্থাৎ - যে মানুষ এইসব বিষয়কে প্রাপ্ত করে আর যে এইসব বিষয়কে ত্যাগ করে দেয়, সেই উভয়ে মধ্যে সব বিষয়কে প্রাপ্তকারী মানুষের তুলনায় তার ত্যাগকারী শ্রেষ্ঠ হয়।

এটা ব্রহ্মচারীদের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বালক বয়স থেকেই এই ধরনের শিক্ষা এইজন্য দেওয়া হয়েছে যে যাতে গৃহস্থাশ্রমে পৌঁছে মানুষ কামুক না হয়ে যায়। গৃহস্থের পূর্বে ব্রহ্মচর্য আশ্রমীকে যেসব কারণ দ্বারা কাম্য বিষয় থেকে দূরে থাকার জন্য বলা হয়েছে, সেইসব কারণকে ধ্যানে রেখেই গৃহস্থাশ্রমের পশ্চাৎকারী বানপ্রস্থাদি আশ্রমের থেকেও কাম্য বিষয়কে সরিয়ে দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। গৃহস্থের পূর্বে আর পশ্চাৎ কাম্য ভাবের বিরুদ্ধে ঘনঘোর তপশ্চর্যার জীবন বিদ্যমান রয়েছে। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, গৃহস্থকেও কাম্যভাব থেকে দূরে থাকা উচিত। গৃহস্থকে কামের নামে কেবল একটাই সন্তান উৎপন্ন করার আজ্ঞা রয়েছে। এই একটি সন্তানই দাম্পত্য স্নেহের মধ্যে বেঁধে নিতে হয়। এই দাম্পত্য স্নেহ আর এক-দুটি সন্তানের উৎপত্তি কামুকতার পরিচায়ক নয় প্রত্যুত সৃষ্টির আজ্ঞাকে বিনয়পূর্বক পালন করা হবে, কারণ সৃষ্টি স্ত্রী - পুরুষকে সমান সংখ্যাতে উৎপন্ন করে এটা সূচিত করে দিয়েছে যে, যেভাবে প্রাণীমাত্রের মধ্যে কামের সমান ভাগ রয়েছে, সেইভাবে মানুষের মধ্যেও সমানই ভাগ হওয়া উচিত। জুলাই সন ১৯০৭ প্রসিদ্ধ "সরস্বতী" পত্রিকার মধ্যে লেখা হয়েছে যে "এক বিদ্বান প্রাকৃতিক উদাহরণের দ্বারা এই কথাকে সিদ্ধ করে দিয়েছে যে প্রত্যেক মানুষকে কেবল একটাই বিবাহ করা - একটাই স্ত্রী রাখাটা হল ঈশ্বরের আজ্ঞা। উনি সারা বিশ্বের স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার দ্বারা এই হিসেব লাগিয়েছেন যে জগতের মধ্যে যত পুরুষ রয়েছে, প্রায় তত সংখ্যকই স্ত্রী রয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান, এই হিসেব দ্বারা বালক আর বালিকাও সমান রয়েছে। ইউরোপ আর আমেরিকা আদি যত শ্বেত চামড়ার ব্যক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে প্রতি ১০০ জন পুরুষের তুলনায় ১০১ টি স্ত্রী রয়েছে। আমেরিকার হবিশয়ের মধ্যেও নর আর নারীদের এটাই সংখ্যা রয়েছে। জাপানের মধ্যে প্রতি ১০২ পুরুষের মধ্যে ১০০ টি স্ত্রী রয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, এই বিশেষত্ব এরকম যা ধ্যানে রাখার যোগ্য। এখানে ১০৪ পুরুষ আর বালকের তুলনায় ১০০ টি স্ত্রী আর বালিকা রয়েছে, অর্থাৎ পুরুষের অপেক্ষায় স্ত্রী কম রয়েছে, অতএব একজন পুরুষকে একের অধিক স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ করা অন্যায় হবে, ঈশ্বরের আজ্ঞার উলঙ্ঘন হবে আর প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ হবে।" শুধু এটাই নয়, কিছু বিদ্বানেরা খোঁজ নিয়েছেন যে, অন্য প্রাণীদের মধ্যেও নর আর মাদার সংখ্যা সমানই হয়। তারা বলে যে, সৃষ্টি এই সমানতাকে খুবই যত্নসহকারে পূরণ করে। যদি কোনো য়োনির নর বা মাদার কিছু সংখ্যক নষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে খুব শীঘ্রই সেই সংখ্যা পূরণ হয়ে যাবে।

ডক্টর ট্রাল বলেছেন যে *"এটাই হল সৃষ্টির এক নিয়ম যে যদি স্বাভাবিক সমানতার মধ্যে কোনো ধরনের ভিন্নতা করা হয় তাহলে শীঘ্রই তত সংখ্যা উৎপন্ন হয়ে সেই ভিন্নতা পূরণ হয়ে যায়। পশু-পাখিদের মধ্যেই নয় প্রত্যুত মানুষের মধ্যেও এই নিয়মটি কাজ করছে। প্রায়শঃ দেখা যায় যে যুদ্ধের মধ্যে পুরুষ মারা*

যায়, অতঃ যুদ্ধের পশ্চাৎ প্রায়শঃ বালকই অধিক উৎপন্ন হয় আর যখন শান্তি হয়ে যায় তখন বালিকাদের বৃদ্ধি শুরু হয়"।এই নিয়মের থেকে জানা যায় যে নর-নারীর জোড়া স্থির রাখাটা সৃষ্টি স্বীকার করে, এইজন্য গৃহস্থের উচিত যে সে এক স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ করে নিজের (স্ত্রী-পুরুষের) দুই প্রতিনিধি যেন অবশ্য উৎপন্ন করে। এই পর্যন্ত সে ধার্মিকই থাকবে - কামি বলা যাবে না।

যেরকম ভাবে বিনা নকশার চাদর অর্থ হবে, অনর্থ হবে না, সেইভাবে এক-দুটি সন্তান উৎপন্ন করাও কামুকতার পরিচায়ক হবে না। এটাই হল অর্থ-কামের ধার্মিক রহস্য। এইজন্য একজন ধার্মিক মানুষের উচিত যে সে সৃষ্টির বিভাজনকে ধ্যানে রেখে আর একটি পুরুষের জন্য একটি স্ত্রীর কাম-সম্বন্ধিত সমান নিয়ম দেখে নিয়ে যেভাবে সমানতার সঙ্গে একটি স্ত্রী একটি পুরুষকে বা একটি পুরুষ একটি স্ত্রীকে নিতে পারে ঠিক সেইভাবে ভোজন, বস্ত্র, গৃহ আর গৃহস্থীর সঙ্গে সম্বন্ধিত সমস্ত অর্থও সমস্ত মানুষকে ধ্যানে রেখে সমানতার সঙ্গেই নিতে পারে। যেভাবে স্ত্রী-পুরুষের কাম-সম্বন্ধিত অসমান বিভাজন সমাজের মধ্যে বিপ্লব উৎপন্ন করতে পারে, সেইভাবে অর্থ-সম্বন্ধিত অসমান বিভাজনও সমাজের মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন করতে পারে, এইজন্য আর্যরা একটি স্ত্রীর জন্য একটি পুরুষের আর একটি পুরুষের জন্য একটি স্ত্রীরই নিয়ম বানিয়েছে তথা সমস্ত মানুষকে সমানতার সঙ্গে অর্থের উপযোগ করার আজ্ঞা দিয়েছে। বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে দুই ধুরের মাঝে চাপে থাকা ঘোড়া যেভাবে চিৎকার করে, ঠিক সেইভাবে দুই স্ত্রীর পুরুষেরও দুর্গতি হয় [Δ], এইজন্য একটি স্ত্রীই হওয়া উচিত আর এই ভাবে সকলকে সমানতার সঙ্গে অর্থেরও উপযোগ করা উচিত। সকলকে সমান অর্থ নেওয়ার আজ্ঞা বেদের মধ্যে পরমাত্মা উপদেশ করেছে -

সমানী প্রপা সহ বোऽন্নভাগঃ সমানে য়োক্ত্রে সহ বো
য়ুনজিম। সম্যঞ্চোऽগ্নিম্ সপর্য়তারা নাভিমিবাভিতঃ।।
(অথর্বঃ ৩|৩০|৬)

য়ে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ।
তেষা শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিঁম্লোকে শত সমাঃ।।
(য়জুঃ ১৯|৪৬)

সহৃদয়ম্ সাম্মনস্যমবিদ্বেষম্ কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্য়ত বত্সম্ জাতমিবাঘ্ন্যা।।
(অথর্বঃ ৩|৩০|১)

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো য়থা বঃ সুসহাসতি।।
(ঋঃ ১০|১৯১|৪)

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানম্ মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।

Δ উভে ধুরৌ বহ্নিরাপিব্দমানোऽন্তর্য়োনেব চরতি দ্বিজানিঃ। (ঋঃ ১০|১০১|১১)

সমানম্ মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি৷৷

(ঋঃ ১০|১৯১|৩)

অর্থাৎ - তোমাদের দুগ্ধাদি পানীয় পদার্থ সমান হোক, আর অন্নের বিভাজন সমান-সমান হোক। যেভাবে রথের নাভির চতুর্দিকে আরে এক সমান হয়, সেইভাবে তোমরা সবাই এক সমান হয়ে যজ্ঞ করো। মন দ্বারা সাম্য ভাবনা যা সমস্ত জীবের মধ্যে রয়েছে সেটাই আমার প্রিয় আর তার সম্পত্তিই শত-শত বছর ধরে থাকে। এইজন্য আমি তোমাদের সকলকে সমান হৃদয় আর সমান মনের করে দ্বেষ রহিত করছি। তোমরা একে অপরের সঙ্গে এইভাবে ভালোবাসো যেভাবে গৌ নিজের সদ্যজাত শাবককে ভালোবাসে। তোমরা নিজেদের বিচার, হৃদয় আর মনকে এক সমান করো তথা নিজের গুপ্ত পরামর্শ, সভা আর আন্তরিক বিচারকে এক সমান করার চেষ্টা করো।

এই হল বেদের অর্থ সম্বন্ধিত উপদেশ, এরমধ্যে সমান অর্থ গ্রহণের উপদেশ রয়েছে। এই বৈদিক উপদেশগুলোকে ধ্যানে রেখে ভগবান্ মনু বলেছেন যে -

বয়সঃ কর্মণোऽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।

বেষবাগ্বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্বিচরেদিহ৷৷

(মনুসংহিতা ৪|১৮)

অর্থাৎ - গৃহস্থ নিজের বয়স, কর্ম, বেদ আর সমস্ত মানুষের অনুরূপই নিজের বেশভূষা, বাণী আর বুদ্ধির অবলম্বনপূর্বক আচরণ করে সংসারের মধ্যে থাকবে।

এখানে সকলের সমানই নিজেদের বৈদিক বেশভূষা রাখার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হল এটাই যে প্রায়শঃ বেশভূষাই অসমানতা প্রকট করে, শোভা-শৃঙ্গার আর ঠাট-বাটের দ্বারাই অসমানতার আরম্ভ হয়, এইজন্য তাকে থামানো হয়েছে। আর্য সভ্যতার মধ্যে এই সাম্যভাবের বড়োই মহিমা রয়েছে। তাদের সভ্যতার মধ্যে পরস্পরকে সমদর্শী বলা হয়েছে, এইজন্য ভগবদ্গীতার (৫|১৮) মধ্যে বলা হয়েছে যে - **"শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"**, অর্থাৎ তিনিই পণ্ডিত বুদ্ধিমান যিনি চাণ্ডাল আর কুকুরের সঙ্গেও সাম্যভাবে ব্যবহার করেন।

এটাই হল আর্য সভ্যতার আদর্শ, কিন্তু এমনটা মোটেও ভাবা উচিত নয় যে এই সাম্যভাব ইউরোপের রুশ আদি দেশের মতো সাম্যবাদ। রুশের সাম্যবাদ হল শৃঙ্গারিক সাম্যবাদ। সেটা সব কিছুর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ আর বিলাসের সমতার প্রচার করে, ত্যাগ আর তপস্বী-জীবনের করে না। এটাই হল কারণ যে সেও মেশিনের দ্বারা শৃঙ্গার বৃদ্ধিকারক পদার্থ তৈরি করে সংসারের ধন নিতে চায় আর তার পরিবর্তে বিলাস বৃদ্ধিকারক পদার্থ দিতে চায়। তার স্কিমের মধ্যে পশু আর বৃক্ষের আয়ু আর ভোগের উপর বিচার করার জন্য কোনো স্থান নেই আর না কর্মফলের দাতা পরমেশ্বরের জন্য কোনো স্থান রয়েছে। এইজন্য সেটা বিলাসীদেরই সাম্যবাদ, তার দ্বারা সংসারের আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ সংসারের মধ্যে এত শৃঙ্গারিক পদার্থই নেই যার দ্বারা সংসারের সকল মানুষ সমানতার সঙ্গে বিলাস আর শৃঙ্গারের উপভোগ করতে পারে। সোনা, রূপা, হীরা, মোতি, রেশম, হাতীদাঁত আর যান তথা ফার্নিচার আদি যত বিলাসের সঙ্গে

সম্বন্ধিত পদার্থ রয়েছে সেটা খুবই কম রয়েছে। তার দ্বারা খুবই কিছুসংখ্যক লোকের শৃঙ্গার বাড়ানো যেতে পারে। এক-এক ক্যারেট (Carat) ওজনের হীরা আর মোতি সংসারের মধ্যে কত রয়েছে? সেটা কি ততখানি রয়েছে যার এক-একটি মালা সংসারের সকল মানুষকে দেওয়া যেতে পারে? আর সংসারের মধ্যে কি এত সোনা রয়েছে যে সব মানুষকে সোনার বাসন এক সমান বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে? নেই। সংসারের মধ্যে এরকম অমূল্য পদার্থ খুবই কম রয়েছে, এইজন্য রুশ আদি ইউরোপীয় দেশের শৃঙ্গারিক সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত হল একদমই মিথ্যা, কিন্তু আর্যদের বৈদিক সাম্যবাদের ভবন ত্যাগবাদের পবিত্র ভিত্তির উপর নির্মাণ করা হয়েছে আর তারমধ্যে **"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"** (য়জুঃ ৪০|১) আর **"য়াত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থম্"** (মনুঃ ৪|৩) এর সিদ্ধান্ত কাজ করছে, যার তাৎপর্য হল যা কিছু অন্য প্রাণীদের ভোগের পরে বাকি থাকে তারমধ্যে থেকে কেবল নিজের জীবন-যাত্রার নির্বাহমাত্রের জন্যই নেওয়া উচিত, এর অধিক নয়। আর্যদের এই ত্যাগবাদের মধ্যে সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ আর তৃণ-পল্লবের পূর্ণ আয়ু আর পূর্ণ ভোগের সুবিধার মূলমন্ত্র কাজ করছে আর তপস্বী-জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে স্বয়ং পূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে মোক্ষ প্রাপ্ত করতে তথা অন্য প্রাণীদের জন্যও মোক্ষ প্রাপ্তির মার্গ বিস্তৃত করার মহান ধ্যেয় বিদ্যমান রয়েছে। এইজন্য বৈদিক সাম্যবাদের সঙ্গে ইউরোপীয় সাম্যবাদের তুলনা হওয়া সম্ভব নয়। শুদ্ধ ত্যাগবাদী আর্যরা বেশ ভালোভাবে বুঝে নিয়েছে যে মানুষের তৃপ্তি শৃঙ্গার, বিলাস আর কামুকতার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। এটাই হল কারণ যে আর্য সভ্যতার প্রচারকরা খুব বলপূর্বক বলেছে যে -

য়ত্ পৃথিব্যাম্ ব্রীহিয়বৌ হিরণ্যম্ পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকেন তত্সর্বম্ ইতি মত্বা শমম্ ব্রজেত্।। ¶

অর্থাৎ - এই পৃথিবীর সমস্ত অন্ন, সোনা আর স্ত্রী এক পুরুষের জন্যও পর্যাপ্ত নয়, এইজন্য এই সবের ত্যাগই হল উত্তম।

এইরকম অবস্থাতে রুশের সংগ্রহবাদ আর্যদের ত্যাগবাদের সঙ্গে কোনো সমতা করতে পারবে না। আর্যরা তাদের এই ত্যাগবাদকে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে আরম্ভ করেছে আর বানপ্রস্থ তথা সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যে সমাপ্ত করেছে। আর্যদের আয়ুর ৩/৪ ভাগ হল ত্যাগী, তপস্বী আর ঈশ্বরপরায়ণ। মাঝখানে আয়ুর ১/৪ ভাগ যা আদি অন্তিমের মধ্যে তপস্বীজীবনের সঙ্গে জড়িত থাকা গৃহস্থাশ্রমের নামে প্রসিদ্ধ, সেটাও উক্ত সমাজের ৩/৪ ভাগকে অন্ন পৌঁছে দেওয়ার জন্যই লাগানো হয়েছে, এইজন্য তার কাছেও বিলাসী জীবন বানানোর জন্য না তো কিছু অবশিষ্ট বাকি থাকতে পারে আর না তার কাছে এইসব পাষণ্ডের জন্য সময় হবে। এর অতিরিক্ত সেও পঁচিশ, ছত্রিশ অথবা আটচল্লিশ বছরের ব্রহ্মচর্য ব্রত করে এসেছে আর শীঘ্রই বানপ্রস্থ হবে, এইজন্যই সে তপস্বী-জীবনের অভ্যাসকে ছেড়ে দিতে পারবে না। সে কোনো রকমে যাত্রামাত্রের দ্বারা নির্বাহ করে আর এক - দুটি সন্তান উৎপন্ন করে মোক্ষ-সাধনের জন্য অরণ্যবাসী হবে, এইজন্য আর্যদের গৃহস্থাশ্রমও হল তপস্বীদেরই আশ্রম, অর্থাৎ সম্পূর্ণ আর্য সমাজই হল ত্যাগী আর

¶ মহা০ উদ্যোগ০ ৩৯|৮৪। চতুর্থপাদ "ইতি পশ্যন্ন মুহ্যতি" আছে।

তপস্বীদের সমাজ।

আর্যদের এরকম ত্যাগী আর তপস্বী আদর্শ গৃহস্থের বর্ণনা আর্যদের ইতিহাসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সমস্ত ঋষি-মুনি গৃহস্থই ছিল, তাদেরও স্ত্রী আর সন্তান ছিল, কিন্তু জীবন-যাপন সর্বদা সরল আর তপস্বীদের মতো ছিল। অনসূয়া আর শকুন্তলা আদি ঋষিপত্নি আর ঋষিকন্যারা অরণ্যবাসিনীই ছিল। রামচন্দ্র আর পাণ্ডবেরা গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গেই চোদ্দো-চোদ্দোটা বছরের বনবাস সরলতার সঙ্গে কেটে দিয়েছিল। এর দ্বারা সেই সময়ের জীবনের আর সেই সময়ের গৃহস্থীর সম্বন্ধে ভালো করে অনুমান করা যেতে পারে। সেই সময়ের ঋষিও গৃহস্থ ছিল, তাদেরও ঋষিপত্নি ছিল, সন্তান ছিল আর বিবাহ আদি হতো। তারা মূর্খ ছিল না, কিন্তু এত বিদ্যাপ্রেমী আর জ্ঞানপটু ছিলেন যে আজকের সংসার তাদের এঁটো খাবার খেয়ে বিদ্বান হয়, কিন্তু তাদের গৃহস্থীর এটা কেমন সৌম্য ছিল! এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে আর্যগৃহস্থও কত সরল আর সহজ গৃহস্থীর সঙ্গে বসবাস করতো আর আর্য সভ্যতাকে কত অল্প সংগ্রহের দিকে অগ্রসর করা হয়েছিল। এটাই হল ত্যাগবাদ।

এই ধরনের ত্যাগবাদের সমানতার দ্বারা সংসার থেকে তিনটি বিষয় উঠে দাঁড়ায়। সবার আগে তো চোরের অভাব হয়ে যায়। যেখানে সকল মানুষ সরল, তপস্বী আর সমান অর্থের হয়, সেখানে অধিক পদার্থ সংগ্রহ করার প্রবৃত্তিই হয় না। চুরি তো তখনই হয় যখন কারও কাছে অধিক আর কারও কাছে কম পদার্থ থাকে, কিন্তু যেখানে সমানতা রয়েছে - যেখানে মোহ উৎপন্ন করে এমন কোনো পদার্থই নেই, সেখানে কেউ কারও পদার্থই নিবে না। দ্বিতীয় বিষয় যেটা উঠে যায় সেটা হল ব্যভিচার। যেখানে মানুষ তপস্বী আর সমান অর্থের হয় সেখানে এই বিষয়টা হয় না যে, কারও অনেক ধনের কারণে দু-দুটি বিবাহ হয়েছে আর কারও বিয়েই হয়নি। সেই সময় তো সকলে স্ত্রী প্রাপ্ত করে আর ব্যভিচার কমে যায়। তার সঙ্গে যখন শৃঙ্গার সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার হয়ে যায় তখন শোভা-শৃঙ্গারের কারণে যেসব ব্যভিচার হয়, সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। এই দুই মন্দ বন্ধ হয়ে যেতেই তৃতীয় মন্দ লড়াই-ঝগড়া, মারপিট, পঞ্চায়েত আর আদালত আদি কলহের সমস্ত অঙ্গ পূর্ণরূপে উঠে যায়। এখানেই শেষ নয়, কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মোহ আর মত্সর আদি মানসিক বিকারও দূর হয়ে যায়, কারণ সংসারের মধ্যে অর্থ-কাম বা ধন আর স্ত্রীর জন্যই তো ঝগড়া। যখন সবাই সমান সম্পত্তি আর সমান স্ত্রী প্রাপ্ত করবে তাহলে কিসের জন্য বৈমনস্য? এইজন্য আর্য সভ্যতা বলে যে -

মাতৃবত্‌পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ঠবত্।
আত্মবত্ সর্বভূতেষু য়ঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।

(পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদঃ ৪৩৫)

অর্থাৎ - যে পরস্ত্রীকে মাতার সমান, পরধনকে কাঠের সমান আর সমস্ত প্রাণীকে নিজের সমান দেখে, সে-ই আসলে দেখে।

এটাই হল কারণ যে আর্যরা নিজেদের সভ্যতার মধ্যে অত্যন্ত সরলতা, তপস্যা আর ঈশ্বরপরায়ণতাকে স্থান দিয়েছে, কিন্তু বৈদিক ঋষিগৃহস্থের উপরিউক্ত বস্তু দেখে এমনটা ভাবা উচিত নয় যে এটা সন্ন্যাসীদের গৃহস্থী। আমি গৃহস্থকেও ফলাহারী, বল্কলধারী আর মাটি তথা কাষ্ঠাদি পাত্র দ্বারা যে নির্বাহ করা লিখেছি,

সেটাই উপযুক্ত। আজও লক্ষ-লক্ষ জঙ্গলবাসী গৃহস্থ এইভাবেই জীবনযাপন করে। তাদের থেকে যদি এক স্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের সমস্ত জীবন সন্ন্যাসীদের মতোই হবে। এটাই হল কারণ যে তাদের মধ্যে চুরি, ব্যভিচার আর লড়াই-ঝগড়া খুবই কম হয়ে থাকে। আজ যদি তাদের মধ্যে অহিংসা, সৃষ্টিজ্ঞান আর ঈশ্বরপরায়ণতা হতো তাহলে আমরা তাদেরই ঋষি বলতাম, কিন্তু ঋষিত্ব প্রাপ্ত করার জন্য আর্য সভ্যতার অনুকরণ করতে হয় - ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকেই গায়ত্রী, প্রাণায়াম, ব্রহ্মচর্য, সৃষ্টির কারণের জ্ঞান আর সাম্যবাদের অভ্যাস করতে হয়, এইজন্য জংলী সভ্যতা আর আর্য সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ হল এটাই যে আর্যসভ্যতা বিচারপূর্বক স্থির করা হয়েছে আর জংলী সভ্যতা অজ্ঞানের কারণে আপনা-আপনি হয়ে গেছে।

আর্যসভ্যতাতে শিশুকাল থেকেই ব্রহ্মচারীর মনে বসিয়ে দেওয়ার আয়োজন করা হয়, এইজন্য ব্রহ্মচারী গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বৃদ্ধিকারক বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করে, ব্রহ্মচর্য দ্বারা উৎপন্ন বীর্যকে প্রাণায়াম দ্বারা উর্ধ্বগামী করে আর "**সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ত্** (ঋঃ ১০|১৯০|৩)" এর নিত্য পাঠ দ্বারা সৃষ্টির মহান কারণ পরমেশ্বরকে জানে। এই মন্ত্র তাকে নিত্য শিক্ষা দেয় যে পরমেশ্বর এই সৃষ্টি সেইভাবে নির্মাণ করেছে যেরকমটা পূর্বকল্পে নির্মাণ করেছিল। এই সব বৈদিক ক্রিয়ার দ্বারা তারা সরল, তপস্বী আর ঈশ্বরপরায়ণ হয় তথা সর্বদা সহপাঠিদের সঙ্গে সমানভাবে থাকার কারণে তাদের মধ্যে ত্যাগভাবের সমানতার ভাব পুষ্ট হয়ে যায়, অতএব আর্যদের সাম্যবাদ তার অনন্য ছায়ার সঙ্গে সামনে বেরিয়ে আসে। আর্যদের প্রাচীন বৈদিক সাম্যবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ব্রহ্মচারীদের জন্য সত্যার্থ প্রকাশের মধ্যে লিখেছেন যে *"সকলের জন্য তুল্যের বস্ত্র, ভোজ্যদ্রব্য, আসন দিতে হবে, তা সে রাজকুমার বা রাজকুমারী হোক বা কোনো দরিদ্রের সন্তান হোক সবাইকে তপস্বী হওয়া উচিত"*|এখানে সাম্যবাদের সঙ্গে তপস্বীজীবনের কথা বলা হয়েছে যা খুবই মহত্বপূর্ণ।

এইভাবেই সাম্যবাদের চর্চা করে গীতারহস্য পৃষ্ঠা ৩৬৮ আর ৪০৪ এর উপর লোকমান্য তিলক মহাশয় বলেছেন যে "সাম্যবুদ্ধিকে বাড়িয়ে রাখার অভ্যাস প্রত্যেক মানুষকে করতে থাকা উচিত আর এই ক্রম দ্বারা সারা সংসারের মানুষের বুদ্ধি যখন পূর্ণ সাম্য অবস্থাতে পৌঁছে যাবে তখনই সত্যযুগের প্রাপ্তি হবে তথা মানবজাতির পরম সাধ্য প্রাপ্ত হবে অথবা পূর্ণ অবস্থা সকলের প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কার্য-অকার্য শাস্ত্রের প্রবৃত্তিও এইজন্য হয়েছে আর এই কারণে তার ভবনকেও সাম্যবুদ্ধির ভিত্তির উপরেই দাঁড় করানো উচিত।

অহিম্সকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ।

ভবেত্ কৃতয়ুগপ্রাপ্তিরাশীঃ কর্মবিবর্জিতা।

(মহা০ শা০ ৩৪৮|৬৩)

অর্থাৎ - আত্মজ্ঞানী, অহিংসক, একান্ত ধর্মের জ্ঞানী আর প্রাণীমাত্রের শুভকারী পুরুষদের দিয়ে যদি এই জগৎটা ভরে যায় তাহলে আশীঃকর্ম অর্থাৎ কাম্য অথবা স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা করে থাকা সমস্ত কর্ম এই জগৎ থেকে দূরে সরে গিয়ে পুনঃ কৃতযুগ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কারণ এরকম স্থিতিতে সমস্ত পুরুষ জ্ঞানবান হওয়ার কারণে কেউ কারও ক্ষতি তো করবেই না প্রত্যুত প্রত্যেকটা মানুষ সকলের কল্যাণের উপর ধ্যান দিয়ে

তদনুসারেই শুদ্ধ অন্তঃকরণ আর নিষ্কামবুদ্ধির দ্বারা নিজের-নিজের ব্যবহার করবে। আমাদের শাস্ত্রকারের মত হল, অনেক প্রাচীনকালে সমাজের এরকমই স্থিতি ছিল আর সেটা পুনঃ কখনও না কখনও প্রাপ্ত হবেই।" এই বর্ণনার মধ্যে লোকমান্য মহাশয় পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, সব প্রাণীদের সুখের ধ্যান রেখে যে সাম্যবাদ হবে সেটাই সত্যযুগ নিয়ে আসবে।

এই হল আর্যসভ্যতার সাম্যবাদের উদাহরণ, এইসব উদাহরণের মধ্যে সমস্ত সংসারের মানুষ আর প্রাণীদের ধ্যানে রেখে সাম্যবাদের চর্চা করা হয়েছে আর সবগুলোর মধ্যে সরলতা আর তপস্বীজীবনের ঝলক বিদ্যামান রয়েছে, এইজন্য আমি বলেছি যে, ইউরোপ আর আর্য সাম্যবাদের মধ্যে মহান পার্থক্য রয়েছে। আর্যদের সাম্যবাদ অর্থাৎ ত্যাগবাদ আস্তিকতা থেকে উৎপন্ন হয়ে আর সমস্ত প্রাণীকে সুখী বানিয়ে পরমাত্মার দর্শন করায় আর ইউরোপের সাম্যবাদ ঘৃণিত আর অপবিত্র কামুকতাকে বাড়িয়ে মানুষকে পতিত করে। আর্যদের তপস্বী আর ত্যাগী-জীবন সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু আর সমস্ত বৃক্ষের মূলকারণের উপরে গম্ভীরতাপূর্বক বিচার করে আর সেই বিচারকে ধার্মিক দাঁড়িপাল্লার দ্বারা সকলকে সকলের লাভ পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সকলকে মোক্ষাভিমুখী বানায় আর সমস্ত প্রাণীসমূহকে এই প্রাকৃতিক অত্যাচার পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে আকাশস্বরূপ অনন্ত পরমাত্মার আনন্দময়ী কোলে স্বতন্ত্রতার সঙ্গে বিচরণ করার প্রেরণা করে, কিন্তু ইউরোপের সাম্যবাদ এইসবের মূল পরমাত্মাকেই সরিয়ে দিচ্ছে, এইজন্য আর্যদের শুদ্ধ ধর্মের তুলনা ইউরোপের কোনো নীতির সঙ্গে হওয়া সম্ভবই না।

আর্যদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত শুদ্ধ ধর্মের আচার আর প্রচার ছিল ততদিন পর্যন্ত তারমধ্যে সবদিক দিয়ে শান্তি ছিল, কিন্তু কারণবশত যখন আর্যদের মধ্যে প্রমাদ বাড়ে আর তারা শুদ্ধ বৈদিক ধর্মের মূল ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কঠিন তপ থেকে সরে যেতে থাকে তখন এর ফল এই হয় যে তাদের একটি অনেক বড়ো দল ব্রাত্য করে পৃথক করে দেওয়া হয় যা দেশ-দেশান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে যায় আর নিজের রূপ, ভাষা আর আচরণ-ব্যবহার আর্যদের বিপরীত বানিয়ে এখানে পুনঃ আসে আর থেকে যায়। এর পরিণাম এই হয় যে, তাদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে অবশিষ্ট বেঁচে থাকা শুদ্ধ আর্যও বিলাসী হয়ে যায় আর নিজের বিলাসোৎপাদক পদার্থকে বিক্রি করার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন দেশের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে থাকে। এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের এই বিলাসপ্রমাদ জারি থাকে, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশ তার নকল করা আরম্ভ করে দেয় আর স্পর্ধাতে তাদেরও আগে চলে যায়। এই স্পর্ধাবৃদ্ধির কারণে যা কিছু দুঃখজনক পরিণাম হয়েছিল, সেটা আজ সকলের সামনে রয়েছে।

আর্যদের এই ধার্মিক ইতিহাস বলছে যে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ যতই হোক না কেন আর যত মানুষই সরল, তপস্বী তথা ঈশ্বরপরায়ণ হোক না কেন, কিন্তু দিন বা অনেক বছর পরে সমাজের মধ্যে এরকম মানুষ অবশ্যই উৎপন্ন হয়ে যায় যারা ধার্মিক বন্ধনগুলোকে ভেঙে ফেলে আর পাপাচরণে রত হয়ে যায়। এর কারণ হল জীবের স্বতন্ত্রতা। যদিও কর্মফল ভোগের মধ্যে জীব পরতন্ত্র, কিন্তু কর্ম করতে স্বতন্ত্র, এইজন্য তার এই স্বতন্ত্র কর্মণ্যতার কারণ প্রবন্ধকারীকে হেরে যেতে হয়। এমনকি মানুষকে কর্মানুসারে দণ্ড দিয়ে সংসারকে আদর্শরূপ রাখতে পরমাত্মাকেও হেরে যেতে হয়। পরমাত্মা অসংখ্যবার মানুষকে তার কুকর্মের কারণে

বড়ো-বড়ো পাপ-য়োনির মধ্যে ফেলে দিয়ে শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে পাপ কর্ম করা বন্ধ করেনি অর্থাৎ মানুষ অন্য মানুষ আর অন্য প্রাণীদের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করেনি। আজও দুরাচারী আর অত্যাচারী মানুষ মানুষের আর অন্য প্রাণীদের এত কষ্ট দেয় যে কখনও-কখনও সেই কষ্ট, পীড়া আর যন্ত্রণায় লক্ষ-লক্ষ প্রাণীদের অকালেই মরে যেতে হয়, এইজন্য অত্যাচারীদের দ্বারা দেওয়া কষ্ট আর মৃত্যুর থেকে বাঁচার জন্য আর্যরা নিজেদের সভ্যতার মধ্যে শুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে আপদ্ধর্মকেও স্থান দিয়েছে আর আপদ্ধর্মের সময়ে শুদ্ধধর্মের নিয়মকে সুধরে নিতে অথবা সর্বদাই পাল্টে দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছে।

আপদ্ধর্ম

এই সৃষ্টির মধ্যে জীব অসংখ্য রয়েছে। সেইসব হয়তো অত্যন্ত ছোটো-ছোটো পার্থিবকণার থেকেও অধিক রয়েছে। এই জীবের মধ্যে মানুষও রয়েছে। মানুষের যেরকম শক্তি সেটা সবকিছুর উপর সুপরিচিত, এইজন্য এটা বলতে মোটেও সন্দেহ নেই যে সংসারের মধ্যে জীবেরও এক বিশেষ শক্তি রয়েছে। এই জীব মানব-শরীরে এসে নিজের সামূহিক শক্তির প্রয়োগ করে তখন সেই শক্তি এত প্রবল হয়ে যায় যে ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত বড়ো-বড়ো প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেও বিপ্লব উৎপন্ন করে দেয়। এটাই হল কারণ যে, সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে কোথাও-না-কোথাও কম বেশি ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে আর এটা জানা কঠিন হয়ে যায় যে, মানুষের সামুদায়িক শক্তির প্রয়োগ কখন কোথায় হয়েছে আর তারদ্বারা কখন, কোথায়, কি অপবাদটা উঠে দাঁড়িয়েছে। যদিও এটা অজ্ঞাত তথাপি এটা নিশ্চিত যে মানুষের নিয়ম বিরুদ্ধ কর্মজন্য অপবাদের কারণে নানা প্রকারের অস্বাভাবিক উৎপাত উৎপন্ন হয়ে যায় আর সেটা শুদ্ধধর্মের দ্বারা থামানো যায় না। প্রত্যুত যেভাবে সেটা অনিয়মিত রীতিতে উৎপন্ন হয় ঠিক সেইভাবে তার প্রতিকারও অনিয়মিত সিদ্ধান্তের দ্বারাই হয়ে থাকে। এই অনিয়মিত সিদ্ধান্তেরই নাম হল আপদ্ধর্ম।

আপদ্ধর্ম অপবাদের সঙ্গে থাকে, যেখানে অপবাদ রয়েছে সেটাই হল আপদ্ধর্ম। এর কারণ হল এটাই যে, যখন অপবাদ দ্বারা অনিয়মিততা উৎপন্ন হয় আর সেই অনিয়মিততার কারণে দুঃখ আর মৃত্যু ভয় অধিক উৎপন্ন হয়ে যায় আর সম্মুখে আসন্ন ভয়ংকর হিংসা দেখা যায় তখন অনিয়মিত আপদ্ধর্মের দ্বারাই সেই আসন্ন ভয়ংকর হিংসার মূলকে নষ্ট করা হয়। যদি এরকমটা না করা হয় তাহলে অপবাদের বৃদ্ধি অধিক হয়ে যাবে আর সমস্ত সংসার অনিয়মিত দুঃখের কারণে সমূল নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আর্য সভ্যতার মধ্যে প্রাণীদের দুঃখ দেখা অনুচিত বলে মনে করা হয়েছে, এইজন্য আর্যরা আসন্ন হিংসার হিংসাকেই উচিত বলে মনে করেছে আর তাকেই আপদ্ধর্ম বলা হয়েছে, কারণ সংসারের মধ্যে হিংসার সমুদ্র উথলে পড়ছে আর চার প্রকারের হিংসার দ্বারা প্রাণীসংহার হচ্ছে, যথা -

১. ঝড়, বজ্রপাত, প্লাবন আর বর্ষা আদির কারণে অসংখ্য জীব অকালেই মরে যায়,
২. বাঘ, সিংহ, চিতা, সাপ আর অন্য প্রাণীদের দ্বারা সহস্র সহস্র জীব মরে যায়,
৩. মানুষের দ্বারা লক্ষ-লক্ষ পশু-পক্ষী আদি মরে যায় আর
৪. মানুষের দ্বারা মানুষেরও সংহার হয়।

হিংসার এই চারটি শ্রেণীকে দুটিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম বিভাগে প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সমাবেশ হতে পারে আর দ্বিতীয় বিভাগে তৃতীয় আর চতুর্থ শ্রেণীর। প্রথম বিভাগটির মধ্যে অমানুষী হিংসা রয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে মানুষী, তবে প্রথম বিভাগের হিংসার কারণ হল দ্বিতীয় বিভাগই, কারণ যত প্রাণী প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা আর সিংহাদি প্রাণীদের দ্বারা অকালে মরে যায় তারমধ্যে বহু সংখ্যক সেই পাপের ফলের কারণে মরে যায় যা সে কখনও মানব-শরীরে থেকে করেছিল। যদি সে নিজের মানব-শরীরের দ্বারা পাপ না করতো তাহলে এখানে এই ভোগ-শরীরে পীড়া হতো না, কিন্তু সে মানব-শরীর দ্বারা নানা প্রকারের দুষ্কর্ম করেছে, এইজন্য প্রাকৃতিক বিপ্লব আর অন্য প্রাণীদের দ্বারা এখানে তার দুর্গতি হয়। সাপ পোকামাকড়কে খায়, ময়ূর সাপকে খায় আর কুকুর ময়ূরকে খেয়ে ফেলে, একইভাবে গাভী ঘাসকে খায় আর গাভীকে বাঘ খাচ্ছে। এটাই হল নরকের যন্ত্রণা আর এটাকেই অমানুষিক হিংসা বলে, কিন্তু মানুষী হিংসা হল এর থেকেও উল্লেখযোগ্য। তার দুটি বিভাগ রয়েছে - একটি হল অজ্ঞাত হিংসা আর দ্বিতীয়টি হল জ্ঞাত হিংসা।

অজ্ঞাত হিংসা হল সেটা যা বিনা ইচ্ছায়, কেবল শরীরের সক্রিয়তার কারণে হয়ে যায় আর জ্ঞাত হল সেটা যা জেনেশুনে করা হয়। মানুষ যতই সাবধানতার সঙ্গে ভালো ব্যবস্থা করুক না কেন, সে অজ্ঞাত হিংসার থেকে বাঁচতে পারবে না। চলাফেরাতে, কাজ করতে, পানাহার করতে কিছু-না-কিছু প্রাণীর নাশ হয়েই যায়। এটাকে হিংসা মেনেই আর্যরা পঞ্চমহাযজ্ঞকে নিত্য করার আজ্ঞা দিয়েছে, কিন্তু এই হিংসা স্বীকারের এই অর্থ নয় যে, যখন অজ্ঞাত অবস্থাতে সূক্ষ্ম জীবের হিংসা হয়ে যাচ্ছে তাহলে নিয়ে আসো গাভী, মোষ, ছাগ আর মুরগিকেও মেরে খাওয়া যাক। নিজের স্বার্থের জন্য প্রাণীদের হিংসা করা হল এক কথা আর অজ্ঞাত অবস্থায় কৃমি কীটপতঙ্গ আদিকে মারা অথবা নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সিংহ, সর্পাদিকে মেরে ফেলা হল অন্য কথা। এখানে তো **"দৃষ্টিপূতম্ ন্যসেত্ পাদম্ বস্ত্রপূতম্ জলম্ পিবেত্"** (মনুঃ ৬|৪৬), অর্থাৎ চলার সময় সম্মুখে ভালো করে দেখে চলা, ছেঁকে জল পান করার পরেও যে হিংসা হয়ে যায় তারই গণনা অজ্ঞাত হিংসার মধ্যে রয়েছে আর এই অজ্ঞাত হিংসা থেকে কোনো প্রকারে বাঁচার উপায় নেই।

এখন আসছি জ্ঞাত হিংসার উপর, জ্ঞাত হিংসার দুটি বিভাগ রয়েছে - প্রথম বিভাগটি মানুষের অতিরিক্ত অন্য প্রাণীদের হিংসার সঙ্গে সম্বন্ধিত আর দ্বিতীয় বিভাগটি মানুষের হিংসার সঙ্গে সম্বন্ধিত। এই উভয় প্রকারের হিংসাকে মানুষ কর্মযোনি হওয়ার কারণে জেনেশুনে করে থাকে, এইজন্য সে হিংসার ফল পায় আর অন্য যোনিগুলোতে গিয়ে নানা প্রকারের উপরিউক্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। যদিও উভয় প্রকারের হিংসার মধ্যে পাপ হয়, কিন্তু এরমধ্যে মানুষের নাশ সম্বন্ধিত হিংসা তো খুবই মারাত্মক। মানুষকে মারা তো দূরের কথা আর্যরা তো মানুষকে কটু বাক্য বলার মধ্যেও হিংসা মানে। এমনকি কারও প্রতি মনের

মধ্যে দুষ্ট বিচার নিয়ে আসাকেও হিংসা বলেছে। বলার তাৎপর্য এই হল যে, মানুষকে এই জ্ঞাত হিংসা থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত, কিন্তু যেরকম উপরে চারটি শ্রেণীর হিংসার বর্ণনা করা হয়েছে তার থেকে এটাই প্রতিত হয় যে সংসারের মধ্যে হিংসার একটা প্রচণ্ড প্রবাহ বয়ে চলেছে যাকে নির্মূল করা সম্ভব নয়, কারণ এই হিংসা-প্রবাহটাই হল সংসারের মূলকারণ। যেদিন হিংসার উন্মূলন হয়ে যাবে সেদিন সৃষ্টিও সমাপ্ত হয়ে যাবে, কারণ কায়িক, বাচিক আর মানসিক হিংসার দ্বারাই মানুষের দুঃখ হয় আর অন্যকে দুঃখ দেওয়াটাই হল পাপ আর পাপের ভোগই হল সংসারের কারণ, এইজন্য সংসারের মূলকারণ এই হিংসার অত্যন্তাভাব হওয়াই সম্ভব না। তা সে যতই ধার্মিক প্রবন্ধ করা হোক না কেন, হিংসাকারী মানুষের উৎপত্তি হয়ে যাবেই আর শুদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অপবাদ হয়ে যাবেই। পরিব্রাত্ তা সে যতই সদাচারের প্রচার করুক অর্থ আর কামের মধ্যে - লোভ আর মোহের মধ্যে বৃদ্ধি হয়ে যাবেই আর হিংসা অর্থাৎ পাপজন্য পীড়ার দ্বারা মানুষের দুঃখ হবেই। যত ধরনের দুঃখ রয়েছে - বেদনা রয়েছে সব হল মৃত্যুর ছোটো-বড়ো পথ, সবকিছুর সমাপ্ত মৃত্যুর মধ্যেই হয় আর সব কোনো-না-কোনোভাবে মৃত্যুর নিকটই নিয়ে যায়, এইজন্য অপবাদের থেকে উৎপন্ন হওয়া মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য আপদ্ধর্মের যোজনা হয়েছে। ভগবান্ মনু বলেছেন যে -

বিশ্বৈশ্চ দেবৈঃ সাধ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
আপত্সু মরণাদ্ভীতৈর্বিধেঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ।।
(মনুসংহিতা ১১|২৯)

অর্থাৎ - সকল দেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ আর ঋষিগণ আপদকালের সময় মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য ধর্মের প্রতিনিধি এই আপদ্ধর্মের রচনা করেছে।

একে নীতিও বলা হয়। এই নীতি শুদ্ধ সত্যের আস-পাশেই থাকে। একেই বেদের মধ্যে ঋত বলা হয়েছে। বেদের মধ্যে **"ঋতম্ চ সত্যম্ চ"** (ঋঃ ১০|১৯০|১), এর মতো এই ঋত সত্যের সঙ্গেই আসে, কারণ সত্য হল শুদ্ধধর্ম আর ঋত হল আপদ্ধর্ম। এই আপদ্ধর্ম ধার্মিক, সামাজিক আর রাজনৈতিক তিন প্রকারের হয়ে থাকে। অথর্ববেদের ৮|৯|১৩ এরমধ্যে লেখা রয়েছে যে -

ঋতস্য পন্থামনু তিস্র আগুস্রয়ো ঘর্মা অনু রেত আগুঃ।
প্রজামেকা জিন্বত্যূর্জমেকা রাষ্ট্রমেকা রক্ষতি দেবয়ূনাম্।।

অর্থাৎ - ঋতের তিনটি মার্গ চলে আর তিনটিকে অনুধর্মা বলে - প্রথমটি প্রজা (সমাজের) বলের রক্ষা করে, দ্বিতীয়টি রাষ্ট্র (রাজনীতির) রক্ষা করে আর তৃতীয়টি ব্যক্তি (ধর্মের) রক্ষা করে, অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধার্মিক তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে অনুধর্ম অর্থাৎ ঋতের তিনটি মার্গ চলে।

যখন যেখানে যেরকম আবশ্যকতা হবে তখন সেখানে সেরকম ব্যবহার করা উচিত। ভাগবত ১১|১৯|৩৮ এরমধ্যে ঋতের ব্যাখ্যা করে **"ঋতম্ চ সূনৃতা বাণী"** বলা হয়েছে। সূনৃতা শব্দের অর্থে টীকাকার লিখেছে যে **"সত্যপ্রিয়াবাক্ সূনৃতা"**, অর্থাৎ প্রিয় সত্য বাণীকে সূনৃতা বলে। প্রিয় সত্য আর শুদ্ধ সত্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেরকম পার্থক্যই ঋত আর সত্যের মধ্যে রয়েছে। প্রিয় সর্বদা শুদ্ধ সত্য থাকতে পারে না। কখনও-কখনও প্রিয়তার কারণে শুদ্ধ সত্য থেকে সরে যায়, এইজন্য ঋত আপদ্ধর্মের

আর সত্য শুদ্ধধর্মের প্রতিনিধি মানা হয়েছে। শুদ্ধধর্ম আর আপদ্ধর্ম সর্বদা সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধার্মিক ব্যবহারের মধ্যে সঙ্গে-সঙ্গে থাকে, অতঃ যখন যার আবশ্যকতা হয় তখন সেটাই আগে হয়ে যায়। ঋগ্বেদ ৬|৪৭|৭ এরমধ্যে খুবই স্পষ্ট রীতির সঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে যে **"ভবা সুনী তিরুত বামনীতিঃ"**, অর্থাৎ সুনীতি - ধর্ম দ্বারা অথবা বামনীতি - আপদ্ধর্ম দ্বারাই সর্বদা কাজ সিদ্ধ করা উচিত। এর কারণ স্পষ্ট যে, যখন দুষ্ট মানুষের সঙ্গে আচরণ করতে হয় আর দুঃখের থেকে ত্রাস উৎপন্ন হয় - আসন্ন মৃত্যুর ভয়ংকর দুঃখ সামনে দেখা যায় তখন আপদ্ধর্মের দ্বারাই নিজের রক্ষা করা যেতে পারে। বলা হয় যে, হিন্দু আর মুসলমানদের লড়াইয়ের মধ্যে বেশিরভাগ মুসলমান সেনাধ্যক্ষ নিজের সেনার সামনে অনেকগুলো গাভীকে দাঁড় করিয়ে দিতো। এর ফল এই হতো যে, হিন্দু সৈনিক গোবধের ভয়ে গুলি চালানো বন্ধ করে দিতো আর মুসলমান সৈনিক তাদের উপরে গুলি চালিয়ে বিজয় প্রাপ্ত করে নিতো, কিন্তু যদি হিন্দু সৈনিক আপদ্ধর্মের অনুসারে সেই সময় গোবধকে পাপ না মনে করতো আর গুলি চালানোর আজ্ঞা দিয়ে দিতো তাহলে আজ দেশের মধ্যে হিন্দুদের সামনে এত বড়ো গোসংহার হতো না। এর উপরে আপদ্ধর্মের জ্ঞাতা কোনো এক নীতিনিপুণ সত্যই বলেছিল যে, **"ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবম্ ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ"** (কিরাতার্জুনীয়ম্ ১|৩০), অর্থাৎ যে মায়াবিয়দের মায়াকে বুঝতে পারে না সে মূঢ়বুদ্ধি অবশ্যই পরাজিত হয়, এইজন্যই বলা হয়েছে যে **"য়স্মিন্যথা বর্ত্ততে য়ো মনুষ্যঃ তস্মিন্সস্তথা বর্তিতব্যম্ স ধর্মঃ"** (মহাভারত শান্তি০ ১০৯|৩০), অর্থাৎ যে যার সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করে তার সঙ্গে সেই ধরনের ব্যবহার করাই হল ধর্ম, কারণ **"শঠস্য শাঠ্যম্ শঠ এব বেত্তি"** অর্থাৎ শঠকে শঠই শিক্ষা দিতে পারে। এর কারণ এই হল যে, আপত্তির সময় কর্তব্য-অকর্তব্য আর অকর্তব্য কর্তব্য হয়ে যায়। এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে (৪|১৮) বলেছেন যে -

কর্মণ্যকর্ম য়ঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম য়ঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স য়ুক্তঃ কৃত্স্নকর্মকৃত্॥

অর্থাৎ - যে কর্মের মধ্যে অকর্ম আর অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখে, মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান সে হয়, এইজন্য যখন যেখানে যেরকম আবশ্যকতা হবে তখন সেখানে সেরকমই ব্যবহার করা উচিত। এটাই হল আপদ্ধর্মের রহস্য আর এটাই হল তার তাৎপর্য।

আর্যশাস্ত্রের মধ্যে বেদের অতিরিক্ত যেসব স্মৃতিগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোও এক ধরনের আপদ্ধর্মেরই থলি। শ্রুতির সামনে স্মৃতির কোনো গণনা নেই, কিন্তু কখনও-কখনও স্মৃতি দিয়েই কাজ করা হয়ে থাকে, আপদ্ধর্মই হল এর কারণ। একথাটা মান্য যে, মানুষের সেই সমাজই উন্নত থাকতে পারে যারমধ্যে ঋত আর সত্যের তত্ত্বকে সঠিকভাবে বোঝা হয়েছে আর উভয়ের ব্যবহারের কুঞ্জী বলে দেওয়া হয়েছে। আপদ্ধর্ম বা নীতিধর্মের মধ্যে কত দূর পর্যন্ত পাপ রয়েছে আর কত দূর পর্যন্ত ধর্ম রয়েছে, একথার নির্ণয় করা সহজ। শুদ্ধধর্মের উপরে আসা বাঁধার নিবারণ করার জন্য যে বামনীতির দ্বারা কাজ করা হয়েছে যদি সেটা ধর্মোদ্ধারের পরেই ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তো সেটা সংযত আপদ্ধর্ম, অর্থাৎ ঋত নামের নীতিই বলা হবে, কিন্তু যদি ধর্মোদ্ধারের পরেও সেই নীতি ব্যবহারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তাহলে সেটা

ঋত নয় বরং পাপই বলা হবে। ঋতের মধ্যে অর্থাৎ আপদ্ধর্মের মধ্যে বা বামনীতির মধ্যে পাপাংশ রয়েছে, কিন্তু সেটা ধর্মোদ্ধারের কারণ হওয়ার জন্য পাপ বলা হয় না, কিন্তু সেটাই যদি নিজের মনোরঞ্জনের জন্য, অন্যের হানির জন্য সর্বদা ব্যবহারে নিয়ে আসার জন্য নিযুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই পাপ হয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মনুস্মৃতির ১১|৩০, ২৮ এরমধ্যে লেখা রয়েছে যে -

প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য য়োऽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পারায়িকম্ তস্য দুর্মতের্বিদ্যতে ফলম্।।
আপত্কল্পেন য়ো ধর্মম্ কুরুতেऽনাপদি দ্বিজঃ।
স নাপ্নোতি ফলম্ তস্য পরত্রেতি বিচারিতম্।।
(মনুসংহিতাঃ ১১|৩০, ২৮)

অর্থাৎ - ধর্ম পালনের শক্তি থাকার পরেও যে আপদ্ধর্মের সেবন করে সে পরলোকে ফল পায় না, একইভাবে আপত্কালের ধর্মকে যে ধর্মের সময়ে করে, তার কর্মও পরলোকে নিষ্ফল হয়ে যায়, অর্থাৎ তাদের দুজনকেই পাপী মনে করা হয়।

এইসব প্রমাণের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ধর্ম আর আপদ্ধর্মের ব্যবহার নিজের-নিজের সময়েই করা উচিত। আপদ্ধর্মের উত্তম উপযোগ হল এটাই যে, তাকে ধর্মোদ্ধারের জন্যই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ধর্মোদ্ধার হয়ে যাওয়ার পরে, ধর্ম সংকট নিবৃত্তির পরে আর মৃত্যুভয় সরে যাওয়ার পরে বামনীতি অথবা আপদ্ধর্মের ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া উচিত, এটাই হল ধর্ম আর আপদ্ধর্মের ব্যবস্থা। এর একটি উত্তম উদাহরণ ছান্দোগ্য উপনিষদ ১|১০|৩ এরমধ্যে দেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা রয়েছে যে, কুরুদেশের মধ্যে শিলাবৃষ্টির জন্য অকাল পরে যায়। অকালের কারণে উষস্তি ঋষি নিজের স্ত্রী সহিত মাহুতের গ্রামে যায় আর মাহুতকে নোংরা পাত্রে খেতে দেখে ভিক্ষা চায়। মাহুত বলে যে আমার কাছে আর কোনো পাত্র নেই, কেবল এই পাত্রটাই রয়েছে যারমধ্যে আমি খাচ্ছি। উষস্তি বলে যে এটাতেই আমাদের কিছু দাও। মাহুত উষস্তিকে সেই বাসনের মধ্যেই আহার আর জল দেয়। উষস্তি বলে যে এই জলটা এঁটো। এতে মাহুত বলে যে **"ন স্বিদেতেऽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি"**, অর্থাৎ তাহলে কুল্মাষ কি এঁটো ছিল না? তখন উষস্তি বলে যে **"ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্নিতি, কামো মে উদপানমিতি"**, অর্থাৎ এই আহার না পেলে আমরা বাঁচতে পারতাম না, কিন্তু জল তো সর্বত্র ভরে পরে রয়েছে।

এই কাহিনীর মধ্যে ধর্ম আর আপদ্ধর্মের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যে আহারের অভাবে মৃত্যুর ভয় ছিল তা আপদ্ধর্মের দ্বারা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে জলের অভাবে মৃত্যুর ভয় ছিল না, তারজন্য শুদ্ধধর্মের ব্যবহার করা হয়েছে আর এঁটো জল গ্রহণ করা হয়নি। এটাই হল আপদ্ধর্মের আসল পরীক্ষা।

প্রাচীন ঋষিরা এই ধরনের আপদ্ধর্মকে প্রত্যেক সময়ের জন্য খুব যত্ন সহকারে স্থির রেখেছে, এইজন্য সংস্কারের সময় নিশ্চিত করা পর্যন্ত তারা "সর্বকালমিত্যেকে" এর সিদ্ধান্ত স্থির রেখেছে। এটাই হল ধর্ম আর

আপদ্ধর্মের রহস্য, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এরকম সময় না আসে যে এখন ধর্মই চলে যাচ্ছে, মৃত্যুই নিকট চলে আসছে অথবা জাতি বা রাষ্ট্রেরই নাশ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। অথর্ববেদের আজ্ঞানুসারে প্রজা দুঃখী হলে পরে, রাষ্ট্র দুঃখী হলে পরে আর নিজের ধর্মে সংকট আসলে পরেই ঋতের ব্যবহার করা উচিত, এটাই হল নীতি।

আমি গত পৃষ্ঠার মধ্যে বৈদিক অর্থের চারটি বিভাগকে যে প্রমাণের সঙ্গে লিখেছি সেই প্রমাণের সঙ্গে-সঙ্গে সেই গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর বিরোধী প্রমাণও পাওয়া যায়। সেই সবকে এই আপদ্ কোটির মধ্যেই বুঝে নেওয়া উচিত। উদাহরণার্থ মানুষ হল ফলাহারি, কিন্তু দুঃসময় এলে পরে সে অন্নও খেতে পারে। বেদের মধ্যে যে অপূপ, সক্তু আর হবি আদি অন্নমিশ্রিত পদার্থের বর্ণনা রয়েছে সেটা হয় যজ্ঞের মধ্যে হবন করার জন্য বা দুঃসময়ে মানুষের খাওয়ার জন্য হবে। একইভাবে মানুষকে খুবই কম বস্ত্রের সঙ্গে থাকা উচিত - অধোবস্ত্র আর উপবস্ত্রই পরা উচিত, কিন্তু বেদের মধ্যে যে অনেক বস্ত্রের বর্ণনা রয়েছে সেটা শীত প্রধান দেশের মধ্যে বা তুষারের মধ্যে বা কোনো অন্য আবশ্যকতার সময়ে পরার জন্যই হবে। আবশ্যকতা হলে বিপদের সময়ে মানুষ বহুমূল্য, ভড়কদার আর অধিক বস্ত্রও পরতে পারে। সেইভাবে গৃহ মাটি আর তৃণেরই হওয়া উচিত, কিন্তু পুস্তক রাখার জন্য, রাজ্য সামগ্রী তথা কোনো রাজ দরবারের জন্য, যজ্ঞমণ্ডপ আর দুর্গের জন্য বড়ো-বড়ো ইট-পাথরেরও মহল নির্মাণ করা যেতে পারে, দুষ্ট তথা বর্বর শত্রুর থেকে বাঁচার জন্য নানা প্রকারের শস্ত্রাস্ত্র, রসদ, জিনিসপত্র, কল-কারখানা আর যন্ত্রেরও সংগ্রহ আর উপযোগ করা যেতে পারে। এই রকমভাবে বৈদিক অর্থের মধ্যে বলে থাকা এই চারটি বিভাগ এলোমেলো হতে পারে আপদ্ধর্মের সময়ে। এইভাবে আবশ্যকতানুসারে এক বা একের অধিক সন্তানও উৎপন্ন করা যেতে পারে আবার আপত্তির সময়ে অহিংসার স্থানে দুষ্ট শত্রুদের নাশও করা যেতে পারে। এই ধরনের আপদ্ধর্মের পালনের দ্বারা মানুষকে মোক্ষের সোজা মার্গের থেকে যদিও কিছুটা সরে যেতে হয়, কিছুটা পাপও হয়ে যায় আর হিংসাও হয়, কিন্তু কাজ হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ আপত্তি সরে হওয়ার পরে বা সুকাল হলে পরে পুনঃ শুদ্ধধর্মের অনুষ্ঠান হয় আর তারপর মোক্ষমার্গ সোজা হয়ে যায়, কারণ আপত্তিকাল দীর্ঘকাল পর্যন্ত থাকে না আর না আপত্তির সময়ে উপভোগ করা পদার্থের সংস্কার দৃঢ় হয়, এইজন্য আপদ্ধর্মের সময়ে উপযোগ করা ব্যবহার শুদ্ধধর্মের সময়ে কোনো সমস্যাই উৎপন্ন করে না। এটাই হচ্ছে সুনীতি আর বামনীতির নির্ণয় আর এটাই হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে এসে থাকা বিরোধী বচনের সংগতি।

সুকাল আর আপত্কালের চক্কর এসেই থাকে, এইজন্য শুদ্ধধর্ম আর আপদ্ধর্মেরও চক্কর আসতে থাকে। বলা যায় না কখন-কোন আপত্তি এসে যায় আর তারথেকে বাঁচার কোন উপায়টা করতে হয়। এটা ভেবেই আর্যরা নিজেদের সভ্যতার মধ্যে আপদ্ধর্মকে বিশেষ স্থান দিয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে যেভাবে

শুদ্ধধর্ম আশ্রমব্যবস্থার ভূমিকার উপরে স্থির করা হয়েছে ঠিক সেইভাবে আপদ্ধর্ম বর্ণব্যবস্থার ভূমিকার উপর নির্মিত করা হয়েছে। আশ্রমব্যবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধধর্মের ব্যবহার হয় আর মানবসমাজের উপরে কোনো প্রকারের আপত্তি (বিপদ) আসে না, কিন্তু আশ্রমব্যবস্থার তিরোভাবের সঙ্গে-সঙ্গে সংসারের মধ্যে আপত্তির চক্কর শুরু হয়ে যায়, অতএব আপত্তিকে টক্কর দেওয়ার জন্য বর্ণব্যবস্থার আবশ্যকতা হয়।

বলা তো হয় বর্ণ চারটি, কিন্তু সেটাও আশ্রমের মতোই দুটি। দুটি বর্ণ তো দুটি বর্ণের সহায়ক। প্রধান বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় বর্ণেরই গণনা রয়েছে। যখন শুদ্ধধর্মের সময় থাকে সেই সময় সব বর্ণ ব্রাহ্মণ্যই থাকে, কিন্তু আপত্তি (বিপদ) আসতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের আবির্ভাব হয়ে যায় আর চারটি বর্ণের নিজের-নিজের ব্যবহার আরম্ভ হয়ে যায় আর যে যেই কাজের যোগ্য হয় তাকে সেই কাজেই লাগিয়ে দেওয়া হয় তথা আপত্তিগুলোকে দূর করে দেওয়া হয়, এইজন্য বর্ণব্যবস্থার তুলনা শরীরের সঙ্গে করা হয়েছে, মস্তক ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, পেট বৈশ্য আর পা শূদ্র মানা হয়েছে। আপত্তিরহিত অবস্থাতে যেভাবে বিনা হাত আর বিনা পায়ের মানুষ বাঁচতে পারে - যেভাবে বিনা হাত-পায়ের সাপ নিজের পূর্ণ আয়ু জীবিত থাকে, সেইভাবে শুদ্ধধর্মের সময়ে ব্রহ্মপরায়ণ লোকেরাও বাঁচতে পারে, কিন্তু আপত্তির সময়ে বিনা হাত-পায়ের মানুষ কোনো কাজই করতে পারে না। সেই সময় কেবল মস্তিষ্ক দ্বারা সম্পন্নকারী জ্ঞানবিজ্ঞান আর য়োগসমাধি দ্বারা সমাজের কাজ চলতে পারবে না, এইজন্য আপদ্ধর্মের সংরক্ষক ক্ষত্রিয়কেই মানা হয়েছে আর আপদ্ধর্মের সময় সমস্ত প্রজাকে ক্ষাত্রধর্মতে দীক্ষিত হয়ে রাজার আজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রের কাজের বিভাজন করে গুণ-কর্ম-স্বভাবানুসারে নিজের-নিজের কাজের মধ্যে নিযুক্ত হওয়াকেই ধর্ম মানা হয়েছে। এরকম সময়ে সমস্ত সমাজ রাজন্য প্রধান হয়ে যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যেও এই ধরনের সময় এসেগেছে। মহাভারতের মধ্যে লেখা রয়েছে যে, মহাভারতের সময়ে দ্রোণাচার্যাদি ব্রাহ্মণও ক্ষাত্রধর্মের মধ্যেই দীক্ষিত হয়েছিল। এর কারণ হল এটাই যে বিনা এই প্রকারের সংগঠিত শক্তিতে - বিনা প্রত্যেক ব্যক্তির সহযোগে আপত্তির নিবৃত্তি হবেই না। তাৎপর্য এই হল যে যেভাবে শুদ্ধধর্মকালে সমস্ত সমাজ ব্রাহ্মণ্য থাকে, ব্রাহ্মণ রীতি-নীতিরই ব্যবহার হয় আর পরিব্রাতের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সব মানুষ আশ্রমের মধ্যেই স্থির থাকে আর মোক্ষসাধনের মধ্যেই লেগে থাকে, সেইভাবে আপদকালে সমস্ত সমাজ রাজন্য হয়ে যায়, সর্বত্র রাজনীতিরই ব্যবহার হওয়া শুরু করে আর সম্রাটের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সব মানুষ চার বর্ণের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় আর আপত্তিকে সরিয়ে দেওয়ার কাজে লেগে যায়, কিন্তু এর দ্বারা এটা মোটেও ভাবা উচিত নয় যে শুদ্ধধর্মের সময় বর্ণের অভাব হয়ে যায় আর আপদ্ধর্মের সময়ে আশ্রমের লোপ হয়ে যায়, প্রত্যুত এটা ভাবা উচিত যে উভয় সময়ের মধ্যে বর্ণাশ্রমব্যবস্থার কোনো-না-

কোনো বীজাঙ্কুর থেকে যায়, কারণ সুকাল আর আপদকালের চক্কর সর্বদা হতেই থাকে। এটাই হল কারণ যে ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বর্ণব্যবস্থার দুই প্রকারের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেসময় শুদ্ধধর্মের ব্যবহার হয় আর সমস্ত ব্যবহার আশ্রম ব্যবস্থার অনুসারেই চলে সেই সময়ে লোকেরা ব্রাহ্মণ স্বভাবের আর আশ্রমের রঙে রঙিন আর মোক্ষমার্গের পথিকই থাকে। সেই সময়ে সমস্ত কাজ ধর্ম অনুসারেই চলে, কোনো আপত্তি হয় না, এইজন্য কোনো বর্ণের বাস্তবিক স্বরূপও প্রকাশিত হয় না, প্রত্যুত সব বর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু যেসময়ে আপদ্ধর্মের ব্যবহার হয় আর সমস্ত ব্যবহার বর্ণব্যবস্থার অনুসারেই চলে তখন বর্ণব্যবস্থা গুণ-কর্ম আর স্বাভাবানুসারে মানা হয় আর যে যেই কাজের যোগ্য হয় তাকে সেই কাজের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় ভগবান্ মনুর আদেশানুসারে আবশ্যকতা হলে পরে ভূতপূর্ব আপদকালের সময়ে ব্রাহ্মণ লোকেরা শূদ্র হয়ে যায় আর ভূতপূর্ব আপদকালের সময়ে শূদ্র লোকেরা ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। একইভাবে ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যদের বর্ণের মধ্যেও অদল-বদল হয়ে যায়। এর কারণ হল এটাই যে আপত্তির সময়ে বর্ণধর্মের পালন যেন ঠিক-ঠিক ভাবে থাকে। এইজন্য যে যেই কাজকে সঠিকভাবে করতে পারে, তাকে সেই কাজের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়, যাতে কাজের মধ্যে ত্রুটি না আসে আর সংকট এড়াতে সমস্ত সমাজ বর্ণের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ক্ষাত্রধর্ম প্রধান হয়। বলার তাৎপর্য হল ব্রাহ্মণশক্তি আর ক্ষাত্রশক্তি সদা-সর্বদা স্থির থাকে আর আবশ্যকতানুসারে আপদকালে স্পষ্ট রূপে আবির্ভূত হয়ে যায়। এটাই হল আর্যদের নীতির রহস্য আর এটাই হল তাদের বর্ণব্যবস্থার আদর্শ। এই আদর্শের বর্ণনা করে বেদ উপদেশ করেছে -

য়ত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রম্ চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ।
তম্ লোকম্ পুণ্যম্ প্রজ্ঞেষম্ য়ত্র দেবাঃ সহাগ্নিনা।।

(য়জুঃ ২০|২৫)

অর্থাৎ - যেখানে ব্রহ্মশক্তি আর ক্ষাত্রশক্তি একই সঙ্গে থাকে আর যেখানে পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান স্থির থাকে, সেই দেশকেই পুণ্যদেশ বলে।

এই উভয় শক্তির সামঞ্জস্য দ্বারাই দেশের মধ্যে বা জনসমাজের মধ্যে শান্তি স্থির থাকতে পারে, অর্থাৎ দুই শক্তি যখন একে-অপরের সহায়তা করে তখনই লোক - পরলোকের কার্য সম্পন্ন হয়। ভগবান্ মনু বলেছেন -

নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃঘ্নোতি নাক্ষত্রম্ ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রম্ চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে।।

(মনুসংহিতাঃ ৯|৩২২)

অর্থাৎ - ব্রহ্মশক্তি বিনা না তো ক্ষাত্রশক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে আর না ক্ষাত্রশক্তি বিনা ব্রহ্মশক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে, প্রত্যুত উভয়ের মিশ্রণ দ্বারাই লোক-পরলোকের উন্নতি হয়।

এটাই হল আর্যদের নীতি আর এটাই বর্ণব্যবস্থার উপযোগিতা, কিন্তু এই প্রাচীন বর্ণব্যবস্থার বর্তমান দুর্দশাকে জানার পরেও কিছু লোক বলে যে আর্যদের বর্ণব্যবস্থা কোনো কাজের না। তারা এরমধ্যে তিনটি দোষ বলে। তারা বলে যে প্রথমত বর্ণব্যবস্থার দ্বারা সুসংগঠিত মানবসমাজ চারটি বিভাগ হয়ে যায় আর

ঐক্যতা নষ্ট হয়ে যায় তথা যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা ক্ষত্রিয় কিছু পরিমাণই থেকে যায়, শেষ বর্ণ যুদ্ধকলাহীন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত যুদ্ধকারী জাতিরই প্রভুত্ব হয়ে যায় আর সেই জাতির বিশেষ ব্যক্তির হাত দ্বারাই ইচ্ছেমতো শাসন হয়। তৃতীয়ত প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের রণকলা না তো আজকালের বিজ্ঞান আধারিত রণকৌশলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা রাখে আর না তাদের কাছে বর্তমান ইউরোপের মতো কলাযুক্ত শস্ত্রাস্ত্র, যান আর যুদ্ধোপকরণ উপস্থিত রয়েছে, এইজন্য রাষ্ট্রনির্মাণের সেই প্রাচীন বর্ণব্যবস্থার আদর্শ এই সময়ের জন্য উপযুক্ত নয়।

শুনতে যদিও এই শঙ্কাগুলো খুবই প্রবল প্রতিত হয়, তবে বর্ণব্যবস্থার যথার্থ স্বরূপের উপর বিচার করলে পরে তিনটি শঙ্কাই দুর্বল হয়ে যায়। যারা বলে যে বর্ণব্যবস্থা অনৈক্যতা উৎপন্ন করে - এক জাতিকে চার ভাগে ভাগ করে দেয় তারা ভুল করছে, তাদের একথা যথার্থ নয়। এই শঙ্কাটা তো বর্তমান বিশৃঙ্খল বর্ণব্যবস্থাকে দেখে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু বাস্তবিক বর্ণব্যবস্থার মধ্যে এই ধরণের শঙ্কার অবকাশ নেই, কারণ বাস্তবিক বর্ণব্যবস্থার প্রাদুর্ভাব তো আপত্তি (বিপদ) থেকে, সংকট থেকে, মৃত্যু আর দুঃখ থেকে বাঁচার জন্যই হয়ে থাকে আর সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের সম্মতি দ্বারা রাষ্ট্রের কাজ চালানোর জন্য স্থির করা হয় আর যার যেরকম যোগ্যতা হয় তাকে সেই কাজের মধ্যে নিযুক্ত করা হয়, অর্থাৎ সেই নিযুক্তি গুণ, কর্ম আর স্বাভাবানুসারে হয়। কর্ম দ্বারা আর্য আর দস্যুদের বিভাগ হয়ে থাকে, গুণ দ্বারা দ্বিজ আর শূদ্রের বিভাগ হয়ে থাকে আর স্বভাব দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যদের বিভাগ হয়ে থাকে। অন্যায়কারীকে অনার্য বলে, তা সে বিদ্বান হোক অথবা গুণবান কিন্তু যদি তার ব্যবহার ভালো না হয়, যদি সে পাপী আর অন্যায়কারী হয় তাহলে সে আর্যসমাজের মধ্যে থাকতে পারবে না। কর্মের পরীক্ষার দ্বারা অন্যায়কারীকে পৃথক করে শুদ্ধ আর্যদের গুণের পরীক্ষা দ্বারা দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই বিভাগের মধ্যে দ্বিজ আর শূদ্র রয়েছে। যারা ব্রহ্মচর্যপূর্বক বিদ্যা, সভ্যতা আর সদাচাররূপী গুণগুলোকে ধারণ করেছে তাদের দ্বিজ বিভাগের মধ্যে মনে করা হয় আর যারা এই গুণগুলোকে ধারণ করেনি তাদের শূদ্র বলা হয়। বিদ্বান, গুণবান, ব্রহ্মচারী আর সদাচারীরাই রাষ্ট্রের কাজকে চালাতে পারে, এইজন্য দ্বিজদেরই রাষ্ট্রের কাজে নিযুক্ত করা হয়, কারণ আপত্তির সময়ে রাষ্ট্রকে প্রায়শঃ তিন ধরনের উত্তরদায়িত্বের আবশ্যকতা হয়। রাষ্ট্র চায় যে তার উপর যতই আপত্তি আসুক না কেন, তবে বাচ্চাদের শিক্ষার কাজ যেন বন্ধ না হয়। একইভাবে তার উপর যতই সংকট উপস্থিত হোক না কেন, তবে শত্রুর থেকে দেশ আর ধর্মের রক্ষা যেন হয় আর যে রকমই ভয়ংকর সময় হোক জীবিকার প্রবন্ধ যেন শিথিল না হয়ে যায়।

এই তিন প্রকারের প্রবন্ধের জন্য সমস্ত দ্বিজদের তিনটি ভাগে ভাগ করে দিয়ে তিনটি কাজের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই কার্যবিভিন্নতা দ্বিজদের স্বভাবানুসারে করা হয়। যার স্বভাব যেমনটা দেখা যায় তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করা হয়। যে পড়ার প্রতি বিশেষ রুচি রাখে তাকে শিক্ষার কাজ, যে শূরবীর আর নির্ভয় হয় তাকে রক্ষার কাজ আর যে পশুপালন তথা কৃষির প্রতি রুচি রাখে তাকে জীবিকার কাজ দেওয়া হয়। একইভাবে যে অশিক্ষিত (শূদ্র) হয় তাকে সেবার কাজ দেওয়া হয়। আপত্তির সময়ে যদি এই ভাবে কাজের বিভাজন না করিয়ে দেওয়া হয় আর সমস্ত প্রজাকে একই কাজের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে

স্বপ্নতেও কোনোদিন রক্ষা হবে না। সবাই যদি যুদ্ধই করতে লেগে যায় তাহলে সেনার জন্য যুদ্ধোপকরণ যথা শস্ত্র, যান আর খাদ্য কে তৈরি করবে আর আগামী যুবকদের যোগ্য বানানোর জন্য শিক্ষা কে দিবে? এইজন্য আপত্তির সময়ে কাজের বিভাজন করে রাষ্ট্রের কাজ চালানোর জন্য একটি জাতিকে চার ভাগে ভাগ করতেই হয়, তবে এই বিভাজনের এই অর্থ মোটেই নয় যে এক বিভাগ অন্য বিভাগের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখে না। আপত্তির সময়ে সমস্ত বিভাগ একমত হয়ে আপত্তিকে সরিয়ে দেওয়ার কাজে লেগে যায়, যেরকমটা আবশ্যকতা পড়ায় দ্রোণাচার্য শিক্ষার কাজ ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধের কাজে লেগে ছিলেন। বলার তাৎপর্য হল যে আপত্তির সময়ে সমস্ত জনসমাজ রাজার অধীন থেকে নিজের যোগ্যতার অনুসারে আবশ্যক বিভাগের কাজ করে, এইজন্য এই বর্ণব্যবস্থার মধ্যে অনৈক্যতা আর কম সৈনিকের সমস্যা আসে না।

দ্বিতীয় শঙ্কা যার মধ্যে রাজার হাতে রাজ্যের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তারমধ্যেও ভুল রয়েছে। আর্যদের রাজা একা নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারতো না। তার সঙ্গে সর্বদা বিচার করার জন্য এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের সভা থাকতো, যার সম্মতিতে রাজা শাসন করতো, কিন্তু স্মরণে রাখা উচিত যে রাজার মতো এই সভাটিও নিজের ইচ্ছেমতো আইন বানাতে পারতো না। এখানে নতুন আইন বানানোর কোনো প্রথাই ছিল না। এখানে তো পরমাত্মার তৈরী বেদের আইনই চলতো। রাজা আর রাজসভা তো কেবল বেদানুকূল ব্যবহার চলানোর জন্যই ছিল, নতুন আইন বানানোর জন্য নয়, অতএব সেটা একা রাজা হোক অথবা দশ সহস্র সভ্যের সভা হোক কাউকে নতুন ধর্ম, নতুন নিয়ম আর নতুন বিধান জারি করার অধিকার ছিল না। সেই সময়ে এর-ওর বহুমত নেওয়া হতো না। সেই সময়ে তো এই নিয়ম ছিল যে-

একোঽপি বেদবিদ্ধর্মম্ য়ম্ ব্যবস্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ।।
(মনুঃ ১২|১১৩)

অর্থাৎ - যদি সর্ববেদবিদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী একাকীও কোনো ধর্ম ব্যবস্থা করেন তবে সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কারণ সহস্র, লক্ষ-লক্ষ আর কোটি-কোটি বেদহীন ব্যক্তি মিলিত হয়ে কোনো ব্যবস্থা করলেও সেটা কখনও মান্য করা উচিত নয়।

এর কারণ বেদের অপৌরুষেয়তাই ছিল। আর্যদের বিশ্বাসানুসারে বেদই হল এরকম নিয়ম যা ঈশ্বরীয় জ্ঞান হওয়ার কারণে সকলকে সমানরূপে লাভ পৌঁছে দেয়, এইজন্য তারা কখনও নতুন কোনো নিয়ম বা আইন তৈরী করেনি। আজকাল সমাজের মধ্যে যেভাবে বহুমতের প্রথা চলছে, সেটা খুবই হানিকারক, কারণ সংসারের মধ্যে সব মানুষ ধার্মিক হয় না। বিশেষ করে আপত্তির সময়ে তো খুবই কম ব্যক্তি ধর্মাত্মা আর বিদ্বান হয়ে থাকে। যদি সকলেই ধর্মাত্মা আর বিদ্বান হয় তাহলে বহুমতের বা রাজসভার আবশ্যকতাই হবে না। আইনকে পালন করানোর আবশ্যকতা তো তখনই হয় যখন জনসমাজ অশিক্ষিত, অধর্মী আর কর্মহীন হয়, কিন্তু অশিক্ষিত আর অধর্মী সমাজের বহুমতও সেরকমই হয়, যেরকমটা তাদের রুচি হয়। মদ্যপানকারী কখনও মদের বিরূদ্ধে নিজের মত দিতেই পারবে না। বিলাসী, কামলোলুপ, স্বার্থী আর পরোপভোগী কখনও নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজের মত দিতেই পারবে না, এইজন্য সবার মত দ্বারা আইন

বা নিয়ম তৈরীর প্রথা ঠিক নয়। প্রথা তো সেটাই ঠিক হবে যা প্রাচীন বৈদিক আর্যদের সভ্যতার অনুসারে চলানো হবে।

এখন বাকি রইলো তৃতীয় শঙ্কা, তার উত্তরে নিবেদন করবো, যে ধরণের লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত ছিল, সেই লোকেদের দমন করার যোগ্য প্রাচীন আর্যদের কাছে যুদ্ধোপকরণ ছিল, কিন্তু যে ধরণের লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত ছিল না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্য উপকরণও ছিল না। আর্যসভ্যতার মধ্যে যুদ্ধের জন্য স্থান তো রয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের মর্যাদাও রয়েছে। "কখন, কার সঙ্গে, কিভাবে যুদ্ধ করা উচিত" - এই সব কথা আর্যদের সভ্যতার মধ্যে বিশেষ স্থান রাখতো, কারণ আর্যরা যুদ্ধের অর্থ এরকমটা মনে করতো না যে বিনা চিন্তাভাবনা করে যেখানে দেখো সেখানেই যুদ্ধ করে মরো। এইজন্য যুদ্ধের বিষয়ে ভগবান্ মনু লিখেছেন -

অনিত্যো বিজয়ো য়স্মাদ্ দৃশ্যতে যুদ্ধমানয়োঃ।
পরাজয়শ্চ সম্গ্রামে তস্মাদ্যুদ্ধম্ বিবর্জয়েত্।।
এবম্ বিজয়মানস্য য়েऽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশম্ সর্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।।
য়দি তে তু ন তিষ্ঠেয়ুরুপায়ৈঃ প্রথমৈস্ত্রিভিঃ।
দণ্ডেনৈব প্রসহ্যৈতাঁশ্ছনকৈর্বশমানয়েত্।।
(মনুঃ ৭|১৯৯, ১০৭, ১০৮)

অর্থাৎ - সংগ্রামের মধ্যে যুদ্ধকারীর জয় আর পরাজয় অনিত্য, তাই যুদ্ধ করা উচিত নয়। সবার আগে তো বিরোধীকে সাম, দান, ভেদ উপায়ের দ্বারাই বশ করা উচিত, কিন্তু যদি সামাদি তিনটি উপায় দ্বারা শত্রু না মানে তাহলে দণ্ড (যুদ্ধ) করেই বশ করা উচিত।

এই প্রমাণগুলোর দ্বারা বোঝা যায় যে যুদ্ধ খুব বিশেষ কোনো আবশ্যক বস্তু নয়। সেটা তো সেই মূর্খ, জংলী, বর্বর আর অত্যাচারীদের বশ করার জন্য যারা না জ্ঞান জানে, না বিজ্ঞান, না নীতি জানে, না ধর্ম আর না হানি-লাভ জানে, প্রত্যুত লোকেদের উপর অত্যাচার করাই যাদের উদ্দ্যেশ্য। যুদ্ধ তাদের জন্য নয় যারা প্রত্যেক বিষয়কে ভালো করে বুঝতে পারে। এটাই হল কারণ যে আর্যরা সর্বদা বর্বরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছে আর তাদেরই পরাস্ত করেছে। রাবণ থেকে শুরু করে সিকন্দর, গোরী, গজনী আর ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত দের সঙ্গে আর্যরা যুদ্ধ করতে থাকে আর সকলকে পরাস্ত করেছে। যদিও মুসলমানদের পরাস্ত করতে তাদের চারশ বছর লেগেছিল তথাপি শেষে তাদেরও পরাস্ত করে দেয়। বাকি রইলো ইউরোপবাসী, তারাও শুরুতে ব্যবসায়িক রূপে এখানে আসে আর ধীরে-ধীরে দেশের স্বামী হয়ে যায়, অতঃ এদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সঠিক ভাবে সুযোগই আসেনি। এরা শুরুতেই নিজেদের সভ্যতা, প্রবন্ধ, জ্ঞান আর কলাকৌশলের প্রভাব আমাদের উপরে এমনভাবে জমায় যে আমরা এদের নিজের শত্রুই মনে করিনি। শত্রু না মনে করার কারণ এটা ছিল যে এরা বর্বর নয় তবে সভ্য আর উদাত্ত চিন্তাবিদ ছিল। আর্যদের বিশ্বাস ছিল যে এরকম লোকেদের থেকে অধিক ভয় নেই। আর্যদের এই অনুমান ভুল ছিল। তাদের অনুমানের প্রমাণ সময়-সময়ে পাওয়া যায় আর

বিশেষরূপে এইসময় পাওয়া যাচ্ছে। আজ সমস্ত সংসারের মধ্যে সাম্যবাদের যে চর্চা ছড়াচ্ছে, জার্মান যুদ্ধের সময় থেকে এখন পর্যন্ত কোনো দেশ অন্য কোনো দেশের উপরে অধিকার করার জন্য চেষ্টা করেনি, ইংল্যান্ডের অনেক অধীন দেশ ধীরে-ধীরে স্বতন্ত্র হচ্ছে আর ভারতবর্ষের মধ্যেও স্বতন্ত্রতার শঙ্খনাদ চতুর্দিকে বাজছে, এই সমস্ত সংসারব্যাপিনী স্বতন্ত্রতার জন্মদাতা আর বিস্তারকর্তা কে? আমরা, নাকি চীনারা, নাকি আমেরিকানরা, নাকি আফগানিস্থানের পাঠানরা?

আমি তো মনে করি এদের মধ্যে কেউ না। এর যদি কোনো শ্রেয় থাকে তাহলে সেটা কেবল ইউরোপনিবাসিনী জাতিদেরই হবে। তারাই এই সার্বভৌম স্বতন্ত্রতার সিংহনাদ করেছে, অতএব এইধরনের স্বতন্ত্রতাপ্রিয়, বিদ্যাব্যসনী আর উচ্চ চিন্তাবিদ জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আর্যরা কিভাবে প্রস্তুতি নিতো? যে জাতি শুরু থেকেই নিজের উর্বরাশক্তির দ্বারা হর্বর্ট স্পেন্সর, টালস্টায়, লেনিন আর এরকমই অনেক মহান পুরুষের জন্ম দিয়েছে, যে জাতির কয়েক লক্ষ ব্যক্তি আজ বিশ্বস্বতন্ত্রতার চেষ্টা করছে আর যে জাতি সংসারকে অমিত বিদ্যাভাণ্ডারের দান দিয়েছে সেই জাতির সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া আর্য সভ্যতার বিপরীত হবে। তারা তো ধীরে-ধীরে সেই বিষয়ের দিকেই আসছে যা সর্বদা আর্যসভ্যতার অনুকূল, এইজন্য ইউরোপবাসীদের সঙ্গে অথবা এই ধরনের উন্নত সভ্যতা প্রাপ্ত যেকোনো জাতির সঙ্গে আর্যরা যুদ্ধ করে না। এটাই হল কারণ যে এখানে কলাযুক্ত যন্ত্রেরও আবিষ্কার করা হয়নি। এখানকার লোকেদের বিশ্বাস ছিল যে যেসব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে এতো উচ্চ আর উন্নত হবে তাদের থেকে আমাদের অধিক হানি হবে না। আর্যদের এরকম বোঝা আর ধারণাকে রাজনৈতিক ভুল বলা যেতে পারে না। আর্যদের মতো উচ্চ সভ্যতায় পৌঁছে যেকোনো মানবজাতি, তা সে পূর্বে যতোই বর্বর থাকুক না কেন, এরকম পরিণামে পৌঁছায়। ইউরোপের উন্নত মস্তিষ্কও আজ এইরকম পরিমাণে পৌঁছেছে। সেখানেও যুদ্ধকে বন্ধ করাতে আর সংসার থেকে কুটিলতার মূল তুলে ফেলার মতো লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তি জন্মে গেছে। তারিখ ২৬ মে সন ১৯২৫ এর "বর্ত্তমান" পত্রিকায় ছেপেছিল যে "নিজের মৃত্যুর পূর্বে ১০ ডিসেম্বর সন ১৯১০ তে মহাত্মা টালস্টায় একটি পত্র লিখেছিল যে অন্ধকারের সেই দশা যারমধ্যে মানবজাতি ডুবে যাচ্ছে আরও ভয়ংকর হয়ে যেতো যদি কয়েকশ মানুষ নিজের জীবনকে সংকটে রেখে তাকে থামানোর চেষ্টা না করতো। অধিকারীদের পক্ষ থেকে তাদের সব ধরনের দণ্ড দেওয়ার ভয় দেখানো হয়, কিন্তু তারা এক তিলও সরে যায়নি। তারা স্বতন্ত্র থাকার ইচ্ছুক, এইজন্য তারা অধিকারীদের আজ্ঞার পালন করে না, বরং তারা নিজের আত্মার ধ্বনির উপর আচরণ করে। আমি মরার নিকটে, তবে আমি এটা দেখে আনন্দিত যে সেই মানুষদের সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে যারা অধিকারীদের থেকে মানবজাতির সংহারক পদ দেওয়ার পরেও শান্তির সঙ্গে অস্বীকার করে দেয় আর অবজ্ঞা করার দণ্ড স্বয়ং ভোগ করে নেয়। রুসের মধ্যে এরকম যুবক অনেক রয়েছে, যারা জেলের ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করছে। তারা তাদের পত্রের মধ্যে লিখেছে তথা সাক্ষাৎকারীদের বলেছে যে তারা জেলের মধ্যে অনেক শান্তিতে রয়েছে।

কেবল রুসের মধ্যেই নয় বরং মহাযুদ্ধের সময়ে সন ১৯১৫ তে হল্যান্ডের মধ্যেও একটি সংস্থা যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্থাপিত করা হয়েছিল। সেটি একটি ঘোষণা পত্রও বের করেছিল। সেই সময় তার

সঞ্চালককে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কিন্তু এখন হল্যান্ড সরকার তার প্রকাশন তথা তার এক লক্ষ কপি বিতরণ করার আজ্ঞা দিয়ে দিয়েছে। ঘোষণা পত্রের অর্থ এইরকম যে - আমরা যুদ্ধনীতির বিরোধী স্ত্রী-পুরুষদের দেখছি যে লোকজনের মধ্যে শান্তির ভাবনা বেড়ে চলেছে আর যারা সৈনিক হতে চায় না তাদের সংখ্যাটা ধীরে-ধীরে নিরন্তর বেড়ে চলেছে, অতঃ আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমরা নিশ্চয় করে নিয়েছি যে আমরা সব ধরনের সৈনিক চাকরি গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করছি। কেবল ব্যারাক রুম , ট্যাংক, যুদ্ধসৈনিক আর উড়োজাহাজের সার্ভিস থেকেই আমরা প্রত্যাখ্যান করছি না বরং যুদ্ধসামগ্রী নির্মাণের সমস্ত কারখানা আর ট্রান্সপোর্টের ডিপোগুলো থেকেও নিজেদের প্রথক্তা প্রকট করছি। সারাংশ হল যেকোনো কাজ যা যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে, সেগুলোর মধ্যে আমরা ভাগ নিবো না। আমরা যথাসম্ভব যুদ্ধের জন্য একত্র হবে এরকম সৈনিকদেরও একত্রিত হতে দিবো না। যেসব বন্ধুরা যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষপাতী হবে, তারা আমাদের মধ্যে সম্মিলিত হবে আর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তখন সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। এই সংস্থার পক্ষ থেকে একটা পত্রও বের হয়, যা সর্বদা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার করে। আমেরিকান মহিলারাও নিজের দেশের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা খুলেছে।"

এখানেই শেষ নয় কিছু ইউরোপবাসীদের সভ্যতা এত উচ্চতায় পৌঁছে গেছে যে এখন তাদের বৈজ্ঞানিক স্বয়ংই বৈজ্ঞানিক যুদ্ধপকরণের নির্মাণ করার প্রতি বিরোধ করে দিয়েছে। তারিখ ১০ ডিসেম্বর সন ১৯২১ এর "আদর্শ" পত্রিকার মধ্যে লেখা হয়েছে যে "ইটন নগরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর লিটিল্স্টন বলেছিলেন যে সারাটা বছর পূর্ব যুদ্ধবিভাগ (War Office) দুটি বড়ো বৈজ্ঞানিককে লিখেছিল যে তারা যেন এরকম বিষাক্ত গ্যাসের নির্মাণ করে যা অর্ধেক মিনিটের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নগরকে ধ্বংস করে দিতে পারে, কিন্তু দুই বৈজ্ঞানিক এর উত্তরে বলে দেয় যে আমরা বিদ্যার এরকম দুরুপযোগ করতে পারবো না।" ইউরোপের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এখন অধিকাংশ এরকম বিদ্বান রয়েছে যারা যুদ্ধকে পছন্দ করে না। তারা চায় না যে বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানবাসীদের নাশ করা হোক। একথার প্রমাণ সেই পত্র থেকে পাওয়া যায় যা জার্মান যুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, ডাক্তার আর অন্য বিদ্বানেরা জার্মানীর বিদ্বানদের লিখেছিল। সন ১৯২০ তে "হিন্দুস্থান" পত্রের মধ্যে ছাপা হয়েছিল যে "ব্রিটিশ বিদ্বানরা জার্মানীর বিদ্বানদের পত্র লিখেছে - হে জার্মানী আর অস্ট্রিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ! রাসায়নিক আর অন্য বিদ্বানগণ! গত যুদ্ধের কারণে কিছু সময়ের জন্য আমাদের মৈত্রী ভঙ্গ হয়ে যায়, যারজন্য আমরা দুঃখিত আর আমরা জানি যে আপনাদেরও দুঃখিত হতে হয়েছে। আমরা আশা করছি যে পুরোনো মৈত্রীকে পুনঃ মিলিত হওয়ার প্রবন্ধ উভয় পক্ষের বিদ্বান করবেন। যুদ্ধের সময়ে স্বদেশাভিমানের কারণে যাকিছু মন্দবুদ্ধি উৎপন্ন হয়েছে তাকে অতিশীঘ্রই পরিত্যাগ করার আবশ্যকতা রয়েছে। যুদ্ধের সময়ে আমাদের ধ্যান একে-অপরের বিরুদ্ধ দিশার মধ্যে ছিল, কিন্তু এখন উভয় পক্ষের মাঝে বিদ্বানদের মান একই সমান হওয়ায় মিলন হওয়াটা অসম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক শক্তিকে ধ্যানে রেখে এক অথবা একের অধিক জাতির উচিত পরিচয় করার মধ্যে আমাদের দেরি করা উচিত নয়। রাজনৈতিক মতভেদ সংসারের পৃথক-পৃথক জাতির মধ্যে বিক্ষেপ করছে, এরকম অবস্থায়

আমাদের যে সংস্কৃতির আবশ্যকতা রয়েছে সেই মৈত্রীভাব সংস্কৃতির স্থাপনার জন্য যা কিছু করণীয় তা অতি শীঘ্র করা উচিত।"

এই পত্র দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে যুদ্ধের কারণে বিদ্বানদের কষ্ট হয়েছিল, অতঃ তারা মৈত্রীর সংস্কৃতিকে এখন সুদৃঢ় করতে চায়, যার দ্বারা ভবিষ্যতে যেন যুদ্ধ না হয়। এই পত্রটি হল্যান্ড নিবাসীদের ছিল। সারা সংসারের লোকেরা ইংল্যান্ড নিবাসীদের সবথেকে অধিক পতিত বলে মনে করে, কিন্তু সেখানকার বিদ্বানও বৈজ্ঞানিক যুদ্ধকে ভালো মনে করে না। শুধু তাই নয় প্রত্যুত ইংল্যাণ্ডের মধ্যে তো এত ভালো মানুষ উৎপন্ন হয়ে গেছে যে তারা নিজেরই জাতির দুষ্ট মানুষদের থেকে বাঁচার জন্য অন্যদেশের নিবাসীদের সচেতন করে দিতে হাত ছাড়া করে না। একবার জাপানের মারকুইস ইটো জাপানের রক্ষার জন্য হর্বর্ট স্পেন্সরের নিকট কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। স্পেন্সর রক্ষা করার অনেক উপায় বলার সঙ্গে এটাও লিখে দিয়েছিলেন যে "জাপান যেন ইংরেজ অথবা অন্য যেকোনো বিদেশিকে নিজের দেশে বাস করার অধিকার না দেয়"। কত স্পষ্ট সত্য, এইজন্য আমি বলেছি যে জাতির সভ্যতার বিকাশ এই প্রকার হয়ে যায় যে তারা যুদ্ধ থেকে, বৈজ্ঞানিক যুদ্ধোপকরণ থেকে আর প্রত্যেক প্রকারের কুটিলতা থেকে ধীরে-ধীরে সরে যেতে থাকে, অতএব বিজ্ঞান-কুশল জাতিদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের প্রস্তুতি করাটা রাজনৈতিক ভুল হবে আর আর্যদের নিকট কলাযুক্ত যুদ্ধোপকরণের অভাবের কারণ বর্ণব্যবস্থাকে অকেজো বলে দেওয়াটা তার থেকেও অধিক ভুল হবে, কারণ সভ্য জাতির সঙ্গে আর্যরা সর্বদা বৈদিক বিচার আর আর্য-আচরণের দ্বারাই যুদ্ধ করেছে। এই ধরনের যুদ্ধ পূর্ব সময়ে হয়েছিল। পূর্বকালে এখানকার ঋষিরা আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশ্র আর ইরানের মধ্যে নিজের সভ্যতা আর আচরণের প্রচার করে সেখানকার প্রজাদের পরাজিত করেছে। এটাই হচ্ছে কারণ যে আর্য সভ্যতার আদিম রাজনীতিজ্ঞ ভগবান্ মনু বলেছেন -

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বম্ স্বম্ চরিত্রম্ শিক্ষেরনপৃথিব্যাম্ সর্বমানবাঃ।।
(মনুঃ ১|১৩৯)

অর্থাৎ - ব্রহ্মাবর্তের ব্রাহ্মণদের থেকে সমস্ত সংসারের মানুষ সদাচারের শিক্ষা প্রাপ্ত করবে।

প্রাচীন আর্য ঋষি নিজের এরকম বৈদিক শিক্ষা আর সদাচার দ্বারা সংসারের সমস্ত জাতিকে নিজের শিষ্য বানিয়ে তাদের উপর নিজের প্রভাব জমাতেন। আজও বৈদিক বিচারের প্রচার দ্বারা আর আর্য-আচরণকে নিজের সরল আর তপস্বী ব্যবহারের দ্বারা আমরা অন্য সভ্য জাতিদের নিকট পৌঁছাতে পারি আর তাদের প্রভাবিত করতে পারি। এরকমটা করা আমাদের সভ্যতার একটা বিশেষ অঙ্গ। আজ যদি আমরা আর্যভোজন, আর্যবস্ত্র, আর্যগৃহ আর আর্য গৃহস্থীর সঙ্গে নিজের নির্বাহ করতে লেগে যাই আর শৃঙ্গার, বিলাস তথা কামুকতাকে ছেড়ে দিয়ে তপস্বী হয়ে যাই আর দেশ-দেশান্তরের মধ্যে গিয়ে নিজের আচরণের উদাহরণ দেখিয়ে বৈদিক বিজ্ঞানের প্রচার করি তাহলে সভ্য জাতিগুলো আমাদের সভ্যতাকে স্বীকার করে নিবে আর অনায়াসেই পরাজিত হয়ে যাবে আর পরতন্ত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ বিদেশিরা আমাদেরকে আমাদের বাস্তবিক সভ্যতা থেকে সরিয়ে দিয়ে শৌখিন, বিলাসী আর লোলুপ

বানিয়েই দাস বানিয়েছে, এইজন্য যদি আমরা নিজের বৈদিক জীবনযাপনের মধ্যে ফিরে আসি তাহলে অনায়াসেই বিজয় প্রাপ্ত করতে পারি। একথাকে আমরা আমাদের একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার দ্বারা ভালো করে বুঝে নিতে পারি।

রামায়ণের মধ্যে লেখা রয়েছে যে লঙ্কাতে যাওয়ার সময় পথে হনুমানের সঙ্গে সুরসার সাক্ষাৎ হয়। সুরসা হনুমানকে খেয়ে ফেলার জন্য নিজের মুখ বড়ো করে নেয়। ওদিকে হনুমানও নিজের শরীরকে অধিক ফুলিয়ে নেয়। এইজন্য সে তার মুখ আরও অধিক বড়ো করে নেয়, তখন হনুমান আর্যনীতিকে স্মরণ করে আর দ্রুত ছোটো হয়ে তার মুখে ঢুকে যায়। অত্যন্ত ছোটো হয়ে যাওয়ার কারণে না তো সে তাকে দাঁত দিয়ে চাবাতে পারছিল আর না জিব দিয়ে চাটতে পারছিল। শেষে সে নিরুপায় হয়ে যায় আর হনুমান তার ফাঁদ থেকে বেঁচে যায়। এটা হল আর্যনীতির আখ্যায়িকা। এখানে বলা হয়েছে যে যদি সভ্য শত্রু নিজের বিদ্যা, সভ্যতা, ধন, ঐশ্বর্য, যন্ত্র, শস্ত্র আর নীতির স্বরূপ অধিক বাড়িয়ে খেয়ে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে তাহলে আর্যদের উচিত যে তারা তাদের অত্যন্ত সরল, ধার্মিক আর তপস্বী জীবনের দ্বারা সব ধরনের মাহাত্ম্যকে নিরর্থক করে দিবে। সভ্য শত্রুদের প্রতি আর্যদের সর্বদা এই রীতিটাই ছিল। তারা সর্বদা বর্বরদের দণ্ড দ্বারা আর সভ্যদের উপদেশ ও তপ দ্বারা - সরলতা আর ধার্মিকতার দ্বারাই বশ করে নেওয়ার আয়োজন করেছে, তাই তারা শুদ্ধধর্মের কেন্দ্র পরিব্রাটের দ্বারা পরাস্ত করেছে আর সর্বদা স্বতন্ত্রতার ধ্যেয় নিজেদের সম্মুখে রেখেছে। তারা স্বতন্ত্রতাকে নিজেদের সভ্যতার মূল মেনেছে আর একথাকে সারা জীবনে কখনো ভুলেনি যে **"সর্বম্ পরবশম্ দুঃখম্ সর্বমাত্মবশম্ সুখম্"** (মনুঃ ৪|১৬০), অর্থাৎ পরবশতাই হল মহান দুঃখ আর স্বতন্ত্রতাই হল মহান সুখ। এটাই হচ্ছে কারণ যে আর্যদের এই মনোবৃত্তিকে সফল বানানোর জন্য ভগবান্ মনু উপদেশ করেছেন -

স্ববীর্যাদ্রাজবীর্যাচ্চ স্ববীর্যম্ বলবত্তরম্।
তস্মাত্ স্বেনৈব বীর্যেণ নিগৃহ্ণীয়াদরীন্ দ্বিজঃ।।
(মনুসংহিতাঃ ১১|৩২)

অর্থাৎ - আত্মবল আর রাজবলের মধ্যে নিজের আত্মবলই হচ্ছে মহান, এইজন্য আর্যদের উচিত যে তারা নিজের সভ্য শত্রুকে নিজের আত্মিক বল দ্বারাই নিবারণ করবে। এটাই হচ্ছে ধর্ম আর আপদ্ধর্মের সারাংশ। এই ধর্ম আর আপদ্ধর্মের মিশ্রিত বলকে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা বলে। এই বর্ণাশ্রমব্যবস্থা ভারতীয় বৈদিক আর্যদের অতিরিক্ত সংসারের আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আর্যদের ধর্ম এরমধ্যেই ভরা রয়েছে আর এটাই নিজের শুদ্ধধর্ম আর আপদ্ধর্মের বিশাল নীতি দ্বারা লোক তথা পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধিত অর্থ, কাম আর মোক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য উৎপন্ন করে কেবল মানবজাতিকেই নয় প্রত্যুত সমস্ত প্রাণী সমূহকে সুখী, শান্ত আর মোক্ষাভিমুখী বানিয়ে তোলে। এটাই হল আর্যধর্মের আদর্শ আর এটাই ধর্মের প্রাধান্যতার রহস্য। এই পর্যন্ত আমি আর্য সভ্যতাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেখিয়েছি আর বলেছি যে আর্যরা বেদের উপদেশ থেকে কিভাবে সভ্যতার রচনা করেছে আর কিভাবে সেই সভ্যতাকে সংসারের জন্য উপযোগী তথা লাভদায়ক সিদ্ধ করেছে। আর্যদের সভ্যতার এইভাবে উপযোগী হওয়ার কারণ হল তার স্বাভাবিকতা আর

স্বাভাবিকতা হয়েছে অপৌরুষেয়তার কারণেই। এই অপৌরুষেয় আর্যসভ্যতাটি মনুষ্যকৃত নয়, প্রত্যুত সেটা পরমাত্মার দ্বারা পরিকল্পিত। যেভাবে পরমাত্মা সৃষ্টির আদিতে আর্যদের উৎপন্ন করেছেন, সেইভাবে পরমাত্মাই তাদের সভ্যতাকে বৈদিক জ্ঞান দ্বারা নির্মাণ করার সূচনা দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে কারণ যে আর্যসভ্যতা সংসারের সমস্ত মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ আর তৃণপল্লবকে একই সমান লাভদায়ক তথা সবাইকে লোক-পরলোকের সুখ প্রদানকারী সিদ্ধ হয়েছে। আমি অনেক প্রমাণ দিয়ে সিদ্ধ করেছি যে এই সভ্যতা বেদমন্ত্রের আধারের উপর গড়ে তোলা হয়েছে আর পর্যাপ্ত বেদমন্ত্র লিখে তথা আর্য সভ্যতার রচনাকে দেখিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছি যে উভয় অঙ্গ একে-অপরের মধ্যে ভরে রয়েছে। এটাই হচ্ছে বেদের শিক্ষার রহস্য।

উপসংহার

বেদের পাঠ থেকে, বৈদিক সাহিত্যের অবলোকন থেকে, বেদানুকূল অন্য সমস্ত লৌকিক বাঙ্ময়ের অনুশীলন থেকে আর্যদের দিনচর্যা, নিয়ম-কানুন, তিথি-উৎসব, সংস্কার আর সমস্ত ব্যবহারের উপরে এক গম্ভীর দৃষ্টি রাখলে সমস্ত বৈদিক সম্পত্তির এটাই তাৎপর্য নিষ্পন্ন হয় যে মানুষ মোক্ষকে নিজের জীবনের লক্ষ্য মেনে নিয়ে এরকম ব্যবহার করবে যে যার দ্বারা স্বয়ং দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করতে পারবে আর অন্য যেকোনো প্রাণীর আয়ু তথা ভোগের মধ্যে যেন কোনো প্রকারের বিঘ্ন উৎপন্ন না হয়, প্রত্যুত বর্ণাশ্রমের দ্বারা সমাজের এরকম সংগঠন হোক যে সরলতার সঙ্গে সকলের রক্ষা হতে থাকবে আর শিক্ষা তথা দীক্ষার দ্বারা সমস্ত প্রাণিসমূহ মোক্ষাভিমুখী নিরন্তর হতে থাকে। আর্যদের শিক্ষা আর সভ্যতার যদি কোনো অঙ্গের আলোচনা করা হয় তাহলে তার অন্তর্ভাবনা থেকে এই উদ্দেশ্য পূর্তির ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। আর্যদের প্রাচীন কোনো রাজা, রানী, ঋষি, ব্রাহ্মণ আর বৈশ্য, শূদ্র আদির জীবন-চরিত্রকে ধ্যান দিয়ে যদি পড়া যায় তাহলে সেখান থেকে এই ধ্বনিটাই বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ আর্যদের শিক্ষা আর সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন হওয়াতে আর অনেক ধরনের সংকট আর বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করার পর আজও জীবিত রয়েছে। সংসারের মধ্যে অনেক সভ্যতার জন্ম হয় আর বিস্তার হয়, কিন্তু আজ তাদের কোথাও নাম বা চিহ্নও শেষ নেই, কিন্তু আর্যদের আহার-বিহার, বেশ-ভূষা, জীবনযাপন, আচরণ-ব্যবহার, যজ্ঞ-য়াগ, দান-পুণ্য, ব্রত-উপব্রত, ধর্ম-কর্ম, দয়া-প্রেম, দর্শন-বিজ্ঞান, য়োগ-সমাধি, কর্মফল, বন্ধ-মোক্ষ, ব্রহ্মচর্য, পাতিব্রত, গোভক্তি, বাটিকাভক্তি আর কৃমি-কীট আদি সমস্ত প্রাণীদের সঙ্গে সহানুভূতি আদি যত আদিমকালীন মন্তব্য আর কর্তব্য রয়েছে তা আজও যেমনটা-তেমনই পাওয়া যায়। এর দ্বারা এটা খুব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে আর্যদের সভ্যতার মধ্যে নিজের রক্ষা করে নেওয়ার জন্য পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে আর তাকে চিরজীবি করে রাখার পূর্ণ শক্তি রয়েছে, এইজন্য আমি উচিত সময়ে তাকে সংসারের সামনে পুনঃ উপস্থিত করার আয়োজন করেছি।

ইউরোপের মধ্যে এইসময় একটি এরকম ব্যবস্থার অনুসন্ধান হচ্ছে যা সকলকে এক সমান লাভদায়ক আর স্বয়ং স্থির হয়ে থাকার শক্তি রাখবে। এই উদ্দেশ্যকে নিয়ে ইউরোপবাসীরা অনেক ধরনের বিধি আর ব্যবস্থা উপস্থিত করেছে আর সেগুলোর প্রতি সংসারের সমস্ত জাতি আকর্ষিতও হয়েছে, কারণ সংসারের এটা একটা প্রবল নিয়ম যে, মানুষ যার দ্বারা প্রভাবিত হয় তারই অনুকরণ করা প্রারম্ভ করে দেয়। আজ সমস্ত সংসারের মধ্যে ইউরোপ প্রভাবশালী, তাই সবগুলো দেশ তার অনুকরণ করছে। যখন সেটি ভৌতিক উন্নতির দ্বারা শৃঙ্গারিক ধনিকের শৈলী ভরিয়ে ধনী আর নির্ধনের অর্থাৎ মালিক আর চাকরের রূপে দেখা যায় তো সংসারের সবগুলো দেশ সেই ধরনের নকল করা আরম্ভ করে দেয় আর যখন সেটি কমরেড সংস্থার দ্বারা সাম্যবাদের রূপে পূর্ণ হয়ে সামনে আসে তো সমস্ত সংসারের মধ্যে সাম্যবাদের প্রচার হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। যেভাবে সে নিজের জংলী অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আজ পর্যন্ত ভিন্ন-ভিন্ন অনেক রূপ ধারণ করে অনেক প্রকারের উদাহরণ দেখিয়েছে আর সংসারকে প্রভাবিত করেছে, ঠিক সেইভাবে এখন সে সমস্ত শৈলী থেকে হতাশ আর ক্লান্ত হয়ে স্বয়ংই প্রাকৃতিক জীবনের দিকে আসার বিচার করছে। কেবল বিচারই করছে তা নয় বরং প্রাকৃতিক জীবনের অনুকূল ব্যবহারও করা আরম্ভ করে দিয়েছে। ইউরোপের সহস্র ব্যক্তি কয়েকশ সংস্থা, কয়েকশ পুস্তক আর কয়েকশ পত্রের দ্বারা বর্তমান সভ্যতার খণ্ডন করছে, বর্তমান যান্ত্রিক উন্নতির দ্বারা উৎপন্ন হওয়া কলা আর বিলাস তথা কামুকতার ঘোর বিরোধ করছে আর ভৌতিকবাদের অনিবার্য পরিণামরূপ যুদ্ধের তিরস্কার করছে। শুধু এটাই নয় প্রত্যুত সহস্র মানুষ বর্তমান নাগরিক জীবনকে পরিত্যাগ করে জঙ্গলের মধ্যে সরল জীবন (Nature life) যাপনও আরম্ভ করে দিয়েছে। যেভাবে এখন পর্যন্ত ইউরোপ দেশের অন্য রীতি-নীতির প্রভাব অন্যদের উপরে পড়েছে ঠিক সেইভাবে তার এই প্রাকৃতিক জীবনেরও প্রভাব অন্যদের উপরে পড়ছে আর সংসারের সমস্ত দেশের মধ্যে এই ধরনের জীবনযাপনের উপযোগিতার বৃদ্ধি হচ্ছে। আর বেশ কিছু মানুষ সংসারের সমস্ত দেশের মধ্যে এই প্রাকৃতিক জীবনের অনুকূল নিজেদের জীবন বানানো আরম্ভও করে দিয়েছে। এর থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে ভৌতিক উন্নতির পরিণাম সকলের উপরে ঠিকভাবে বিদিত হয়ে গেছে, তাই এখন নিশ্চয়ই তার সমাপ্ত হতে চলেছে, কারণ প্রাকৃতিক জীবনবাদীদের

সরল আর সোজা কথা সবার হৃদয়ে ঘর করে নেয়, তার কথা হৃদয়ের মধ্যে জমে যায় আর একথার উৎসাহ উৎপন্ন করে দেয় যে বর্তমান নাগরিক জীবন থেকে সরে গিয়ে আরম্ভিক জীবনযাপনের সঙ্গে থাকাটাই উচিত। লোকজন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে বিনা প্রাকৃতিক জীবন বানিয়ে আর বিনা শৃঙ্গারিক জীবন থেকে সরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সমতার প্রবৃত্তি, দীর্ঘজীবনের অভিলাষা আর ঈশ্বর, জীব, কর্মফল আর মোক্ষ আদি পারলৌকিক সমস্যার কোনো ভালো সমাধান বেরিয়েই আসবে না। তবে এটা ঠিক যে প্রাকৃতিক জীবন দ্বারা উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান হওয়া সম্ভব। এটা সম্ভব যে সরল-সাধারণ জীবন দিয়ে ব্রহ্মচর্যের জন্য সহায়তা পাওয়া যেতে পারে আর সরল-সাধারণ জীবন দিয়ে সাম্যবাদেরও সমস্যার নিবৃত্তি হতে পারে আর দীর্ঘ জীবনও প্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু এই ইউরোপীয় প্রাকৃতিক জীবনের মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত

না সেটা বের করে দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সভ্যতা চিরস্থায়ী হতে পারবে না আর না অধিক দিন পর্যন্ত মানবজাতির কোনো কল্যাণ করতে পারবে।

এই প্রাকৃতিক সভ্যতার মধ্যে যে সবথেকে বড়ো ত্রুটি রয়েছে সেটা হচ্ছে এই সভ্যতার প্রচারক বিদ্বান মানুষকেও প্রকৃতির অনুসারে চালিত এক ধরনের পশুই মনে করে। সে সর্বদা মানুষের জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত পশুদের সঙ্গেই দিয়ে থাকে। সে বলে যে আদিতে পশুদের মতো মানুষও প্রকৃতির আজ্ঞানুসারেই চলতো, তাই সুখী ছিল, যদি পুনঃ প্রাকৃতিক আজ্ঞার পালন করা যায় তাহলে পুনঃ সুখী হওয়া সম্ভব, কিন্তু একথা ঠিক নয়, কারণ মানুষের মধ্যে আহার-বিহার সম্বন্ধিত যেসব নিয়ম আমরা দেখি সেটা পশুদের মতো প্রকৃতির আজ্ঞার উপর অবলম্বিত দেখা যায় না। যেভাবে পশু নিজের ভোজনকে জানে আর নিজেরই ভোজনকে খায়, সেইভাবে মানুষের কোনো ভোজনের নির্ণয় দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ সব কিছুই খেয়ে ফেলে, আর সব কিছু পান করে ফেলে, কিন্তু প্রকৃতি সেই আহারের কোনো নির্ণয়ই করে না। তার বিচারেরও এরকমই অবস্থা। না তার মৈথুনের কোনো সময় নির্ধারিত রয়েছে আর না সে ঋতুমতী স্ত্রীর গন্ধ আদির দ্বারা কোনো সূচনা অনুভব করতে পারে, এইজন্য একথা সর্বদা অসত্য যে আরম্ভে মানুষ পশুদের মতো প্রকৃতির পক্ষ থেকে সূচনা পেতো। এরকম অবস্থাতে এই ধরনের বিচারের আর তদনুসারে ব্যবহারের দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক বড়ো হানির আশঙ্কা রয়েছে, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের বিচার আর আচরণ শিক্ষিত লোকেদের দ্বারা ব্যবহারের মধ্যে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে, কিন্তু যখনই প্রকৃতির আনন্দে লেখাপড়া ছেড়ে দিবে তখনই অথবা কিছু দিনের মধ্যেই লোকেদের অবস্থা জংলী হয়ে যাবে আর প্রাকৃতিক জীবন ছেড়ে দিয়ে জংলী জীবন হয়ে যাবে।

জংলী জীবন প্রাকৃতিক জীবন নয়, কারণ প্রাকৃতিক জীবনের অনুসারে মানুষকে কেবল ফলই খাওয়া উচিত, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় যে জংলী লোকেরা প্রায়শঃ মাংসই অধিক খেয়ে থাকে। একইভাবে প্রাকৃতিক জীবনের শিক্ষার অনুসারে শৃঙ্গাররহিত জীবনই যাপন করা উচিত আর সন্তান কম উৎপন্ন করা উচিত, কিন্তু জংলী লোকেরা খুবই শৃঙ্গারপ্রিয় হয়ে থাকে, খুব মদ্যপান করে আর অসংখ্য সন্তান উৎপন্ন করে থাকে। সব থেকে বড়ো দোষ তো এটা যে নিজের রক্ষা পর্যন্ত করতে পারে না। বিদ্বান জাতিরা সর্বদা তাদের দাস বানিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেয় আর তাদের জংলী জীবনযাপনকে বদলিয়ে নিজের মতো করে দেয়, এইজন্য প্রাকৃতিক জীবনের মধ্যে জংলী জীবন ঢুকে যাওয়ার অনিবার্য আশঙ্কা রয়েছে, আর একথা ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ। এই সময় সংসারে যত অসভ্য আর জংলী জাতি রয়েছে সে সব আগে সভ্য, উন্নত আর বিদ্বানই ছিল, কিন্তু কারণবশত শিক্ষা ছেড়ে দেওয়ার দরুণ আজ এই দশাকে প্রাপ্ত করেছে। এরকম দশাতে এটা আশা কখনও করা যেতে পারে না যে প্রাকৃতিক জীবনকে স্বীকার করে নিলে - পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এক ধরনের পশু হয়ে গেলে - মানুষ সেই আদর্শ প্রাকৃতিক জীবনের পালন করতে থাকবে যা শিক্ষিত বিদ্বান নেচারবাদী পাশ্চাত্যদের মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরছে। সেই জীবন তো ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার দ্বারা ভালো-মন্দ আর লাভ-হানির জ্ঞান থাকবে। শিক্ষার বিদায় হতেই প্রাকৃতিক জীবনের লোকজন জংলী হয়ে যাবে আর অন্য শিক্ষিত জাতিদের দ্বারা দাস বানিয়ে ফেলা হবে

আর আনন্দের সঙ্গে অন্যের সভ্যতাকে স্বীকার করে নিবে, এইজন্য বিদ্যা আর শিক্ষা থেকে উপেক্ষাকারী আর সাধারণ মানুষকে জংলী বানিয়ে অন্যদের দাস করে তুলবে এরকম এই রীতি-নীতি আর জীবনযাত্রার মান সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিপূর্ণ।

এই সভ্যতার মধ্যে সরলতা, সদাচার, ফলাহার, ব্রহ্মচর্য, শান্তি আর বিশাল ভাবনার যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায় সেটা প্রকৃতির দ্বারা উৎপন্ন নয়, প্রত্যুত সেটা উচ্চ শিক্ষার দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছে আর উচ্চ সভ্যতারই ফল। মূর্খ, অসভ্য আর জংলী মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে এই ধরনের ভাবনা উদয় হতেই পারবে না। এরকম ভাবনা তো তখন উদিত হয় যখন কয়েক প্রজন্ম ধরে উচ্চ শিক্ষার প্রচার থাকে আর শিক্ষিত নেত্র বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক উত্থান-পতন দেখতে পায়। পাশ্চাত্য বিদ্বানরা যে প্রাকৃতিক জীবন সম্বন্ধীয় বিচারের ধারণা পেয়েছে, তাদের ধারণারও কারণ এটাই। তাদের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটি সামাজিক ক্রান্তিদেরও পূর্ব ইতিহাস পড়তে পাওয়া যায় আর কয়েকটি ক্রান্তি স্বয়ং দেখতে, শুনতে আর অনুভবও করতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, কিছু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা তারা এটাও নিশ্চিত করে নিয়েছে যে মানুষ সৃষ্টি উৎপত্তির সময়ে সব ধরনের রোগ-দোষ আর দুঃখ-দরিদ্র থেকে মুক্ত ছিল[Δ], তাই তারা বলে যে মানুষকে সেইভাবে আহার-বিহার আর জীবনযাপনের সঙ্গে থাকা উচিত যা আদিমকালে ছিল। আমিও বলছি যে ঠিক আছে আরম্ভিক রীতি-নীতি, জীবনযাপন আর আহার-বিহার উত্তম ছিল, এইজন্য সেইভাবে মানুষমাত্রকে থাকা উচিত, কিন্তু প্রশ্ন তো এটা হচ্ছে যে সেই জীবনযাপন কি এরকমই ছিল যেরকমটা নেচারবাদী বলছে? আদিমকালীন মানুষের সুখ-দুঃখের কারণ কি প্রকৃতি ছিল আর মানুষের আদিমকালীন স্থিতি কি পশুদের মতো ছিল? এরকমই যদি থাকে তাহলে আজ মানুষের সেই পশুতা কোথায় চলে গেছে আর তাদের আহার-বিহার, জীবনযাপন আর রীতি-নীতির প্রেরণা আজও প্রকৃতির পক্ষ থেকে কেন হচ্ছে না? আজ যখন প্রকৃতির পক্ষ থেকে মানুষ কোনো ধরনের সূচনা পাচ্ছে না তাহলে সহজেই অনুমান করে নেওয়া উচিত যে আরম্ভিক অবস্থার মধ্যেও মানুষের জন্য প্রকৃতির পক্ষ থেকে কোনো প্রেরণা হতো না আর না সেইসময়ে সুখ-শান্তির কারণ প্রকৃতি অথবা পশুদশা ছিল, প্রত্যুত বর্তমান কালের মতোই সেই সময়ে সুখ-শান্তির কারণ জ্ঞান, বুদ্ধি আর চিন্তা-ভাবনার শক্তিই ছিল।

যেভাবে আজ জ্ঞান, বুদ্ধি আর বিচার করার শক্তি শিক্ষা আর গুরুপরম্পরা থেকে প্রাপ্ত হয়, সেইভাবে আদিমকালে জ্ঞান পরমাত্মা থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল, তাই সেই আরম্ভিক জ্ঞান, বুদ্ধি আর বিচারশক্তিকে আর্যরা অপৌরুষেয় বলেছে আর তাকেই বেদ অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জ্ঞানের নামে সূচিত করেছে। এই আরম্ভিক বৈদিক জ্ঞানের মধ্যে মানুষের উপযোগী সেই সমস্ত বিষয় যেমনটা-তেমনই রয়েছে যাকে নেচারবাদীরা উপস্থিত করছে, কিন্তু এর অতিরিক্ত কিছু বিষয় আরও রয়েছে যার দ্বারা বৈদিক সভ্যতা স্থির থাকতে পারে আর অন্যদের প্রভাব থেকে নিজের রক্ষাও করতে পারে। এটা আমাদের কল্পনা নয় প্রত্যুত এরকমটা রয়েছে আর

Δ Man, the pure image of God, was in the beginning without sin and sickness, trouble and mistery.
- Return to Nature

এটা সব লোকেদের অনুভবেরও যোগ্য। ভারতীয় আর্যদের বৈদিক সভ্যতা লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে সহস্র-সহস্র বিঘ্ন-বাঁধার সঙ্গে সংঘর্ষ করে আজও সুরক্ষিত রয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে এই সভ্যতার মধ্যে নেচারবাদীদের সভ্যতার গুণ তো রয়েছেই সঙ্গে কিছু বিদ্যা আর রক্ষা সম্বন্ধীয় এরকম গুণও রয়েছে যা নেচারবাদীদের সভ্যতার মধ্যে নেই। এটাই হচ্ছে কারণ যে নেচারবাদী সভ্যতাকে কোনো দেশ বা জাতি বা রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিই স্বীকার করতে পারে, সম্পূর্ণ দেশ আর সম্পূর্ণ সমাজ পারবে না, কারণ সমস্ত সমাজ নেচারবাদকে স্বীকার করে নেওয়ার কিছু প্রজন্ম পরেই সমস্ত সমাজ জংলী হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে আর অন্য সভ্য জাতিদের থেকে নিজের আর নিজের সভ্যতার রক্ষা করা কঠিন হবে, কিন্তু বৈদিক আর্য সভ্যতার মধ্যে এই ধরনের ভয়ের আশঙ্কা নেই, এইজন্য মানবজাতির জন্য বৈদিক আর্য সভ্যতাই হচ্ছে উপযোগী।

বৈদিক আর্যসভ্যতা বৈদিক হওয়ার জন্যই অপৌরুষেয়, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় বলে, কারণ সনাতন থেকে আর্যদের এটাই বিশ্বাস যে বেদ হচ্ছে অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরীয়, কিন্তু আর্যদের মধ্যে অনেক অনার্য-জাতির সংমিশ্রণের কারণে বৈদিক আর লৌকিক সাহিত্যের মধ্যে নবীন বিচারের আর নবীন আচরণের প্রক্ষেপ হয়ে যায় যারজন্য বেদের অপৌরুষেয়তাতে লোকেদের শঙ্কা হচ্ছে। কিছু লোক বলছে যে বেদের মধ্যে হিংসা, অসভ্যতা, ইতিহাস আর জ্যোতিষসম্বন্ধীত বর্ণনার দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে যে এটা ঈশ্বরীয় নয়, প্রত্যুত এটা অনেক অর্বাচীন আর খুবই সাধারণ জ্ঞানের রচনা। এছাড়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে কিছু লোক তো এটাও বলে দেয় যে মানুষ যখন নিজের উৎপত্তিকাল থেকেই বিকাশের দ্বারা ক্রমে-ক্রমে উন্নতি করে আগে বেড়ে চলেছে তখন তাকে অপৌরুষেয় জ্ঞানের আবশ্যকতা কি করতে?

শুনতে যদিও এই কথাগুলো ঠিক প্রতিত হয়, তবে এরমধ্যে কোনো সারই নেই, কারণ বেদ যেখানে বলছে যে **"মা হিস্ম্যাত্ সর্বা ভূতানি"** অর্থাৎ কোনো প্রাণীর হিংসা করো না, আর **"সভ্যঃ সভাম্ মে পাহি"** (অথর্বঃ ১৯|৫৫|৬) অর্থাৎ হে সভ্য! আমার এই সভার রক্ষা করো। তো সেই বেদের মধ্যে হিংসা আর অসভ্যতার আশঙ্কা করাটা নিতান্তই অনুচিত। এরকমই ইতিহাসের মধ্যে এসে থাকা পুরুরবা, নহুষ, য়য়াতি, পুরু, অত্রি, জমদগ্নি, ব্রজ, অর্ব, আয়োধ্যা, গঙ্গা আর সরস্বতী আদি নামকে বেদের মধ্যে দেখতে পেয়ে ইতিহাসের আশঙ্কা করাটাও উচিত নয়, কারণ বেদের মধ্যে এইসব সূর্য, নক্ষত্র, বিদ্যুত্, কিরণ, নেত্র, গৌ-গোষ্ঠ, শরীর আর বাণী আদির জন্য নেওয়া হয়েছে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি, জাতি আর সমাজ অথবা দেশ, নগরের জন্য নেওয়া হয়নি।

তবে হ্যাঁ, ইতিহাস আর পুরাণের মধ্যে এইসব নাম ব্যক্তিদের জন্য অবশ্য এসেছে, কিন্তু সেই ব্যক্তিদের নামকরণের পূর্বেও এই নাম উপস্থিত ছিল আর তার সঙ্গে কিছু অর্থ থাকতো, অর্থাৎ পুরুরবা, অত্রি, ব্রজ, আয়োধ্যা আর গঙ্গা আদি নাম রাখার সময় এই শব্দটি কল্পিত করা হয়নি, প্রত্যুত এই শব্দটি সেই ব্যক্তিদের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল আর ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের নামের জন্য কাজেও আসতো। একথা আমরা আজও অনুভব করি, আজও আমাদের যখন কোনো পদার্থের নামকরণের আবশ্যকতা হয় তখন নামকারী শব্দ আমাদের কাছে আগে থেকেই সুরক্ষিত থাকে আর সেখান থেকেই বেছে নিয়ে আমরা অভীষ্ট পদার্থের

নাম রেখে দিই। এইভাবে পুরুরবা আদি রাজাদেরও যখন নাম রাখা হয়েছিল তখনও পুরুরবা আদি নাম তার পিতার নিকট আগে থেকেই উপস্থিত ছিল, এইজন্য বেদের মধ্যে এসে থাকা শব্দ ব্যক্তিদের পরে নয় বরং ব্যক্তিদের থেকে অনেককাল পূর্বের। বাকি রইলো বেদের মধ্যে কোথাও-কোথাও পুরুরবা আদি শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে, বিবাহ আর এরকমই অনেক সামাজিক কথার বর্ণনা, সেটা মানুষের নয় বরং আকাশীয় পদার্থের, কারণ বেদের মধ্যে একটি আকাশীয় জগতেরও বর্ণনা রয়েছে, যারমধ্যে লোকের মতোই সমস্ত পদার্থের চর্চা করা হয়েছে। এই অলৌকিক চর্চার সঙ্গে লৌকিক ব্যক্তিদের চরিত্রের সংমিশ্রণ করে পুরাণকারীরা বেদের আকাশীয় বর্ণনা আর অলংকারের ভাবের বিস্ফোরণ করেছে। ভাগবত ১|৪|২৮ এরমধ্যে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে **"ভারতব্যপদেশেন হ্যান্নায়ার্থশ্চ দর্শিতঃ"**, অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাসের মিষ থেকে বেদের অর্থই প্রদর্শিত করা হয়েছে, এইজন্য মহাভারতকার বলেছে যে **"ইতিহাসপুরাণাভ্যাম্ বেদম্ সমুপবৃম্হয়েত্"**, অর্থাৎ ইতিহাস আর পুরাণ দিয়েই বেদের মর্ম জানা যায়। বলার তাৎপর্য হল বেদের মধ্যে ইতিহাস সম্বন্ধিত কোনো বর্ণনা নেই। একইভাবে বেদের মধ্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধিত এরকম কোনো ঘটনারও বর্ণনা নেই যার দ্বারা বেদের সময়কে বের করা যেতে পারে। যদি বেদের কাল সূচিতকারী জ্যোতিষ-সম্বন্ধিত বর্ণনা হতো তাহলে তারমধ্যে বধূকে ধ্রুবতারা দেখানোর বর্ণনা অবশ্যই থাকতো, কারণ সকলেই জানে যে বিবাহের সময়ে বধূকে ধ্রুবতারার অবলোকন করাটা আর্যদের অনেক প্রাচীন রীতি। এই ক্রিয়ার বর্ণনা সূত্রগ্রন্থের মধ্যেও এসেছে, অথচ বেদের মধ্যে এর বর্ণনা নেই। যদি বেদের মধ্যে ধ্রুবতারার অবলোকনের বর্ণনা থাকতো তাহলে এই ঘটনার দ্বারা নিঃসন্দেহে জ্যোতিষের গণনার দ্বারা বেদের সময় বের করা যেতো, কারণ ধ্রুবতারা সর্বদা থেকে এই স্থানে ছিল না। সেটা দুই সহস্র বছর থেকেই এই স্থানের মধ্যে এসেছে। এরপূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় সনের ২৮২৭০ বছর পূর্বে এই ধ্রুবের স্থানে অন্য তারা ছিল, অথচ তারও বর্ণনা বেদের মধ্যে নেই© | এই ঘটনা থেকে খুবই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে বেদের মধ্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধিত এরকম কোনো ঘটনারই বর্ণনা নেই, যা দিয়ে বেদের সময় বের করা যেতে পারে, কারণ বেদের মধ্যে আর্যদের বিবাহের মতো মহত্বপূর্ণ ধার্মিক সংস্কারের অত্যন্ত আবশ্যক ক্রিয়ারও বর্ণনা নেই, অর্থাৎ যখন জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় ধ্রুব অবলোকনেরও বর্ণনা নেই তখন জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় অন্য এই ধরনের ঘটনার বর্ণনার আশা করাটা, যার দ্বারা বেদের সময় বের করা যেতে পারে, নিতান্ত ভ্রম হবে। এইজন্য বেদের সময় না তো ঐতিহাসিক শব্দের দ্বারা বের করা যেতে পারে আর না জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় কোনো ঘটনার দ্বারা। এর কারণ হচ্ছে এটাই যে বেদের প্রাদুর্ভাব কোনো ঐতিহাসিক কালে হয়নি, প্রত্যুত সেই সময় হয়েছে যে সময়

© In the Hindu marriage ceremony according to the Grihya Sutra, the polar star is pointed to the bridge as an ideal of steadiness and faithfulness. The custom is observed all over India. The present polar star on the northern hemisphere is Alpha of the Little Bear. But already 2,000 years ago this star was so far distant from the celestial pole that in the Vedic antiquity could not possibly have been considered as the polar star. Its place was at that time, accurately in 28,270 B.C., occupied by Alpha Draconis, this being the only star bright enough to serve the purpose of the polar star. Since in Rigveda hymns themselves this custom of pointing out of the polar star is not (yet) mentioned. - Hymns from Rigveda, appendix, by R. Zimmerman

মানুষের উৎপত্তির প্রারম্ভ ছিল, এইজন্য বেদের আদিমকালীনতার উপরে কোনো সন্দেহ হতে পারে না। বেদের এই আদিমকালীনতার প্রবল প্রমাণ আর্যদের আদিমকালিক ইতিহাসের মধ্যে সুরক্ষিত রয়েছে। আর্যদের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকে পূর্বকালের দিকে বাড়িয়ে দিলে বেদের সময় আদিসৃষ্টি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সরকারি দপ্তর থেকে মেগাস্থনিজ যে রাজবংশাবলী প্রাপ্ত করেছিল তার প্রজন্মের আর সেই প্রজন্মের জন্য দিয়ে থাকা বর্ষকে আজ পর্যন্ত জুড়ে দিলে ৮,৭০১ বর্ষ হয়। এই নয় সহস্র বছরের সময় সংসারের সমস্ত সভ্যতাগুলোর থেকে অধিক প্রাচীন। মিশ্র, বেবিলন আর সিরিয়া আদি দেশের প্রাচীন থেকেও প্রাচীন সভ্যতা যে এর পরের সেটা সিদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু আর্যদের ইতিহাসে এই কালের পূর্বের ঐতিহাসিক প্রমাণও শতপথব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। শতপথব্রাহ্মণের ৬|২|২|১৮ তে লেখা রয়েছে যে **"এষা হ সম্বত্সরস্য প্রথমা রাত্রির্য়ত্ফাল্গুনী পূর্ণমাসী"**, অর্থাৎ এটা নিশ্চয়ই ফাল্গুনী পূর্ণমাসী সম্বৎসরের প্রথম রাত্রি। এটা সেই সময়ের বাক্য যে সময় ফাল্গুনী পূর্ণমাসী থেকে সম্বৎসরের প্রারম্ভ হতো। জ্যোতিষরা হিসেব লাগিয়েছে যে সেইসময় বসন্তসম্পাত উত্তরাভাদ্রপদ নক্ষত্রতে হতো, কিন্তু এই সময় বসন্তসম্পাত পূর্বাভাদ্রপদে হয়, অর্থাৎ সম্পাতের পূর্ণ প্রদক্ষিণা হয়ে গেছে আর এখন অন্য প্রদক্ষিণার আরম্ভ। সম্পাতের পূর্ণ প্রদক্ষিণার মধ্যে ২১,০০০ বর্ষ লেগে যায়, অতঃ একুশ সহস্র বর্ষের প্রদক্ষিণাকে পূর্ণ করে এক সহস্র বর্ষ ধরে দ্বিতীয় প্রদক্ষিণা আরম্ভ হয়ে গেছে, অতএব শতপথব্রাহ্মণের এই ভাগটি বাইশ সহস্র বছরের পুরোনো।

যেই ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রাচীনতা এত পুরোনো, সেই ব্রাহ্মণের অবলোকন করলে পরে জ্ঞাত হয় যে এই ব্রাহ্মণের পূর্বেও আরও একটি সাহিত্য উপলব্ধ ছিল যারমধ্যে ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ইতিহাস আর অন্য অনেক বিদ্যার গ্রন্থ উপস্থিত ছিল। উপনিষদের মধ্যে যেখানে-সেখানে **"তদেষ শ্লোকঃ"** লিখে যে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটা সেই লুপ্ত সাহিত্যের। এর অতিরিক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে বেদের নবীন আর প্রাচীন ঋষিদেরও বর্ণনা রয়েছে। এরকম ঋষিদের বর্ণনা রয়েছে যা এই সময় বেদের ঋষি মানা হয় না, কিন্তু কোনো সময় মানা হতো। শুধু তাই নয় প্রত্যুত ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে বেদের খৈলিক ভাগের আর বেদের অনেক শাখারও রয়েছে, যার দ্বারা ভালোভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে বর্তমান ব্রাহ্মণসাহিত্যের পূর্বেও একটি বিস্তৃত সাহিত্য উপস্থিত ছিল যা এখন অপ্রাপ্ত। এই সাহিত্যকেও যদি আমরা পঁচিশ সহস্র বর্ষেরও আগে পঁচিশ সহস্র বর্ষের পূর্বে নিয়ে যাই তাহলে কোনো আপত্তির বিষয় দেখতে পাওয়া যায় না, কারণ বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত যে প্রাচীন সূর্য সিদ্ধান্তের আধারে বানানো হয়েছে তার সময় ত্রেতার আদি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, যার জন্য লক্ষ-লক্ষ বর্ষের সময় আবশ্যক।

এই সাহিত্যের পূর্বে বেদের সেই ঋষিদের সময় ছিল যা এই সময় বেদের মন্ত্রে লেখা রয়েছে। এর সময় উপরিউক্ত সাহিত্যের থেকেও প্রাচীন। এই ঋষিদের সঙ্গে-সঙ্গে বেদের সূক্তের উপর এখন পর্যন্ত অত্যন্ত প্রাচীন অর্থাৎ আদিমকালীন ঋষিদেরও নাম লেখা দেখতে পাওয়া যায়। এই আদিমকালীন ঋষিদের মধ্যে সবথেকে প্রধান ঋষি মনুষ্যজাতির আদি পিতামহ হচ্ছেন ভগবান্ বৈবস্বত মনু। মানবজাতির প্রারম্ভ এই বৈবস্বত মনুর শাসনকালেই হয়েছে, এইজন্য মনুসম্বন্ধিত হওয়ায় মানুষকে **"মানুষ"** বলে। এই আদিম মনুর

নাম ঋগ্বেদের অনেক সূক্তের সঙ্গে ঋষিদের মধ্যে লেখা রয়েছে। শুধু তাই নয় প্রত্যুত ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৫|১৪ তে লেখা রয়েছে যে বৈবস্বত মনু নিজের ছোটো পুত্র নাভানেদিষ্ঠকে দুটি সূক্তও দিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে কারণ যে ঋগ্বেদ মণ্ডল দশের ৬১ আর ৬২ তম সূক্তের ঋষি মনুপুত্র নাভানেদিষ্ঠই আজ পর্যন্ত লেখা রয়েছে। এরকম অবস্থায় বেদের প্রাচীনতা মানুষের আদিমকালীনতা পর্যন্ত পৌঁছায়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন আসছি বেদের অপৌরুষেয়তার কথায়, এর উপর কিছু লোক বলে যে যখন বিকাশক্রম দ্বারা মানুষ নিজের উন্নতি করে-করে আজ এই পর্যন্ত এসেছে তখন তারজন্য অপৌরুষেয় জ্ঞানের কোনো আবশ্যকতাই নেই। সেটা তো অনুভবের দ্বারা ধীরে-ধীরে বংশানুক্রমভাবে আপনা-আপনিই জ্ঞানবৃদ্ধি করে নেয়, এইজন্য অপৌরুষেয় জ্ঞানের ব্যর্থ ঝঞ্ঝাট লাগানো ঠিক নয়। শুনতে যদিও কথাটা ঠিক মনে হয়, কিন্তু যখন আমরা অনুভব আর পরম্পরাতে ধ্যান দিই তো জানতে পারি যে মানুষের জ্ঞান বংশপরম্পরার অনুভবের ফল নয়। আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই যে পতঙ্গ আগুনের নিকট আসে আর আঁচ লাগতেই পালিয়ে যায়, কিন্তু আবারও আসে আর শেষে জ্বলে মরে যায়। তার অনুভব তার জ্ঞানবৃদ্ধিতে কোনো সহায়তা করে না আর না এই অনুভব পতঙ্গের বংশের মধ্যে কোনো জ্ঞানবৃদ্ধির কারণ হয়। যেভাবে লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বে পতঙ্গ আগুনে জ্বলে মরেছে, সেইভাবে তার বংশজ আজও জ্বলে মরে। পতঙ্গকে ছেড়ে দিন আমরা দেখতে পাই যে এই জ্ঞানবান প্রাণী মানুষের বংশজের মধ্যেও অনুভবের সংস্কার বের হয় না। এটা কোথাও দেখা যায়নি যে অমুক কূলের মধ্যে দশ প্রজন্ম ধরে পাণ্ডিত্য হচ্ছে, এইজন্য এখন সেই কূলে যে জন্মাবে তাকে আর পড়তে হয় না, বরং তারা পড়াশোনা জানা বিদ্বান জন্ম নিয়ে নেয়। এরকমটা যখন দেখতে পাওয়া যায় না তখন কিভাবে স্বীকার করা যেতে পারে যে পিতার অনুভব পুত্র পেয়ে যায়। সংসারের মধ্যে তো এর বিপরীত দেখতে পাওয়া যায়। সংসারের মধ্যে তো প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষি-মুনি যত উন্নত ছিলেন, যত জ্ঞানবান্ ছিলেন আর যত যোদ্ধা ছিলেন, তাদের বংশজ সেরকমটা ছিল না। ঋষি বংশজের থেকে তো তাদের পুরোনো পুঁজিও চলে যাচ্ছিল। এরকম অবস্থায় এটা বলা যেতে পারে না যে জ্ঞান অনুভব দ্বারা বৃদ্ধি হয় আর আপনা-আপনিই বংশজরা পেয়ে যায়। জ্ঞান যদি স্বয়ং উপার্জিত হয় তাহলে অনুভব দ্বারা বৃদ্ধি হতো আর পৈতৃক সংস্কারের দ্বারা আপনা-আপনিই বংশজরা পেয়ে যেত, কিন্তু জ্ঞান তো নৈমিত্তিক অর্থাৎ অন্যের নিমিত্ত দ্বারা পাওয়া যায়, এইজন্য সেটা আপনা-আপনি বংশজের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে না। আজ যখন এতো জ্ঞানোন্নতি হয়ে যাওয়ার পরেও মানুষ নিজের অনুভব দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে না আর কোনো জংলী মানুষ আপনা-আপনি বিনা পড়াশুনায় রেখাগণিতের আচার্য হয়ে যায় না তাহলে সেই সময় যখন মানুষ আদিম অবস্থায় ছিল অথবা নবজাত ছিল, কিভাবে বলা যেতে পারে যে সে নিজের অনুভব দ্বারা উন্নতি করে নিয়েছে আর সেই জ্ঞান তার বংশজের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে গেছে? এরকম অবস্থাতে এটাই বলা যেতে পারে যে জ্ঞান হচ্ছে নৈমিত্তিক আর আদিসৃষ্টিতে সেই জ্ঞান মানুষ পরমাত্মারই নিমিত্ত দ্বারা প্রাপ্ত করেছে।

পরমাত্মার নিমিত্ত যে জ্ঞান আদিতে মানুষ পেয়েছে তাকেই অপৌরুষেয় জ্ঞান বা বেদ বলে। এই

বেদজ্ঞান যে ভাষায় দেওয়া হয়েছে সেই ভাষার উৎপত্তি সংসারের কোনো ভাষা থেকে হয়নি আর না সেই ভাষা সংসারের কোনো শব্দের নকল থেকে বা মানুষের স্বাভাবিক উচ্চারণ থেকে আপনা-আপনি উদ্ভূত হয়েছে, কারণ আমরা সংসারের মধ্যে দেখতে পাই, যে ধরনের বর্ণাত্মক ধ্বনি মানুষের মুখ থেকে বের হয় সেই ধরনের স্পষ্ট ধ্বনি সংসারের আর কোনো স্থান থেকে বের হয় না, এইজন্য মানুষ নিজের বর্ণকে অন্য ধ্বনির থেকে নকল করতে পারে না। যদি বহিরাগত ধ্বনি থেকে মানুষ বর্ণের নকল করতে পারতো তাহলে আজ সংসারের মধ্যে কোনো জাতির বর্ণমালাই অপূর্ণ হতো না, সবাই বহিরাগত ধ্বনি থেকে বর্ণমালা বাড়িয়ে নিতো, কিন্তু এরকমটা হয় না। যার ভাষার মধ্যে টবর্গ নেই, সে টবর্গকে বিনা মানুষের মুখ থেকে শুনে কোনো ভাবেই উন্নত করতে পারবে না, এইজন্য ভাষা বাহ্য ধ্বনি থেকে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। একইভাবে ভাষা আপনা-আপনি মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়, কারণ মানুষ সেই বর্ণ বলে যা সে শোনে, যে বর্ণ শোনে না তাকে বলতেও পারে না, এইজন্য ভাষা না তো বাহ্য ধ্বনি থেকে নকল করা যেতে পারে আর না আপনা-আপনি মানুষের মুখ থেকে বের হতে পারে, প্রত্যুত সেটা কেবল পরমাত্মারই প্রেরণায় উৎপন্ন হতে পারে, অন্য কোনো উপায় দ্বারা নয়। অন্য উপায় অপভ্রষ্টতার হবে। অন্য ভাষা থেকে অপভ্রষ্ট হয়ে নবীন ভাষা হতে পারে, কিন্তু বেদভাষা অন্য কোনো ভাষার অপভ্রংশ নয়, কারণ অপভ্রংশ সর্বদা ক্লিষ্ট উচ্চারণ থেকে সরল উচ্চারণের দিকে, আর বিস্তৃত বর্ণমালা থেকে সঙ্কুচিত বর্ণমালার দিকে যায়। আমরা দেখি যে বেদের বর্ণমালা সারা সংসারের বর্ণমালার থেকে বিস্তৃত আর ক্লিষ্ট। এরমধ্যে ঋ, লৃ, ষ, ক্ষ, জ্ঞ, ঘ, ঢ, ধ, ভ, ঙ, ণ, ঞ আদি এরকম উচ্চারণ রয়েছে যা এর ক্লিষ্টতা আর বিশালতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ, এইজন্য এটি অন্য ভাষার অপভ্রংশ হতে পারে না। বলার তাৎপর্য হল, যে বৈদিক ভাষা অন্য ভাষার অপভ্রংশ নয়, আর যেটা মৌলিক, সেটা না তো আপনা-আপনি উত্তরিত হতে পারে আর না সেটা সংসারের আওয়াজ থেকে নকল করা যেতে পারে, এইজন্য সেটা হবে অপৌরুষেয় আর সেই ভাষাকে মানুষ পর্যন্ত নিয়ে আসার কর্তা পরমাত্মা ছাড়া আর অন্য কেউ হবে না। বৈদিক ভাষার প্রেরণা পরমাত্মাই করেছেন, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে পরমাত্মা এই ভাষাকে নিষ্প্রয়োজনে দেন নি, তিনি মানুষের উন্নতি করার জন্য এটা দিয়েছেন, তাই বেদ ভাষা হচ্ছে সার্থক আর সেই অর্থসহিত ভাষাকে বেদ, অর্থাৎ বেদজ্ঞান বলে। সংসারের মধ্যে যত ভাষা ছড়িয়ে রয়েছে সবগুলো সেই বৈদিক ভাষারই অপভ্রংশ। একইভাবে সংসারের মধ্যে গণিত, জ্যোতিষ, বৈদ্যক, দর্শন আর ধর্ম সম্বন্ধীয় যা কিছু জ্ঞান ছড়িয়ে রয়েছে সেটাও বেদেরই জ্ঞান থেকে ছড়িয়েছে। যে বৈদিক ঋষিরা সংসারের মধ্যে ভাষা, জ্ঞান, ধর্ম আর সভ্যতার বিস্তার করেছে, তারা বলে যে এই জ্ঞানের প্রচারকর্তা **"স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ"** অর্থাৎ পূর্বজদেরও গুরু হচ্ছেন পরমাত্মা। তারই শ্বাসভূত বেদের দ্বারা আদি সৃষ্টিতে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, এইজন্য নেচারবাদী যেমনটা বলেছে যে আরম্ভে মানুষ সবদিক দিয়ে সুখী ছিল, এটার কারণ হচ্ছে যে সেই পরমেশ্বরের দেওয়া বৈদিক জ্ঞানের দ্বারাই উন্নতি হয়েছিল আর তারই অনুসারে ব্যবহার হতো আর তাই তারা সবদিক থেকে সুখী ছিল। এই বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া উচিত যে, মানুষের সুখ-শান্তির সেই মার্গই উত্তম হতে পারে যেটা আদিমকালীন আর ঈশ্বরপ্রদত্ত বেদানুকূল হবে।

যদিও এটা সত্য যে বেদজ্ঞান ঈশ্বরীয় আর তারই অনুসারে মানুষের ব্যবহার হওয়া উচিত, কিন্তু আমরা দেখি যে আজ সংসারের মধ্যে নানা ধরনের ইচ্ছেমতো সভ্যতাকে স্থির রাখার জন্য প্রত্যেক জাতির লোকেরা নিজের-নিজের সন্তানকে নানা ধরনের প্রবৃত্তিকারী শিক্ষা দিচ্ছে। যদি তাদেরকে কেউ সেই শিক্ষার বিষয়ে এটা জিজ্ঞেস করে যে আপনারা কোন অধিকারে নিজের সন্তানদের এই ধরনের শিক্ষা দিচ্ছেন, তো তাদের কাছে কেবল এটা ছাড়া যে "সন্তানকে আমি জন্ম দিয়েছি আর পালন করেছি, এইজন্য আমার অধিকার আছে যে আমরা নিজের রুচি অনুসারে অমুক রীতি-নীতির শিক্ষা দিবো", আর কোনো অন্য উত্তর নেই, কিন্তু যদি কেউ পুনঃ প্রশ্ন করে যে সন্তানরা কি আপনার কাছে কোনো প্রার্থনা পত্র পাঠিয়ে ছিল যে আপনি আমাদের উৎপন্ন করুন, পালন করুন আর ইচ্ছেমতো পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে নিজের রুচি মতো বানিয়ে তুলুন, তখন কেবল এদিক-সেদিকের কথা বলা ছাড়া আর কোনো উত্তর বেরিয়ে আসে না, এইজন্য সংসারের কোনো জাতি বা মানুষের এই অধিকার নেই যে সে শিক্ষার নামে, সভ্যতার নামে আর ধর্মের নামে নিজের সন্তানকে বা সংসারের কোনো মানুষকে নিজের রুচির অনুসারে অমুক রীতি-নীতিকারী বানাবে, কারণ শিক্ষার ইচ্ছেমতো নীতি স্বীকার করে নিলে ভবিষ্যতে সন্তানকে কেবল নিজের মনোরঞ্জনের খেলনা বানিয়ে দিলে পরে সংসারে কখনও সুখ আর শান্তি স্থাপিত হবে না, অতএব শিক্ষা আর ধর্মপ্রচারের নীতি এরকম হওয়া উচিত যা সংসারে কোনো প্রাণীর প্রতিকূল না হয়। বৈদিক শিক্ষাই হচ্ছে এরকম শিক্ষা যা আদিসৃষ্টিতে পরমাত্মার পক্ষ থেকে প্রাণীমাত্রের সুখ-শান্তির জন্য দেওয়া হয়েছে, অতঃ সেই শিক্ষাই মানুষ আর অন্য প্রাণী সমুদায়ের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুকূল।

আমরা সংসারের মধ্যে দেখি যে সকল মানুষই দীর্ঘজীবন, জ্ঞান, মান, কাম, ন্যায় আর মোক্ষের ইচ্ছা করে আর অন্য সকল প্রাণী মান আর ন্যায় আদি বিষয়ের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘজীবনের কামনা একসমানই করে, এইজন্য সমস্ত মানুষকে দীর্ঘজীবন, জ্ঞান, মান, কাম, ন্যায় আর মোক্ষ-প্রাপ্তির সমান স্বত্ব দাতা আর সমস্ত প্রাণী সমূহকে পূর্ণ আয়ু বাঁচার সুবিধা প্রদানকারী হচ্ছে কেবল বেদের শিক্ষাই, অন্য নয়। বৈদিক শিক্ষাই হচ্ছে এমন শিক্ষা যা প্রাণীমাত্রকে দীর্ঘজীবনের সুবিধাকে ধ্যানে রেখে সমস্ত মানুষকে তার ইচ্ছার মধ্যে বিবেক উৎপন্ন করিয়ে আর সমান স্বত্ব দিয়ে সবাইকে মোক্ষের দিকে অগ্রসর করে।

মানুষের এই ইচ্ছা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে কাম, অর্থ আর মান আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান, ন্যায় আর দীর্ঘজীবন। কামের আরেক নাম হচ্ছে পূত্রৈষণা, অর্থের আরেক নাম হচ্ছে বিত্তৈষণা আর মানের আরেক নাম হচ্ছে লোকৈষণা। বৈদিক শিক্ষার অনুসারে এই তিনটি ঐষণা ত্যাজ্য। কামের জন্য গীতার (৩|৩৯) মধ্যে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে **"জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা"**, অর্থাৎ কাম হচ্ছে জ্ঞানীদের নিত্য শত্রু, এইজন্য বৃহদারণ্যকোপনিষদের (৪|৪|২২) মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"কিম্ প্রজয়া করিষ্যামঃ"**, অর্থাৎ সন্ততি হতে কি লাভ? একইভাবে অর্থের (ধন) জন্যও লেখা রয়েছে -

অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনম্ মানম্ চ মধ্যমা।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাম্ ধনম্।।

অর্থাৎ - অধম মানুষ ধনের ইচ্ছা করে, মধ্যম মানুষ ধন আর মানের ইচ্ছা করে আর উত্তম মানুষ কেবল

মানেরই ইচ্ছা করে। এখানে ধনকে নিকৃষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে আর মানকে উত্তম বলা হয়েছে, কিন্তু মনুস্মৃতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জন্য মানের ইচ্ছাও বিষের তুল্যই হানিকারক বলা হয়েছে। ভগবান্ মনু বলেছেন -

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা।।

(মনুঃ ২|১৬২)

অর্থাৎ - ব্রাহ্মণ মানকে সর্বদা বিষের সমান ভয় করবে আর অপমানকে সর্বদা অমৃতের সমান আকাঙ্ক্ষা করবে।

বৈদিক শিক্ষার এই আদর্শ থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে আর্যসভ্যতার মধ্যে কাম, অর্থ আর মানের জন্য কোনো স্থান নেই। বৈদিক আর্যসভ্যতার মূলপ্রচারক ভগবান্ মনু বলেছেন -

তমসো লক্ষণম্ কামো রহসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণম্ ধর্মঃ শ্রেষ্ঠ্যমেষাম্ য়থোত্তরম্।।

(মনুঃ ১২|৩৮)

অর্থাৎ - তমগুণের লক্ষণ হচ্ছে কাম, রজোগুণের অর্থ আর সতোগুণের ধর্ম। এই তিনটি উত্তরোত্তর একে-অপরের থেকে শ্রেষ্ঠ।

এই প্রমাণগুলো থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে আর্যসভ্যতার মধ্যে অর্থ, কাম আর মান, অর্থাৎ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণার অনেক ভরমারের মহত্ব নেই, কিন্তু ততোটুকুই অর্থ, কাম আর মানের মহত্ব রয়েছে যা ধর্মপূর্বক প্রাপ্ত হতে পারে, কারণ ধর্মপূর্বক অর্থ, কাম আর মানের সংগ্রহ দ্বারাই মানুষের আর অন্য প্রাণীদের এক সমান সুখ পাওয়া যেতে পারে আর সব প্রাণী নিজের ভোগকে প্রাপ্ত করার সঙ্গে পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারবে। একথা মৃত্যুর সময় ঠিক-ঠিকভাবে বুঝতে পারা যায়। সেই সময় সমস্ত ঐষণা বিদায় নিয়ে নেয় আর এই ভাবনা উদয় হয়ে যায় যে সমস্ত অর্থ, কাম আর মানকে দিয়েও যদি আরও দুটি দিন বাঁচার উপায় করা যায় তাহলে আমি অর্থ, কাম আর মানের ব্যর্থ মমতার প্রায়শ্চিত্ত করে নিবো, এইজন্য আর্যসভ্যতার মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি ঐষণার ত্যাগ আবশ্যক বলে দেওয়া হয়েছে, আর মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার দ্বিতীয় শ্রেণী যারমধ্যে জ্ঞান, ন্যায় আর দীর্ঘজীবন সম্মিলিত রয়েছে তাকে অনেক বড়ো মহত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানের স্থান খুবই উঁচুতে, কারণ জ্ঞান দ্বারাই ন্যায় আর দীর্ঘজীবনের মহত্ব বুঝতে পারা যায়। জ্ঞান দ্বারাই বুদ্ধি অর্থাৎ সত্ত্ব জাগ্রত হয় আর **"সত্ত্বস্য লক্ষণম্ ধর্মঃ"** এর অনুসারে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির যে উত্তম পরিণাম ধর্ম, তার প্রবৃত্তি হয়। ধর্মের প্রবৃত্তি থেকে সমস্ত প্রাণীদের প্রতি ন্যায়বুদ্ধি আর নিজের প্রতি দীর্ঘজীবনের অভিলাষা উৎপন্ন হয়। সমস্ত প্রাণীদের প্রতি ন্যায়ের অভিপ্রায় হচ্ছে এটাই যে কারও আয়ু আর ভোগের মধ্যে যেন কোনো বিঘ্ন না হয়, অর্থাৎ কোনো প্রাণীর স্বাভাবিক আয়ুতে যেন বাধা না পড়ে। এইভাবে ধার্মিক বুদ্ধির বিস্তৃত আর সূক্ষ্ম অবলোকনশক্তির কারণে অন্তিম আর প্রধান ধ্যেয় এটাই স্থির হয়ে যায় যে কেউ যেন কখনও না মরে। এই কখনও না মরার উদ্দেশ্যের সামনে অর্থ, কাম, মান, জ্ঞান আর ন্যায় সব ফ্যাকাশে হয়ে যায় আর সমস্ত বিভ্রান্তি শান্ত করে এই তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধ হয় যে সংসারের

মধ্যে কখনও না মরার ইচ্ছাধারাটা অবিচ্ছিন্নরূপে বয়ে চলেছে।

কখনও না মারা যাওয়ার এই অবিচ্ছিন্ন অভিলাষার স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এটাই যে কেউ যেন কখনও জন্ম না নেয় আর জন্ম না নেওয়ার অর্থটাও হচ্ছে এটাই যে একবার মরে আবার যেন মরতে না হয়, এইজন্য বলা হয়েছে **"কো বা মৃতা য়স্য পুনর্ন মৃত্যুঃ"**, অর্থাৎ মারা তো সে-ই গেছে যাকে আবার জন্ম নিতে হবে না, একেই অতিমৃত্যু বলে। এটাই হচ্ছে দীর্ঘজীবনের অভিলাষার রহস্য। এই অভিলাষার প্রেরণায় প্রত্যেক প্রাণী চায় যে আমার যেন কখনও মৃত্যু না হয়। লোকের অভিলাষাকারী সমস্ত প্রাণীর অন্তিম সম্মতি হচ্ছে এটাই যে কেউ কখনও না মরুক আর পরলোকের অভিলাষাকারীরও এটাই সম্মতি যে একবার মৃত্যুর পরে যেন আবার জন্ম নিতে না হয়, অর্থাৎ বর্তমান জীবন থেকে শুরু করে মৃত্যুর জীবনের পরে পর্যন্ত দীর্ঘজীবনের - কখনও না মরার অবিছিন্ন জীবনেচ্ছা সমস্ত প্রাণী সমুদায়ের মধ্যে সমান বিদ্যমান রয়েছে আর সবাই এই ইচ্ছার পূর্তির মধ্যেই লেগে থাকে যে আমার কখনও মৃত্যু না হোক। এই সর্বসম্মতি স্বীকৃত সিদ্ধান্তের অনুসারে সমস্ত সংসারের শিক্ষার মধ্যে কেবল বেদেরই শিক্ষা উপযোগী সিদ্ধ হয়, কারণ সেই শিক্ষাই এই লোকের মধ্যে সকলকে দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করার উপায় বলে আর সেই শিক্ষাই পরলোকের মধ্যেও সবাইকে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত করার উপায় বলে দেয়, এইজন্য এখন দেখা উচিত যে দুই লোকের মধ্যে দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করার জন্য সেই শিক্ষা কি কি উপায় বলে। দুই লোকের মধ্যে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত করার জন্য বৈদিক আর্য সভ্যতা সাত্ত্বিক আহার, উত্তম জলবায়ু আর উচিত শ্রমের সেবন, ব্রহ্মচর্যের পালন, চিন্তার ত্যাগ, সদাচার, সঙ্গীত আর প্রাণায়াম আদি সাত উপায়ের শিক্ষা দেয়, যা হচ্ছে সর্বমান্য। এইজন্য আমি এখানে কেবল এর সামান্য বর্ণনা করে বলে দিতে চাই যে এই সাতটি উপায় কিভাবে সবাইকে সমানরূপে দীর্ঘজীবন প্রাপ্তকারী হবে। সর্বপ্রথম উপায়টি হচ্ছে সাত্ত্বিক আহার। সাত্ত্বিক আহারের মধ্যে দুধ, দই, ঘী, ফল, ফুল আর হবিষ্যান্নকে ধরা হয়েছে। এখন দেশী আর বিদেশী সব বৈদ্য আর ডাক্তার স্বীকার করে নিয়েছে যে এই পদার্থের আহার দ্বারা মানুষ রোগী হয় না, সর্বদা স্বাস্থ্যবান থাকে আর দীর্ঘজীবি হয়। তাছাড়া এই সাত্ত্বিক আহারের কারণে বল, কান্তি, মেধা, রূপ, স্মৃতি আর ধারণা আদি অনেক দৈবী শক্তিও প্রাপ্ত হয়, এইজন্য দীর্ঘজীবন প্রাপ্তকারীর জন্য সর্বদা দুধ আর ফলেরই সেবন করা উচিত।

ভোজনের পরে দীর্ঘজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে বায়ু, জল আর পরিশ্রম। শহরের জল-বায়ু ভালো না, তাই শহরের বাইরে বনজঙ্গল বা অরণ্যের মধ্যে সাধারণ আর পরিষ্কার ঘরে বাস করা উচিত আর ফল তথা দুধ উৎপন্নকারী শ্রমকে মর্যাদার সঙ্গে করা উচিত। এই পদার্থ বন-বাগান আর চারণভূমির দ্বারা গাভীর থেকে পাওয়া যেতে পারে, এইজন্য বন-বাগান বানানো আর চারণভূমি বানানোর মধ্যেই শ্রম করা উচিত, উঠ-বস আর হকি, ক্রিকেট আদির মধ্যে নয়।

দীর্ঘজীবনের সহায়ক তৃতীয় উপায়টি হচ্ছে চিন্তার নিবৃত্তি। যে মানুষ সর্বদা চিন্তাগ্রস্থ থাকে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। কোনো এক কবি ঠিকই বলেছে যে -

চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা য়াতি গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবম্ চিন্তা দহতি জীবিতম্।।

অর্থাৎ - চিন্তা আর চিতার মধ্যে চিন্তাই হচ্ছে বড়ো, কারণ চিতা কেবল মৃতকেই জ্বালায়, কিন্তু চিন্তা তো জীবিত মানুষকেই জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। এইজন্য দীর্ঘজীবনের ইচ্ছুকদের সর্বদা চিন্তার ত্যাগ করে দেওয়া উচিত। যখন খাওয়ার জন্য বাগান থেকে ফল আর গাভীর থেকে দুধ পাওয়া যাচ্ছে তাহলে চিন্তা কিসের জন্য? চিন্তা তো হচ্ছে কেবল আহারের, কিন্তু **"কা চিন্তা মন জীবনে য়দি হরির্বিশ্বম্ভরো গীয়তে"**, অর্থাৎ যে পরমাত্মা জঙ্গল আর পশুদের প্রদান করে সারা বিশ্বের ভরণ-পোষণ করছে, তার রাজ্যে নিজের জীবনের জন্য কিসের চিন্তা? চিন্তা তো কামী, লোভী আর ঈর্ষা-দ্বেষ রাখে এরকম নীচদের হয়ে থাকে, কিন্তু যে অর্থ, কাম আর মানের ব্যর্থ পাখণ্ডকে ছেড়ে দিয়েছে তার জন্য চিন্তা করার আবশ্যকতা নেই, কারণ চিন্তা থেকে শোক আর শোক থেকে দৌর্বল্য প্রাপ্ত হয় আর শেষে জীবন নষ্ট হয়ে যায়, তাই দীর্ঘজীবনের ইচ্ছাকারীদের কখনও চিন্তা করা উচিত নয়।

দীর্ঘজীবনের চতুর্থ উপায়টি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। যোগশাস্ত্রের (২|৩৮) মধ্যে লেখা রয়েছে যে **"ব্রহ্মচর্য়প্রতিষ্ঠায়াম্ বীর্য়লাভঃ"**, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য থেকে বীর্য প্রাপ্ত হয় আর **"বীর্য়ে বাহুবলম্"**, অর্থাৎ বীর্য থেকে বল প্রাপ্ত হয়। বলবান মানুষই বাটিকা লাগাতে আর পশুর জন্য চারণভূমি বানানোর শ্রম করতে পারবে আর বীর্যবানরাই সর্বদা চিন্তামুক্ত থাকতে পারে, কারণ বীর্যের মধ্যে সবথেকে বড়ো গুণ হচ্ছে এটাই যে সেটা সর্বদা মানুষকে আনন্দিত রাখে। বীর্যের মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের আনন্দ থাকে যা মানুষকে সর্বদা প্রসন্ন রাখে আর চিন্তিত হতে দেয় না। তাছাড়া ব্রহ্মচারীরাই অনেক সন্তানের দুঃখ থেকে বাঁচতে পারে তথা তারাই অমোঘবীর্য হয়ে আবশ্যক আর উত্তম সন্তানকে উৎপন্ন করতে পারে, তারাই দীর্ঘাতিদীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করতে পারে। অথর্ববেদের (১১|৫|১৯) মধ্যে লেখা রয়েছে **"ব্রহ্মচর্য়েণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত"**, অর্থাৎ বিদ্বানেরা ব্রহ্মচর্য দ্বারাই মৃত্যুকে সরিয়ে দিতে পারে। এইজন্য দীর্ঘজীবনের অনুষ্ঠানকারীদের জন্য অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের অত্যন্ত আবশ্যকতা রয়েছে।

দীর্ঘজীবনের পঞ্চম উপায়টি হচ্ছে সদাচার। যে মানুষ চুরি, ব্যভিচার, অসত্য-ভাষণ, মদ্য-মাংসের সেবন, কলহ, লড়াই, আর অন্য অনেক ধরনের অসভ্যতা, অশিষ্টতা তথা ঈর্ষা-দ্বেষ আদি অনাচারকে করে আর সংযম, ব্রত, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আদি করে না, তাদেরও আয়ু ক্ষীণ হয়ে যায়, কিন্তু যে মানুষ সদাচার রত - আচরণশীল, চরিত্রবান, তারা দীর্ঘজীবি হয়, এতে সন্দেহ নেই। ভগবান্ মনু বলেছেন **"সদাচারেণ পুরুষঃ শতবর্ষাণি জীবতি"**, অর্থাৎ সদাচার দ্বারা মানুষ শত বছর বাঁচে। এর কারণ হচ্ছে এটাই যে যারা সদাচারের নিয়মে বাঁধা থাকে তারা মর্যাদিত আর ব্রতযুক্ত হয়, অতঃ তারা অবশ্যই দীর্ঘজীবি হয়, এইজন্য দীর্ঘজীবনের ইচ্ছাকারীদের সর্বদা সদাচারী হওয়া উচিত।

দীর্ঘজীবনের ষষ্ঠ উপায়টি হচ্ছে সঙ্গীত। সঙ্গীতের সদৃশ চিত্তকে প্রসন্নকারী আর কোনো বস্তু সংসারের মধ্যে নেই আর না প্রসন্নতার সমান বা আনন্দের সমান জীবনদানের দাতা কোনো ঔষধি রয়েছে, অতএব দীর্ঘজীবন দেয় এরকম সঙ্গীতের অভ্যাস করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। আর্যরা তাদের প্রত্যেক কাজের মধ্যে যে বেদের সস্বর পাঠের ক্রম রেখেছে, তার কারণ হচ্ছে এটাই। আর্য লোকেরা সারাদিন কোনো-না-কোনো বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্যেই থাকতো আর কোনো-না-কোনো বেদমন্ত্র গান করে থাকতো,

কিন্তু আজকাল বিদ্বানেরা সস্বরজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, এইজন্য বেদের পাঠ তেমনটা আনন্দ দেয় না, যতটা সঙ্গীতের সঙ্গে দিতো। দীর্ঘজীবনের ইচ্ছুক প্রত্যেক আর্যের উচিত যে তারা পরমাত্মার স্তুতি-প্রার্থনা আর উপাসনা সম্বন্ধিত বেদমন্ত্রকে সর্বদা স্বরের সঙ্গে নিয়ম মতো গান করার অভ্যাস করা। বৈদিক গানের দ্বারা হৃদয়ে আনন্দ আর মস্তিষ্কে উচ্চ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তার নিজের সমস্ত কাজকে নিয়মপূর্বক করার সূচনা প্রাপ্ত হতে থাকে আর সে দীর্ঘজীবনের উপায় করতে গিয়ে কখনও বিচলিত হয় না।

দীর্ঘজীবনের অন্তিম আর সপ্তম উপায়টি হচ্ছে প্রাণায়াম, কারণ প্রাণীদের আয়ু প্রাণের উপরেই অবলম্বিত। যে প্রাণী যতটা কম শ্বাস নেয় সে ততটাই অধিক বাঁচে। কচ্ছপ সবথেকে কম শ্বাস নেয়, এইজন্য সবথেকে বেশি দিন বাঁচে। প্রাণায়ামের দ্বারা দ্বিতীয় লাভটা হচ্ছে প্রাণপ্রদ বায়ুর সংগ্রহ। প্রাণপ্রদ বায়ু ভিতরে যাওয়াতে রক্তের মধ্যে প্রবাহমান মলের শুদ্ধি হয়, এইজন্য ভগবান্ মনু বলেছেন - যেভাবে অগ্নি ধাতুর মলকে জ্বালিয়ে দেয় সেইভাবে প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের মল নষ্ট হয়ে যায়। মল নষ্ট হতেই শরীর নিরোগ হয়ে যায় আর দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়ামের এই বিশেষত্ব এখন পশ্চিমের বিদ্বানদেরও জ্ঞাত হয়েছে, এইজন্য সেখানে এখন প্রাণায়ামের খুব প্রচার চলছে। সেখানকার লোকেদের প্রাণায়াম হতে দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে[Δ]। আমাদের দেশের মধ্যে তো পূর্ব সময়ে প্রাণায়ামের খুবই অধিক প্রচার ছিল। প্রত্যেক আর্যকে সকাল-বিকেল প্রাণায়াম করতেই হতো। এটাই হচ্ছে কারণ যে এখানে প্রাণায়ামের অন্তিম সীমা সমাধি পর্যন্ত লোকেদের ক্ষমতা হয়ে গেছিল। পাঞ্জাবকেশরী রানা রণজিৎ সিংহের সময়ে হরিদাস বৈরাগী শ্বাসরহিত হয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ভূমির ভিতরে থেকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে কিভাবে বিনা শ্বাসে মানুষ বাঁচতে পারে। এই চমৎকারটা সেই সময় যেই ইংরেজরা নিজের চোখে দেখেছিল, সেটা তারা ইতিহাসের মধ্যে লিখে রেখেছে[¶]। এই রকমই মাদ্রাজের এক যোগী আকাশে উড়ে আর কলকাতার

Δ "Young at sixty again". In an American monthly named Physical Culture, one writer under the above heading has written an elaborate article, the gist of which is that he suffered all sorts of ailments upto sixty, but when he took to deep breathing as advised by Dr. Bernard Macfadden, the premier physical culturist and prescriber of nature cure, he was fresh again. দিগ্বিবিজ্ঞান পৃষ্ঠা ৭৩

¶ Dr. McGregor says in his History of the Sikhs A noval scene occurred at one of these garden houses in 1837. A fakir who arrived at Lahore engaged to bury himself for any length of time shut up in a box, without food or drink. Ranjit disbelieved his assertions and determined to put them to proof; for this purpose the man was shut up in a wooden box which was placed in a small apartment below the level of the ground. There was a folding door to the box which was secured by a lock and key. Surrounding this apartment there was the garden house, the door of which was likewise locked and outside of this a high wall having the door built up with bricks and mud. Outside the whole there was placed a line of sentries, so that no one could approach the building.

The strictest watch was kept of the space for forty days and forty nights, at the expiration of which period the maharaja attended by his grandson and several of his sardars as well as General Ventum, captain Wade and myself proceeded to disinter the fakir. After the disenternment when the fakir was able to converse, the completion of the feat was announced by the discharge of guns and other demonstrations of joy; while a rich chain of gold was placed round his neck by Ranjit himself. - Reproduced from Hindu Superiority

ভূমিকৈলাসের এক য়োগী বিনা শ্বাসে মৃতবত্ হয়ে কতই-না ইউরোপনিবাসীদের চকিত করেছে, এইজন্য আর্যদের প্রাণায়ামবিদ্যা হচ্ছে সর্বদা সিদ্ধ। দীর্ঘজীবন বানিয়ে তুলতে এটা হচ্ছে তাদের অন্তিম উপায়। এই উপায় দ্বারা তারা এই লোকের মধ্যে দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করতো আর এর দ্বারাই সমাধিস্থ হয়ে পরমাত্মার দর্শন করে পরলোকের দীর্ঘজীবন মোক্ষও প্রাপ্ত করে নিতো। বলার অভিপ্রায় হল এই সাতটি উপায় দিয়ে দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হতে পারে। পূর্বকালে এর দ্বারাই আর্যরা দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করতো আর এখনও প্রাপ্ত করা যেতে পারে।

এই দীর্ঘজীবনের উপায়ের মধ্যে যদিও লোকেরই দীর্ঘজীবনের উপায় দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু যদি বিচার করে দেখা যায় তাহলে এই উপায়ই পরলোকের দীর্ঘজীবন অর্থাৎ মোক্ষও প্রাপ্ত করাতে পারে। মোক্ষ প্রাপ্তির সাধনও হচ্ছে এটাই। ফলাহার, সদাচার, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য, বেদপাঠ আর প্রাণায়াম (সমাধি) এগুলোও তো হচ্ছে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়, মোক্ষ প্রাপ্তিও তো এইসব উপায় দিয়েই হয়। এর কারণ হচ্ছে এটাই যে উভয় লোকের উদ্দেশ্য হচ্ছে দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করা। এখানেও মানুষ দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করতে চায় আর সেখান থেকেও কেউ মরার জন্য আসতে চায় না। এই ইচ্ছা কেবল মানুষেরই নয়, প্রত্যুত প্রাণী মাত্রের এটাই উদ্দেশ্য যে সবার দীর্ঘাতিদীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হোক, এইজন্য লোক আর পরলোক সম্বন্ধিত উভয় দীর্ঘজীবন একই প্রকারের উপায় দিয়ে মিলে যেতে পারে। যে উপায় উভয় প্রকারের দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করার জন্য বলা হয়েছে, সেই উপায়ের ব্যবহার করলে পরে না প্রাণীর আয়ু আর ভোগের মধ্যে ভিন্নতা আসবে আর না মানুষের মধ্যে অসমানতা উৎপন্ন হবে, প্রত্যুত সবার এক সমান দীর্ঘাতিদীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হবে আর সবাই শান্তির সঙ্গে মোক্ষাভিমুখী হয়ে যাবে।

এই লোক আর পরলোকের অমর জীবনধারাকে একটির মধ্যে মেশানোর জন্য আর অনন্ত জীবন প্রাপ্ত করার জন্য উপরিউক্ত যে সাতটি উপায়ের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সব উপায় মানবসমাজ তখনই পেতে পারবে যখন সংসারের মধ্যে আর্যসভ্যতার প্রচার হবে। আর্যসভ্যতার যে-যে প্রধান-প্রধান অঙ্গের দ্বারা প্রাণীমাত্রের লোক-পরলোকের অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হতে পারে, সেটা সংখ্যায় আঠ আর ব্রহ্মচর্য, সরলতা, পশুপালন, জঙ্গলরক্ষা, যজ্ঞ, সার্বভৌম রাজ্য, যুদ্ধ আর ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সম্বন্ধিত। এখানে আমি ক্রম দ্বারা এই আটটি অঙ্গের বর্ণনা করবো।

আর্যসভ্যতার মধ্যে সবথেকে প্রধান অঙ্গটি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা একজন আর্য বাল্যাবস্থা থেকেই গুরুর নিকট গিয়ে চারটি বিষয়ের অভ্যাস করে নেয়, যথা - (১) সে অনেক ধরনের বিদ্যা পড়ে, (২) সে বীর্যরক্ষার দ্বারা বল প্রাপ্ত করে, (৩) সে সরল আর তপস্বী জীবনের সঙ্গে থাকার অভ্যাস করে আর (৪) সে নিত্য সন্ধোপাসনা তথা প্রাণায়ামের দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত করার অভ্যাস করে। আর্যসভ্যতার সম্পূর্ণ ভবন এই চারটি অভ্যাসের উপরেই স্থির করা হয়েছে। এরমধ্যে বিদ্যার দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় আর ধর্ম জাগ্রত হয়, যার দ্বারা সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে প্রেম, দয়া আর সমানতার ভাব উৎপন্ন হয় আর তার থেকে কোনো প্রাণীর আয়ু আর ভোগের মধ্যে বিঘ্ন আসে না। বীর্যরক্ষার দ্বারা বল, অমোঘবীর্যত্ব আর তপস্বীজীবন তৈরি হয়, যা দিয়ে মানুষ নিজেরই পুরুষার্থ দ্বারা নিজের আবশ্যক অর্থকে উৎপন্ন করতে পারে, সন্ততিনিরোধের শক্তি উৎপন্ন হয় আর

ব্রহ্মবাদিনী, পতিব্রতা, সতী আর বিধবাধর্মপালনকারী স্ত্রীদের প্রাদুর্ভাব হয়, যার দ্বারা সংসারের মধ্যে চারিদিকে ধার্মিক বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়ে যায়। তপস্বীজীবনের কারণে শৃঙ্গারের অভাব হয়, মানুষের মধ্যে অসমানতাজন্য ঈর্ষা-দ্বেষ আর মদ-মত্সরের তিরোভাব হয় আর সংসার থেকে রোগ-দোষ, দুঃখ-দরিদ্রতার নাশ হয়ে যায় আর সমস্ত প্রাণী আনন্দের সঙ্গে নিজের জীবন-যাপন করে। সন্ধোপাসনা আর প্রাণায়ামের দ্বারা সদাচারের বৃদ্ধি হয় আর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয় যারদ্বারা সমস্ত শঙ্কার নিবৃত্তি হয় আর শেষে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের উক্ত চারটি সাধনের দ্বারা মানুষের জীবনকে সফল বানানোর যত বিষয় রয়েছে, সব প্রাপ্ত হতে পারে, এইজন্য আর্যরা নিজেদের সভ্যতার ভবনকে এই ব্রহ্মচর্যব্রতের আধারশিলার উপর স্থির করেছে আর ব্রহ্মচর্যকে সুদৃঢ় রাখার জন্য খুবই কড়া নিয়ম বানিয়েছে। মনুস্মৃতির মধ্যে লেখা রয়েছে -

অত ঊর্ধবম্ ত্রয়োঽপ্যেতে য়থাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য়বিগর্হিতাঃ॥

(মনুঃ ২|১৪)

অর্থাৎ - যে আর্য সন্তান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হয়ে ব্রহ্মচর্যব্রতের পালন করবে না, সে ব্রাত্য হয়ে যাবে আর আর্যসমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এটাই যে আর্যসভ্যতা বিনা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠায় পূর্ণরূপে সফল হতে পারবে না। এটাই হচ্ছে কারণ যে আর্যরা সবার আগে এটিকেই নিজের সভ্যতার প্রধান অঙ্গ বলে মেনেছে। আর্যসভ্যতার দ্বিতীয় প্রধান অঙ্গটি হচ্ছে সরলতা। আর্যদের তিনটি আশ্রমই হচ্ছে সরল-সাধারণ। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী আর সন্ন্যাসী মিলে সমস্ত আর্য জনসংখ্যার ৩/৪ ভাগ একদম সরল। এমনকি তাদের কাছে ঘর পর্যন্ত নেই। তারা সব ধরনের শৃঙ্গার আর বিলাস থেকে - পোশাক অথবা ঠাট-বাটের (সাজ-সজ্জা) থেকে দূরে। বাকি রইলো গৃহস্থোদের চতুর্থ ভাগ, সেটাও বিলাসী নয়, কারণ ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে আসা আর বানপ্রস্থ আশ্রমের মধ্যে শীঘ্রই যাওয়ার কারণে তথা রাত-দিন তাদের ঘরে ব্রহ্মচারী আর সন্ন্যাসীদের নিবাস হওয়ার কারণে তারা বিলাসী আর শৃঙ্গারপ্রিয় হতেই পারবে না। তারা তো উক্ত তিন প্রকারের তপস্বী আশ্রমি, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী আর হীনগুণ মানুষদের আর পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-পল্লবের সেবায় আর এরপর এদের সেবা করবে এরকম কেবল একটি সন্তান উৎপন্ন করে তাকে যোগ্য করে তোলার মধ্যেই দিন-রাত লেগে থাকে, এইজন্য আর্যগৃহস্থকে সরলতা থেকে সরে যাওয়ার সুযোগই পায় না। এরফলে এই সরলতার কারণে সমস্ত মানবসমাজ সমতার অলৌকিক সুখের উপভোগ করে আর খিদে তথা ঈর্ষা-দ্বেষাদি দুঃখের থেকে মুক্ত থাকে।

আর্যসভ্যতার তৃতীয় প্রধান অঙ্গটি হচ্ছে পশুপালন। যেভাবে সরলতার দ্বারা মানবসমাজ সুখ পায়, ঠিক সেইভাবে পশুপালনের দ্বারা গ্রাম্য পশুরা সুখ পায়, অতঃ গ্রাম্য পশুদের সেবা করা আর্যরা নিজেদের বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করে। এই কর্তব্য আর্যরা নিরর্থকই মেনে নেয়নি, প্রত্যুত তার দুটি কারণ ছিল। একটি কারণ তো হচ্ছে যে আর্যদের বিশ্বাসানুসারে সমস্ত পশু হল পূর্বজন্মের মানুষ আর পাপের কারণে এই য়োনিগুলোর মধ্যে উৎপন্ন হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্য করছে আর দ্বিতীয় কারণ ছিল যে যাদের সঙ্গে পূর্বজন্মে

অনুচিত ব্যবহার করেছিল আর হানি করেছিল, তাদের এইজন্মে সেই হানির প্রতিফল দেওয়ার জন্য এসেছে, এইজন্য এদেরকে এদের ভোগ দিয়ে পূর্ণ আয়ু জীবিত থাকার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই বিশ্বাসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে আর্যরা পশুপালনকে নিজের ধর্ম মেনে নিয়েছিল আর তাদের সহায়তা করে নিজের আর্থিক সমস্যাকে সহজেই সমাধান করে নিয়েছিল। পশুদের থেকে আহার আর বস্ত্রের জন্য দুধ, দই, ঘী, হবিষ্যান্ন আর উল আদিকে নিয়ে তথা তাদের বাহন, বোঝা তুলতে, কৃষি, পাহারা আর পরিচ্ছন্নতার কাজে লাগিয়ে নিজেদের সরল আর তপস্বীজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত সমস্ত অর্থকে সিদ্ধ করে নিয়েছিল।

আর্যসভ্যতার চতুর্থ প্রধান অঙ্গটি হচ্ছে বনের রক্ষা আর বাটিকা (বাগান) লাগানো। বন আর বাগান থেকে ফল, অন্ন আর পশুচারণ যোগ্য তৃণের প্রাপ্তি হয়। এই কারণেই আর্যদের তপস্বীসমাজ বনস্থ হয়ে বনের মধ্যেই নিবাস করতো আর তাদের পশুও বনের মধ্যে চরে বেড়াতো। এর অতিরিক্ত বন থেকে যে আরেকটা লাভ রয়েছে সেটা হচ্ছে হাওয়ার শুদ্ধি। সংসারের যত প্রাণনাশক বায়ু উৎপন্ন হয়, সেই সবকে বৃক্ষই খেয়ে ফেলে আর তার পরিবর্তে প্রাণপ্রদ বায়ু দেয়। এই কারণেই বায়ুর অশুদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন হওয়া রোগ বনের মধ্যে হয় না। এরকমই বন থেকে তৃতীয় লাভটা হচ্ছে বর্ষা সম্বন্ধিত। বর্ষারও বনের জন্যই হয়। "হার্ম্সবর্থ হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ড" এরমধ্যে লেখা রয়েছে যে বর্ষার ন্যুনাধিকতা উৎপন্ন করা মানুষের হাতে, যদি বর্ষা কম করতে হয় তাহলে বন কেটে ফেলো আর যদি বর্ষা অধিক বর্ষণ করতে হয় তাহলে বন লাগিয়ে দাও[Δ]। যেমন-যেমনটা ভাবে বন কেটে ফেলা হয় আর খেতি বৃদ্ধি পেতে থাকে সেরকম-সেরকমটা ভাবেই বর্ষা কমে যাচ্ছে আর সংসার থেকে জল-সম্বন্ধীয় আর্দ্রতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। "জ্যোতি" নামক মাসিক পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সম্বত্ ১৯৭৯ তে লেখা রয়েছে যে "মিস্টার মার্টলের কথন হচ্ছে জল কমে যাচ্ছে, ভূমি শুকনো হচ্ছে আর জল উড়ে যাচ্ছে। সাহারাতে যে বড়ো-বড়ো ফাটল ছিল আর যারমধ্যে যে জল সবসময় থাকতো তা শুকনো হয়ে যাচ্ছে। Grand Canon এর নদী শুকিয়ে যাওয়া আর তার স্থানে কেবল Great Salt Lake রয়ে যাওয়া, তথা প্রাবৈন্সের তরাই, আফ্রিকার বেশ কয়েকটি স্থান আর মধ্যএশিয়ায় জল শুকিয়ে যাওয়া এসবই হচ্ছে আগামী দুর্ঘটনার চিহ্ন। যদিও কয়েকটি স্থানের মধ্যে তো লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে অথবা ভূবিদ্যার ত্রেতাযুগ (Quaternary period) থেকে শুকিয়ে যাওয়ার ক্রিয়া জারি আছে; কিন্তু কয়েকটি স্থানের মধ্যে দেখতে-দেখতে অর্থাৎ ঐতিহাসিক সময় থেকেই জল শুকিয়ে যাওয়া আরম্ভ হয়েছে। জল শুকিয়ে যায় তিনটি কারণে - কম বর্ষা, বনের নাশ আর খেতির বিস্তার।" বনের মধ্যে অধিক বৃষ্টি হওয়ার কারণ বেদের মধ্যেও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে -

অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধবম্ স্তূপম্ দদতে পূ ত দক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ।।

(ঋঃ ১|২৪|৭)

Δ Those features are permanent qualities which man can effect only to a limited extent as when he reduces the rain fall a little by cutting down forests or increases it by planting them.
- Harmsworth History of the World p.33

অর্থাৎ - অবর্ষণের সময়ে পবিত্রকারী বরুণ (রাজা) বনের উপরে স্তূপ - জলরাশি দেয় আর নিচে পড়তে থাকা জলধারা সেই স্তূপে থাকে, যাকে মহাকাশের মধ্যে থাকা কিরণ নিয়ে আসে। তাৎপর্য হল, সূর্যের কিরণ মহাকাশে জলের সঞ্চয় করে অবর্ষণের সময়েও বর্ষাকে বনের উপর পড়ার প্রেরণা করে, এইজন্য বনের মধ্যে কখনও অবর্ষণ হয় না, কিন্তু যেখানে বন নেই, কেবল খেতি হয় সেখানে যেভাবে অনাবৃষ্টির জন্য দুষ্কাল হয়, সেইরকম অতিবৃষ্টির জন্যও দুষ্কাল হয়, কিন্তু বনের মধ্যে অনাবৃষ্টি তো হয়ই না, প্রত্যুত অতিবৃষ্টির দ্বারাও দুষ্কাল হয় না, কারণ অতিবৃষ্টির ফলে ঘাস আর বনবৃক্ষ অধিক বাড়তে থাকে, যারদ্বারা ফল প্রাপ্ত হয় আর গৌচারণের দ্বারা দুধ প্রাপ্ত হয়, এইজন্য আর্যরা নিজেদের সভ্যতার মধ্যে বনরক্ষাকে মহত্ব দিয়েছে।

আর্যসভ্যতার পঞ্চম প্রধান অঙ্গটি হচ্ছে যজ্ঞ। যদিও যজ্ঞের অর্থ অনেক বড়ো, তবে এখানে যজ্ঞের অর্থ হবে ইচ্ছানুসারে জল বর্ষানো। আর্যদের সভ্যতার মধ্যে ইচ্ছানুসারে জল বর্ষানো হল একটি বিশেষ আবিষ্কার। আর্যসভ্যতার মধ্যে এই আবিষ্কারের মহত্ব এই কারণে যে, মানুষের নির্বাহ পশুর উপর, পশুদের বৃক্ষের উপর আর বৃক্ষের বর্ষার উপর অবলম্বিত। তাই যদি জল না বর্ষে তাহলে বৃক্ষের অভাব হবে আর বৃক্ষের অভাবে পশুদের আর পশুদের অভাবের কারণে মানুষের অভাব হবে। বলার তাৎপর্য হল প্রাণীমাত্রের নির্বাহ কেবল বর্ষার উপরেই অবলম্বিত, এইজন্য আর্যরা ইচ্ছানুসারে জল বর্ষণের আবিষ্কার করেছিল। এই বিদ্যার আবিষ্কার আর্যদের মৌলিক জ্ঞান - যজ্ঞের দ্বারা হতো। যজ্ঞের দ্বারাই ইচ্ছানুসারে জলবর্ষণ করা হতো। শতপথব্রাহ্মণ ৫|৩|৫|১৭ তে লেখা রয়েছে যে **"অগ্নের্বৈ ধূমো জায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্ বৃষ্টিঃ"**, অর্থাৎ অগ্নি হতে ধূম, ধূম হতে মেঘ আর মেঘ হতে বৃষ্টি হয়। একথাই মনুস্মৃতির মধ্যে এইভাবে লেখা রয়েছে -

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নম্ ততঃ প্রজাঃ।।
(মনুঃ ৩|৭৬)

অর্থাৎ - অগ্নিতে দেওয়া আহুতি সূর্যের কিরণে পৌঁছায় আর সূর্যের কিরণের দ্বারা বৃষ্টি হয় তথা বৃষ্টির দ্বারা অন্ন আর অন্নের দ্বারা প্রজা উৎপন্ন হয়।

একথাই ভগবদ্গীতার মধ্যে এইভাবে রয়েছে -

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্ন সম্ভব।
য়জ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো য়জ্ঞঃ কর্ম সমুদ্ভবঃ।।
(গীতাঃ ৩|১৪)

অর্থাৎ - অন্নের দ্বারা সব প্রাণী উৎপন্ন হয়, অন্ন বর্ষার দ্বারা উৎপন্ন হয়, বর্ষা যজ্ঞের দ্বারা উৎপন্ন হয় আর যজ্ঞ কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

এই বর্ণনাগুলো থেকে জানা যাচ্ছে যে আর্যরা কোনো বিশেষ প্রকারের যজ্ঞ দ্বারা ইচ্ছানুসারে জল বর্ষণের বিদ্যা খুঁজে বের করেছিল। এই ধরনের বিদ্যা অসম্ভব নয়। এই যুগেও কিছু মানুষ ইচ্ছানুসারে

জলবর্ষণ করতে পারে। ঋগ্বৈদিক ইন্ডিয়াতে বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস বলেছেন *"এই সময়েও জঙ্গলী জাতির মধ্যে বর্ষা বর্ষণকারী উপস্থিত রয়েছে। এরা বর্ষা-ক্রিয়া করে আর জলবর্ষণ করে দেয়। জঙ্গলী জাতিদের মধ্যে এর খুব মান রয়েছে''*©**।** এরকমই একটি বর্ণনা লাহোরের "কর্মবীর" পত্রের ২৪ মার্চ সন ১৯২৮ তারিখে ছেপে ছিল। তারমধ্যে লেখা রয়েছে যে "সন ১৯২১ কেলিফর্নিয়াতে মিস্টার হ্যাডফিল্ড বলেছেন যে আমি আকাশে জল বর্ষণ করতে পারি। সেখানকার কৃষকরা দুই সহস্র পাউন্ড দিয়ে নিজেদের ওখানে জলবর্ষণ করতে বলে। লেখা-লেখি হয়ে যাওয়ার পর টাকা ব্যাংকে জমা করে দেওয়া হয়। মিস্টার হ্যাডফিল্ড একটি বিশাল ঝিলের পাশে জনশূন্যস্থানে নিজের ঘর বানান আর নিজের ক্রিয়া আরম্ভ করে দেন। তৃতীয় দিনেই জলের বৃষণ শুরু হয়ে যায় আর তিনি দুই সহস্র পাউন্ড টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেন। মিস্টার হ্যাডফিল্ড জল বর্ষণের বিদ্যাকে সিদ্ধ করেছেন। তিনি জল বর্ষণের পাঁচশ প্রয়োগ করেছিলেন। প্রত্যেকবার তিনি সফল হয়েছেন। তিনি উঁচু-উঁচু স্থানে বা মিনারের উপর আগুন জ্বালিয়ে কিছু এরকম পদার্থ দিয়ে দেন যার দ্বারা বাষ্প সঘন হয়ে বর্ষণ হতে থাকে।" এই বর্ণনা থেকে জ্ঞাত হচ্ছে যে বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া অথবা যজ্ঞের দ্বারা ইচ্ছানুসারে জল বর্ষণ হওয়া সম্ভব। এরকমই কোনো ক্রিয়ার দ্বারা পূর্বকালীন আর্যরাও ইচ্ছানুসারে জলবর্ষণ করতো। বেদের মধ্যে যে **"নিকামেনিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু"** (যজুঃ ২২|২২) লেখা রয়েছে, তার তাৎপর্যও হচ্ছে এটাই যে যখন-যখন বর্ষার কামনা করা হয় তখন-তখন যজ্ঞের দ্বারা জলবর্ষণ হয়। জল বর্ষণকারী যজ্ঞের মধ্যে ঘিয়ের অনেক বড়ো খরচ হয়ে যায়, কারণ ঘিয়ের মধ্যে হাওয়াকে থামিয়ে রাখতে আর অন্য তরল পদার্থকে নিজের সঙ্গে জমিয়ে দেওয়ার গুণ রয়েছে, এইজন্য অগ্নির দ্বারা আকাশের মধ্যে ঘী এতটাই অধিক ফেলে দেওয়া হয় যে সেটা ঘৃতবাষ্প হয়ে উপরের দিকে নিজের একটি সোজা মার্গ বানিয়ে নেয়, যার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। ঘিয়ের বায়ুপ্রতিরোধক গুণ আমরা প্রতিদিন নিজেরাই অনুভব করে দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই যে শীতের দিনে বায়ুপ্রবেশ থেকে বাঁচার জন্য আমরা ঘী, মাখন, মালাইকে মুখে আর হাতে পায়ের মধ্যে লাগিয়ে থাকি যাতে বায়ু জন্য ত্বক না ফাটে। দ্বিতীয় অনুভব আমরা ঘিকে একটি বাটির মধ্যে ভরে আগুনের মধ্যে দিয়ে দেখতে পারি। একই সঙ্গে একটি বাটির মধ্যে জল ভরে আর অন্যটিতে ঘী ভরে আগুনের উপর রেখে দিলে আমরা দেখতে পাই যে ঘী শান্তরূপে ধীরে-ধীরে জ্বলে কমে যাচ্ছে, কিন্তু জলের বাটির মধ্যে ছোটো-ছোটো বুদবুদ উৎপন্ন হচ্ছে। বুদবুদ বাড়তে থাকে, ফাটতে থাকে আর জল কমে যায়। জলের মধ্যে বুদবুদ উৎপন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে জলের মধ্যে হাওয়ার প্রবেশ আর ঘিয়ের মধ্যে বুদবুদ না হওয়ার কারণ হল হাওয়ার প্রতিরোধ। জলের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করতে পারে কিন্তু ঘিয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এই দুই অনুভবের দ্বারা জ্ঞাত হয় যে ঘিয়ের মধ্যে বায়ু প্রতিরোধের গুণ রয়েছে। এই কারণেই অগ্নি দ্বারা আকাশের মধ্যে যখন ঘী ছড়ানো হয় তখন নিজের ভিতরে বায়ুকে ঢুকতে দেয় না আর দূরে পর্যন্ত উপরের দিকে এক সোজা স্তূপাকার মার্গ বানিয়ে দেয়। যার ফলে

© Even in modern time, the rain maker is the most important person among savage tribes. He pronounces incantation and performs mysterious rites with the object of bringing down rain from the heaven. He is the priest in embryo and weilds great influence in savage society. - Rigvedic India, p.555

নিচের সঘন বায়ু বিরল হয়ে উড়ে যায় আর সেই ঘৃতমার্গের মধ্যে আকাশস্থিত জলবাষ্প ভরে যায় আর ঘিয়ের মধ্যে জলকে জমিয়ে দেওয়ার শক্তি থাকার কারণে জলবাষ্প সঘন হয় আর জল হয়ে বর্ষণ হতে থাকে। ঘিয়ের মধ্যে জলকে জমিয়ে দেওয়ার শক্তিটাও সকলে অনুভব করে থাকি। আমরা দেখি যে শীতের দিনে ঘিয়ের সঙ্গে ছাচের জলও জমে যায়। যেভাবে শীতে ঘী জমে যায় সেইভাবে উপরের জলবাষ্পের শীতলতায় ঘৃতবাষ্পও জমে যায় আর নিজে জমাটবাঁধার সঙ্গে-সঙ্গে জলবাষ্পকেও সঘন বানিয়ে দেয় আর জলের রূপে বর্ষণ করে। অনুমান হচ্ছে যে প্রাচীন আর্যরা ঘৃতের এই গুণের সঙ্গে অন্য এরকমই পদার্থের গুণের সংগ্রহ করে কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ায় জল বর্ষণের বিদ্যা সিদ্ধ করে নিয়েছিল, যার দ্বারা ইচ্ছানুসারে জলবর্ষণ করতো আর জল দ্বারা বনবৃক্ষকে, বনবৃক্ষ দ্বারা পশুদের আর পশু তথা বনবৃক্ষের দ্বারা সমস্ত মানুষের অর্থকষ্টকে দূর করে দিতো।

আর্য সভ্যতার ষষ্ঠম প্রধান অঙ্গটি হচ্ছে সার্বভৌম রাজ্য। আর্যদের বিশ্বাসানুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সংসারের মানুষের শাসন একই রাজ্যের দ্বারা না হবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সংসারের মানুষ একই রীতি-নীতির না হবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত সব মানুষ একে-অপরের জন্য ত্যাগভাবের সঙ্গে ব্যবহার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই সুখ-শান্তি পাবে না আর না আর্যদের আদর্শ নীতি জগৎব্যাপী হতে পারবে। এই জগৎব্যাপী ঐক্যতা সার্বভৌম চক্রবর্তী রাজ্য দ্বারাই স্থাপিত হতে পারে। এই কারণেই পূর্বকালে সার্বভৌম রাজ্য স্থাপিত করার অনেক বড়ো প্রচেষ্টা করা হতো। তাদের আদিমকালিক ইতিহাসে অনেক চক্রবর্তী রাজাদের বর্ণনা পাওয়া যায়, যার দ্বারা সিদ্ধ হচ্ছে যে তারা নিজের শুভ সংকল্পে কৃতকার্য হয়েছিল আর জগৎব্যাপী সভ্যতা স্থাপিত করতে পেরেছিল।

আর্যদের সভ্যতার সপ্তম প্রধান অঙ্গটি হচ্ছে যুদ্ধ। এটাকে আপদ্ধর্ম মানা হয়েছে। যেভাবে ভিন্ন বিপদের সময়ে ভিন্ন আপদ্ধর্মের যোজনা হয়ে থাকে, সেইভাবে অসভ্য, বর্বরকে শিক্ষিত করার জন্য যুদ্ধের প্রয়োগও স্বীকার করা হয়েছিল। যুদ্ধের দ্বারা আর্যরা সর্বদা আততায়ী, বর্বরদের বশ করে রাখতো। এই কারণেই আর্যসভ্যতার মধ্যে যুদ্ধনিপুণ যোদ্ধার বড়ো মান রয়েছে। যে আর্য যুদ্ধে ভয় পেতো সে আর্য বলার অধিকারী থাকতো না। এই কারণেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের থেকে সরে যেতে দেখে বলেছিলেন যে - **"অনার্য়জুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন"** (গীতাঃ ২|২), অর্থাৎ হে অর্জুন! তোমার এই কথাগুলো অস্বর্গ্য, অপ্রীতিকর আর অনার্যদের মতো। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ভীতুকে অনার্য বলা হয়েছে আর দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি আর এরকমই অন্য আততায়ীদের বর্বর বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে যে যুদ্ধ হল আর্যসভ্যতার একটা বিশেষ অঙ্গ, কারণ বিনা যুদ্ধ করে - বিনা বর্বরদের শিক্ষা দিয়ে সরল সাধারণ আর্যসমাজ সুখ-শান্তি পাবে না আর না চক্রবর্তী রাজ্য স্থাপিত হতে পারবে। এই কারণেই আর্যরা নিজেদের সভ্যতার মধ্যে যুদ্ধকে অবশ্যক বলে মেনেছে।

আর্যদের সভ্যতার অন্তিম আর অষ্টম অঙ্গটি হচ্ছে ধর্ম প্রচার। ধর্ম প্রচারের দ্বারা আর্যরা নিজেদের বিচার আর আচরণ সংসারের মধ্যে প্রচার করতো। যেভাবে যুদ্ধের দ্বারা আততায়ী, বর্বরদের আর্যদের রাজা শিক্ষিত করতো, ঠিক সেইভাবে ধর্ম প্রচারের দ্বারা সভ্য মানুষদের আর্যদের পরিব্রাট্ শিক্ষিত করতো। যখন

কোনো বর্বর তাদের অত্যাচার করতো তখন তাকে যুদ্ধের দ্বারা পরাস্ত করতো আর যখন কোনো সভ্যজাতি কোনো রাজনৈতিক চাতুর্য দ্বারা তাদের বা তাদের সভ্যতার নাশ করতে চাইতো তখন তারা তাকে নিজেদের ধার্মিক আচরণ-প্রচারের দ্বারা বশ করতো আর নিজের সভ্যতার রক্ষা করে নিতো। একথার উদাহরণ আজ আমরা নিজের চোখে দেখছি। আজ আমরা প্রাচীন আর্যসভ্যতার কেবল একটা ছোট্ট অঙ্গ চরকা আর তাঁতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপের সভ্যজাতিদের যান্ত্রিক কুচক্রকে ঢিলে করে দিয়েছি। এই ভাবেই যদি আমরা বৈদিক আচরণ-ব্যবহারের অনুসারে অর্থ আর কাম সম্বন্ধিত প্রত্যেক ব্যবহারের মধ্যে নিজেদের প্রাচীন আর্যদের মতো সরল জীবনযাপন বানিয়ে নেই, আর নিজেদের প্রাচীন আর্যদের মতো তপস্বীজীবন যাপন করি তাহলে বিনা কোনো কামান-বন্দুক, বিনা কোনো যুদ্ধোপকরণে আমরা না কেবল ইউরোপের বর্তমান নীতিকে পরাস্ত করে তার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো, প্রত্যুত সংসারের অর্থ আর কাম-সম্বন্ধীয় একটা অনেক বড়ো আর আবশ্যক সমস্যাকে সমাধান করতেও সক্ষম হতে পারবো, যেই সমাধানের খোঁজে ইউরোপের উচ্চ মস্তিষ্ক এক শতাব্দী ধরে ব্যগ্র আর নানা প্রকারের শিক্ষা, সভ্যতা আর ব্যবস্থার প্রচার করে-করে সংসারকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে।

এটাই হল বৈদিক আর্যসভ্যতার প্রধান অঙ্গ আর এই অঙ্গকেই স্বীকার করার কারণে আর্যরা নিজেদের রক্ষা করার সাথে দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করতো আর এই সময়েও প্রাপ্ত করতে পারবে, এইজন্য আমি এই পুস্তকের উপক্রমে সেই নেচারবাদীদের রীতি-নীতি, আচরণ-ব্যবহার আর জীবনযাপনের উল্লেখ করেছি আর তারমধ্যে যেসব ত্রুটি রয়েছে সেটা তুলে ধরেছি, তার পূর্তি বিনা বৈদিক আর্যদের এই সভ্যতাকে পূর্ণরূপে স্বীকার করে আর বিনা আর্যদের বর্ণাশ্রমব্যবস্থাকে গ্রহণ করে হওয়া সম্ভব নয়। তা যত ধরনের শিক্ষাই প্রচলিত হোক না কেন তারদ্বারা সংসারের সমস্ত মানুষ আর অন্য সমস্ত প্রাণীদের লোকের সম্বন্ধীয় দীর্ঘজীবন সমস্যা আর পরলোক সম্বন্ধীয় অনন্ত জীবন সমস্যা প্রলয়কাল পর্যন্ত সমাধান হবে না। এই সমস্যাগুলোকে আর্যদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই সরলতার সঙ্গে সমাধান করতে পারে আর এমন একটি মার্গ বানিয়ে দিতে পারে যার দ্বারা খুব সহজে নিজের সমাজের রক্ষা করার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ আদি সমস্ত প্রাণী লোক আর পরলোকের সম্পূর্ণ সুখকে প্রাপ্ত করতে পারে। এটাই হচ্ছে শান্তির আসল উপায় আর এটাই এই পুস্তকের উপক্রমের উপসংহার। অতএব প্রাচীন আর্যসভ্যতা প্রেমীদের সারা সংসারে ছড়িয়ে দিন আর সবাইকে লাভ পৌঁছে দিয়ে এই সংসারকে একবার পুনঃ আদর্শের সঙ্গে পূর্ণ করুন। পরমাত্মার অনেক দয়া আর বিদ্বানদের অসীম সহানুভূতির দ্বারা আমাদের এই আন্তরিক ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হোক।

ইত্যোম্ শম্।।

ওতম্ আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তামা রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূরऽইষব্যোऽতিব্যাধী মহাররথো জায়তাম্ দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢানড্বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্য়োষা জিষ্ণূ রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো য়ুবাস্য য়জমানস্য বীরো জায়তাম্ নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু ফলবত্যো নऽওষধয়ঃ পচ্যন্তাম্ য়োগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্।। - য়জুঃ ২২|২২